ছত্রাক পরিচিতি

মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

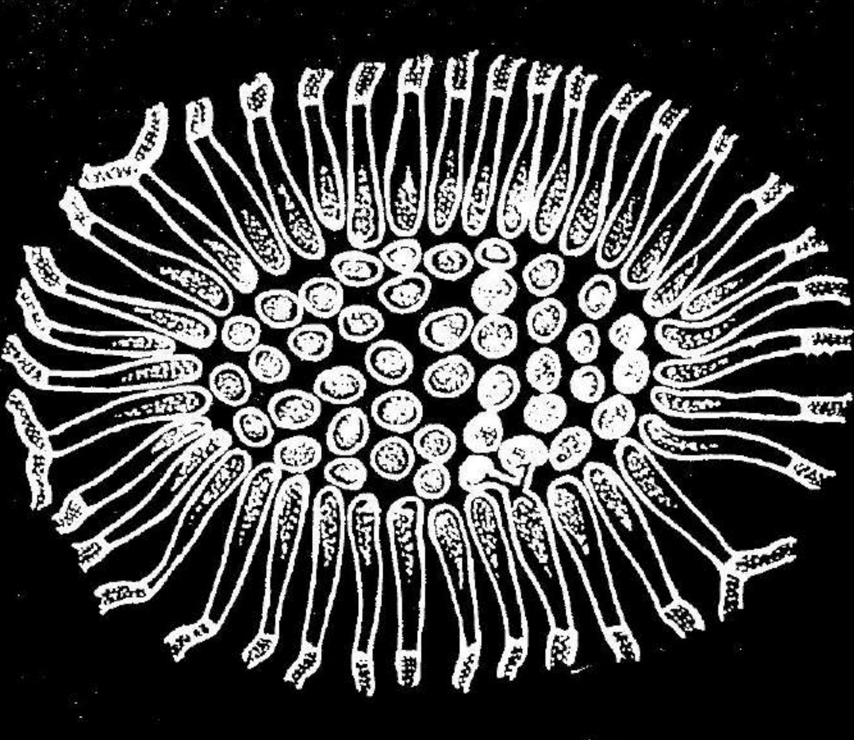

ছত্রাক পরিচিতি

[১ম খণ্ড]

মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

সহকারী অধ্যাপক

শেরপুর ডিগ্রি কলেজ

শেরপুর, বগুড়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

কপি-২
১৪/৭/০৫

ছত্রাক পরিচিতি [১ম খণ্ড]
[ছত্রাকের গঠন ও পরিচিতিবিষয়ক]

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৯ / জুন ২০০২

বাএ ৪২৭০
(২০০১–২০০২ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ৪)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ২৯৬

প্রকাশক
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
শা. র. শামীম

মূল্য
দুইশত আশি টাকা মাত্র

BANSDOC Library
18244
10.6.04

CHATRAK PARICITI (Introduction to Mycology) vol. I by Muhammed Abul Kalam Azad. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2002. Price : Taka 280.00 only.

ISBN 984-07-4279-5

উৎসর্গ

ডাঃ সালমা বিলকিস
ও
আমার পরিবারের সকল সদস্যকে

ভূমিকা

উদ্ভিদ রাজ্য বিশাল এবং প্রায় সর্বব্যাপী। এ বিশ্বের সুবিশাল স্থলভাগ তো বটেই, জলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলেও উদ্ভিদের কোনো না কোনো সদস্য বা তাদের রেণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সুবিস্তৃত এবং সুবিশাল ব্যাপ্তির উদ্ভিদরাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হলো ছত্রাক।

ছত্রাক বা ফানজাই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো মাশরুম বা ব্যাঙের ছত্রাকসদৃশ বস্তু। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ আরো ব্যাপক। সার্বিকভাবে বলা যায়, ফানজাই বা ছত্রাক হলো থ্যালাসসদৃশ, ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদগোষ্ঠী, যারা ভূঁইফোঁড়ের মতো দ্রুত গজিয়ে উঠে ও দ্রুত মরে যায়। ছত্রাক নানা পরিবেশে নানা জৈব পদার্থে মৃতজীবী বা পরজীবীরূপে বাস করে। কখনো কখনো উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে এরা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিও সৃষ্টি করে থাকে। এরা কখনো স্বভোজী নয় বরং পুষ্টির ক্ষেত্রে সর্বদাই পরনির্ভরশীল থাকে। বিজ্ঞানী Alexopoulous-এর মতে, কেন্দ্রিকাযুক্ত, রেণু বহনকারী, ক্লোরোফিলবিহীন জীব যারা সাধারণত যৌন ও অযৌনভাবে জনন কাজ সম্পন্ন করে এবং যাদের শাখান্বিত সূত্রাকার দেহের গঠন সেলুলোজ বা কাইটিন বা উভয় প্রকার পদার্থযুক্ত কোষপ্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে, তাদের ছত্রাক নামে অভিহিত করা যায়।

সাধারণভাবে ছত্রাক সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে ছত্রাকবিজ্ঞান বা মাইকোলজি নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ছত্রাক সম্পর্কে রীতিবদ্ধ অধ্যয়নই ছত্রাকবিজ্ঞান নামে অভিহিত। যাঁরা ছত্রাকবিজ্ঞান তথা ছত্রাকের গঠন, জনন, শারীরবৃত্ত ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ নিয়ে গবেষণা করেন বা ছত্রাক সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁদের ছত্রাকবিদ বলে।

ছত্রাক বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ। এগুলোর আকার, আয়তন, গঠন প্রকৃতি ও জীবনযাপনে বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে। ছত্রাকের ইতিহাস সুপ্রাচীন। গ্রিক, রোমান এবং চীনদেশের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ছত্রাকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে ছত্রাকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, প্রকৃতি এবং ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণী, গোত্র ইত্যাদি নিয়ে এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে একে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। ছত্রাক পরিচিতি-এর ১ম খণ্ডের আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে ছত্রাক পরিচিতি, মিক্সোমাইকোফাইটা, ইউমাইকোটিনা, কাইট্রিডিওমাইসেটিস, প্লাজমোডিওফোরোমাইসেটিস, উমাইসেটিস, জাইগোমাইসেটিস, অ্যাসকোমাইসেটিস, হেমিঅ্যাসকোমাইসেটিডি, ইউঅ্যাসকোমাইসেটিডি ইত্যাদি। ছত্রাক পরিচিতি-এর ২য় খণ্ডের আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে হাইমেনোঅ্যাসকোমাইসেটিস, ডিসকোমাইসেটিস, বেসিডিওমাইসেটিস (উন্নত ছত্রাক), হেটারোবেসিডিওমাইসেটিডি, ডিউটেরো-মাইসেটিস এবং লাইকেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছত্রাকবিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত কোনো গ্রন্থ নেই। এ ধরনের গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদার আলোকে বর্তমান গ্রন্থটি রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যসূচির আলোকে যথাসম্ভব বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে প্রতিটি বিভাগ, শ্রেণী, বর্গ ও গোত্র সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে প্রতীক প্রজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে সহজ সরল চলিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যথাসম্ভব বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের

বিষয়বস্তু বোঝার সুবিধা হয়। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠিতব্য প্রতীক প্রজাতি সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজন ছাড়াও অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে মৌলিকতার দাবি অবান্তর। কেননা, এটি আমার গবেষণার ফসল নয়, এটি বিভিন্ন বই, সাময়িকী, জার্নাল প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের মতো করে পরিবেশন করেছি মাত্র। গ্রন্থটি প্রণয়নের সময় আমি দেশী ও বিদেশী অনেক লেখক ও প্রাবন্ধিকের রচনা থেকে প্রচুর তথ্য অকৃপণভাবে গ্রহণ করেছি। এসবের একটি তালিকা গ্রন্থের শেষাংশে যুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত এসব গ্রন্থ ছাড়াও আমি দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন উৎস থেকে নানাভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে উপকৃত হয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কৃতজ্ঞতাভরে আমি সবার ঋণ স্বীকার করছি।

গ্রন্থটি প্রকাশের সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আমি নানাবিধ সহযোগিতা পেয়েছি। এ সুযোগে আমি সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটি প্রণয়নের সময় আমার স্ত্রী ডাঃ সালমা বিলকিস ও ছেলে-মেয়েরা আমাকে প্রচুর সময় দিয়েছেন। এদের সবার কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ ও আমার স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, সহপাঠীরা সহযোগিতামূলক ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন, তাঁরা অবশ্যই স্মর্তব্য। পরিশেষে বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে বাংলা ভাষায় স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক অপ্রতুল বলে দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়ে গ্রন্থ লেখার অদম্য ইচ্ছায় এ কাজে হাত দিয়েছিলাম। তারই ফসল এ গ্রন্থটি। যেসব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এ গ্রন্থটি প্রণীত এবং প্রকাশিত হলো তাদের বিন্দুমাত্র উপকার হলেও আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	ছত্রাক পরিচিতি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	মিক্সোমাইকোফাইটা	৫১
তৃতীয় অধ্যায়	:	উপশ্রেণী : ইউমাইকোটিনা	৬৩
চতুর্থ অধ্যায়	:	কাইট্রিডিওমাইসেটিস	৭৯
পঞ্চম অধ্যায়	:	প্লাজমোডিওফোরোমাইসেটিস	৯৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	উমাইসেটিস	১০৬
সপ্তম অধ্যায়	:	শ্রেণী – জাইগোমাইসেটিস	১৬১
অষ্টম অধ্যায়	:	শ্রেণী – অ্যাসকোমাইসেটিস	২১২
নবম অধ্যায়	:	উপশ্রেণী : হেমিঅ্যাসকোমাইসেটিডি	২৫৮
দশম অধ্যায়	:	উপশ্রেণী : ইউঅ্যাসকোমাইসেটিডি	২৭৫
		তথ্যপঞ্জি	৩০১
		পরিশিষ্ট	৩০৩

প্রথম অধ্যায়

ছত্রাক পরিচিতি

(Introduction to Mycology)

সূচনা

ফানজাই (Fungi)—ল্যাটিন শব্দ ; আভিধানিক অর্থ—মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতাসদৃশ বস্তু। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ—আরও ব্যাপক। এক্ষেত্রে, ফানজাই অর্থ হচ্ছে—থ্যালাসসদৃশ, ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদগোষ্ঠী (মল্ড, ঈস্ট, মাশরুমসদৃশ উদ্ভিদ)। এগুলো ভুঁইফোঁড়ের মতো দ্রুত গজিয়ে উঠে ও দ্রুত মরে যায়। এগুলো নানান পরিবেশে নানান জৈব পদার্থে মৃতজীবী কিংবা পরজীবীরূপে বাস করে। কখনও কখনও উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে রোগ-ব্যাধির কারণও হয়। এরা কখনও স্বভোজী হয় না, বরং পুষ্টির ক্ষেত্রে সর্বদা পরনির্ভরশীল থাকে।

এসব পরভোজী উদ্ভিদগোষ্ঠীর সবাই কিন্তু ক্ষতির কারণ হয় না। অনেকেই আবার মানব-কল্যাণে প্রভূত অবদান রাখে। এসব ছত্রাক এককোষী সরল হতে বহুকোষী, আণুবীক্ষণিক হতে বৃহৎ আকার-প্রকৃতির হয়। প্রাচীনকাল হতে অদ্যাবধি প্রায় ৫০,০০০ থেকে ৯০,০০০ ছত্রাক প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও বহু প্রজাতি এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সাধারণভাবে ছত্রাক সম্পর্কিত বিদ্যাকে ছত্রাকবিজ্ঞান বা মাইকোলজি (Mycology) বলে (*mykes* = ছত্রাক ; *logos* = জ্ঞান)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ছত্রাক সম্পর্কে রীতিবদ্ধ অধ্যয়নই ছত্রাকবিজ্ঞান। আর যাঁরা ছত্রাকের গঠন, জনন, শারীরবৃত্ত ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ নিয়ে গবেষণা করেন বা ছত্রাক সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাঁদেরকে ছত্রাকবিদ বলে।

ছত্রাকের সংজ্ঞা

সাধারণত দৃষ্টিকোণ হতে বিচিত্র প্রকৃতির আকার-আয়তন, বসবাস, জনন পদ্ধতি ও ক্লোরোফিলবিহীন সমাঙ্গদেহী, অপরিবাহী থ্যালোফাইটা বিভাগভুক্ত প্রকৃত কোষী উদ্ভিদগুলোকে ছত্রাক নামে অভিহিত করা হয়। প্রখ্যাত ছত্রাকবিদ Bessey (১৯৫০) উল্লেখ করেন যে, "ব্যাকটেরিয়া ও মাইসেটোজোয়া ব্যতীত থ্যালোফাইটাভুক্ত ক্লোরোফিলবিহীন, অপরিবাহী ও পরভোজী প্রকৃতির এবং অযৌন ও যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারকারী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে ছত্রাকরূপে গণ্য করা যায়"। Alexopoulous (১৯৬২)-এর মতে, "কেন্দ্রিকাযুক্ত, রেণু বহনকারী, ক্লোরোফিলবিহীন জীব—যারা সাধারণত যৌন ও অযৌনভাবে জননকাজ সম্পন্ন করে এবং যাদের শাখান্বিত সূত্রাকার দেহের গঠনগুলো সেলুলোজ বা কাইটিন বা উভয় প্রকার পদার্থযুক্ত কোষপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তাদেরকেই শুধু ছত্রাকরূপে অভিহিত করা যেতে পারে।"

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য

ছত্রাক বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ। এগুলোর আকার, আয়তন, গঠনপ্রকৃতি ও জীবনযাপনে বৈচিত্র্যময়তা থাকলেও বিশিষ্ট ছত্রাকবিদ Ainsworth (১৯৭৩) যেভাবে ছত্রাকের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ :

১. ক্লোরোফিলবিহীন উদ্ভিদ।
২. কাণ্ড, মূল ও পাতাবিহীন ; এমনকি সংবহনতন্ত্রবিহীন।
৩. দেহ এককোষী কিংবা শাখা-প্রশাখাযুক্ত সূত্রাকার, বহুকোষী এবং শীর্ষবৃদ্ধিযুক্ত।
৪. কোষপ্রাচীর কাইটিননির্মিত (Oomycetes-এ সেলুলোজ থাকে) এবং সঞ্চিত খাদ্য হলো গ্লাইকোজেন।
৫. চলন-ক্ষমতাবিহীন ; তবে কিছু কিছু জননকোষ (চলরেণু) চলনক্ষম।
৬. কেন্দ্রিকা আকারে খুব ছোট ও চলনক্ষম। মাইসেলিয়াম মনোক্যারিওটিক, ডাইক্যারিওটিক কিংবা হেটোরোক্যারিওটিক হতে পারে।
৭. অযৌন ও যৌন পদ্ধতিতে জনন কাজ হয়ে থাকে। জনন হোমোথ্যালিক বা হেটোরোথ্যালিক হতে পারে।
৮. জীবনচক্র সরল বা জটিল হয়ে থাকে।
৯. মৃতজীবী, মিথোজীবী বা পরজীবী।

ছত্রাকবিজ্ঞানের ইতিহাস

ছত্রাকের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। গ্রিক, রোমান এবং চীন দেশের অতি পুরাতন গ্রন্থসমূহে ছত্রাকের বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও তখন ছত্রাক সম্পর্কে কোনো ধ্যান-ধারণা বা জ্ঞান ছিল না, তবুও তারা অনেক ছত্রাকই খাদ্য ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করত।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর Gaspard Bauhin (১৬২৩) সর্বপ্রথম ১০০টির মতো ছত্রাকের তালিকা তৈরি করেন। Tournifort (১৬৯৪) সর্বপ্রথম ছত্রাক ৬টি গোষ্ঠীতে ভাগ করেন, যথা :

১. ছত্রাক
২. বোলেটাস
৩. অ্যাগারিকাস
৪. লাইকোপারডন
৫. কোরালয়েডস ও
৬. টিউবেরা। Antonio Micheli (১৭২৯) ছত্রাকের প্রজাতি ও তাদের গঠন বর্ণনা করেন এবং বড় আকৃতির ছত্রাকগুলোকে ৪টি গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন, যথা—
    ১. ফানজাই ল্যামেলাটি (Agaricaceae)
    ২. ফানজাই পোরেসি (Folyporaceae)
    ৩. ফানজাই রামোসি (Clovariaceae) এবং
    ৪. ফানজাই পালভেরেন্টিস (Puff-balls)।

তিনি অনেক ছত্রাককে শুদ্ধভাবে চাষ করতেও সমর্থ হন এবং ছত্রাক হতে ছত্রাকের জন্ম হয় বলে উল্লেখ করেন। মাইকেলি-কে তাঁর কাজের জন্য ছত্রাকবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। Hendrick Persoon তাঁর *Mycologia Europaea* তে (৩ খণ্ড) দুটি শ্রেণী, ৬টি বর্গ ও ৭১টি গণে ছত্রাককে ভাগ করেছেন।

ধারণা করা হয় যে, Elias Fries ই প্রথম ছত্রাকবিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখেন। তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল *Systema Mycologicum* (৩ খণ্ড) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থের মৌলিক

বৈশিষ্ট্যমালার উপর ভিত্তি করেই অধুনা ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়। আমেরিকার ছত্রাকতত্ত্বের জনক বলে পরিচিত Jovid Von Schweinritz উত্তর ক্যারোলিনা ও পেনসিলভানিয়া হতে ৩,২০০টি ছত্রাক সংগ্রহ করে সেগুলোর বিবরণ দেন। বিজ্ঞানী Saccardo মোট ৮০,০০০ ছত্রাকের বিবরণ ল্যাটিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তাছাড়া, ছত্রাক সম্পর্কিত গবেষণায় Berkler, Kuhn, Debary, Hartig, Woronin, Brefeld–এর অবদানও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রকৃতি ও বসতি

বৈচিত্র্যময় ছত্রাকের বসতিও বিচিত্রধর্মী। পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই যেখানে জৈব দ্রব্যের উপস্থিতি রয়েছে অথচ সেখানে কোনো না কোনো ছত্রাক বাস করে না। ছত্রাকের বসতি বিশ্বব্যাপী ও সর্বজনীন। মাটি, পানি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, এমনকি জীবিত ও মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ, নানান জৈব দ্রব্য সবখানেই ছত্রাকের বাস। তবে অধিকাংশ ছত্রাকই স্থলজ। এ ছত্রাকগুলো প্রধানত জৈব পদার্থ, বিশেষত হিউমাসসমৃদ্ধ মাটিতেই ভাল জন্মে।

যেসব ছত্রাক প্রধানত নিশ্চল প্রকৃতির জননকোষ তৈরি করে এবং বায়ু, পানি ও প্রাণিবাহিত হয়ে থাকে সেসব ছত্রাককেই সাধারণত উন্নত শ্রেণীর ছত্রাক বলে ধরা হয়। এদের কোনো কোনোটা জীবিত জীবকেও আক্রমণ করে থাকে। এগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর কলায় বাস করে। আবার কোনো কোনো ছত্রাক জলজও হয়ে থাকে। এগুলোকে নিম্নশ্রেণীর ছত্রাক বলে গণ্য করা হয়। এ ছত্রাকগুলো মুখ্যত স্বাদুপানির জীবসমূহের পচনশীল দেহের উপর জন্মে এবং ফ্লাজেলাযুক্ত জননকোষ গঠন করে। এদের কোনো কোনোটা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের ও গুদামজাত ফল–মূল ও খাদ্যশস্যের উপর মৃতজীবীরূপে জন্মায়। আবার কোনো কোনোটা পানীয় পানিতে জন্মায়। এরা বাতাসে সর্বদাই বাস করে। এদের অধিকাংশই আলোবিহীন স্থানে বা স্বল্পালোকিত স্থানে জন্মাতে পছন্দ করে। কিছু কিছু ছত্রাক পরজীবীরূপেও জন্মে এবং নানা ধরনের রোগ–ব্যাধি সৃষ্টি করে থাকে।

জীবন-যাপন পদ্ধতি

ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন বলে স্বভোজী নয়। এ কারণেই এদেরকে পুষ্টির জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এরা সবসময়ই পরভোজী। এজন্য জীবিত বা মৃত জীবদেহ ও জৈব দ্রব্যসমৃদ্ধ মাটিই এদের পুষ্টির একমাত্র উৎস। পুষ্টির উপর ভিত্তি করে ছত্রাকের স্বভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—

১. মৃতজীবী ও

২. পরজীবী।

নিচে এসব ছত্রাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

১. মৃতজীবী ছত্রাক

যেসব ছত্রাক উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ বা দেহাবশেষ, জৈব–দ্রব্যসমৃদ্ধ মাটি কিংবা পচনশীল জৈব দ্রব্য হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে, সেগুলোকে মৃতজীবী ছত্রাক বলে। উদাহরণ হিসেবে *Agaricus so.*, yeast প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এসব মৃতজীবী ছত্রাকও দু'ধরনের হতে পারে ; যথা :

ক. পূর্ণ বা বাধ্যতামূলক মৃতজীবী ও

খ. আংশিক বা ইচ্ছাধীন মৃতজীবী।

নিচে এসব মৃতজীবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ক. **পূর্ণ বা বাধ্যতামূলক মৃতজীবী ছত্রাক :** এ জাতীয় ছত্রাক শুধু পচনশীল দ্রব্য কিংবা জৈব দ্রব্যের উপরই জন্মায়। এগুলো কোনো সজীব জীবকে আক্রমণ করতে পারে না। এগুলো আবার তিন ধরনের হতে পারে ; যেমন :

১. **বাধ্যতামূলক মৃতজীবী :** এগুলো শুধু পচনশীল উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষের উপর জন্মায় বা জৈব খাদ্যবস্তুর উপর জন্মে জীবন নির্বাহ করে। উদাহরণ : *Mucor sp.*, *Penicillium* sp. প্রভৃতি।

২. **মলবাসী ছত্রাক :** এগুলোও বাধ্যতামূলক মৃতজীবী ছত্রাক। তবে এরা শুধু প্রাণীর বিষ্ঠার উপর জন্মে থাকে। যেমন : *Ascobolus immersus, Peziza so.*

খ. **আংশিক বা ইচ্ছাধীন মৃতজীবী :** এ জাতীয় ছত্রাকগুলো সাধারণত জীবনের শুরুতে কিছু সময় পরজীবীরূপে এবং অবশিষ্ট সময় মৃতজীবীরূপে অতিবাহিত করে। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরা মৃতজীবীরূপেও সারা জীবন কাটাতে পারে। এছাড়া এগুলো কৃত্রিম আবাদ–মাধ্যমেও জন্মানো যায় ; যেমন *Phytophthora* sp., *Taphrina* ইত্যাদি।

২. পরজীবী ছত্রাক

যেসব ছত্রাক কোনো না কোনো জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের উপরে বা ভিতরে বাস করে ও পুষ্টি সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে তাদের পরজীবী ছত্রাক বলে। এখানে আশ্রয় ও পুষ্টিদানকারী জীবকে পোষক বলে। এক্ষেত্রে পরজীবী ছত্রাকটি পোষকদেহে রোগ সৃষ্টি করে। পোষক ও পরজীবীর এরূপ সহ–অবস্থানের রীতিকে পরজীবিতা বলে। এখানে পরজীবী লাভবান হয় ও পোষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরজীবী ছত্রাকের প্রকারভেদ

অবস্থান ও পুষ্টি সংগ্রহের ভিন্নতাহেতু পরজীবী ছত্রাককে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

ক. অবস্থান অনুসারে পরজীবী ছত্রাককে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা :

১. বহিঃপরজীবী ও

২. অন্তঃপরজীবী।

১. **বহিঃপরজীবী :** এসব পরজীবী ছত্রাক পোষক জীবদেহের বহির্গাত্রে উপরিগতভাবে জন্মায় ; কিন্তু অ্যাপ্রেসোরিয়াসের সাহায্যে পোষক দেহে লেগে থাকে এবং চোষক অঙ্গের দ্বারা পোষক দেহ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে। উদাহরণ হিসেবে Wine-mold (*Erysiphe polygong*) এর নাম করা যায়।

২. **অন্তঃপরজীবী :** এ জাতীয় পরজীবী ছত্রাকগুলো পোষক দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জীবন–যাপন করে। এগুলো পোষক দেহকলায় দু'ভাবে অবস্থান নিতে পারে।

১. যেসব অন্তঃপরজীবী পোষক দেহকলার কোষবকাশ অঞ্চলে বসবাস করে চোষকমূলের দ্বারা কোষ হতে খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে অন্তঃকোষীয় পরজীবী বলে। উদাহরণ : *Fusarium* sp.

২. যেসব অন্তঃপরজীবী পোষকদেহের কোষের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনধারণ করে, তাদেরকে অন্তঃকোষীয় পরজীবী বলে। উদাহরণ : *Pythium* sp., *Ustilago* sp. প্রভৃতি।

খ. পুষ্টি সংগ্রহের ধরন অনুযায়ী পরজীবী ছত্রাককে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা :

১. বাধ্যতামূলক পরজীবী ও

২. ইচ্ছাধীন বা সুবিধাবাদী পরজীবী।

নিচে এসব পরজীবী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. **বাধ্যতামূলক পরজীবী :** এ জাতীয় পরজীবী ছত্রাকগুলো নির্দিষ্ট পোষক দেহেই শুধু সফল জীবন-যাপন করতে পারে ; তাই এদেরকে বাধ্যতামূলক পরজীবী বলে। এ ছত্রাকগুলোকে কৃত্রিম পুষ্টির মাধ্যমে কিংবা পোষক পরিবর্তন করে কখনই জন্মানো কিংবা বাঁচানো যায় না। উদাহরণ হিসেবে *Synchytrium* sp., *Puccinia* sp. প্রভৃতির নাম করা যায়।

২. **ইচ্ছাধীন বা সুবিধাবাদী পরজীবী :** এ জাতীয় ছত্রাকগুলো মূলত মৃতজীবীরূপে হিউমাসসমৃদ্ধ মাটিতেই জীবনযাত্রা শুরু করে এবং তাদের বসতির আশে-পাশে উপযুক্ত পোষক উদ্ভিদ পেলে তাকে আক্রমণ করে জীবনের পরবর্তী সময় পরজীবীরূপে অতিবাহিত করে। *Fusarium* sp., *Botrytis* sp., *Pestalotia* sp. প্রভৃতি এ ধরনের ছত্রাক।

গ. পোষক দেহের ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে পরজীবী ছত্রাকগুলো দু'ধরনের হতে পারে ; যথা :

১. ধ্বংসাত্মক পরজীবী ও

২. সুষম পরজীবী।

নিচে এসব পরজীবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. **ধ্বংসাত্মক পরজীবী :** এ জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণে পোষক দেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টির কারণে প্রভূত ক্ষতি হয়ে থাকে ; এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে থাকে ; কেননা, পোষকের আক্রান্ত কলাগুলো পরজীবীজাত টক্সিক দ্রব্যের জন্য ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে *Phytophtora infestans*-এর কথা বলা যায়।

২. **সুষম পরজীবী :** এ জাতীয় পরজীবী ছত্রাকগুলো পোষক দেহ হতে খাদ্য সংগ্রহ করলেও কোনো মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয় না কিংবা পোষকের জীবনের হুমকি হয়েও দাঁড়ায় না। এসব পরজীবী ছত্রাক তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পোষক হতে গ্রহণ করলেও সুস্থ জীবন-যাপনে কোনো অসুবিধা হয় না। উদাহরণ হিসেবে *Peronospora* sp.-এর কথা বলা যায়।

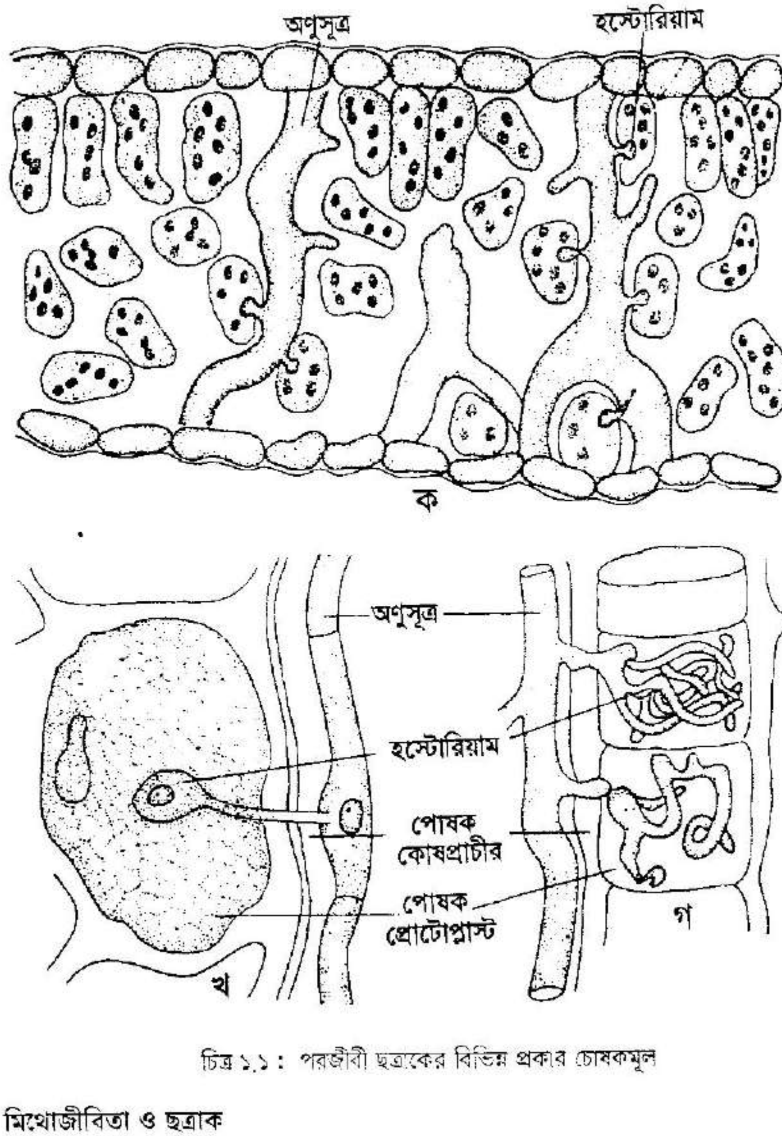

চিত্র ১.১ : পরজীবী ছত্রাকের বিভিন্ন প্রকার চোষকমূল

মিথোজীবিতা ও ছত্রাক

মৃতজীবী ও পরজীবীরূপে জীবন-যাপন করা ছাড়াও অনেক সময় দুটি জীব এমন ঘনিষ্ঠভাবে পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে একত্রে সহাবস্থান করে এমনভাবে জীবন-যাপন করে যে, তাদের মিলিতভাবে একটি জীব বলে অনুমিত হয়। 'লাইকেন' হচ্ছে এরূপ ছত্রাক ও শৈবালের সহাবস্থান-জড়িত অবস্থা। এখানে ছত্রাক ও শৈবাল মিথোজীবী এবং তাদের অবস্থানরীতিকে মিথোজীবিতা বলে। এরূপ সহ-অবস্থানে ছত্রাক শৈবালকে খাদ্য তৈরির কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে শৈবাল হতে তৈরি খাদ্য গ্রহণ করে।

মিথোজীবী ছত্রাকের আরেকটি রূপ দেখা যায় মাইকোরাইজাতে কখনও কখনও বন-জঙ্গলের বিভিন্ন প্রকার উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ মূলে (গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী) ছত্রাককে মিথোজীবীরূপে বাস করতে দেখা যায়। এখানে ছত্রাকটি মূলরোমের ন্যায় কাজ করে এবং বিনিময়ে পায় পুষ্টির নিশ্চয়তা। ছত্রাক ও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের মধ্যে এ ধরনের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে মাইকোরাইজা বলে। মাইকোরাইজায় অংশগ্রহণকারী ছত্রাককে মাইকোরাইজাল ছত্রাক বলে (চিত্র ১.২ক)।

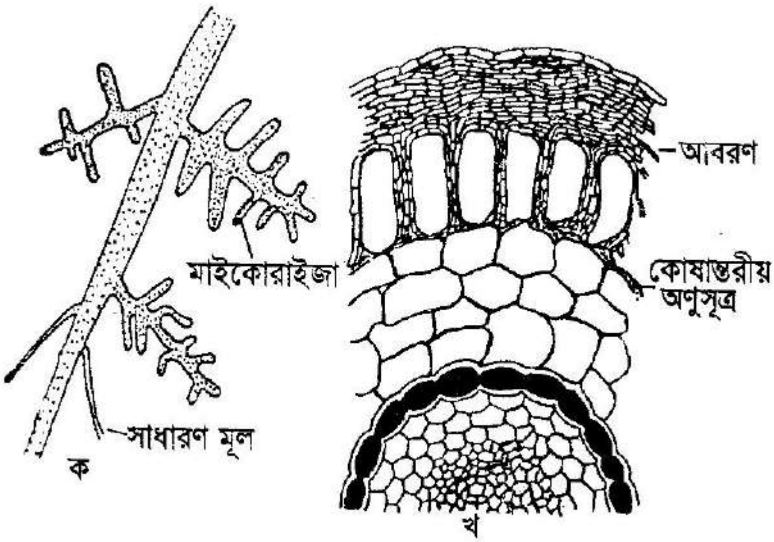

চিত্র ১.২ : মূলের একাংশে মাইকোরাইজা ছত্রাক

যদিও মিথোজীবিতা ও মাইকোরাইজা সম্বন্ধদ্বয় ক্ষতিকর নয়, তথাপি এ সম্বন্ধ দুটিকে অনেক সময় এক ধরনের মৃদু পরজীবিতা হিসেবে ধরণা করা হয়। কেননা, কতিপয় এন্ডোট্রফিক মাইকোরাইজাল ছত্রাকের দেহে উদ্ভূত চোষকমূল পোষকের দেহকলায় প্রবেশ করে পুষ্টিশোষণ করে। মাইকোরাইজা দু'ধরনের হতে পারে :

১. এক্টোট্রফিক ও
২. এন্ডোট্রফিক।

নিচে এসব মাইকোরাইজা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **এক্টোট্রফিক মাইকোরাইজা :** অরণ্যের অধিকাংশ গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মূলে এক্টোট্রফিক মাইকোরাইজা বসবাস করে—এক্ষেত্রে ছত্রাকের হাইফিগুলো শোষকমূলের কোষাবকাশ অঞ্চলে বিন্যস্ত থাকে এবং মূলের বাইরের ছত্রাক দেহ জড়িয়ে থেকে এক ধরনের আবরণ তৈরি করে (চিত্র ১.২খ)।

২. **এন্ডোট্রফিক মাইকোরাইজা :** আবার অর্কিডজাতীয় উদ্ভিদ মূলে এন্ডোট্রফিক মাইকোরাইজা বর্তমান। এক্ষেত্রে পোষক মূলের কোষাভ্যন্তরে ছত্রাক-হাইফিগুলো ছড়িয়ে থাকে ও পুষ্টি গ্রহণ করে।

আবার সময় সময় একটি ছত্রাক অন্য আরেকটি ছত্রাকের উপর পরজীবীরূপে বাস করে। এ ক্ষেত্রে প্রথম ছত্রাকটিকে মাইকো-পরজীবী বলে। আবার এমনও দেখা যায় যে, অনেক ছত্রাকই উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ-দেহের বহির্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু কোনোরূপ ক্ষতি করে না। এ ধরনের ছত্রাককে পরাশ্রয়ী ছত্রাক বলে।

ছত্রাকের অনুকূল পরিবেশ

ছত্রাক নানান ধরনের উৎস হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে। পরিবেশের আর্দ্রতা, উষ্ণতা, পরিমিত অক্সিজেনের উপস্থিতি, pH, মৃদু-আলোর উপস্থিতি, প্রভৃতির উপর ছত্রাকের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। অধিকাংশ ছত্রাকই অল্প-এসিড মাধ্যমে (pH 6) ৩০°-৩৫° সেঃ তাপমাত্রায় ভালভাবে জন্মায় ও বৃদ্ধি পায় ; কিন্তু তীব্র আলো ও উচ্চ তাপমাত্রা ছত্রাকের জন্য প্রতিকূল অবস্থা।

ছত্রাকের দৈহিক গঠন

ছত্রাকের দেহ সরল এককোষী (chytrids, yeast) কিংবা বহুকোষী থ্যালাস প্রকৃতির হয়।

ছত্রাকের এককোষী থ্যালাস

নিম্নশ্রেণীর কোনো কোনো ছত্রাক দেহ (chytrids, yeasts) প্রায় গোলাকার বা ডিম্বাকার একটি কোষের তৈরি। এ দেহকোষই জননকালে জনন একক হিসেবে কাজ করে। এগুলো হতে অযৌন বা যৌন এককও উৎপন্ন হয়। এ ধরনের ছত্রাককে এককোষী হলোকার্পিক ছত্রাক বলে। এ জাতীয় ছত্রাকে একই সময়ে অযৌন ও যৌন পর্যায় দেখা যায় না। *Synchytrium* sp., *Plasmodisphora* sp. প্রভৃতির নাম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

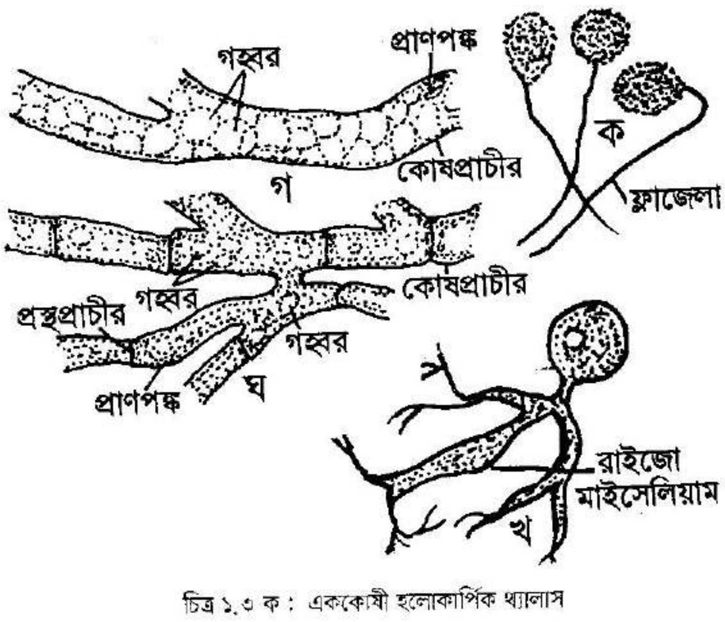

চিত্র ১.৩ ক : এককোষী হলোকার্পিক থ্যালাস

Plasmodiophora-তে অযৌন পর্যায়ে অনাবৃত, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত অ্যামিবয়ডসদৃশ প্রোটোপ্লাজমের পিণ্ড দেখা যায় ; একেই *Plasmodium* sp. বলে। ডিপ্লয়ড প্লাজমোডিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট ভাগ হয়ে বিশ্রাম-রেণু গঠন করে। Yeast ছত্রাকটি সূত্রাকৃতি সম্পর্কযুক্ত হলেও এককোষী। এখানে কোনো মাইসেলিয়াম দেখা যায় না।

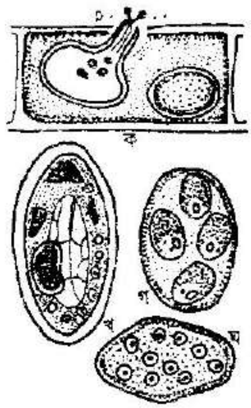

চিত্র ১.৩ খ : বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক-দেহ ক. এককোষী, খ. রাইজোমাইসেলিয়াম, গ. সিনোসাইটিক হাইফি, ঘ. প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হাইফি।

ছত্রাকের বহুকোষী থ্যালাস

এ জাতীয় ছত্রাকের দেহ সূত্রাকার থ্যালাস নিয়ে গঠিত। থ্যালাসটি সশাখ বা অশাখ হতে পারে। এরূপ থ্যালাস-দেহকে মাইসেলিয়াম বলে। মাইসেলিয়াম বহুসংখ্যক শাখান্বিত সূত্র নিয়ে গঠিত হতে পারে। এদের এক একটি সূত্রকে হাইফি বলে। হাইফি বর্ণহীন বা সাবর্ণ, সরল বা শাখান্বিত, প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত বা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন সিনোসাইটিক ও দীর্ঘ হয়ে নলাকার কোষ গঠন করে। শীর্ষ বৃদ্ধির কারণে মাইসেলিয়ামে রাইজয়ডসদৃশ পদ্ধতি ক্ষীণভাবে বিকাশলাভ করে। রাইজয়ডযুক্ত ও মাইসেলিয়ামকেই রাইজোমাইসেলিয়াম বলে (চিত্র ১.৩খ)। হাইফিগুলো নিজ নিজ কোষাবরণে আবদ্ধ থাকে।

হাইফিগুলো দু'ধরনের হতে পারে ; যথা :

ক. প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত ও

খ. প্রস্থপ্রাচীরবিহীন।

প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হাইফিতে প্রোটোপ্লাস্ট নিয়মিতভাবে প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা বিভক্ত থাকে বলে তা কোষীয় গঠনযুক্ত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিটি প্রস্থপ্রাচীর কেন্দ্রীয় সূক্ষ্ম রন্ধ্রযুক্ত হতে থাকে। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই রন্ধ্রবিহীন হয়। তাছাড়া, খুব কমক্ষেত্রেই প্রস্থপ্রাচীরটি একাধিক রন্ধ্রযুক্ত হয়। এ রন্ধ্রপথেই কেন্দ্রিক ও প্রাণসত্তা এক কোষ হতে অন্য কোষে যেতে পারে। আবার কোনো কোনো ছত্রাকে মেকি-প্রস্থপ্রাচীরও তৈরি হয়ে থাকে। এ প্রস্থপ্রাচীরগুলো সেলুলিন বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের তৈরি। এগুলো প্রস্থপ্রাচীরসদৃশ রাসায়নিক দ্রব্যের সমাবেশ বিশেষ।

প্রস্থপ্রাচীরগুলো আড়াআড়ি ও উলম্ব ধরনের হয় ; কিন্তু তির্যক ধরনের প্রস্থপ্রাচীর খুব একটা দেখা যায় না।

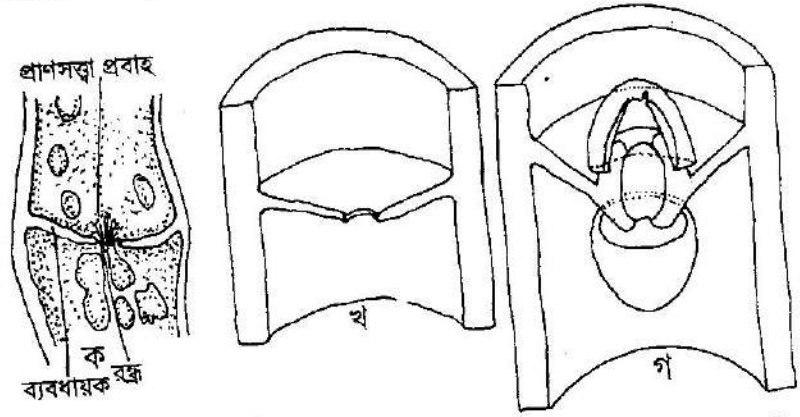

চিত্র ১.৪ : হাইফিতে প্রস্থপ্রাচীর প্রকৃতি। ক. সরল রন্ধ্রযুক্ত প্রস্থপ্রাচীর ; খ.গ. অঙ্কনে প্রস্থপ্রাচীর

প্রস্থপ্রাচীরের উৎপত্তি

ছত্রাক শ্রেণীগুলোর সব ছত্রাকেই প্রস্থপ্রাচীরের উদ্ভূত ধারা একইরকম। হাইফিশীর্ষের নিচে নিয়মিত বিরতি বা ব্যবধানে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে। এগুলো নলাকার হাইফির ভিতর ভাগের পরিধি অঞ্চলে বলয়াকারে বা প্রাচীর দ্রব্যের স্তূপাকারে উদ্ভব ঘটে। কেন্দ্রাভিমুখীভাবে বলয়ের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ফলে রন্ধ্রের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাস কমতে থাকে। এ বৃদ্ধি দ্রুত হয়ে থাকে। Buller (১৯৩৩) উল্লেখ করেন যে, সিনোসাইটিক *Rhizopus* sp.–এ ক্ষতস্থান নিরাময়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগে। Rhizoctonia–এর ডলিপোর (Dolipore) খুবই জটিল প্রকৃতির এবং সম্পূর্ণ হতে মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগে। *Ciboria* sp.–তে সময় নেয় মাত্র ৬ মিনিট।

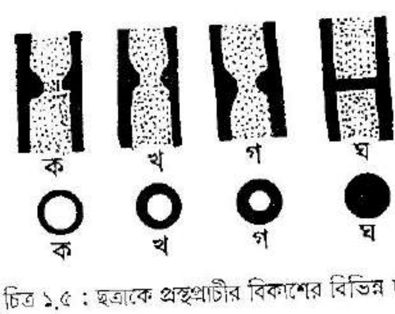

চিত্র ১.৫ : ছত্রাকে প্রস্থপ্রাচীর বিকাশের বিভিন্ন দশা

প্রস্থপ্রাচীর রন্ধ্র

সাধারণত প্রস্থপ্রাচীরের কেন্দ্রাঞ্চলে এক বা একাধিক সূক্ষ্ম রন্ধ্র থাকে। এ সচ্ছিদ্র প্রস্থপ্রাচীরগুলো নলাকার হাইফিকে মজবুত করে। রন্ধ্রযুক্ত প্রস্থপ্রাচীরগুলোর রন্ধ্র অংশে সামান্য স্ফীত হয়

চিত্র ১.৬)। Basidiomycetes–এর প্রস্থপ্রাচীরের রন্ধ্র আরও জটিল ধরনের—এগুলোকে ডলিপোর বলে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রন্ধ্রের রিম আরও স্ফীত ও পুরু হয়ে পিপাকৃতি হয় এবং রন্ধ্রপ্রান্তদ্বয় টুপিসদৃশ আবরণী দিয়ে সংরক্ষিত হয়। ছেদনে এ আবরণকে ব্র্যাকেট-এর ন্যায় দেখায়। এজন্য একে প্যারেনথোজম বলে (চিত্র ১.৭)।

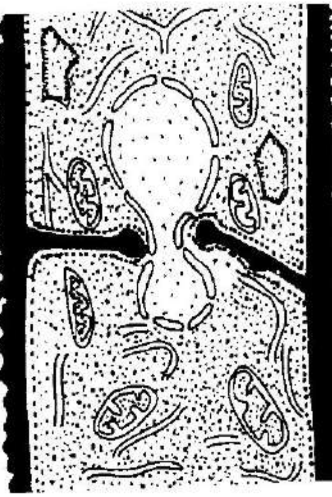

চিত্র ১.৬ : সরল রন্ধ্র ও সামান্য স্ফীত রিম

চিত্র ১.৭ : Basidiomycetes ও ডলিপোর ও প্যারেনথোজম

প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হাইফিগুলোতে প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত না হওয়ায় অবিচ্ছিন্ন থাকে। এজন্য সিনোসাইটিক ধরনের কোষগুলোর বেলনাকার প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি কেন্দ্রিকাসহ দানাদার প্রাণসত্তা থাকে। মাইসেলিয়াম বহিঃবাসী বা আন্তঃবাসী হতে পারে। মাইসেলিয়াম গঠনকারী হাইফিগুলো শীর্ষবৃদ্ধি মাধ্যমে দীর্ঘ হয়। রেণু অঙ্কুরণের ফলে যে অঙ্কুর নলটির উদ্ভব হয় সেটির বিকাশজনিত কারণেই মাইসেলিয়ামের উদ্ভব হয়। প্রজাতিভেদে এ হাইফিগুলো ০.৫ মিমি. হতে ১০০ মি. মাইক্রোমিটার বেধযুক্ত হতে পারে। আয়তনে সমগ্র মাইসেলিয়াম দৈর্ঘ্যে কয়েক মাইক্রোমিটার হতে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

মাইসেলিয়ামের রূপান্তর

ছত্রাকের মাইসেলিয়াম নানাভাবে বিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ তৈরি করে। একে মাইসেলিয়ামের রূপান্তর বলা হয়ে থাকে ; যেমন :

১. **স্ট্রোমা :** স্থানিক বৃদ্ধির জন্য কোনো কোনো সময় মাইসেলিয়াম একত্রিত হয়ে পিণ্ডের মতো আকার ধারণ করে ; একে **মাইসেলিয়াল ম্যাট** বলে। এ ম্যাটের আকার আরও বৃদ্ধি হলে ঘন সন্নিবেশিত শক্ত অঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ অঙ্গকে স্ট্রোমা বলে।

২. **স্ক্লেরোশিয়াম :** কখনও কখনও একাধিক হাইফি একত্রিত হয়ে ছত্রাক–গুটি তৈরি করে ; এদেরকেই স্ক্লেরোশিয়াম বলে। এগুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা :

১. পুরু আবরণযুক্ত স্ক্লেরোশিয়াম—এগুলো কালো বা বাদামি রঙের শক্ত ও পুরু প্রাচীর ঘেরা যেমন : *Scleratium rolfsii* এবং

২. আবরণবিহীন স্ক্লেরোশিয়াম—এসব ছত্রাক-গুটিতে কোনো আবরণ থাকে না, যেমন : *Rhizoctonia solani*। প্রতিকূল পরিবেশে এদের সাহায্যে ছত্রাক পরিবেশ হতে অক্সিজেন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশ ফিরে এলেই এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

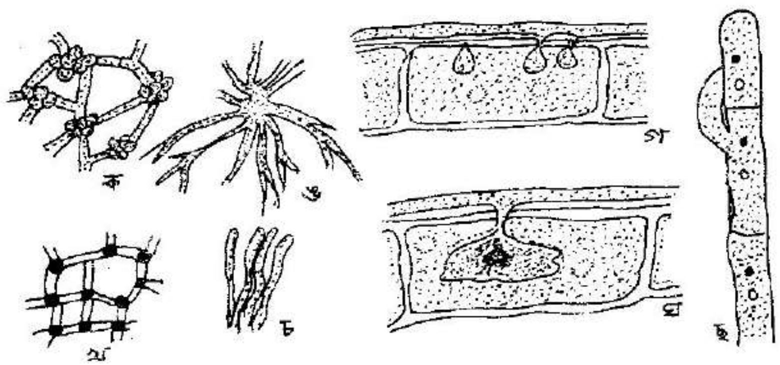

চিত্র ১.৭ ক : মাইসেলিয়ামের রূপান্তর। ক. পুরু আবরণীযুক্ত স্ক্লেরেশিয়াম ; খ. আবরণীবিহীন স্ক্লেরেশিয়াম ; গ. গোলাকার চোষকমূল ; ঘ. শাখা-প্রশাখাযুক্ত চোষকমূল ; ঙ. রাইজয়ড ; চ. রাইজোমর্ফ, ছ. ক্ল্যাম্প-যোজক

৩. **রাইজয়ড :** কিছু কিছু ছত্রাকের মাইসেলিয়াম হতে কোনো কোনো স্থানে শিকড়ের ন্যায় গুচ্ছাকার হাইফি বের হয়। এ ধরনের গুচ্ছাকার হাইফিকে রাইজয়ড বলে। এগুলো ছত্রাককে অবস্থানের সাথে আটকে থাকতে সাহায্য করে।

৪. **রাইজোমর্ফ :** একাধিক হাইফি যখন পাশাপাশি বৃদ্ধি পাওয়ার সময় জড়াজড়ি করে দড়ির আকার ধারণ করে, তখন এদের রাইজোমর্ফ বলে। এগুলো সাধারণ খাদ্যবস্তু শোষণে অংশ নিয়ে থাকে।

৫. **চোষক মূল বা হস্টোরিয়াম :** অধিকাংশ পরজীবী ছত্রাক আন্তঃকোষীয় স্থানে অবস্থান করার সময় হাইফি হতে এক বিশেষ ধরনের অঙ্গসংলগ্ন কোষে প্রবেশ করিয়ে খাদ্যরস শোষণ করে। এ জাতীয় অঙ্গকে চোষক মূল বলে। এগুলো আকারে গোলাকৃতি, নবসদৃশ, বেলনাকৃতি কিংবা শাখা-প্রশাখাযুক্ত হতে পারে।

৬. **ক্লাম্প যোজক :** বেশিরভাগ বেসিডিওমাইসেটিস ছত্রাকের গৌণ মাইসেলিয়ামের পাশাপাশি দুকোষের প্রস্থপ্রাচীরের কাছে সেতুর ন্যায় হাইফীয় যোজককে ক্ল্যাম্প-যোজক বলে।

ছত্রাক কোষের গঠন

স্লাইম মোল্ড ছাড়া অন্যান্য ছত্রাক কোষের প্রোটোপ্লাস্ট শক্ত ও মজবুত কোষপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে (চিত্র ১.৮)।

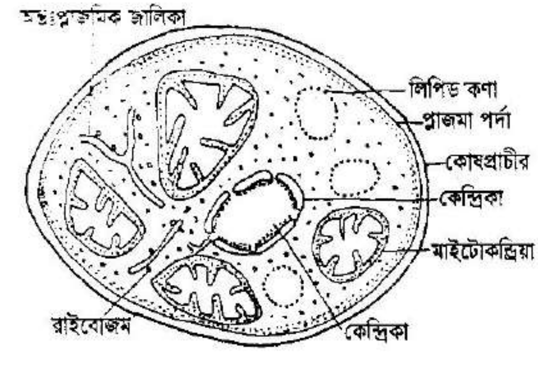

চিত্র ১.৮ : *Tortula* ঈস্ট কোষ

[illegible] কোষপ্রাচীর

[illegible] গোষ্ঠীভেদে বা একগোষ্ঠী প্রজাতিভেদে কোষপ্রাচীরের গঠন-উপকরণে ভিন্ন দেখা [illegible]। সাধারণত কোষপ্রাচীর সেলুলোজ, ছত্রাক-সেলুলোজ (কাইটিন) কিংবা কাইটিন ও [illegible]জের সংমিশ্রণজাত দ্রব্য দিয়ে তৈরি। অবশ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানান গ্লুকান প্রভৃতি [illegible]কারাইড দিয়েও কোষপ্রাচীর গঠিত। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছত্রাক কোষপ্রাচীরে [illegible] থাকে না, থাকে ছত্রাক সেলুলোজ। এ দ্রব্যটির রাসায়নিক সংকেত হলো [illegible]$H_{34}N_4O_{21})n$। কোষপ্রাচীরের এসব দ্রব্য মাইক্রোফাইব্রিলের একক হিসেবে থাকে।

Oomycetes-এর দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত কোষের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ প্রকৃতির (Frey, ১৯৫০ & [illegible]kar, ১৯৬৩)। *Perenospora* sp. ও *Saprolegnia* sp. -এর কোষপ্রাচীরে প্রকৃত সেলুলোজ রয়েছে (Debary, ১৮৬৬, ১৮৮৭)। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে [illegible]. *Phytophthora* ও *Pythium*-এর কোষপ্রাচীরের উপাদানে সেলুলোজ অপ্রধান কিংবা অনুপস্থিত (Bartnicki-Garcia, ১৯৬৬, Mitchell & Sabar, ১৯৬৮)। পক্ষান্তরে, গ্লুকান দ্রব্যের প্রাধান্য থাকে। সুতরাং Oomyates-এর কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ দ্রব্যের প্রাধান্য না থাকলেও কাইটিন দ্রব্য কিন্তু মোটেই থাকে না।

Zygomycetes ও উন্নত ছত্রাক শ্রেণী—Ascomycetes, Basidiomy Cetes ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে কাইটিন দ্রব্য থাকে। কাইটিন হলো পলিস্যাকারাইড। এটি নাইট্রোজেন ও শর্করার যৌগ Glucosamine। সম্ভবত এ সঙ্গে পেকটিড দ্রব্য, প্রোটিন, লিপিড, সেলুলোজ, ক্যালোজ ও খনিজ দ্রব্য থাকে। অবশ্য এ ধরনের সম্ভাব্যতার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। Burnet (১৯৬৮) উল্লেখ করেন যে, Ascomycetes ও Basidismycetes ছত্রাকের কোষপ্রাচীরের গঠনে অদ্রবণীয় গ্লুকান পদার্থের প্রাধান্য থাকে। তাছাড়া, কাইটিন দ্রব্যও পরিমিত পরিমাণে থাকে। Yeast ও Hemiascomycetideae-তে কাইটিন দ্রব্য থাকে না। এদের কোষপ্রাচীর মুখ্যত মানান ও গ্লুকোনের মাইক্রোফাইব্রিল নিয়ে গঠিত (Hawker, ১৯৬৬)। মানান দ্রব্যটি হচ্ছে মাননোজ নামক

হেক্সোজ শর্করার পলিমার এবং গ্লুকান হচ্ছে গ্লুকোজের পরিলমার। কয়েকজন গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, বহু ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে লিগনিন দ্রব্যও পাওয়া গেছে। তবে এগুলো রাসায়নিকভাবে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মতো কিনা—সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যাহোক, ছত্রাকের কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আজও সম্পূর্ণ হয় নি। সেলুলোজ কোষপ্রাচীরের ন্যায় কাইটিন দ্রব্যের প্রাচীর ও প্রকৃত দ্রবণের ক্ষেত্রে ভেদ্য হয়ে থাকে।

খ. প্রোটোপ্লাস্ট

কোষপ্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে অতি পাতলা জীবিত প্লাজমা-পর্দাবেষ্টিত জেলির ন্যায় থলথলে, দানাদার বা জালকাকার বা সমসত্ত্ব দ্রব্যকে প্রোটোপ্লাস্ট বলে। প্লাজমা-পর্দা, প্রাণসত্তা, কেন্দ্রিকা নিয়ে ছত্রাকের প্রোটোপ্লাস্ট গঠিত। ছত্রাকে কোনো প্লাস্টিড অঙ্গাণু নেই।

১. **প্লাজমা-পর্দা :** কোষপ্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগে প্রাণসত্তাকে ঘিরে যে সজীব পাতলা পর্দা থাকে, তাকেই প্লাজমা-পর্দা বলে। পর্দাটি নরম, কোমল, পাতলা ও সজীব। প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রোটোপ্লাস্টের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এটি কোষপ্রাচীরের সাথে নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। এ ভাঁজযুক্ত গঠনগুলোকে *লোমাজম* বলে (Moore & Mealear, ১৯৬৬)। পর্দাটি দ্বি-স্তরীয় প্রকৃতির।

চিত্র ১.৯ : *Mucor* ছত্রাকের বর্ধনশীল শীর্ষের ছেদনের সূক্ষ্ম গঠন

২. **প্রাণসত্তা :** প্লাজমা-পর্দা ঘেরা বর্ণহীন জেলিসদৃশ পদার্থকে প্রাণসত্তা বলে। পরিণত মাইসেলিয়ামে প্রাণসত্তা অপেক্ষাকৃত পাতলা ও গহ্বরযুক্ত। এ প্রাণসত্তায় প্রধানত আন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা, মাইটোকন্ড্রিয়া, গহ্বর, রাইবোজম প্রভৃতি অঙ্গাণু থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গলজি বডিও থাকে। এ প্রাণসত্তায় সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে গ্লাইকোজেন, ভলিউটিন তেলবিন্দু প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো ছত্রাকের প্রাণসত্তায় নানা ধরনের উৎসেচক ও জৈব অ্যাসিডও থাকে।

ক. **আন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা :** ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে আন্তঃপ্লাজমা জালিকার উপস্থিতি জানা যায়। এগুলো সাধারণত পর্দাপদ্ধতি বা মাইক্রো-নলাকার গঠনবিশেষ ; আর এ পর্দাগুলো ছোট ছোট কণার সমষ্টি। অনেক বিজ্ঞানীর মতে এগুলো রাইবোজম কণাযুক্ত গঠন করে। অনেক ছত্রাকে এগুলো ভেসিকুলার হয়ে থাকে। তবে এগুলো আলগা ও অনিয়মিত।

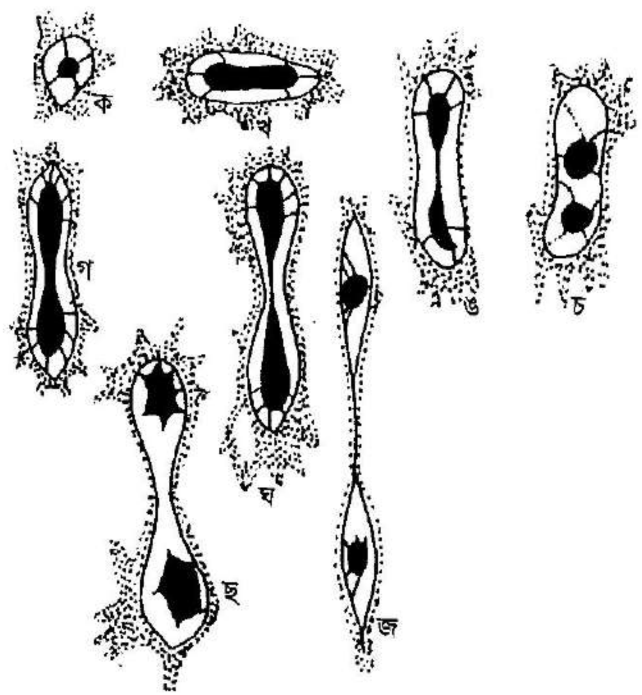

চিত্র ১.১০ : ছত্রাকের কেন্দ্রিকা-বিভাজনের বিভিন্ন দশা ও কেন্দ্রিকা-পর্দার উপস্থিতিসহ আচরণ দেখানো হয়েছে।

খ. **মাইটোকন্ড্রিয়া** : প্রাণসত্তায় ছোট ও গোলাকার গঠন দেখা যায় ; এদের মাইটোকন্ড্রিয়া বলে। এটি দ্বি-স্তরীয় পর্দাযুক্ত গঠন। ভিতরের পর্দাটি ভাঁজ হয়ে যুক্ত অবস্থায় ক্রিস্টি গঠন করে। ক্রিস্টিতে সেসব পদার্থই থাকে যেসব পদার্থ পর্দাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। এদের ক্রিয়াকাণ্ড সবুজ উদ্ভিদের মাইটোকন্ড্রিয়ার অনুরূপ। Hawker (১৯৬৫) উল্লেখ করেন যে, ছত্রাকীয় মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টি স্বল্প সংখ্যক, অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা ও অধিক অনিয়মিত।

৫. **কেন্দ্রিকা** : ছত্রাকের প্রাণসত্তায় এক বা একাধিক গোলাকার বা উপবৃত্তাকার ছোট আকারের কেন্দ্রিকা থাকে। এগুলোর অধিকাংশই ১ থেকে ৩ মাইক্রোমিলিমিটার ব্যাসযুক্ত এবং সর্বোচ্চ ব্যাস ২৫ মাইক্রোমিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি কেন্দ্রিকা একটি নির্দিষ্ট ও সচ্ছিদ্র কেন্দ্রিকা-পর্দাযুক্ত হয়ে থাকে। কেন্দ্রিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত ঘন। এ অঞ্চলটি হেমাটক্সিলিন রঞ্জক দ্বারা গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়। কিন্তু ফডিলজেন রঞ্জকে মোটেই রঞ্জিত হয় না। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে এ অঞ্চলটিকে অ্যামরফাস (amorphus) বা দানাদার বলে মনে হয়। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ একে নিউক্লিওলাস বলে অভিহিত করেছেন। Bakerspigel (১৯৬০) উল্লেখ করেন যে, এতে RNA থাকে।

ছত্রাক কোষের কেন্দ্রিকাগুলো হোমোক্যারিওন বা হেটারোক্যারিওন যুক্ত হতে পারে। কেন্দ্রিকাগুলো বংশানুধৃতিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হলে তাদের সহবস্থানকে হেটারোক্যারিওসিস (heterokaryosis) বলে। এদের বিভাজন মাইটোটিক ও মিওটিক উভয় পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে, ছত্রাকের কেন্দ্রিকা-বিভাজনকালে (বিশেষত মাইটোসিসে) কেন্দ্রিকা-পর্দার বিলুপ্তি ঘটে না ; বরং দুটি অপত্যকেন্দ্রিকা গঠনকালে কেন্দ্রিকা-পর্দাটি খাঁজযুক্ত হয়ে ডাম্বেলের মতো হয়। কেন্দ্রিকার বিভাজনকালে কেন্দ্রিকা-পর্দার এরূপ আচরণবিধিকে ক্যারিওকোরেসিস (Karyocoresis) বলে (চিত্র ১.১০)।

ছত্রাক কোষের কেন্দ্রিকার বিভাজনে তিন ধরনের রীতি দেখা গেছে :

(১) *Macrophomia phaseoli* তে মোটামুটি স্বাভাবিক মাইটোসিসের মতো আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

(২) *Mucor hiemalis*–এ অস্বাভাবিক ধরনের মাইটোসিস হয়।

(৩) *Basidiobdus ranarum*–এ উল্লিখিত দুটি প্রজাতির মাঝামাঝি ধরনের মাইটোসিস লক্ষ্য করা যায়।

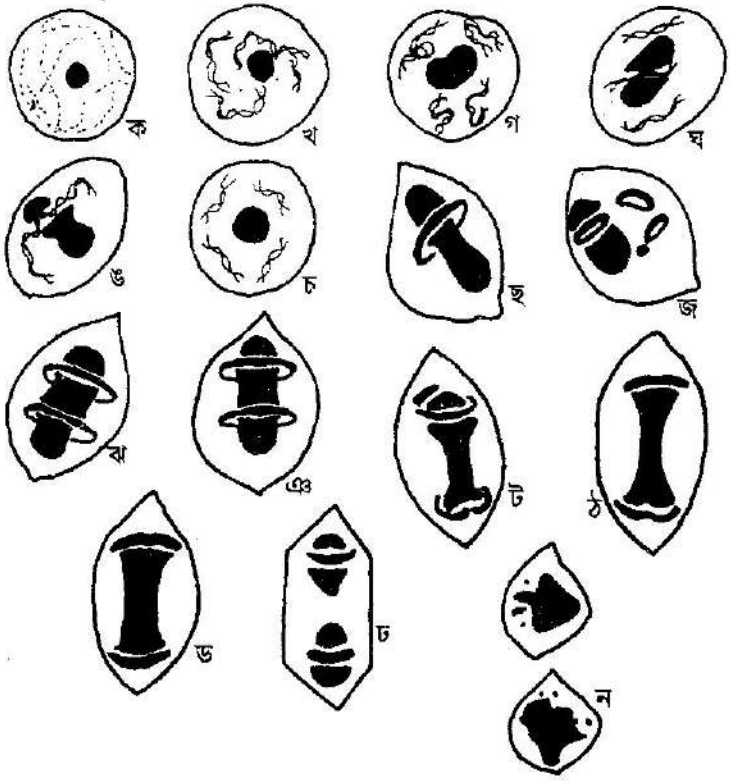

চিত্র ১.১১ : ছত্রাক কেন্দ্রিকার মিয়োটিক বিভাজন

Macrophomia phaseoli–এর মেটাফেজ পর্যায়ে লাটিমসদৃশ মাকুযন্ত্র ও মাকুতন্তু তৈরি হয় এবং উভয় মেরুতে সেন্ট্রিওল থাকে। কিন্তু মেটাফেজ প্লেট–এ ক্রোমোজম বিন্যাস সুস্পষ্ট নয়। এনাফেজে ক্রোমোজম–পদার্থগুলো দুটো ক্রোমোজমগোষ্ঠী হয়ে মাকুতন্তুর সাথে উভয় মেরুতে গমন করে (চিত্র ১.১০)। *Basidiobolus ranarum*–এর মেটাফেজ দশায় নিরক্ষ–অঞ্চলে মাকুতন্তুতে শনির বলয় তৈরি হয় এবং এটি এনাফেজ দশায় তা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় (চিত্র ১.১১)। *Mucor hiemalis*–এর মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজম পদার্থগুলো নিরক্ষ অঞ্চলে শামুকের আকৃতিসদৃশ বা আধা–কাপের মতো হয়ে বিন্যাসিত হয় এবং এনাফেজ দশায় পৃথক হয়ে দু'মেরুতে গমন করে। বেশ কিছু ছত্রাকে কেন্দ্রিকা পর্দা স্থায়ী হয় এবং শেষদিকে উভয় মেরুর মধ্যবর্তী অংশে সংকুচিত হয় (টেলোফেজ দশা ১.১০ ছ–জ, ১.১১ ড,ঢ)। *Saccharomyces* sp.–এ অন্তঃকেন্দ্রিকা–তন্তু তৈরি হয় এবং *Polystictus versicolor* sp.–এর ডাইক্যারিয়ন কোষের মাইটোসিসেও এমনটি দেখা যায় (চিত্র ১.১২)।

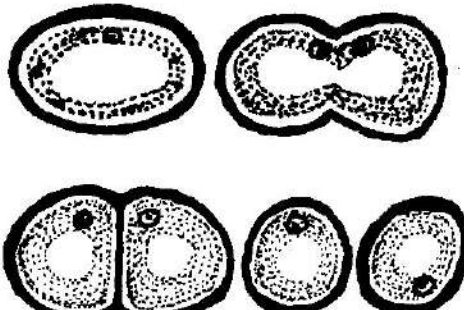

চিত্র ১.১২ : ছত্রাকে অযৌনভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি

ছত্রাকের মিওটিক কোষ বিভাজনে প্রোফেজ দশা ছাড়া অন্য দশাগুলো উচ্চশ্রেণীর কোষ–বিভাজনের অনুরূপ। অনেক ছত্রাকে জাইগোটিন দশায় সিন্যাপসিস হয়, কিন্তু *Neurospora* sp. –তে এমনটি হয় না। বিভিন্ন ছত্রাকের কোষ–বিভাজনে ক্রোমোজমের মিওটিক আচরণ ১.১৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ফ্লাজেলাম

ছত্রাকের সচল কোষ বিশেষত গ্যামেট ও চলরেণুগুলো একটি বা দুটি ফ্লাজেলাযুক্ত হয়ে থাকে। ফ্লাজেলামের অক্ষীয় সূত্রটিকে এক্সোনেম (axoneme) বলে। এতে ১১টি তন্তু থাকে ; তন্মধ্যে ৯টি পরিধিস্থ ও ২টি কেন্দ্রীয় (ঘ)। প্রতিটি ফ্লাজেলাম প্রাণসত্তার শিথ দ্বারা আবৃত থাকে। বহুদিন হতে ধারণা ছিল। Couch, ১৯৩৮, ১৯৪১ ও VIK (১৯৩৯) যে, ছত্রাকের ফ্লাজেলামগুলো দু'ধরনের, যথা—

i. হুইপল্যাস বা মসৃণ ফ্লাজেলাম ও

ii. টিনসেল বা ফ্লিমারজিসেল ফ্লাজেলাম।

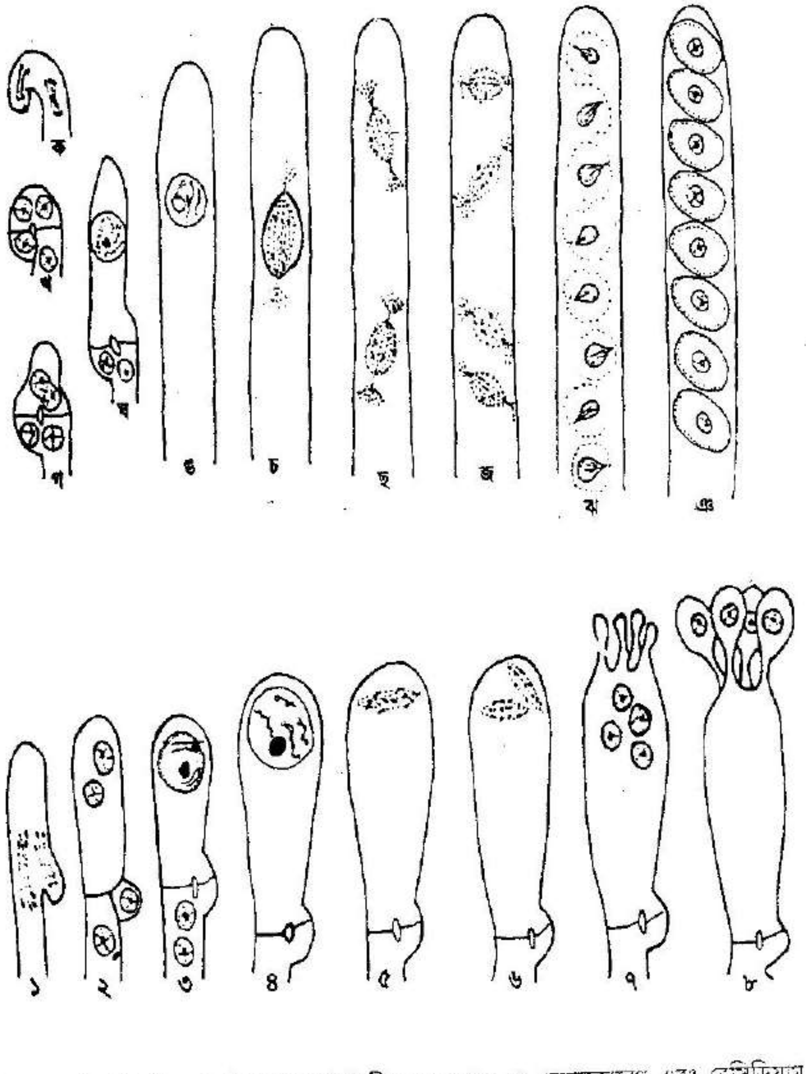

চিত্র ১.১৩ : মিওটিক ও বিভাজন মাইটোটিক অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু এবং বেসিডিয়াম ও বেসিডিওরেণুর বিকাশ ক–খ. কনজুগেট মাইটোসিস ও ক্রোজিয়ার গঠন ; গ. ক্যারিওগ্যামি ; ঘ. সিন্যাপসিস ; ঙ. ডিপ্লোটিন ; চ. অ্যানাফেজ–১ ; ছ. অ্যানাফেজ–২ ; জ. এনাফেজ–৩ ; ঝ. অ্যাসকোরেণু তৈরি হচ্ছে ; ঞ. ৮–রেণু যুক্ত অ্যাসকাস ; ট–ঠ. কনজুগেট মাইটোসিস ও ক্ল্যাম্পযোজন ; ড. ক্যারিওগ্যামি, ঢ. ডিপ্লোটিন ; ন–প. মিওটিক বিভাজন ; ফ. ৪টি হ্যাপ্লয়ডকেন্দ্রিক ; ভ. ৪–রেণুযুক্ত বেসিডিয়াম।

১. হুইপল্যাস ফ্লাজেলাম : এগুলো মসৃণ হুইপল্যাসসদৃশ গঠনযুক্ত এবং বর্ধিত শীর্ষভাগ সূচাগ্র। [illegible]-এর মতে প্রান্তভাগ ১১টি ফাইব্রিল নিয়ে গঠিত। Kole (১৯৫৭) ও Koch (১৯৫৬) উল্লেখ করেন যে, এ প্রান্ত খণ্ডটি ২টি কেন্দ্রীয় ফাইব্রিল নিয়ে গঠিত। এগুলো পরিধীয় ফাইব্রিলের চেয়ে দীর্ঘ। ফ্লাজেলামের মূলীয় অংশ শিথ দিয়ে আবৃত, দীর্ঘ, অপেক্ষাকৃত স্থূল ও [illegible]

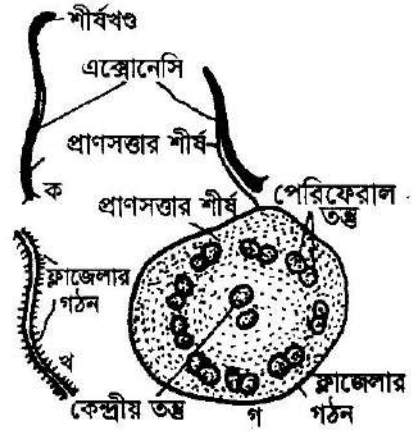

চিত্র ১.১৪ : বিভিন্ন ধরনের ফ্লাজেলা ও তার গঠনশৈলী

২. টিনসেল ফ্লাজেলাম : এ ফ্লাজেলামগুলো হঠাৎ করে অগ্রভাগে সরু নয়, কিন্তু প্রান্ত-খণ্ডযুক্তও নয়। এগুলো পার্শ্বীয় রোমযুক্ত। এক্ষেত্রে রোমগুলো ফ্লাজেলামব্যাপী দু'স্তরে বিন্যাসিত থাকে (গ)।

৩. ভোঁতা ফ্লাজেলাম : Burnatt (১৯৬৮) উক্ত দু'ধরনের ফ্লাজেলামের সাথে আর একটি ফ্লাজেলাম যুক্ত করেন ; এটি ভোঁতা ফ্লাজেলাম। এটি মসৃণ ও হুইপল্যাসের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য দেখালেও এতে কোনো প্রান্ত-খণ্ড থাকে না।

ফ্লাজেলা-বিন্যাস

Synchytrium sp.-এর চলরেণুর পশ্চাদভাগে একটি হুইপ্ল্যাস ধরনের ফ্লাজেলাম থাকে (ক)। কিন্তু *Rhizidiomyces* sp.-এর সম্মুখভাগে একটি টিনসেল ধরনের ফ্লাজেলাম দেখা যায় (খ)। আবার *Saprolegnia* sp.-এর সামনের দিকে দু'ধরনের ২টি ফ্লাজেলাম থাকে ; একটি টিনসেল ধরনের এবং সামনের দিকে নির্দেশিত এবং অন্যটি হুইপল্যাস ধরনের এবং পিছন দিকে নির্দেশিত (ঘ)। Plasmodisphoromycetes-এর সামনের দিকে নির্দেশিত ফ্লাজেলামটি ভোঁতা প্রকৃতির এবং পিছন দিকে নির্দেশিত ফ্লাজেলামটি হুইপল্যাস ধরনের (গ)। ফ্লাজেলামের সংখ্যা, প্রকৃতি ও অবস্থান ফাইকোমাইসেটিস ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

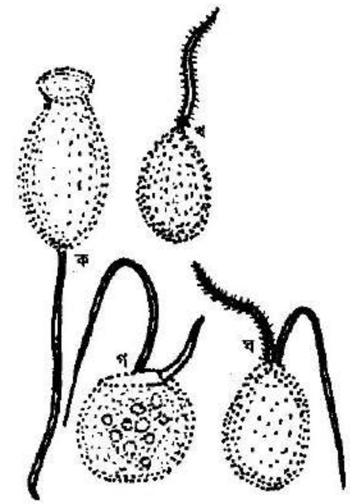

চিত্র ১.১৫ : ছত্রাকে ফ্লাজেলাবিন্যাস

ছত্রাক-কলা

ছত্রাকের মাইসেলিয়াম সাধারণত জট পাকানো হাইফির স্তূপবিশেষ। কিছু কিছু ছত্রাকের মাইসেলিয়াম নিম্নরূপভাবে রূপান্তরিত হতে পারে। এক্ষেত্রে হাইফিগুলোর আকার-আকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং আলগাভাবে একত্রিত হয়ে মেকি কলা গঠন করে থাকে। এ ধরনের কলাকে প্লেকটেনকাইমা বলে। সবধরনের ছত্রাক কলা এ নামভুক্ত। প্লেকটেনকাইমা দু'ধরনের হতে পারে ; যথা : প্রোজেনকাইমা ও সিউডোপ্যারেনকাইমা।

১. **প্রোজেনকাইমা** (Prosenchyma) : যখন কোনো ছত্রাকের হাইফিগুলো পাশাপাশি কিংবা মোটামুটি সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়ে আলগাভাবে বুনট বাঁধা দেহকলা গঠন করে তখন এ কলাপুঞ্জকে প্রোসেনকাইমা বলে। এসব কলার হাইফিগুলো স্বকীয়তা হারায় না। এগুলো লম্বাটে প্রকৃতির এবং সহজেই পরস্পর হতে পৃথক করা যায় (চিত্র ১.১৬)। এদেরকে প্রোসোপ্লেকটেনকাইমাও বলা হয়।

২. **সিউডোপ্যারেনকাইমা** (Pseudoparenchyma) বা **প্যারাপ্লেকটেনকাইমা** (Paraplectenchyma) : যখন কোনো ছত্রাকের হাইফিগুলো পরস্পরকে বিভিন্নভাবে জড়াজড়ি করে একটি পাকানো কলাপুঞ্জের সৃষ্টি করে তখন এদেরকে সিউডোপ্যারেন-কাইমা বলে। এ কলা গঠনকারী হাইফিগুলো স্বকীয়তা হারায় বলে এদেরকে পৃথক করা যায় না। হাইফিগুলো এমনভাবে জট পাকিয়ে থাকে যে প্রস্থচ্ছেদে এদেরকে বাহ্যিকভাবে প্যারেনকাইমীয় কোষের ন্যায় গোলাকার বা সমব্যাসযুক্ত বলে অনুমিত হয় (চিত্র ১.১৬)।

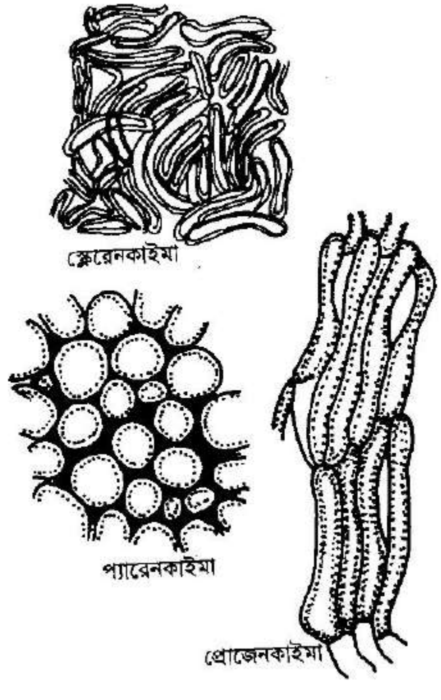

চিত্র ১.১৬ : ছত্রাকের প্লেকটেনকাইমা কলা বা সিউডোপ্যারেনকাইমা

ক. **স্ক্লেরোসিয়াম** (Sclerotium) : কোনো কোনো ছত্রাকের হাইফিগুলো পরস্পর জড়াজড়ি করে বেলনাকার বা গোলাকার একটি শক্ত ও জটিল গঠন তৈরি করে, একেই স্ক্লেরোসিয়াম বলে। এগুলো সিউডোপ্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে ভিতর দিকের কোষগুলো বর্ণহীন ও সঞ্চিত খাদ্যে ভরপুর এবং বাইরের দিকের কোষগুলো স্থূল প্রাচীরযুক্ত, গাঢ় বাদামি বা কালো রঙের ও শক্ত খোলকের ন্যায়। প্রজাতিভেদে এদের আকার আলপিনের মাথার মতো ক্ষুদ্র হতে ফুটবলের মতো বড় হতে পারে। এগুলো বিশ্রাম-অঙ্গ হিসেবে গণ্য। কেননা এটি ছত্রাককে প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রমে সহায়তা করে, যেমন *Claviceps* sp.। কোনো কোনো ছত্রাকের স্ক্লেরোসিয়াম মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

খ. **স্ট্রোমা** (Stroma) : কতিপয় ছত্রাকের রেণুস্থলিধরের নিচে প্রোসেনকাইমা বা সিউডোপ্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত অনির্দিষ্ট আকৃতির নিরেট গদির ন্যায় অঙ্গের উৎপত্তি হয়ে থাকে, এগুলোকেই *স্ট্রোমা* বলে। স্ট্রোমাগুলোর মধ্যে জননদেহ বা ফলোৎপাদন অঙ্গ থাকে। উদাহরণ *Daldinia* sp.

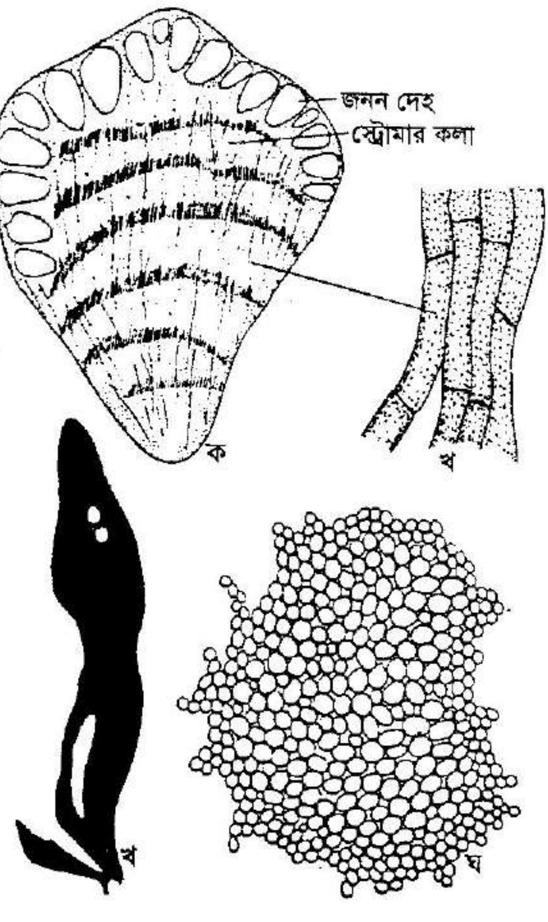

চিত্র ১.১৭ : স্ক্লেরোসিয়াম ও স্ট্রোমা

গ. রাইজোমর্ফ (Rhizomorph) : উচ্চশ্রেণীর কোনো কোনো ছত্রাকের হাইফিগুলো যখন পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকা শক্তভাবে স্থূল, শক্ত পাকানো রশির ন্যায় গাঢ়-বাদামি বর্ণের এক ধরনের অঙ্গ গঠন করে তখন একে রাইজোমর্ফ বলে। এখানে হাইফিগুলোর স্বকীয়তা থাকে না। রাইজোমর্ফগুলোকে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মূলের ন্যায় দেখায়। এদের অগ্রভাগে বৃদ্ধি অঞ্চল ও প্রশস্ত কর্টেক্স বিদ্যমান। এগুলো সাধারণত প্রতিকূলতা এড়ানোর জন্য উৎপন্ন হয় ; কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি আগমনে এরা সক্রিয় হয় ও ছত্রাকের জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখে। এসব রূপান্তর ছাড়াও বুলবিল, গিমা, ক্ল্যামা-সংযোগ প্রভৃতি গঠন করে থাকে।

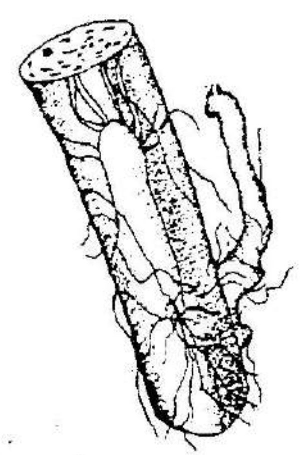

চিত্র ১.১৮ : রাইজোমর্ফের গঠন

বৃদ্ধি

ছত্রাকের দেহগঠনকারী হাইফিগুলো শীর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিকালে প্রাণসত্তার সংশ্লেষ ও কোষ বিভাজনসহ প্রসারিত হয়। বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ হলো ০°-৩০° সে. তাপমাত্রা, pH 6. বৃদ্ধিকালে হাইফিগুলোর বিভাজন নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে ; যথা :

১. কোষ বিভাজন দ্বারা ;
২. যুগ্ম বিভাজন দ্বারা,
৩. ক্ল্যাম্প-সংযোগ দ্বারা।

নিচে এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. **কোষ বিভাজন দ্বারা :** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রিকা-বিভাজনের মাধ্যমে হাইফির বৃদ্ধির সূচনা হয়। এরূপ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট দুটি অপত্য কেন্দ্রিকার মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে একটি প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় এবং একটি নতুন কোষের উদ্ভব হয়।

২. **যুগ্মবিভাজন দ্বারা :** এটি একটি বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজন। এটি সাধারণত ডাইক্যারিওটিক মাইসেলিয়ামে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে, দ্বি-কেন্দ্রিকাযুক্ত হাইফিতে কোষ বিভাজনকালে কেন্দ্রিকা দুটি পাশাপাশি অবস্থান করে একই সাথে বিভক্ত হতে শুরু করে এবং শেষে ৪টি কোষে পরিণত হয়।

৩. **ক্ল্যাম্পযোজনের দ্বারা :** এটিও এক ধরনের যুগ্ম বিভাজন। এক্ষেত্রে বেসিডিওমাইসেটিসের ডাইক্যারিওটিক মাইসেলিয়ামের দ্বি-কেন্দ্রিকাযুক্ত হাইফি যুগ্ম বিভাজন মাধ্যমে দুটি অপত্যকোষ উৎপন্ন করে। ক্ল্যাম্পযোজন নামক বিশেষ এক ধরনের বক্র উপবৃদ্ধির সহায়তায় এটি ঘটে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বি-কেন্দ্রিকাযুক্ত হাইফির কোষ বিভাজনকালে ক্ল্যাম্পযোজন গঠিত হয়। যখন কেন্দ্রিকাদ্বয়ের বিভাজন শুরু হয় তখন দুটি কেন্দ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে ক্ল্যাম্প নামক একটি ক্ষুদ্র নলাকার পার্শ্বীয় গঠন তৈরি হয় (চিত্র ১.১৯)। এটি ক্রমশ নিচের দিকে বেঁকে হুকের ন্যায়

ধারণ করে। একে ক্রোজিয়ার বলে। কেন্দ্রিকাদ্বয়ের একটি এ ক্রোজিয়ারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যটি পূর্বস্থানে থেকে যায়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রিকা দুটির বিভাজন শুরু হয়। ফলে ক্রোজিয়ার মধ্যস্থ কেন্দ্রিকা হতে উদ্ভূত একটি অপত্যকেন্দ্রিকা উৎপত্তিস্থলের দিকে ও অন্য অপত্য কেন্দ্রিকাটি আদিকোষের নিচের দিকে অবস্থান নেয়। অতঃপর একটি কেন্দ্রিকাসহ আরও বাঁকা হয়ে অগ্রপ্রান্ত দিয়ে আদিকোষের পার্শ্বগাত্র স্পর্শ করে ও স্পর্শস্থান দ্রবীভূত হলে ক্রোজিয়ারটিকে একটি সেতুর মত মনে হয়। এসময় উৎপত্তিস্থলের কেন্দ্রিকাটি আদিকোষে চলে যায় ও উৎপত্তিস্থলের পাদদেশে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। ইতোমধ্যে অপর কেন্দ্রিকাটিও প্রস্থপ্রাচীরের ঠিক নিচে আদিকোষে চলে আসে। ফলে আদিকোষটি দুটি অপত্যকোষে পরিণত হয়। কেন্দ্রিকা বিভাজনে অপত্য কেন্দ্রিকার উপপথরূপে কার্যকর এ ধরনের বাঁকানো উপবৃদ্ধিকেই ক্ল্যাম্পযোজন বলে (চিত্র ১.১৯ ঙ–ছ)। যেসব ডাইক্যারিওটিক কোষের কেন্দ্রিকা দুটি পাশাপাশি অবস্থান করে না, শুধু সেসব কোষেই এ নিয়মে বিভাজন হয়ে থাকে।

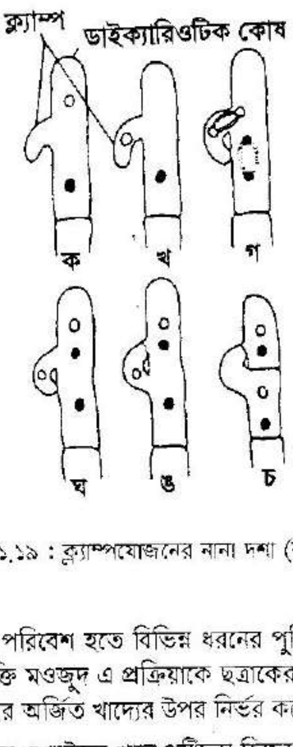

চিত্র ১.১৯ : ক্ল্যাম্পযোজনের নানা দশা (ক–ছ)

পুষ্টি

ছত্রাক মাত্রই পরভোজী। এরা পরিবেশ হতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সংগ্রহ করে দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহবৃদ্ধি, ও প্রজনন করে। শক্তি মওজুদ এ প্রক্রিয়াকে ছত্রাকের পুষ্টি আহরণ বলে। পুষ্টির জন্য ছত্রাক নানা উপায়ে নানা ধরনের অর্জিত খাদ্যের উপর নির্ভর করে।

পুষ্টি উপকরণ : ছত্রাক জৈব ও অজৈব খাদ্য পুষ্টিদ্রব্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অন্য কথায়, জৈব ও অজৈব দ্রব্যই হলো ছত্রাকের খাদ্যবস্তু। পুষ্টি সংগ্রহের কারণে এগুলো পরজীবী, মৃতজীবীরূপে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তুর উপর জন্মে থাকে।

কার্বন–ছত্রাকগুলো সাধারণত কার্বন সংগ্রহের জন্য শর্করাসমৃদ্ধ দ্রব্যের উপর জন্মে থাকে। এগুলো যেমন দেহগঠনে সাহায্য করে তেমনি শক্তিরও যোগান দেয়।

নাইট্রোজেন ছত্রাকগুলো নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণের জন্য জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের খাদ্যবস্তুর উপর জন্মায়। নাইট্রোজেনের উত্তম উৎস হলো—প্রোটিন, পেপটাইড, অ্যামিনো অ্যাসিড, জিলাটিন, অ্যালবুমিন প্রভৃতি।

অনেক ছত্রাকই অজৈব উৎস হতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। Robbin (১৯৩৯) ও Lindberg (১৯৩৩) উল্লেখ করেন যে, *Absidia* sp. *Mucor hiemalis, Lenzites trabea* ও *Marasmius*-এর প্রজাতিগুলো অ্যামোনিয়া ব্যবহার করে কিন্তু নাইট্রেট লবণ ব্যবহারে অক্ষম। নাইট্রেট বিষাক্ত মৃতজীবী ছত্রাকের মধ্যে নাইট্রোজন স্থিতিকরণ প্রজাতি পাওয়া যায় না। Metcalfe ও Chayen (১৯৫৪) উল্লেখ করেন যে, মৃত্তিকাজ *Rhodotorula* sp. ও ঈস্টসদৃশ *Pullularia pullans* নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের কাজ করে থাকে।

ছত্রাক মাইসেলিয়ামে পানি আকারে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের চাহিদা পূরণ হয় এবং এর পরিমাণ পূর্ণ মাইসেলিয়ামের ওজনের ৮৫ থেকে ৯০%।

প্রয়োজনীয় অজৈব খাদ্যের তালিকায় রয়েছে সালফার, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। এগুলোর ছত্রাকের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট (macronutrient)।

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট খাদ্যের মধ্যে রয়েছে লৌহ, দস্তা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, কোবাল্ট ও মলিবডেনাম। বৃদ্ধির জন্য এগুলো অতীব প্রয়োজন। এগুলো সাধারণত অ্যানায়ন আকারে গৃহীত হয়ে থাকে।

অন্যান্য জীবের মতো ছত্রাকের ভিটামিন বা বৃদ্ধি ফ্যাক্টরের প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য, অধিকাংশ ছত্রাকই নিজের জন্য বৃদ্ধি–ফ্যাক্টর তৈরি করতে পারে। এ ছত্রাকগুলো ভিটামিনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর এবং এদেরকে অক্সো–অটোট্রফিক বলে। আবার যেসব ছত্রাক এক বা একাধিক বৃদ্ধি–ফ্যাক্টর সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে তৈরি করতে পারে না, সেগুলো বৃদ্ধির ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল এবং এদেরকে অক্সোট্রফিক বলে। যেসব ছত্রাকীয় ভিটামিন উৎসেচক পদ্ধতিতে অংশ নেয় সেগুলো হচ্ছে—থায়মিন (B_1), বায়োটিন, পাইরিডক্সিন (B_6) ও রাইবোফ্ল্যাভিন (B_2)। কতিপয় ছত্রাকে অবশ্য নিকোটিনিক অ্যাসিড ও প্যান্টোথেনিক এসিড প্রয়োজন হয়। তবে একথা সত্য যে, অধিকাংশ ছত্রাকেরই থায়ামিনের (B_1) প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বৃদ্ধি–ফ্যাক্টরগুলো অনুঘটকের ন্যায় কাজ করে। মৌল পুষ্টিজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্তভাবে দেওয়া যেতে পারে :

১. উপযোগী জৈব–যৌগগুলো কার্বন ও শক্তির উৎস।

২. নাইট্রোজেনের উপযোগী উৎস।

৩. সালফার, ফসফোরাস, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম অজৈব আয়নের এক পরিমিত যোগান।

৪. লৌহ, দস্তা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ ও মলিবডেনাম–অজৈব আয়নের যৎসামান্য যোগান।

৫. কিছু কিছু ভিটামিন বা জৈব বৃদ্ধি ফ্যাক্টরের যৎসামান্য উপস্থিতি।

পুষ্টি–পদ্ধতি

ছত্রাকগুলো ক্লোরোফিলবিহীন বলে অজৈব দ্রব্য হতে কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য তৈরি করতে পারে না। এজন্য এদের নানাভাবে অর্জিত খাদ্যবস্তুর উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য এসব

পরভোজী ছত্রাকগুলোকে তাদের খাদ্যগ্রহণ প্রণালীর উপর ভিত্তি করে দুটো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে যথা— ১. মৃতজীবী ও ২. পরজীবী।

১. মৃতজীবী ছত্রাকগুলো জৈব-পদার্থের উপর জন্মে সেগুলো হতে নানা প্রকার বহিঃকোষীয় উৎসেচকের দ্বারা সরল ও তরল করে নিজদের দেহে শোষণ করে। ইস্ট এবং মোল্ড (yeast and mold) মৃতজীবীর সাধারণ উদাহরণ।

২. পরজীবী ছত্রাকগুলো জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে আশ্রয় নিয়ে সেখান হতেই ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব-রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শোষণ করে জীবন-যাপন করে থাকে।

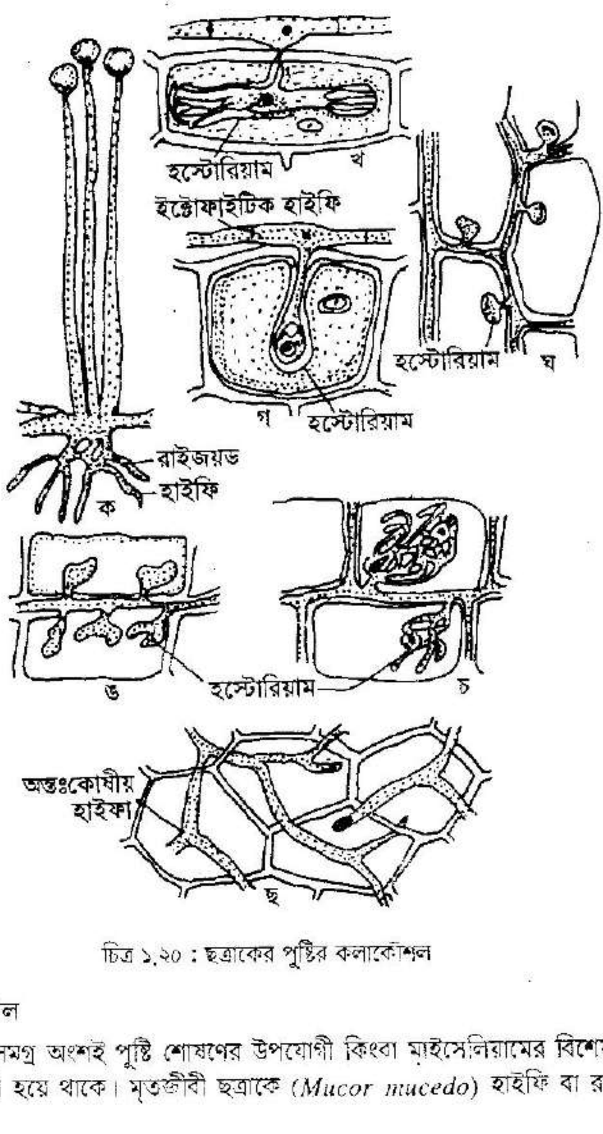

চিত্র ১.২০ : ছত্রাকের পুষ্টির কলাকৌশল

পুষ্টির কলাকৌশল

মাইসেলিয়ামের সমগ্র অংশই পুষ্টি শোষণের উপযোগী কিংবা মাইসেলিয়ামের বিশেষ অংশ এ কাজের উপযোগী হয়ে থাকে। মৃতজীবী ছত্রাকে (*Mucor mucedo*) হাইফি বা রাইজয়ডাল

মিউকর (Rhizopus stolonifer) সরাসরি আশ্রয়ের সংস্পর্শে আসে (ক)। এরা উৎসেচক নিঃসরণ করে অদ্রবণীয় জটিল খাদ্যবস্তুকে তরল ও সরল করে রাইজয়ডাল হাইফি বা পোষক দেহে অনুপ্রবেশকারী হাইফি দ্বারা ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ করে।

পরজীবী ছত্রাকের মাইসেলিয়াম কদাচিৎ এক্টোফাইটিক হয়। এগুলো সচরাচর পোষক দেহের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে (ঘ)। পোষক দেহে যেসব হাইফি প্রবেশ করে সেগুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা—

ক. আন্তঃকোষীয় হাইফি ও

খ. অন্তঃকোষীয় হাইফি।

কোনো কোনো বাধ্যতামূলক পরজীবীর আন্তঃকোষীয় হাইফি হতে সরু, পার্শ্বীয় উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয় ; এগুলোকে চোষকমূল বলে। হাইফির এ পার্শ্বীয় শাখাগুলো পোষক কোষের প্রাচীর ভেদ করে কোষমধ্যে প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধি পেয়ে গোলাকার (ঘ), খণ্ডযুক্ত (খ), শাখাযুক্ত বা শোষণ অঙ্গে পরিণত হয়। এটিই চোষকমূল। অবশ্য প্রজাতিভেদে এগুলোর আকার, আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। Albugo–তে চোষক মূল–বোতামসদৃশ বা গোলাকার (ঘ), *Hyaloperonospora parasitica*–তে থলেসদৃশ (ঙ), *Peronospora calotheca*–তে শাখাযুক্ত সূত্রাকার (চ) এবং *Erysiphe graminis*–এ লম্বাটে শাখাযুক্ত (খ) চোষক মূল দেখা যায়।

চোষক মূলের দুটি অংশ থাকে : ১. সংকুচিত অঞ্চল যা সরু অনুপ্রবেশ নালি তৈরি করে এবং ২. প্রশস্ত বা শাখাযুক্ত অঞ্চল। অনুপ্রবেশ নালিটি 'কলার' (Collar) নামে পরিচিত। প্রশস্ত অঞ্চলটি প্রাণসত্তা পর্দা ভেদ করে চোষকমূলের বেষ্টন করে ছত্রাকপ্রাচীর ও পোষক–পর্দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে মতবিরোধ বিদ্যমান।

চিত্র ১.২১ : *Albugo candida*–এর চোষকমূলের ছেদন

ছত্রাকের জনন

ছত্রাকের মাইসেলিয়ামগুলো যখন পূর্ণতাপ্রাপ্তির একটি নির্দিষ্ট দশায় উপনীত হয় এবং সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণও পর্যাপ্ত হয় তখন এরা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। একেই জনন বলে। জনন

হচ্ছে মাতৃ-পিতৃসদৃশ প্রতিনিধি (offsprings) সৃষ্টি করা। ছত্রাকের ক্ষেত্রে এ কাজটি অঙ্গজ, অযৌন বা যৌনভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অঙ্গজ ও অযৌন জননে কেন্দ্রিকা, গ্যামেট বা জনন-অঙ্গের মধ্যে কখনও মিলন হয় না, কিন্তু যৌন জননে দুটি বিপরীত যৌনের কেন্দ্রিকা, জননকোষ বা জননাঙ্গের মধ্যে মিলন হয়ে থাকে।

যেসব ছত্রাকের সমগ্র দেহটাই জনন এককে পরিণত হয় সেসব ছত্রাককে হলোকার্পিক ছত্রাক বলে। আর যেসব ছত্রাকের অংশবিশেষ জনন কাজে অংশ নেয় তাদেরকে ইউকার্পিক ছত্রাক বলে। আবার, যেসব ছত্রাক শুধু অযৌনভাবে জনন কাজ চালায় ও যৌন দশা অজ্ঞাত তাদেরকে অসম্পূর্ণ ছত্রাক বা ডিউটারোমাইসিটিস বলে। তাছাড়া যেগুলো অযৌন ও যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে তাদের প্রকৃত ছত্রাক বলে।

ছত্রাকের জনন তিনভাবে হতে পারে ; যেমন :

১. অঙ্গজভাবে

২. অযৌনভাবে ও

৩. যৌনভাবে। নিচে এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

১. **অঙ্গজ জনন :** এ ধরনের জনন সাধারণত নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে।

ক. **খণ্ডায়ন :** এক্ষেত্রে ছত্রাকের সম্পূর্ণ দেহটি বা দেহের কিছু অংশ কোনো দৈব কারণে এক বা একাধিক খণ্ডে ভেঙে যায় এবং প্রতিটি খণ্ড এক একটি নতুন মাইসেলিয়াম গঠন করে থ্যালাসের বা দেহের উৎপত্তি হয়।

খ. **দ্বিভাজন :** এক্ষেত্রে এককোষী ছত্রাকের (yeast) দেহকোষটি প্রথমে লম্বা হয়ে মধ্যভাগে খাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে সরাসরি দুটি অপত্যকোষে বিভক্ত হয়ে যায়।

গ. **মুকুলায়ন :** কোনো কোনো ছত্রাকের কোষপ্রাচীরের যে কোনো স্থান স্ফীত হয়ে মুকুলের আকৃতি ধারণ করে। ইতোমধ্যে মাতৃকেন্দ্রিকা বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কেন্দ্রিকার সৃষ্টি হয়, যার একটি মুকুলের মধ্যে চলে আসে। অতঃপর মুকুল ও মাতৃকোষের উৎপত্তি স্থলে খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং এটি ক্রমশ গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে ; ফলে মুকুলটি মাতৃদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন উদ্ভিদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ ধরনের জনন ইস্ট কোষে দেখা যায়।

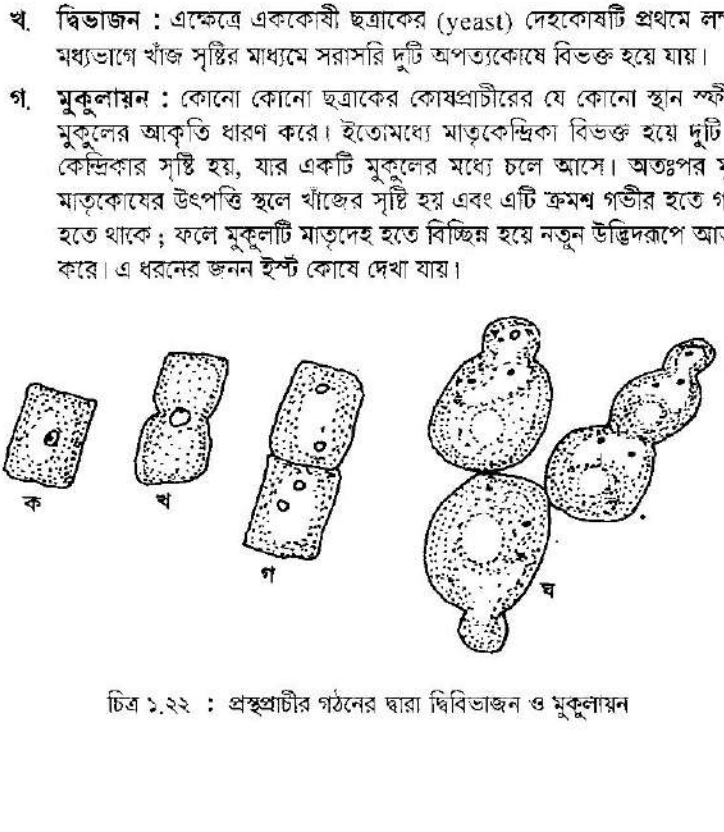

চিত্র ১.২২ : প্রস্থপ্রাচীর গঠনের দ্বারা দ্বিবিভাজন ও মুকুলায়ন

ঘ. প্রতিকূল পরিবেশে স্ক্লেরোশিয়াম ও রাইজোমর্ফ নামক এক ধরনের বিশ্রাম-অঙ্গ তৈরি হয় এবং অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়ামের জন্ম দেয়।

২. **অযৌন জনন :** একই ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কোষ বা জননকোষ অথবা রেণু দ্বারা ছত্রাকের অযৌন জনন কাজ হয়ে থাকে। অঙ্গসংস্থানিকভাবে এককোষী বা বহুকোষী ও সচল বা নিশ্চল প্রকৃতির হতে পারে এবং এগুলো বহির্জনেষ্ণু বা অন্তর্জনেষ্ণুভাবে উৎপন্ন হতে পারে। জৈবিকভাবে রেণুগুলো অযৌন ও যৌন প্রকৃতির হয়। ছত্রাকে যেসব রেণু দেখা যায় সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

রেণু

- i. অযৌন
  এগুলো অঙ্গজ প্রকৃতির, অতিরিক্ত এক উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এ রেণুগুলোর সাথে যৌন জননের কোনো সম্পর্ক থাকে না ; সেহেতু এরা জনুক্রমেও অংশ নেয় না।
  - ১. অয়ডিয়া
  - ২. কনিডিয়া
  - ৩. চলরেণু
  - ৪. অ্যাপ্ল্যানোরেণু
  - ৫. ক্ল্যামাইডোরেণু/ব্রান্ডরেণু
  - ৬. রাস্ট ছত্রাকের বিভিন্ন ধরনের রেণু
    - ক. ইউরেডোরেণু
    - খ. অ্যাসিওরেণু প্রভৃতি
    - গ. টিলিয়োরেণু
- ii. অযৌন, তবে যৌন জনন চক্রের সাথে সম্পর্কিত
  এ রেণুগুলো অযৌন হলেও যৌন জননের সাথে সম্পর্কিত
  - ১. অ্যাসকোরেণু
  - ২. বেসিডিওরেণু
- iii. যৌন
  এগুলো যৌন জননকোষ বা গ্যামেটের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় বলে এদের যৌন রেণু বলে। এগুলো ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাযুক্তও জনুক্রমে অংশ নেয়।
  - ১. উস্পোর
  - ২. জাইগোরেণু

১. **অয়ডিয়া :** কোনো কোনো ছত্রাকের হাইফি প্রস্থপ্রাচীর মুক্ত এক বা একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে অয়ডিয়া গঠন করে। এগুলো অঙ্গজ উপায়ে গঠিত কোষরূপে পরিচিত। এগুলো আয়তাকার বা প্রায় গোলাকার। এগুলো রেণুর ন্যায় আচরণ করে। এদেরকে আর্থ্রোরেণুও বলা হয়। এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে। উদাহরণ— *Coprinus bagopus, Trichosporon beigeli.*

২. **কনিডিয়া :** এগুলো এক ধরনের নিশ্চল রেণু। এগুলো বহির্জনেষ্ণুভাবে কনিডিওফোর নামক বিশেষ হাইফির অগ্রভাগে এককভাবে কিংবা শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। এগুলো স্টেরিগম্যাটি নামক অতি সূক্ষ্ম ও ভঙ্গুর বৃন্তের সাহায্যে কনিডিওফোরের সাথে যুক্ত থাকে। কনিডিওফোর ও সরল কিংবা শাখাযুক্ত হতে পারে ; তাছাড়া এটি প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত বা প্রস্থপ্রাচীরবিহীনও হতে

পারে। কনিডিয়ামগুলো পরিণতি প্রাপ্তির পর বৃন্ত হতে ঝরে যায় ও বায়ুবাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করে।

অনেক সময় কনিডিওফোরগুলো দলবদ্ধভাবে উৎপন্ন হয়ে একটি বিশেষ ধরনের গঠন বা ফলদেহ (অ্যাসারভিউলাস), পোস্টিউল, পিকনিয়া, অ্যাসিডিয়া ও স্পেরোডোকিয়া তৈরি করে।

কনিডিয়ামগুলো উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম গঠন করে থাকে।

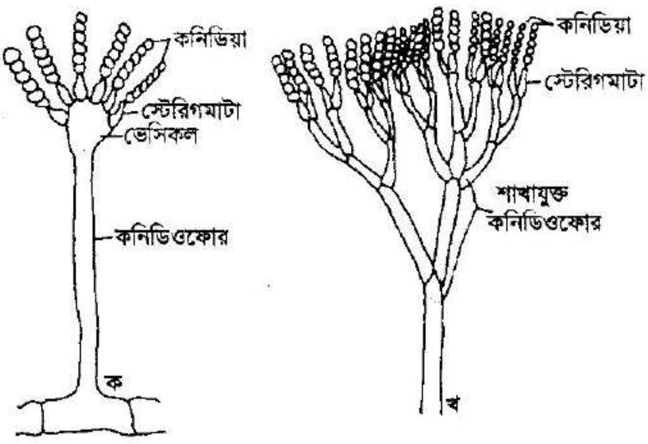

চিত্র ১.২৩ : বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক-রেণু

৩. **চলরেণু :** এগুলো অন্তর্জনেষ্ণুভাবে সৃষ্ট এককোষী, নগ্ন (প্রাচীরবিহীন) সচল ও একটি বা দুটি ফ্লাজেলাযুক্ত এক ধরনের রেণু। এগুলোকে চলরেণু নাম অভিহিত করা হয়। এগুলো চলরেণুস্থলীধরের শীর্ষভাগে উদ্ভূত গোলাকার, বেলনাকার বা থলির ন্যায় চলরেণুস্থলীর মধ্যে উৎপন্ন হয়। এগুলো চলরেণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্ট মাইটোসিস নিয়মে বিভক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় বলে এদেরকে মিটোচলরেণুও বলে। প্রতিটি চলরেণুর ফ্লাজেলামগুলো রোমবিহীন বা রোমযুক্ত হতে পারে। অনেকের মতে ছত্রাকের চলরেণুগুলো রেণুস্থলীরেণুগুলোর একপ্রকার সচল অবস্থা। উদাহরণ *Saprolegnia, Phythium, Phytophthora* প্রভৃতি।

৪. **অ্যাপ্ল্যানোরেণু বা রেণুস্থলীরেণু :** এগুলো এককোষী, অন্তর্জনেষ্ণুভাবে গঠিত নিশ্চল ও ফ্লাজেলাবিহীন একপ্রকার রেণুস্থলীরেণু। এগুলো রেণুস্থলীধরের শীর্ষভাগে থলির ন্যায় রেণুস্থলীর মধ্যে উৎপন্ন হয়। এ ধরনের নিশ্চল রেণুস্থলীরেণুগুলোকে অ্যাপ্ল্যানোরেণুও বলে। এ রেণুগুলো স্থলজ ছত্রাকের মুখ্য বৈশিষ্ট্য (*Mucor* sp., *Rhizopus* sp.)। অ্যাপ্ল্যানোরেণুগুলো ক্ষুদ্রাকৃতি, এককোষী, এককেন্দ্রিকাযুক্ত বা বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়ে থাকে। এ রেণুগুলো প্রাচীরাবৃত ও গহ্বরবিহীন। এদের কোনো ফ্লাজেলা থাকে না। এগুলো প্রাণী ও

বায়ুবাহিত হয়ে থাকে। প্রতিটি রেণুস্থলী রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়ামের জন্ম দেয়।

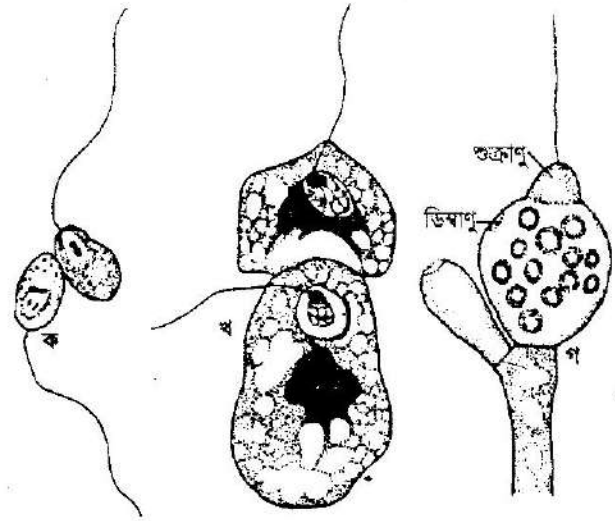

চিত্র ১.২৪ : নিশ্চল রেণুস্থলীরেণু। ক. *Mucor* ছত্রাকে ; খ. *Saprolegnia* ছত্রাকে

৫. **ব্লাস্টোরেণু :** ছত্রাকদেহে ছোট ছোট অংশে উদ্গত হয়ে এ ধরনের রেণু তৈরি হয়। এগুলো মাতৃকোষে যুক্ত থেকে শিকল তৈরি করে। এ জনন পদ্ধতিকে বাডিং (budding) বলে।

৬. **ক্ল্যামাইডোরেণু :** প্রতিকূল পরিবেশে কোনো কোনো ছত্রাকের হাইফিগুলো প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টি করে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। এসব খণ্ডের প্রোটোপ্লাস্ট খুব পুরু প্রাচীরাবৃত হয়ে ক্ল্যামাইডোরেণুতে পরিণত হয়। এগুলো এককভাবে বা শিকলাকারে হাইফির শীর্ষভাগে কিংবা নিবেশিতভাবে উৎপন্ন হয়। এগুলো অন্তর্জনেষ্ণু এককোষী, নিশ্চল। এগুলো সহজে ঝরে পড়ে না। এগুলো দীর্ঘদিন সুপ্তাবস্থায় থাকতে পারে বলে পরিবেশের প্রতিকূলতা এড়াতে পারে। পরিবেশে অনুকূল পরিস্থিতির আগমনে প্রতিটি ক্ল্যামাইডোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে। উদাহরণ : *Fusarium* sp., *Phytophthora* sp., *Mucor* sp.-ছত্রাকে এ ধরনের রেণু তৈরি হয়।

১. **অ্যাসকোরেণু :** এগুলো Ascomycetes শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ অযৌন রেণু। এগুলো প্রধানত অ্যাসকাস নামক এক বিশেষ ধরনের রেণুস্থলীর মধ্যে অন্তর্জনেষ্ণুভাবে ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় (৪-৮) মিওটিক নিয়মে উৎপন্ন হয়। এগুলো এককোষী বা বহুকোষী এবং নিশ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে *Saccharomyces*, *Ascobolus* ও *Peziza* প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

২. **বেসিডিওরেণু :** এগুলো Basidiomycetes শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তাৎপর্যময় অযৌন রেণু। এগুলো প্রধানত বেসিডিয়াম নামক এক বিশেষ ধরনের রেণুস্থলীর উপর বহির্জনেষ্ণুভাবে ও নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সংখ্যায় মিওটিক নিয়মে উৎপন্ন হয়। এগুলো এককোষী ও নিশ্চল ধরনের। উদাহরণ হিসেবে *Agaricus* sp., *Ustilags* sp., *Pucciuia* sp. প্রভৃতির নাম করা যায়।

চিত্র ১.২৫ : বিভিন্ন ধরনের রেণু ক. অ্যাসকোরেণু ; খ. বেসিডিওরেণু

যৌন রেণু

১. **উস্পোর :** অঙ্গসংস্থানিকভাবে ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী দুটি গ্যামেটের (পুং ও স্ত্রী) মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়ড রেণুটির উদ্ভব হয়, তাকে *উস্পোর* বলে। এ রেণুগুলো সাধারণত Oomycetes ও Ascomycetes–এর কতিপয় ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও শনাক্তকারী রেণু।

২. **জাইগোরেণু :** অঙ্গসংস্থানিকভাবে অভিন্ন ও শারীরবৃত্তিয়ভাবে সুসংহত দুটি গ্যামেটের (+) ও (–) মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়ড রেণুটির উৎপত্তি হয়, তাকেই জাইগোরেণু বলে। এগুলো Zygomycetes ছত্রাকের (*Mucor* sp., *Rhizopus* sp.) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেণু।

ছত্রাকের যৌন জনন

ছত্রাকের যৌন জনন দশাটিকে 'সম্পূর্ণ দশা' রূপে বিবেচনা করা হয় এজন্য যে, একে যেন 'অযৌন রেণুদশা' বা 'অসম্পূর্ণ দশা' হতে পৃথক করা যায়। অন্যান্য জীবের ন্যায় এখানেও যৌন জননের সময় দুটি বিপরীতধর্মী যৌনকোষ বা গ্যামেটের মধ্যে বা দুটি সুসঙ্গত কেন্দ্রিকার মিলন হয়। গ্যামেট উৎপাদনকারী অঙ্গকে জননকোষাধার বলে। পুংজননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গের নাম পুংধানী এবং স্ত্রী গ্যামেট উৎপাদনকারীটির নাম স্ত্রীধানী। এ দুটি জননাঙ্গ যদি একই

মাইসেলিয়ামে উৎপন্ন হয় তাহলে মাইসেলিয়ামকে *সহবাসী* এবং ভিন্ন ভিন্ন মাইসেলিয়ামে হলে তাকে ভিন্নবাসী বলে। আবার, অধিকাংশ ছত্রাকেই যৌনাঙ্গ সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায় না। এসব ছত্রাকে যৌন ভিন্নতা প্রকাশের জন্য '+' '–' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

ছত্রাকের যৌন জনন পদ্ধতিতে তিনটি স্বতন্ত্র দশা বর্তমান। এ দশা তিনটি হলো প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামি ও মিওসিস।

১. **প্লাজমোগ্যামি :** যৌন জননের এটিই প্রথম দশা। এখানে দুটি বিপরীত যৌনতাযুক্ত হাইফি বা কোষের প্রোটোপ্লাস্টের সংযোগের কারণে উভয়ের কেন্দ্রিকা (n) একই কোষের মধ্যে পরস্পরের ঘন সান্নিধ্যে অবস্থান করে। একে প্লাজমোগ্যামি বলে। এখানে প্রাণসত্তার মিলন হলেও কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন হয় না। একই কোষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকারী ভিন্নধর্মী কেন্দ্রিকা দুটিকে ডাইক্যারিয়ন (n+n) বলে। গ্যামেটিয় মিলন, জননকোষাধারীয় সংশ্লেষ, জননকোষাধারীয় সংস্পর্শ, সোমাটোগ্যামি বা স্পার্মাটাইজেশনের ফলে প্লাজমোগ্যামি হয়ে থাকে।

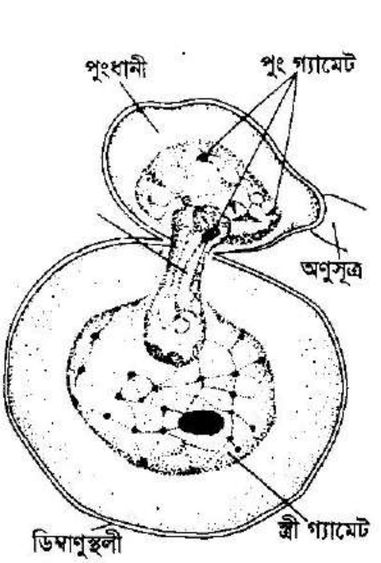

চিত্র ১.২৬ : যৌন জনন ছত্রাকে গ্যামেটের মিলন

ক. **গ্যামেটের মিলন :** এ ক্ষেত্রে গ্যামেট দুটি সচল ও ভিন্ন যৌনতাধর্মী। এ ধরনের দুটি গ্যামেটের মিলনের ফলে ২টি কেন্দ্রিকা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে (n+n)। গ্যামেট দুটি সদৃশ হলে প্রক্রিয়াটি আইসোগ্যামীয় এবং বিসদৃশ হলে অ্যানাইসোগ্যামীয় বলে।

খ. **জননকোষাধারীয় মিলন বা সংশ্লেষ :** এ ক্ষেত্রে দুটি ভিন্নধর্মী জননকোষাধারের মিলনের ফলে প্রোটোপ্লাস্টের মধ্যে যেমন মিলন হয় তেমনি কেন্দ্রিকার মধ্যেও মিলন হয়ে থাকে। এখানে বিপরীত যৌনের জননকোষ দুটির স্পর্শবিন্দুতে একটি ছিদ্রের উদ্ভব হয় এবং ছিদ্রপথেই প্রোটোপ্লাস্টের স্থানান্তর ঘটে। এটি সাধারণত হলোকার্পিক ছত্রাকেই

ঘটে থাকে। উদাহরণ *Rhizophidium* sp. প্রত্যক্ষ মিলন দেখা যায় *Mucor* sp., *Rhizopus* sp., *Sporodinia* sp.

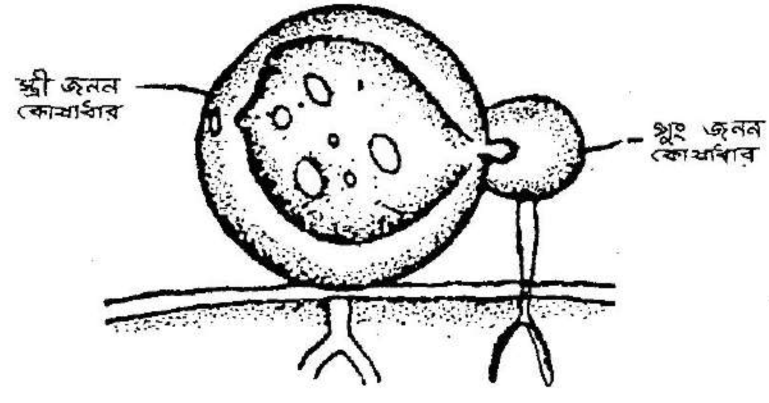

চিত্র ১.২৭ : স্পোরোগিনিয়া ছত্রাকের দুটি জননকোষাধারের মধ্যে প্রত্যক্ষ মিলন দেখানো হয়েছে

গ. **জননকোষাধারীয় সংস্পর্শ :** এখানে দুটি ভিন্নধর্মী জননকোষাধার পরস্পরকে স্পর্শ করলে উভয়ের স্পর্শস্থানের প্রাচীর দ্রবীভূত হয় এবং একটির (পুংধানী) সমুদয় প্রোটোপ্লাস্ট অন্যটির (ডিম্বাণুস্থল) ভিতর নিষেক নল মাধ্যমে চলে যায়। উদাহরণ *Pythium* sp.

ঘ. **সোমাটোগ্যামি :** কোনো জননাঙ্গ তৈরি না করে যদি দেহকোষগুলো জননাঙ্গের মতো আচরণ প্রদর্শন করে এবং সোমাযোগে মিলিত হয় তবে তাদের প্রোটোপ্লাস্ট মিলনকে সোমাটোগ্যামি বলে। দুটি হাইফির মিলনকে অ্যানাস্টোমোসিস (anastomosis) বলে এবং অ্যানাস্টোমোসিসের মাধ্যমে কেন্দ্রিকা স্থানান্তরকে সোমাটোগামি বলে।

ঙ. **স্পার্মাটাইজেশন :** কোনো কোনো ছত্রাকে স্পার্মাশিয়াম নামক এক ধরনের পুংজনন কোষ তৈরি হয়। এগুলো স্ত্রীধানী কিংবা স্ত্রীগুণযুক্ত দেহকোষে প্রবেশ করে এবং ভিন্নধর্মী কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন ঘটে। উদাহরণ : *Podospora* sp., *Puccinia* sp.

২. **ক্যারিওগ্যামি :** এটি যৌন জননের দ্বিতীয় দশা। এ দশায় দুটি বিপরীতধর্মী হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকার (প্লাজমোগ্যামির ফলে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী) মিলন ঘটে। এরূপ ডাইক্যারিওন কেন্দ্রিকার মিলনের ফলে একটি ডিপ্লয়েড সিনক্যারিওন বা জাইগোট কেন্দ্রিকার (2n) সৃষ্টি হয়। একে নিষেকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্লাজমোগ্যামিও ক্যারিওগ্যামি–এ দুটি দশা সম্পন্ন হতে সময়ের ব্যবধান থাকতে পারে কিংবা প্লাজমোগ্যামির পরমুহূর্তে ক্যারিওগ্যামি ঘটতে পারে। নিম্নশ্রেণীর ছত্রাকে প্লাজমোগ্যামির পরপরই ক্যারিওগ্যামি ঘটে থাকে। কিন্তু উন্নত শ্রেণীর ছত্রাকে ক্যারিওগ্যামি কিছুটা বিলম্বে ঘটে থাকে এবং তা ডাইক্যারিওন মাইসেলিয়াম হতে উৎপন্ন বিশেষ

ধরনের কোষ মধ্যে হয়ে থাকে। এজন্য প্লাজমোগ্যামির ফলে একজোড়া বিপরীতধর্মী ('+' ও '–') কেন্দ্রিকার (n+n) উদ্ভব হয় ; একেই ডাইক্যারিওন বা ডাইক্যারিওটিক কোষ বলে। Ascomycetes–এ এ ধরনের কোষকে অ্যাসকাস ও Basidiomycetes–এ বেসিডিয়াম বলে।

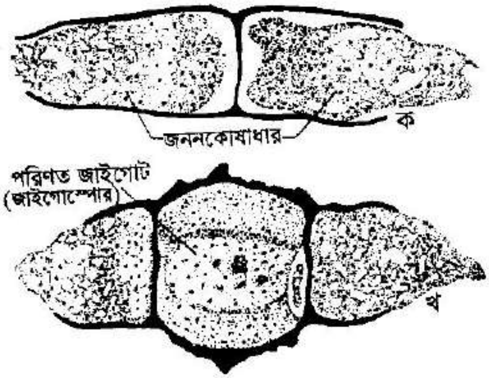

চিত্র ১.২৮ : *Pythium*–sp. এ জননকোষাধারীয় সংস্পর্শ প্রক্রিয়ায় যৌন জনন। খ. সোমাটোগ্যামি

যে প্রক্রিয়ায় কোষ ডাইক্যারিওটিক (n+n) অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাকে ডাইক্যারিওটাইজেশন এবং ক্যারিওগ্যামির দ্বারা যখন কেন্দ্রিকাটির ডিপ্লয়েড বা সিনক্যারিওটিক (2n) অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একে ডিপ্লোটাইজেশন (diplotysation) বলে।

৩. **মিওসিস :** যৌন জননের এটি তৃতীয় বা শেষ দশা। এ দশাটি ক্যারিওগ্যামির পরপরই ঘটতে পারে কিংবা কিছু দেরিতে ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে, অ্যাসকাস বা বেসিডিয়ামের ডিপ্লয়েড প্রোটোপ্লাস্ট মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে হ্যাপ্লয়েড মিওরেণু তৈরি করে।

ছত্রাকের যৌন জনন বিচিত্রধর্মী। এ যৌন জননকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. আইসোগ্যামাস (isogamous) যৌনজনন ও

খ. হেটারোগ্যামাস (heterogamous) যৌনজনন।

নিচে এসব যৌনজনন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১. আইসোগ্যামাস যৌনজনন

এ যৌন জননটি সবচেয়ে সহজ-সরল ও আদিম প্রকৃতির। এধরনের যৌন জনন প্রধানত নিম্নশ্রেণীর ছত্রাকে দেখা যায় ; যেমন Archimycetes. এখানে দুটি ভিন্নধর্মী জননকোষাধারে উৎপন্ন গ্যামেটদ্বয় ফ্ল্যাজেলাযুক্ত, সচল (প্ল্যানোগ্যামেট) ও সবদিক থেকেই সমপ্রকৃতির হলে

তাদের মিলনকে আইসোগ্যামাস জনন বলে। উদাহরণ : *Olpidium sp., Catenaria* sp. ইত্যাদি (বিশদ জানার জন্য সচল গ্যামেটের মিলন ও জননকোষধারীয় মিলন দ্রষ্টব্য)।

২. হেটারোগ্যামাস যৌনজনন

এটি অধিক উন্নত ধরনের যৌন জনন। এখানে মিলনজড়িত দুটি গ্যামেটই বিসদৃশ প্ল্যানোগ্যামেট হতে পারে। বিসদৃশ গ্যামেটদ্বয়ের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি, সচল ও ফ্লাজেলাযুক্ত এবং অন্যটি বৃহৎ, নিশ্চল ও ফ্লাজেলাবিহীন হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্তটিকে শুক্রাণু বা মাইক্রোগ্যামেট (microgamete) এবং দ্বিতীয়টিকে ডিম্বাণু বা ম্যাক্রোগ্যামেট (macrogamete) বলে। হেটারোগ্যামেট দ্বারা সম্পন্ন জননকে হেটারোগ্যামাস জনন বলে। সুতরাং হেটারোগ্যামি দু'ধরনের হতে পারে, যথা : অ্যানাইসোগামি ও উগ্যামি।

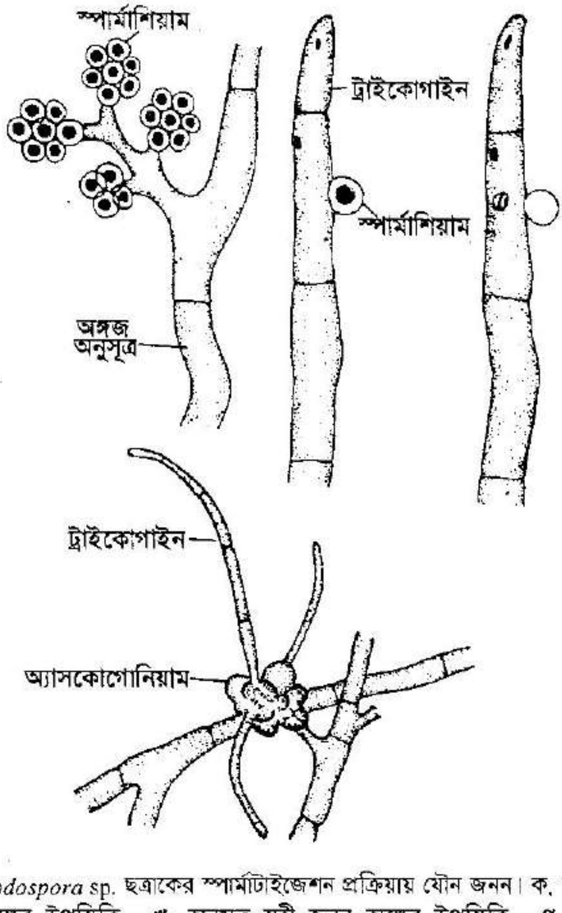

চিত্র ১.২৯ : *Podospora* sp. ছত্রাকের স্পার্মাটাইজেশন প্রক্রিয়ায় যৌন জনন। ক. অণুসূত্রে পুং জনন অঙ্গের উপস্থিতি ; খ. অনুসূত্র স্ত্রী জনন অঙ্গের উপস্থিতি ; গ. স্পার্মাটাইজেশন প্রক্রিয়া ; ঘ. প্লাসমোগ্যামি

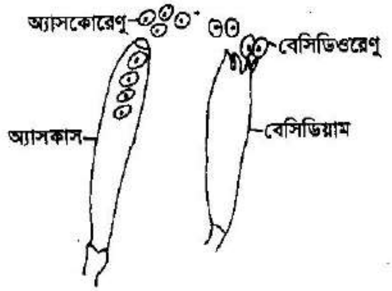

চিত্র ১.৩০ : মিওরেণুর উৎপাদন। ক. অ্যাসকাসে অ্যাসকোরেণু, খ. বেসিডিয়ামে বেসিডিওরেণু

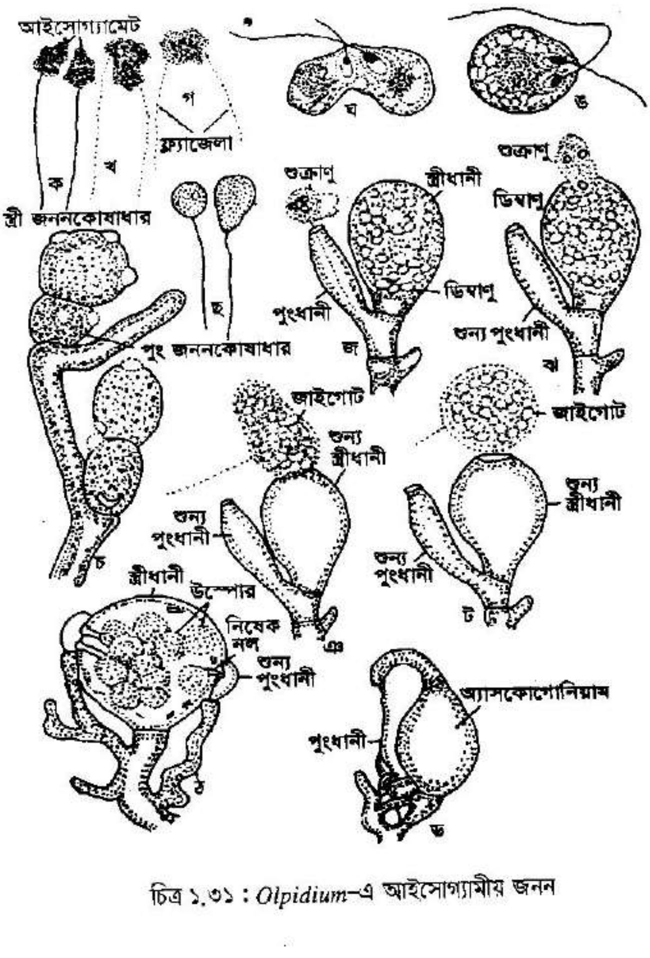

চিত্র ১.৩১ : *Olpidium*–এ আইসোগ্যামীয় জনন

অ্যানাইসোগ্যামি

এরূপ যৌন জনন জড়িত গ্যামেটগুলো অঙ্গ-সংস্থানিকভাবে একইরকমের হলেও আকার-আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। এগুলো জননকোষাধারে উৎপন্ন হয়। বড় আকৃতির গ্যামেটটিকে স্ত্রী-গ্যামেট বা ম্যাক্রোগ্যামেট বলে (ক)। পুংগ্যামেটটি আকারে ছোট এবং একে মাইক্রোগ্যামেট বলে (খ)। এ উভয় ধরনের গ্যামেটেই একটি করে ফ্লাজেলা থাকে। উদাহরণ Allomyces-এ গ্যামেটগুলো সচল প্রকৃতির। এরা পরস্পর মিলিত হয়ে জাইগোরেণু (ঘ) উৎপন্ন করে। *Monoblepharis* sp. ছত্রাকে শুধু মাইক্রোগ্যামেটটি সচল হয়।

চিত্র ১.৩১খ : Allomycetes. অ্যানাইসোগ্যামি জনন

উগ্যামি

এটি যৌন জননের সর্বাধিক উন্নত পদ্ধতি। এখানে জনন কোষাধারে যেসব গ্যামেট তৈরি হয় সেগুলো বাহ্যিকভাবে ভিন্ন ধরনের এবং জনন কোষাধারও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পুংগ্যামেট উৎপাদনকারী জনন কোষাধারকে পুংধানী এবং স্ত্রীগ্যামেট উৎপাদক অঙ্গকে বলে ডিম্বাণুস্থলী বা অ্যাসকোগোনিয়াম।

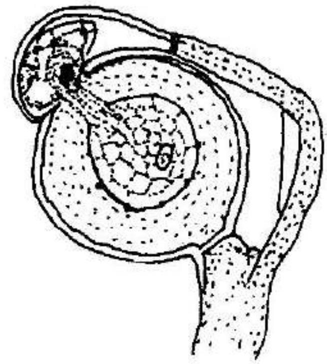

চিত্র ১.৩২ : উগ্যামি

অনেক সময় পুং ও স্ত্রী গ্যামেটগুলো নিশ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো জনন কোষাধার হতে মুক্ত হয় না। নিষেকের সময় পরিণত জনন কোষাধারদ্বয় পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে ; আর

কেবলটি পুং বা স্ত্রী হাইফির বাঁকানো প্রকৃতির জন্য সম্ভব হয় ; উদাহরণ *Pythium* sp. এদের স্পর্শস্থানের কোষপ্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ছিদ্র তৈরি হয়। এ ছিদ্রপথে পুংধানী হতে উদ্ভূত ক্ষুদ্রাকৃতি নিষেকনল বের হয়ে ডিম্বাণুস্থলীতে প্রবেশ করে। এতদসঙ্গে কিছু পরিমাণ প্রাণসত্ত্বাও চলে আসে। এ ধরনের যৌন মিলনে জনন কোষাধার তাদের স্বকীয়তা হারায় না। তাদের মধ্যে বিগলনও হয় না। হঠাৎ করে পুংধানী বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ডিম্বাণুস্থলী পরবর্তী বিকাশ চলতে থাকে। এ ধরনের জননকে উগ্যামি জনন বলে। অবশ্য, এ জননকে সাইফনোগ্যামিও বলা হয়।

আলোচনা হতে এ প্রত্যয় সত্যায়িত যে, দুটি বিপরীত যৌন কোষের মিলনের পর যে রেণু উৎপন্ন হয় তাকে যৌনজাত রেণু বলে। এ রেণুগুলোও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা : অ্যাসকোরেণু, পিকনিওরেণু, বেসিডিওরেণু, জাইগোরেণু, উস্পোর ইত্যাদি। পিকনিয়ামে পিকনিওরেণু, অ্যাসকাসে অ্যাসকোরেণু, বেসিডিয়ামে বেসিডিওরেণু তৈরি হয়। অ্যাসকাসে সাধারণত ৮টি রেণু তৈরি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২টি, ৪টি বা আটটিরও অধিক হয়ে থাকে। অ্যাসকাস বিভিন্ন ধরনের ফলদেহে বা অ্যাসকোকার্পে হয়ে থাকে। আকৃতি অনুযায়ী এদেরকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয় যথা :

১. অ্যাপোথেসিয়াম (apothecium) : বাটির মতো আকৃতিযুক্ত
২. ক্লিস্টোথেসিয়াম (cleistothecium) : গোলাকার ও শক্ত আবরণে ঘেরা
৩. পেরিথেসিয়াম (perithecium) : ফ্লাস্কের মতো।

বেসিডিওরেণু বেসিডিয়ামে হয় এবং বেসিডিয়াম ডাইক্যারিওটিক কোষ হতে উৎপন্ন হয়। পরে মিওসিসের মাধ্যমে বেসিডিয়ামের উপরে উৎপন্ন হয়। পুংধানী ও স্ত্রীধানীর মিলনে উস্পোর তৈরি হয় এবং বিপরীত যৌনের হাইফির শীর্ষভাগের মিলনের ফলে জাইগোরেণু তৈরি হয়ে থাকে।

জীবনচক্র

ছত্রাকে বিভিন্ন ধরনের জীবনচক্র দেখা যায়। তবে মোটামুটিভাবে এগুলোকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যথা :

১. **হ্যাপ্লোবায়োন্টিক** (hoplobiontic) : হ্যাপ্লোবায়োন্টিক অর্থ এক বংশের পর্যায়। এ ধরনের জীবনচক্রে কেন্দ্রিকার অনুক্রম-ধারা নিম্নরূপ :

   বিপরীতধর্মী কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন → মিওসিস → মাইটোসিস। কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলনের পরপরই মিওসিস শুরু হওয়ার জন্য দেহকোষ হ্যাপ্লয়ড হয়। অন্য কথায়, এখানে ডিপ্লয়ড দশাটি স্বল্পস্থায়ী এবং হ্যাপ্লয়ড দশাটি দীর্ঘস্থায়ী। Mucorales ও Ascomycetes-এ ধরনের জীবনচক্র দেখা যায়।

২. **ডিপ্লোবায়োন্টিক** (diplobiontic) : এক্ষেত্রে জীবনচক্রটি হ্যাপ্লোবায়োন্টিকের বিপরীত। এখানে কেন্দ্রিকার অনুক্রম পর্যায় নিম্নরূপ :

   বিপরীতধর্মী কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন → মাটোসিস → মিওসিস কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়ড জাইগোটটি তৈরি হয় তা মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয় বলে দেহকোষটি ডিপ্লয়ড থাকে (*Saccharomyces luduigii*)। অন্য কথায় এখানে ডিপ্লয়ড পর্যায়টি প্রাধান্যজড়িত।

৩. **হ্যাপ্লো-ডিপ্লোবায়োন্টিক** (haplo-diplobiontic) : এ ধরনের জীবনচক্রে দুটি পর্যায় তথা হ্যাপ্লয়ড ও ডিপ্লয়ড উভয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। এখানে কেন্দ্রিকার অনুক্রম ধারাটি নিম্নরূপ :

বিপরীতধর্মী কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন → মাইটোসিস → মিওসিস → মাইটোসিস এখানে হ্যাপ্লোফেজ ও ডিপ্লোফেজ দশার গুরুত্ব মোটামুটিভাবে সমান সমান প্রাধান্য জড়িত। এ ধরনের জীবনচক্র খুব একটা দেখা যায় না। তবে *Allomyces* sp. ও *Saccharomyces cerevisiae* তে দেখা যায়।

ছত্রাকে যৌনতার অবলুপ্তি

উন্নত শ্রেণীর (Ascomycetes) কিছু কিছু ছত্রাকে প্রাগ্রসরভাবে যৌনতার ক্রমবিলুপ্তি সবিশেষ লক্ষণীয়। কোনো কোনো অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকে উভয় ধরনের জননাঙ্গ তৈরি হলেও পুংজননাঙ্গটি অকার্যকর থাকে। এমনকি কোনো কোনো ছত্রাকে শুধুই ডিম্বাণুস্থলী তৈরি হয়, শুক্রাণুস্থলী মোটেই তৈরি হয় না। *Peziza vesiculosus*-এ কোনো জননাঙ্গই তৈরি হয় না। অবশ্য জননাঙ্গের বিলুপ্তি হলে দেহ বিকাশের (ছত্রাকের অ্যাসকোকার্পে) ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এরূপ ক্ষেত্রে দেহকোষগুলো যৌনজননের কাজ চালায়। Basidiomycetes ছত্রাকে কোনো যৌন জননাঙ্গই তৈরি হয় না।

চিত্র ১.৩৩ : সোমাটোগ্যামান কপুলেশন (প্লাজমোগ্যামি) ক. Tuber aestium খ-ঘ. *Morchella* sp.

ছত্রাকের বিভ্রমযৌনতা

Pontecoevo ও Raper (১৯৫২) সর্বপ্রথম *Aspergillns nidulans* ছত্রাকে বিভ্রমযৌনতা (parasexuality) আবিষ্কার করেন। বর্তমানে অসম্পূর্ণ ছত্রাক এবং কতিপয় অ্যাসকোমাইসিটিস ও বেসিডিওমাইসেটিস ছত্রাকের মধ্যে বিভ্রমযৌনতা আবিষ্কৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যৌনজননের ধাপগুলো যথাযথভাবে পালিত না হলেও চূড়ান্ত ফল লাভে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। মোট কথা, এখানে প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামি ও মিওসিস (হ্যাপ্লোডাইজেশন) ধাপগুলো ঘটলেও তা নিয়মিতভাবে এবং নির্দিষ্ট দফায় বা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে না। কেউ কেউ মনে করেন যে, ক্যারিওগ্যামী হলেও প্রকৃত মিওটিক বিভাজন হয় না (Webster, ১৯৭০)। এ ধরনের যৌনজনন প্রক্রিয়াকেই বিভ্রমযৌনতা বা প্যারাসেক্সচুয়ালিটি বলে। এ সম্পর্কে দশম অধ্যায়ের শেষে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

শৈবাল ও ছত্রাক

উপরের আলোচনা হতে একথা বলা যায় যে, নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছত্রাককে শৈবাল হতে পৃথক করে রেখেছে :

১. ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন।

২. পুষ্টি-প্রক্রিয়ায় পরভোজী কিংবা মৃতজীবী বা পরজীবী।

৩. স্টার্চের পরিবর্তে সঞ্চিত খাদ্য হলো গ্লাইকোজেন।

ছত্রাকগুলো আবার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যে শৈবালের সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে :

১. জনন পদ্ধতি

২. যৌনাঙ্গের এককোষী প্রকৃতি

৩. থ্যালাসসাদৃশ্য দেহকাণ্ড

৪. কলা-বিভেদনের অনুপস্থিতি

৫. গ্যামেটের মিলনের পর ভ্রূণ বিকাশের অনুপস্থিতি প্রভৃতি।

ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস

মাইসেলিয়াম ও বংশবিস্তারের ভিত্তিতে ছত্রাকবিদগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তবে তাঁরা শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কখনই একমত হতে পারেন নি। যাঁরা শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে Bessey (১৯৫০), Sparrow (১৯৫৮), Ainsworth (১৯৬১), Alexopolous (১৯৬২), Guamann (১৯৬৪), Hawker (১৯৬৭) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছত্রাকের যত প্রকার শ্রেণীবিন্যাস বর্তমান, এর মধ্যে Gwynne-Vaughan ও Barnes (১৯২৭,১৯৩৭) প্রবর্তিত শ্রেণীবিন্যাস আজ পর্যন্ত আদর্শ শ্রেণীবিন্যাসরূপে ও ব্যাপকভাবে গৃহীত। এ শ্রেণীবিন্যাসটি ছকের মাধ্যমে আলোচনা করা হলো :

ছত্রাকের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস

অধিকাংশ ছত্রাকবিদ ছত্রাক বিভাগটির নাম রেখেছেন Mycota. International Code of Biological Nomenclature (ICBN) ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা নির্ধারিত করেছেন :

১. ছত্রাক বিভাগের নাম হবে	mycota
২. উপবিভাগের নামের শেষাংশ হবে	mycotina
৩. শ্রেণীর নামের শেষাংশ হবে	mycetes
৪. উপশ্রেণীর নামের শেষাংশ হবে	mycetideae
৫. বর্গের নামের শেষাংশ হবে	ales
৬. গোত্রের নামের শেষাংশ হবে	Aceae

আধুনিককালের ছত্রাকশ্রেণীতত্ত্ববিদ C.S. Alexopoulos (১৯৬২) উদ্ভিদরাজ্যের সমস্ত ছত্রাককে Mycota-বিভাগভুক্ত করেন। এ বিভাগে রয়েছে সবুজ বর্ণহীন, কেন্দ্রিকাযুক্ত থ্যালোফাইটস। এ বিভাগকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন :

i. Myxomycotina ও

ii. Eumycotina.

উপবিভাগ (Myxomycotina)

এ গোষ্ঠীভুক্ত ছত্রাকগুলো 'স্লাইম মোল্ড' নামে পরিচিত ও নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত :

১. *Plasmodium* নামে খ্যাত সবুজ বর্ণহীন, ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত থ্যালাস।

২. *Plasmodium*–এর নির্দিষ্ট কোষপ্রাচীর নেই ও অ্যামিবয়ড প্রকৃতির।

৩. এগুলো মুক্তজীবী, ডিপ্লয়ড ও হলোকার্পিক।

৪. জনন–এককগুলো মিওরেণু।

এ উপবিভাগে Myxomycetes নামে একটি শ্রেণী রয়েছে।

উপবিভাগ (Eumycotina)

স্লাইম মোল্ড ছাড়া অন্য সব ছত্রাক এ উপবিভাগভুক্ত। এদের অধিকাংশই সূত্রাকার মাইসেলিয়ামযুক্ত। এখানে জ্ঞাত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০। এরা অযৌন ও যৌন উপায়ে বংশবিস্তার করে। অধিকাংশই ইউকোর্পিক। এ উপবিভাগে ৮টি শ্রেণী ও ১টি কৃত্রিম শ্রেণী :

১. শ্রেণী Chytridiomycetes : থ্যালাস–দেহ বিভিন্ন প্রকার গঠনযুক্ত ; সচল কোষগুলোর পিছনদিকে ১টি হুইপল্যাস ধরনের রোমহীন ফ্লাজেলাম থাকে।

২. শ্রেণী Hyphochytidiomycetes : জলজ ছত্রাক। সচল কোষগুলোর সামনের দিকে ১টি টিনসেলজাতীয় রোমশ ফ্লাজেলাম থাকে।

৩. শ্রেণী Oomycetes : সিনোসাইটিক বা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন মাইসেলিয়াম সুগঠিত। এদের সচল কোষের উভয় প্রান্তে একটি করে ফ্লাজেলাম থাকে—সামনেরটি টিনসেল ধরনের রোমশ ফ্লাজেলাম ও পিছনেরটি হুইপল্যাসজাতীয় রোমবিহীন ফ্লাজেলাম। যৌনজননে উস্পোর তৈরি হয়।

৪. শ্রেণী Plasmodiophoromycetes : পরজীবী ছত্রাক, থ্যালাস অকোষীয় ও বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত ; বিরাম রেণুগুলো দলবদ্ধভাবে তৈরি হয় কিন্তু রেণু উৎপাদক অঙ্গ থাকে না। সচল কোষগুলোর সামনের দিকে দুটি অসম দৈর্ঘ্যের হুইপল্যাস ফ্লাজেলা থাকে।

৫. শ্রেণী Zygomycetes : মৃতজীবী বা পরজীবী ছত্রাক। থ্যালাস সুগঠিত ব্যবধায়কবিহীন বা ব্যবধায়কযুক্ত মাইসেলিয়াম দ্বারা গঠিত। জীবনের কোনো অবস্থাতেই সচল কোষ তৈরি হয় না। যৌন জনন প্রধানত জননকোষ ধারীয় মিলনের ফলে জাইগোরেণু তৈরি হয়ে থাকে। এটি এক ধরনের বিশ্রামরেণু।

৬. শ্রেণী Trichomycetes : দেহ সরল বা শাখান্বিত সূত্রাকার। সূত্রগুলো প্রস্থপ্রাচীরবিহীন। জীবনের কোনো অবস্থাতেই সচল কোষ উৎপন্ন হয় না। এগুলো সন্ধিপদী সজীব প্রাণীর

পরিপাক নালি বা বহিঃত্বকে আটকে থাকে। বিভিন্ন ধরনের রেণুর সাহায্যে অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। যৌন জনন Zygomycetes শ্রেণীর ছত্রাকের ন্যায়।

৭. শ্রেণী Ascomycetes : প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হাইফি দ্বারা মাইসেলিয়াম গঠিত। গুটিকয়েক থ্যালাস এককোষী। উদাহরণ *Saccharomyces*। অযৌন জনন কনিডিয়াম দ্বারা এবং যৌন জননের ফলে অ্যাসকাসের মধ্যে অন্তর্জনেষ্ণুভাবে অ্যাসকোরেণু তৈরি হয়।

৮. শ্রেণী Basidiomycetes : মাইসেলিয়াম সরল কিংবা জটিল ধরনের হয়ে থাকে। বেসিডিয়াম নামক বিশেষ ধরনের গঠনের বহির্ভাগে (বহির্জনেষ্ণুভাবে) ক্যারিওগ্যামিও মিওসিস ও বিভাজন মাধ্যমে বেসিডিওরেণু উৎপন্ন হয়।

৯. শ্রেণী Deuteromycetes : এটি একটি কৃত্রিম শ্রেণী। একে অসম্পূর্ণ ছত্রাকও বলে। এদের যৌন দশা অজ্ঞাত। কিন্তু এসব ছত্রাকের গঠন ও অযৌন জনন Ascomycetes বা Basidiomycetes ছত্রাকের মতো।

প্রখ্যাত ছত্রাকবিদ Ainsworth (১৯৬৬)–এর পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে J. Webster (১৯৭০) ছত্রাকের যে শ্রেণীবিন্যাস করেন তা নিচে দেওয়া হলো :

ছত্রাকের রঞ্জকদ্রব্য

অদ্ভুত সুন্দর রঙিন ছত্রাকও দেখা যায়। কতিপয় ছত্রাকগোষ্ঠীর শ্রেণীবিন্যাসকরণে এ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়। আবার কিছু দারু–বৃক্ষ আক্রমণকারী ছত্রাক কাঠকেও রঙিন করে দেয়। এসব রঞ্জক দ্রব্য ছত্রাকের জৈবনিক কার্যকলাপের ফলে উৎপন্ন হয়। এ রঞ্জক দ্রব্যগুলো ছত্রাকের জন্য কি তাৎপর্য বহন করে তা আজও জানা যায়নি। বিভিন্ন ছত্রাক হতে বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিবিশিষ্ট রঞ্জক পৃথক করা হয়েছে, যেমন—

Phycomyces blakesleeanus, Mucor hiemalis, Allomyces javanicus ও *Pilobolus* sp. প্রভৃতি ছত্রাকে ক্যারোটিন থাকে। ইরিথ্রোগ্লোসিন, আরোগ্লোসিন, ফ্লাভোগ্লোসিন রঞ্জক দ্রব্য *Aspergillus glaucus* ছত্রাকে পাওয়া যায়। *Pennicillium glabrum* ও *P. citrinum* এ সাইটোমাইসেন ও সাইটিনিন পাওয়া যায়। *Helvucin thosporum gramincum*, *H. cynodontis, H. catenarium*–এ হেলমিনথোসপরিন রঞ্জক দ্রব্য পাওয়া যায়। *Ceratocystis ulmi* তে নীল, *Verticillium* sp. সবুজ রঙ দেয়।

আলো বিচ্ছুরণকারী ছত্রাক বা ছেটা ছত্রাক

কতিপয় ছত্রাক হতে আলো বিচ্ছুরিত হয়। কখনও কখনও আক্রান্ত পাতাও কাঠ হতে আলো বিচ্ছুরিত হয়। এসব ছত্রাকের মধ্যে *Panus incadescens, Plebrotus incandescens, P. illudens*–এর পিলি হতে আলো বের হয়, *Clcitocybe illudens*–এর ফল দেহ ও মাইসেলিয়াম হতে আলো বিচ্ছুরিত হয়, *Armillaria mellea*-এর রাইজোমর্ফ হতে আলো বের হয় এবং *Collybia tuberosa, C. cirrhata*-এর স্ক্লেরোশিয়া হতে আলো বের হয়, আবার *Omphalia flavida* ও *Xylaria hypoxylon* এর মাইসেলিয়া আলোক প্রদান করে থাকে।

কেন এই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে সে বিষয়ে অনুশীলন মাধ্যমে জানা গেছে যে, ছত্রাকের কোষে লুসিফেরিন দ্রব্যের উপর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে লুসিফারেজ উৎসেচক ক্রিয়া করলে এ আলোর উদ্ভব হয় ও তা বিচ্ছুরিত হয়।

জীবাশ্ম ছত্রাক

ছত্রাকদেহের রাসায়নিক গঠনজনিত কারণে অশ্মীভূত হওয়ার অবকাশ নেই। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্যালশিয়াম কার্বনেট দ্বারা প্রস্তরীভূত হয়ে থাকে। কখনও কখনও আক্রান্ত পাতা ও কাঠে ছাপ আকারে পাওয়া যায়।

James (১৮৯৩) উল্লেখ করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগেরও ছত্রাক অশ্মীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়। Sevoard (১৯৩৩) এ ধারণার সমর্থক।

জীবাশ্ম ছত্রাকের গণ নামের শেষে ites যুক্ত করে বর্তমানকালের ছত্রাকের পার্থক্য সূচিত করা হয়েছে। Saccardo (১৮৮২) তাঁর *Sylloge Fungorum* গ্রন্থে ৩৫০টি জীবাশ্ম ছত্রাকের নাম উল্লেখ করেন, জীবাশ্মভূত পাতা ও কাঠের উপর তাদের ফলদেহ বিদ্যমান বলেও উল্লেখ করেন। কিছু কিছু জীবাশ্ম-ছত্রাক হলো : *Peronosporites gracilis, Muscorites cambrensis, Phycomycites frodinghami, Erysiphites mehilli, Penicilpites curtipes, Pezisites candidus, Polyporites bowmanii, Agaricites wardiaznuns, Piceinites cretaceous* প্রভৃতি।

ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জীবনের বাসোপযোগী যে কোনো পরিবেশে বসবাসকারী নানা ধরনের অসংখ্য ছত্রাক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। ছত্রাকের নিয়মানুগ পঠন-পাঠন ২৫০ বছরের প্রাচীন হলেও মানবজীবন সঙ্গে সম্পর্কিত সেসব জীবের বিভিন্ন জীবজ ক্রিয়াকর্মের নানা ঘটনা হাজার বছরেরও বেশি বলে অনুমান করা হয়। পাউরুটি তৈরি ও মদ চোলাইকরণ-এর কাজে ছত্রাকের ব্যবহার প্রায় হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানকালের পারমাণবিক যুগে মাত্র কিছু সংখ্যক ছত্রাকের সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিবিড় সম্পর্কের কথা উপলব্ধি করা গেছে। আমাদের জীবনকালে এমন একটি দিনও নেই যা কোনো না কোনোভাবে পরিবেশে বসবাসকারী নানা ধরনের ছত্রাক দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। আমাদের চারদিকের পরিবেশে ব্যাপকভাবে ও বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন ছত্রাক প্রজাতি খুব ধীরগতিতে ও নানাবিধ জৈবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ছত্রাকের এসব ভূমিকাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— উপকারী ভূমিকা ও অপকারী ভূমিকা।

ছত্রাকের উপকারী ভূমিকা

মানবজীবনে ছত্রাক যেসব উপকারী ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলো নিম্নরূপে আলোচনা করা যেতে পারে :

১. **জমির উর্বরতা বৃদ্ধি :** জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে ছত্রাকের অবদান কম নয়। কেননা অধিকাংশ ছত্রাকই মৃতজীবী এবং নানাবিধ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ ও পচনশীল জৈব দ্রব্যের উপর বসবাস করে। এসব ছত্রাকের ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে জটিল জৈব যৌগ ভেঙে সরল হয় ও মাটির সাথে মিশে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। তাছাড়া মৃত্তিকাস্থ বিভিন্ন ধরনের অজৈব পদার্থের তরল অবস্থায় মাটি হতে চুইয়ে বাইরে যাওয়া প্রতিরোধ করে থাকে। মাটিতে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখতেও ছত্রাকের ভূমিকা রয়েছে।

২. **অত্যাবশ্যকীয় শিল্পজাত বস্তু উৎপাদন :** শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ ছত্রাক ব্যবহার করে অতীব প্রয়োজনীয় নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। ইস্টজাতীয় ছত্রাকের কয়েকটি

প্রজাতি ও *Penicillium*-এর কতিপয় প্রজাতির সাহায্যে মদ, পাউরুটি, পনির প্রভৃতি তৈরি করা হয়। সাইট্রিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড, গ্যালিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড প্রভৃতি জৈব অ্যাসিড, ভিটামিনও কয়েক প্রকার উৎসেচক—পলিজাইম টাকাডায়াসটেজ প্রভৃতি তৈরি করতেও *Aspergillus* ও *Penicillium*-এর কয়েকটি প্রজাতি বর্তমানে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। *Mucor rouxli* নামক ছত্রাকটিকে শ্বেতসার হতে চিনি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। *Aspergillus niges* ও *A. oryzae* ব্যবহার করে অ্যামাইলেজ উৎসেচক এবং *Saccharomyces cerevisiae* হতে ইনভার্টেজ উৎসেচক তৈরি করা হয়। সবুজ পনির তৈরিতে *P. camemberi* ও *P. caseicolum* এবং নিল পনির প্রস্তুত করতে *P. roqueforti* ব্যবহার করা হয়। Ascomycetes শ্রেণীর বিভিন্ন ছত্রাক থেকে ভিটামিন B, ভিটামিন D ও রাইবোফ্ল্যাভিন তৈরি করা হয়। তাছাড়া, *Gibberella fujikuroi* হতে উদ্ভিদ বৃদ্ধি, বৃদ্ধির হার নির্ণয় ও হারের তারতম্য নিরূপক হরমোন—'জিবেরেলিন' পাওয়া যায়।

৩. **ওষুধ ও উপক্ষার উৎপাদন :** বিপাকীয় কাজের ফলে ছত্রাকদেহে নানা ধরনের উপক্ষার, জৈব-যৌগ, অধিবিষ, উৎসেচক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থের অধিকাংশই অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এসব দ্রব্যের মধ্যে জীবাণু প্রতিরোধী গুরুত্ব অপরিসীম ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তবে এ দ্রব্যগুলোর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিককালের। Sir Alexander Fleming (১৯২৯) সর্বপ্রথম *Penicillium notatum*-নামক ছত্রাক হতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী, বিস্ময়কর জীবাণু-প্রতিরোধী 'পেনিসিলিন' আবিষ্কার করেন। ১৯৪১ সাল হতে এ ওষুধটি ব্যাপকভাবে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকঘটিত রোগের চিকিৎসায় ওষুধ প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে যেসব জীবাণু-প্রতিরোধী ওষুধ এসব রোগে ব্যবহৃত হয় তার অনেকগুলোই ছত্রাকজাত। ছত্রাকজাত জীবাণু-প্রতিরোধী ওষুধকে বীজঘ্ন বলে। বর্তমানে *Penicillium chrysogonum* হতেও পেনিসিলিন তৈরি করা হয়। তাছাড়া, যক্ষ্মারোগের মহৌষধ 'স্ট্রেপ্টোমাইসিন' *Streptomyces griseus* হতে, ছত্রাকজাত চর্মরোগের শক্তিশালী ওষুধ 'গ্রিসিওফুলভিন' *Penicillium griseofulvium* হতে পাওয়া যায়। আরও কিছু বীজঘ্ন হলো : 'ক্লোরোমাইসিটিন', 'আরিওমাইসিন', 'নিওমাইসিন' প্রভৃতি। আবার অনেকে মনে করেন যে, দৈত্যাকার পাফবল নামে পরিচিত *Calvatia* হতে প্রাপ্ত 'ক্লাভাসিন'-উপক্ষার ক্যান্সার ও পাকস্থলীর টিউমার নিরোধক। কিছু কিছু বীজঘ্ন সপুষ্পক উদ্ভিদের ছত্রাকঘটিত রোগ দমনে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। *Claviceps purpuera* ঘাস গোত্রীয় উদ্ভিদের পুষ্পমঞ্জরী আক্রমণ করে "আরগোট" রোগ সৃষ্টি করে ; ফলে সেখানে স্ক্লেরেশিয়া বা 'আরগোট' নামে অঙ্গ তৈরি হয়। এ আরগোট হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত উপক্ষার (ergonovine, ergotoxin, ergotamine) সহযোগে ergotin ওষুধ তৈরি হয়। এ ওষুধ মানুষ ও গবাদি-পশুর প্রসব পরবর্তী রক্তপাত বন্ধ করে ও জরায়ুর সংকোচন ঘটায়। তাছাড়া, গর্ভপাত ত্বরান্বিতকরণেও ব্যবহৃত হয়।

৪. **জ্ঞান-গবেষণায় ছত্রাকের ভূমিকা :** ধান ও গম গাছের মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক *Gibberella fujikoroi* হতে 'জিবেরেলিন' নামক একটি বৃদ্ধি হরমোন পাওয়া যায়। এটির বাণিজ্যিক নাম 'জিবেরেলিক অ্যাসিড'। উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির তারতম্য ও বৃদ্ধি হার পরীক্ষা কাজে এটির ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া, *Neurocpora, Saccharomyces,*

Ascobolus প্রভৃতি ছত্রাক জিনতত্ত্বীয় গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়। কেননা, এদের আয়ুষ্কাল বেশ সংক্ষিপ্ত।

৫. **মৃত্তিকাবাহিত জীবাণু ও অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের জৈবিক নিয়ন্ত্রণ :** রোগসৃষ্টিকারী ও ফসলীশস্য বিনাশকারী কীট-পতঙ্গের দমনে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এসব ছত্রাক কীট-পতঙ্গের দেহে পরজীবীরূপে বাস করে ও সেগুলোকে ধ্বংস করে। কোনো কোনো প্রজাতি আবার মাটিস্থ ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। শিকারজীবী এসব ছত্রাক মৃত্তিকাবাহিত জীবাণু বিনাশ করতে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় (Drechsler, ১৯৩৭)।

৬. **খাদ্যরূপে ছত্রাকের ব্যবহার :** আমিষ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক মানুষের উচ্চ-প্রশংসিত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এসব ছত্রাকের সংখ্যা প্রায় ২০০। ছত্রাকগুলোর মধ্যে মাশরুম, মোরেল, ট্রাফল প্রভৃতি নামে পরিচিত। *Volvarella sp. Agaricus sp., Morchella* sp., *Podaxom sp., Tuber sp., Lycoperdon* sp. *Clavatia* sp. প্রভৃতি নামক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য একথাও সত্য যে, উক্ত গুণযুক্ত ছত্রাকের সব প্রজাতিই ভক্ষণযোগ্য নাও হতে পারে। কাজেই এদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। এদের পুষ্টিমান প্রচুর বলে ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাংলাদেশেও এদের চাষাবাদ শুরু হয়েছে।

ছত্রাকের অপকারী ভূমিকা

একদিকে ছত্রাক যেমন উপকারী তেমনি অন্যদিকে অপকারীও হয়ে থাকে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **উদ্ভিদদেহের নানাবিধ রোগ :** ছত্রাকজনিত রোগের জন্য বাগানের শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ, দারুবৃক্ষ, ফসলীউদ্ভিদ ও ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। উদ্ভিদে যতরকম রোগ দেখা যায়, তাদের মধ্যে ছত্রাকঘটিত রোগই প্রধান। এ রোগগুলোর মধ্যে কাণ্ড ও মূল-পচন, পাতা পচন, আঠা-ঝরা, ধ্বসা, মরিচা, ভুষা চিতি, নুয়ে পড়া প্রভৃতি প্রধান। এসব রোগের কারণে ফসলীশষ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। উদ্ভিদদেহে রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকগুলোর মধ্যে *Ustilago* sp., *Puccinia* sp., *Phytophthora* sp., *Helmcinthos Porium* sp., *Maerophomina* sp., *Pythium* sp., *Pestalofia* sp., *Colletotrichum* sp., *Xamthomonas* sp. প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২. **মানুষ ও প্রাণীর রোগ :** *Aspergillus* sp., *Mucor* sp., *Rhizopus* sp., *Cercospora* sp. প্রভৃতি প্রাণীও মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ আক্রমণ করে Aspergilloses ও Mycoses রোগ সৃষ্টি করে থাকে। তাছাড়া Deuteromycetes ছত্রাকঘটিত রোগ হচ্ছে Dermatomycosis। এ রোগটি অত্যন্ত বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক ও দুরারোগ্য।

Absidia corymbifera মানুষের Brocomycosis রোগের কারণ। *Microsporum* sp.-এর আক্রমণে চুল পড়া, মাথায় টাক পড়া রোগ হয়। *Monilla* sp. ছত্রাকের আক্রমণে মুখ ও গলায় Thrush রোগ হয়।

৩. **খাদ্যদ্রব্যের পচন ও বিনষ্টকরণ :** বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে শাক-সবজি, জ্যাম, জেলি, আচার, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য ও খাদ্যজাত বস্তু এবং নিত্য প্রয়োজনীয়

...সামগ্রী, যেমন পরিধেয় বস্ত্র, চামড়া, কাগজ, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স, চশমা, রেডিও, কাঠের আসবাবপত্র বই-পুস্তক প্রভৃতির যথেষ্ট ক্ষতি করে। তাছাড়া কাচা বা পাকা ভক্ষণযোগ্য ফলমূলের ক্ষতি করে ও খাওয়ার অযোগ্য করে দেয়।

মন্তব্য : ছত্রাকের উপকারী ও অপকারী ভূমিকা সম্পর্কে উপরের আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা যত দিন যাচ্ছে তত নতুন নতুন তথ্য জ্ঞানভাণ্ডারে এসে জমা হচ্ছে।

বিষাক্ত ছত্রাক

Basidiomycetes শ্রেণীভুক্ত কতিপয় মাশরুমজাতীয় ছত্রাক মানুষ ও প্রাণীর জন্য 'মরণ-টুপি' বা "ধ্বংসকারী দেবদূত" বলে বিবেচ্য।

মরণটুপ- বিষাক্ত ছত্রাকগুলোর মধ্যে *Amanita* গণের কয়েকটি প্রজাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন— *A. Phalloides, A. verna, A. virosa* প্রভৃতি এদের দেহে বিষধর্মী সক্রিয় মূল উপাদানটি হচ্ছে "অ্যামনিটাটক্সিন"। এ টক্সিন দ্রব্যটি এক ধরনের জটিল জৈব্য যৌগ ; এতে *L. amanitine. B. amamitine* ও Phalloidine থাকে। *Amanita muscaria* তে Muscarine নামক টক্সিন থাকে। এটি খেলে মানসিক বিকার ঘটে থাকে। *Agaricus* গণের *A. xanthoderums* সামান্য বিষাক্ত এবং অন্য গণভুক্ত বিষাক্ত ছত্রাক হলো— *Boletus satanus, Russula foetens. Phallus ravenelli* অন্যতম।

ছত্রাকের জাতিজনি

ছত্রাকের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তিজনিত সম্পর্ক বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় নি। তবে ছত্রাকের অভিব্যক্তিজনিত প্রথম ও ঐতিহ্যবাহী তত্ত্বটি হলো : "শৈবাল হতে ছত্রাকের উৎপত্তি"। কিছুসংখ্যক ছত্রাকবিদ মনে করেন যে, প্রোটোজোয়া হতে ছত্রাকের উদ্ভব হয়েছে।

"শৈবালীয় তত্ত্ব"-এর সমর্থকগণ মনে করছেন যে, ছত্রাকগুলো বিলুপ্তমুখী শৈবাল। এগুলো তাদের ক্লোরোফিল হারায়। ফলে এরা পুষ্টি সংগ্রহের জন্য হেটারোট্রফিক জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করে এটি সহজবোধ্য এজন্য যে, কোনো কোনো ফ্লাজেলেটে বিভিন্ন পরিবেশজাত অবস্থা পরিপেক্ষিতে ক্লোরোফিলের বিকাশ ঘটে এবং স্বভোজীরূপে ক্লোরোফিল হারিয়ে মৃতজীবীরূপে জীবনযাপন করে।

শৈবালীয় প্রত্যয়ের সমর্থকবৃন্দ দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে পড়েছেন ; একদল "মনোফাইলেকটিক মতবাদ"-এর অনুসারী এবং অন্যদল "পলিফাইলেকটিক মতবাদ-এর" অনুসারী।

মনোফাইলেকটিক তত্ত্বের অনুসারীগণ মনে করেন যে, স্লাইম মোল্ড ও কতিপয় সরল প্রকৃতির ছত্রাক ছাড়া, (অন্যসব ছত্রাক Phycomycetes Ascomycetes ও Basidiomycetes ছত্রাকগুলো) শৈবাল হতে একটি ধারায় উদ্ভূত হয়েছে। অন্যকথায় ছত্রাকগুলোর একটি সাধারণ উৎপত্তি স্টক রয়েছে এবং মনোফাইলেকটিক ধারায় বিকশিত হয়েছে। একে শৈবালীয় উৎপত্তি বলে ধরা হয়।

আবার পলিফাইলেকটিক কুটাভাষের সমর্থকগণ মনে করেন যে, ছত্রাকগুলো বিভিন্ন শৈবালগোষ্ঠী হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। কাজেই বহুজ-উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে ছত্রাককে একটি 'হেটারোজেনাস একত্রীকরণ' গোষ্ঠীর উদ্ভিদ বলে বিবেচনা করা যায়। যেমন, Phycomycetes-এক শ্রেণীর শৈবাল হতে উদ্ভূত হলে Ascomycetes অন্য একটি শৈবাল শ্রেণী

হতে উৎপত্তি লাভ করেছে. Basidiomycetes ছত্রাকগুলো Ascomycetes হতে বিকাশ লাভ করেছে। এককোষী শৈবাল হতে Chytridiles, Siphonales শৈবাল হতে উচ্চ শ্রেণীর ছত্রাকের উদ্ভব হয়েছে।

উন্নত ছত্রাকগুলো দুটি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে—একটি ধারা Zygomycetes–এর মধ্য দিয়ে এবং অন্য ধারাটি Oomycetes–এর মধ্য দিয়ে (Brefeld, ১৮৮৯, Bessey, ১৮৯৫)। কিন্তু বর্তমানে এটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। কেননা, কোষতত্ত্বীয় ও শারীরবৃত্তীয় অনুশীলনে জানা গেছে যে, অভিব্যক্তির সমান্তরাল ধারায় শৈবাল ও ছত্রাকের বিকাশ ঘটেছে—একটি থেকে অন্যটি উদ্ভূত হয় নি। এরা উভয়েই এক উদ্বংশীয় এককোষী সচল জীব হতে উদ্ভূত হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, DeBary (১৮৮১) সর্বপ্রথম শৈবাল হতে ছত্রাকের উদ্ভব তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, Thallophyta কে সবুজ ও অসবুজ হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করা কোনো প্রাকৃতিক বিন্যাস নয়। তাছাড়া, এটি ধারণাপ্রসূত তত্ত্ব ; কোনো যুক্তিনির্ভর তত্ত্ব নয়। শৈবাল ও ছত্রাকের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া একরূপ নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। শৈবাল তার বিপাকক্রিয়া পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ছত্রাকীয় বিপাকে নেমে এসেছে—এরূপ ধারণায় তিনি বিশ্বাস করেন না। DeBary বিশ্বাস করেন যে, সুদূর অতীতে শৈবাল ও ছত্রাক যথাক্রমে এককোষী সবুজ ও অসবুজ উদ্বংশীয় ধারা হতে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে সমান্তরাল অভিব্যক্তির ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। Atkinson (১৯০৯) এ ধারণার এক দৃঢ় সমর্থক।

অসবুজ এককোষীয় উৎপত্তি : Fischer (১৮৯২) ও Atkinson (১৯০৯) উল্লেখ করেন যে, সম্ভবত অসবুজ এককোষী জীবই ছত্রাকের উৎপত্তি স্থল হয়ে থাকবে।

Capeland (১৯৫০) অধিকাংশ ছত্রাককেই লোহিত ও বাদামি শৈবালের পাশাপাশি সকল ফ্লাজেলাযুক্ত ও বর্ণযুক্ত জীব, সবুজ শৈবাল ব্যতীত অন্য শৈবাল ও Protozoa কে Inophyta –এর আওতাভুক্ত করেন। তিনি অবশ্য জলজ মোল্ড ও Myxomycetes–এ পর্বভুক্ত করেননি। তিনি শুধু ঐসব উদ্ভিদকে Plantae রাজ্যভুক্ত করেছেন যাদের ক্লোরোফিল a ও b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল রয়েছে (অর্থাৎ সবুজ শৈবাল, ব্রায়োফাইট ও পরিবাহী উদ্ভিদ)। বহুকোষী প্রাণিগুলোকেই তিনি শুধু Animalia–প্রাণিরাজ্যের আওতাভুক্ত করেছেন। Zuck (১৯৫৩) উল্লেখ করেন যে, সকল জীবই তিনটি প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকে—Autotrophic, Lysotrophic ও Phagotrophic. এ তিনটি ধারায় সুদূর অতীত হতে ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল পুষ্টি সংগ্রহ করেছে। কাজেই জীবরাজ্য হবে তিনটি—Phyta, Myketes ও Zoa. সম্প্রতিকালের জীববিজ্ঞানীগণ ৪টি রাজ্যের পক্ষপাতি—উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া। এটি Copeland–এরই সরলীকৃত ধারণা ছাড়া আর কিছু নয় (Ingold, ১৯৫৯)।

Taphruia–সদৃশ পূর্বসূরী হতে Ascomycetes ও Basidiomyetes–এর উদ্ভব হয়েছে (Savile ১৯৫৫)।

প্রোটোজোয়ান উৎপত্তি : Gobi (১৮৮৪) সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে, প্রোটোজোয়া হতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে ছত্রাকের উদ্ভব হয়েছে। Dangeard (১৮৮৬) সহ Scherfle (১৯০১, ১৯২৫), Cavers (১৯১৫), Cook (১৯২৮), Martin (১৯৩২, ১৯৫৫), Ramsbottom (১৯৪১), Langeron (১৯৪৫), Langeronz Vambreuseghem (১৯৫২) Heim (১৯৫২) Moreau (১৯৫৪) ও Ingold (১৯৫৯) এ মতের দৃঢ় সমর্থক এবং এঁদের সবাই একমত হন যে, এ

তত্ত্বটি শৈবাল উদ্ভব–তত্ত্ব হতে কম জটিল। Atkinson অবশ্য উল্লেখ করেন যে, যদি বিপাকীয় ও ফ্লাজেলার ধরন বিবেচনায় আনা হয় তবে এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে, শৈবাল নয়, প্রোটোজোয়া হতেই ছত্রাকের উদ্ভব হওয়া সমীচীন। এক–ফ্লাজেলাযুক্ত ছত্রাক এক–ফ্লাজেলাযুক্ত প্রোটোজোয়া হতে এবং দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত ছত্রাক দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত প্রোটোজোয়া হতে উদ্ভব হয়েছে।

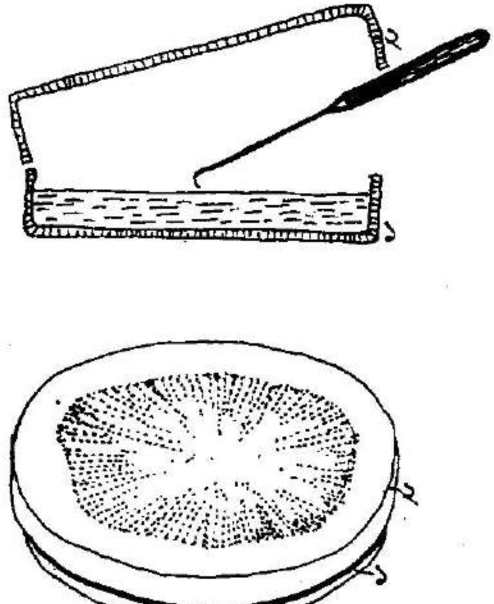

চিত্র ১.৩৪ : ছত্রাকের কৃত্রিম আবাদ

ছত্রাকের উৎপত্তি বিকাশ ও জাতিজনি যাই হোক না কেন, এটি বিস্মৃত হলে চলবে না যে, পৃথিবীতে ছত্রাকের বসবাস খুবই সুপ্রাচীন। Seward উল্লেখ করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগ হতেই পরজীবী ও মৃতজীবী ছত্রাকের অস্তিত্ব ছিল ; এমনকি তারও পূর্বে থাকতে পারে। কাজেই ছত্রাকের ইতিহাস উদ্ভিদজগতে অতি প্রাচীন। Burnett (১৯৬৮) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন "Speculateive study can hardly be proved. Its plausibility cannot be subjected to scientific testing."

ছত্রাক আবাদ

ছত্রাক অনুশীলন কাজের জন্য ছত্রাকের কৃত্রিম আবাদ বাঞ্ছনীয়। এজন্য ২% Agar-Agar আবাদ মাধ্যম ব্যবহার হয়। এর সাথে ২% মল্ট নির্যাস যোগ করতে হয়, যাতে ছত্রাকের যাবতীয় পুষ্টি বিদ্যমান। এগুলো গরম করে পেট্রিডিশে ঢেলে ঠাণ্ডা করতে হয়। আবার কখনও কখনও Agarslope–এ ছত্রাক চাষ করতে হয়। Agar-slope হচ্ছে : গরম পুষ্টিসমৃদ্ধ Agar–কে টেস্টটিউবে ঢেলে ও মুখে তুলা দিয়ে হেলানো অবস্থায় ঠাণ্ডা করলে এটি পাওয়া যায়।

পদ্ধতি

পেট্রিডিশ বা টেস্টটিউব ব্যবহার করার পূর্বে এগুলোকে ওভেনে ১৮০° তাপে ৪ ঘণ্টা ধরে নির্বীজ করতে হয়। পুষ্টিপূর্ণ আগারকে অটোক্লেভ বা প্রেসার কুকারে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড চাপে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে নির্বীজ করতে হবে। অতঃপর একে ৪০° সেলসিয়াসে ঠাণ্ডা করতে হয়। এ অবস্থা আগার দ্রবণ তরল থাকে। এ সময়ই একে পেট্রিডিশ বা টেস্টটিউবে ঢেলে ঢেকে দিতে হয় তুলা দিয়ে টেস্টটিউবের মুখ বন্ধ করে দিতে হয় যাতে আবাদ মাধ্যম দূষণমুক্ত থাকে। আগার দ্রবণ ঠাণ্ডা হলে ঢাকনা সামান্য ফাঁক করে কাঙ্ক্ষিত ছত্রাক রেখে দিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিক্সোমাইকোফাইটা

Myxomycophyta

Myxomycophyta বা স্লাইম মোল্ডগুলো ছত্রাকসদৃশ জীব। এদের অ্যামিবয়ড, প্রাণিসদৃশ অঙ্গজ বা সংশ্লেষ দশাটি কোষপ্রাচীরবিহীন। অ্যামিবয়ড, সংশ্লেষ দশাটি মুক্তজীবী ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত বলে এদেরকে *Plasmodium* বলে। আবার এককেন্দ্রিকাযুক্ত, সরল, অ্যামিবয়ড কোষগুলোকে Myxamoeba এবং গুচ্ছিতগুলোকে *Pseudoplasmodium*, স্লাইম–সূত্র দিয়ে গ্রন্থিতগুলোকে *Filoplasmodium* বলে। Plasmodial স্লাইম মোল্ডগুলোকে 'প্রকৃত স্লাইম মোল্ড', *Pseudoplasmodial* স্লাইম মোল্ডগুলোকে 'সেলুলার স্লাইম মোল্ড' এবং Filoplasmodial স্লাইম মোল্ডগুলোকে 'নিট স্লাইম মোল্ড' বলে।

প্রকৃত স্লাইম মোল্ডগুলোর অধিকাংশই মৃতজীবী ও কিছু সংখ্যক পরজীবী প্রকৃতির হয়ে থাকে। প্রথমোক্তগুলোর ক্ষেত্রে ফল–গঠনে সম্পূর্ণ দেহটিই ব্যবহৃত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে কোনো ফল–গঠন হয় না— *Plasmodium*টি রেণু খণ্ডে পরিণত হয়। প্রকৃত স্লাইম মোল্ডগুলো সোয়ার্ম (swarm) কোষ উৎপন্ন করে। কিন্তু সেলুলার স্লাইম মোল্ডগুলোতে কোনো কোষ তৈরি হয় না। এক্ষেত্রে, Pseudoplasmodium হতে ফল–গঠন তৈরি হয়। কিন্তু Filoplasmodium–এর প্রতিটি কোষ মিউসিলেজযুক্ত sporocyte–এ পরিণত হয় এবং এটাতেই শুধু রেণু উৎপন্ন হয়। রেণুগুলো দ্বিফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু হিসেবে নির্গত হয়। চলরেণুগুলো কিছু সময় সাঁতার কাটার পর ফ্লাজেলা হারিয়ে গোলাকার হয় ও নরম পর্দাবৃত হয়ে নতুন 'নেট *Plasmodium*–এ পরিণত হয়।

শ্রেণীবিভাগ

Myxomycophyta–এর সরল শ্রেণীবিন্যাসকরণ নিম্নোক্তভাবে করা যেতে পারে :

১. মুক্তজীবী প্লাজমোডিয়ামে হ্যাপ্লয়ড বা ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা থাকে।

ক. *Plasmodium* পরজীবী নয়, ফলদেহ বিদ্যমান

শ্রেণী : Myxomycetes (Myxomycoteae)

২ Plasmodium পরজীবী, ফলদেহ অনুপস্থিত।

শ্রেণী : Acrasieae

ক. অ্যামিবয়েড কোষ গুচ্ছিত হয়ে Pseudoplasmodium দেয়।

শ্রেণী : Acrasieae

৩. মাকুসদৃশ বা ডিম্বাকৃতি অ্যামিবয়ড কোষগুলো আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে *net Plasmodium* বা Filoplasmodium দেয়।

শ্রেণী : Labyrinthuleae.

জাতিজনি

Myxomycophyta সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের বৈসাদৃশ্যগুলোই মুখ্য বলে এদের অভিব্যক্তি সিরিজ অনুরূপ নয়। আপাতভাবে Myxomyceteae ও Plasmodiophoreae-এর ফ্লাজেলেট উৎপত্তি বলে মনে হয়। যাহোক, কোষতত্ত্বীয় প্রমাণে এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য খুবই ভিন্নতর হলেও এদের ফ্লাজেলেট উৎপত্তি নিশ্চিত। সম্ভবত Pseudoplasmodium গোষ্ঠীটি আদিম ছত্রাক Chytidiales হতে উদ্ভুত হয়েছে। Bonner উল্লেখ করেন যে, মুক্তজীবী মৃত্তিকাস্থ অ্যামিবা হতে Acrasieae-এর উদ্ভব হয়েছে । এ অ্যামিবাটি ফ্লাজেলেট হতে উদ্ভুত।

সর্বসম্মতভাবে এটি স্বীকৃত হয়েছে যে, Myxomycophyta স্বতন্ত্র ও স্বাধীন উৎপত্তিমুখী। তবে উত্তরসূরিগুলো সমান্তরালভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্রেণী : Myxomycetes

Plasmodial স্লাইম মোল্ডগুলো এ শ্রেণীভুক্ত ছত্রাক। এগুলো ক্ষুদ্র ও নরম প্রকৃতির রেণুস্থলীতে বর্ণযুক্ত রেণু উৎপন্ন করে থাকে। রেণুস্থলী বড় জোর কয়েক মিলিমিটার দীর্ঘ ক্যালসিয়াম লবণের কেলাসযুক্ত হয়ে থাকে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. এগুলো মুক্তজীবী, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত নগ্ন, অকোষীয় ও ডিপ্লয়ড প্লাজমোডিয়াম।

২. ফল-দেহ বা রেণুস্থলী গঠনে সমগ্র প্লাজমোডিয়ামই ব্যবহৃত হয়।

৩. রেণুস্থলীর ডিপ্লয়ড প্রোটোপ্লাস্ট মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে রেণু উৎপাদন করে।

৪. রেণুপ্রাচীর দ্বি-স্তরীয়। বাইরের প্রাচীর-স্তরটি কারুকার্যময় বা কণ্টকিত।

৫. রেণুস্থলীতে সাধারণত *capillitfum* থাকে।

৬. রেণু অঙ্কুরিত হয়ে দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত সোয়াম কোষ (swarm-cell) উৎপন্ন করে এবং এগুলো গ্যামেটরূপে কাজ করে।

৭. যৌন জনন আইসোগ্যামীয়।

৮. ডিপ্লয়ড জাইগোট হতে সরাসরি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্লাজমোডিয়াম উৎপন্ন হয়।

শ্রেণীবিভাগ

Myxomycetes শ্রেণীটিতে ৬টি বর্গ রয়েছে; যথা—

১. Coratiomyxales

২. Licealer

৩. Trichiales

৪. Echinosteliales

৫. Stemonitalcs ও

৬. Physarales এখানে শেষোক্ত বর্গটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

বর্গ : Physarales

এ বর্গে ১২টি গণ ও ১৪২টি প্রজাতি রয়েছে। এদের ফলদেহের বহির্গাত্রে ক্যালসিয়াম লবণের কেলাস থাকে। এ বর্গের উল্লেখযোগ্য গণ হলো—*Physarum* ও *Fulago*। *Physorum* গণে ৯৮টি প্রজাতি রয়েছে ; এর মধ্যে *P. polycephalum* সর্বাধিক পরিচিত।

প্রকৃতি ও বসতি

Physarales বর্গের ছত্রাকগুলো মৃতজীবী। এগুলো আশ-পাশের মৃত ও পচনশীল পাতা, ডালা-পালা ও কাঠের ওপর জন্মে ; এমনকি এগুলোকে বাকলের নিচে, পচনশীল শাক-সবজিতে, রসালো ছত্রাকের উপরে কিংবা স্যাঁতসেঁতে মাটিতেও জন্মে। তাছাড়া, উষ্ণ-আর্দ্রতা, ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও সরাসরি আলোমুক্ত স্থানের ভেজা পাথরেও এদের দেখা যায়। এগুলোকে আজ বন-জঙ্গলেও পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এগুলোকে ঘাসের পাতার উপর কিংবা বাড়ি প্রাঙ্গণের গাছ-পালাতেও দেখতে পাওয়া যায়।

স্লাইম মোল্ডের জীবনচক্রে সাধারণত দুটি দশা দেখা যায়—

i) অঙ্গজদশা ও

ii) জননদশা।

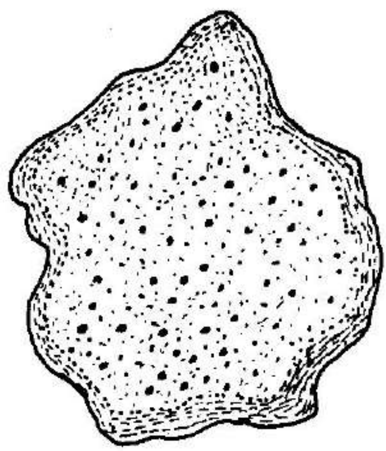

চিত্র ২.১ : তরুণ ডিপ্লয়ড প্লাজমোডিয়াম

i) **অঙ্গজদশা :** থ্যালাস ডিপ্লয়ড। এটি মুক্তজীবী আকৃতিবিহীন, নগ্ন প্রোটোপ্লাজম—এতে বহু ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিক থাকে। বাহ্যত একে নগ্ন, সিনোসাইটিক প্রোটোপ্লাজমের পিণ্ড বলে মনে হয়। একেই প্লাজমোডিয়াম বলে। এরা নরম, জেলিসদৃশ ও পিচ্ছিল। এগুলো অনেক সময় রঙিন হয়ে থাকে এবং লাল, বেগুনি, কমলা, বাদামি, হলুদাভ, কালো সবুজাভ হয়ে থাকে। প্রজাতিভেদে এ রঙের বিভিন্নতা হয়ে থাকে।

সে যাহোক, প্লাজমোডিয়ামে ক্লোরোফিল থাকে না। এ প্লাজমোডিয়ামের প্রোটোপ্লাজমে দুটি অঞ্চল বিদ্যমান—

i) বহিঃঅঞ্চল ও

ii) আন্তঃঅঞ্চল।

বহিঃঅঞ্চলটিকে এক্টোপ্লাজম (ectoplasm) বলে। এ অঞ্চলটি কম স্থিতিস্থাপক ও শক্ত এবং কেন্দ্রিকাবিহীন। আন্তঃপ্লাজমকে এন্ডোপ্লাজম (endoplasm) বলে। এ অঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা থাকে ও স্থিতিস্থাপক তরল দ্রব্যযুক্ত। তাছাড়া, এ অঞ্চলে গহ্বর, সংকোচনশীল গহ্বর, রঞ্জক কণা ও অন্যান্য দ্রব্যও থাকে। *Physarum polycephallum*–এর প্লাজমোডিয়ামে দুটি সংকোচনশীল প্রোটিন কণা Myxomycosin ও Myosin দেখা যায়। এগুলো প্রাণীর পেশিতে প্রাপ্ত Actomyosin–এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নিবিড় অনুশীলন হতে এ তথ্য উদঘাটিত হয়েছে যে, নগ্ন প্লাজমোডিয়ামের চারপাশে একটি স্থিতিস্থাপক জেলাটিন শিথ বা আবরণী বিদ্যমান। এ আবরণীটি খুবই পাতলা। এর রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আজও কিছু জানা যায় নি। অনুকূল পরিবেশে একটি প্লাজমোডিয়াম বেশ কয়েক বর্গ সেন্টিমিটার হতে পারে। প্লাজমোডিয়ামের আকার, আয়তন বৃদ্ধি, আত্তীকরণ পদ্ধতি, প্রাণসত্তার বৃদ্ধি, ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকার বিভাজন মাধ্যমে হয়ে থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কেন্দ্রিকার বিভাজন হয়। প্লাজমোডিয়ামের প্রাণসত্তায় কখনও কখনও শিরা–উপশিরার ন্যায় খাঁজ দেখা যায়। এগুলোর আবির্ভাব তিরোভাব প্লাজমোডিয়ামের চলাফেরার উপর নির্ভরশীল।

বিকাশের এক বিশেষ দশায় প্লাজমোডিয়াম দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে পড়ে পিছনের পাখাসদৃশ দানাদার প্রোটোপ্লাজম অঞ্চল এবং সামনের দিকের জালিকাকার অঞ্চল। জালিকাকার অঞ্চলটি শিরা–উপশিরার পাখাসদৃশ অংশ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি শিরা নলাকার ও জেলিসদৃশ প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ। কেন্দ্রিকা, গহ্বর ও অন্যান্য দ্রব্যসহ প্রোটোপ্লাজম এ গঠনের মধ্যেই বহমান। প্রথমে এ চলন একমুখীও ৪০ থেকে ৬০ সেকেন্ড স্থায়ী ; অতঃপর এ চলন ধীরগতি ও শেষে থেমে গিয়ে আবার বিপরীতমুখী হয়। প্রোটোপ্লাজমের এহেন গতি বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এ শক্তিটির যোগান সাধারণত সংকোচনশীল প্রোটিন ও ATP–এর বিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে।

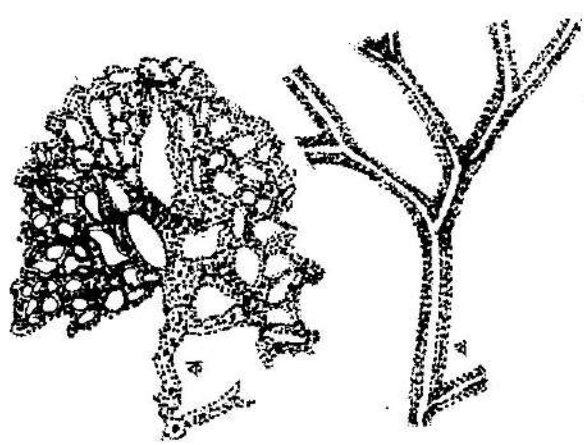

চিত্র ১.২ : *P. polycephalum* বয়স্ক পাখাসদৃশ প্লাজমোডিয়াম ও ট্রেল

প্লাজমোডিয়ামের ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকার সংখ্যা অনেক এবং প্রতিটি কেন্দ্রিকা পর্দাবৃত ও কেন্দ্রিকাণু যুক্ত। তিন ধরনের প্লাজমোডিয়াম শনাক্ত করা হয়েছে, যথা—

১. প্রোটোপ্লাজমোডিয়াম (protoplasmodium)

২. অ্যাপ্ল্যানোপ্লাজমোডিয়াম (aplanoplasmodium) ও

৩. প্ল্যানোপ্লাজমোডিয়াম (planoplsmodium)।

১. **প্রোটোপ্লাজমোডিয়াম :** এগুলো আকারে আণুবীক্ষণিক ও সমসত্ত্ব প্রোটোপ্লাজমযুক্ত। এদের প্রোটোপ্লাজমের চলন-গতি খুবই ধীর ও অনিয়মিত। ফলদেহ তৈরিতে সমগ্র প্লাজমোডিয়ামই একটি রেণুস্থলীতে পরিণত হয়। সেহেতু এটি হলোকার্পিক ছত্রাক।

২. **অ্যাপ্ল্যানোপ্লাজমোডিয়াম :** সূচনালগ্নে এটি প্রোটোপ্লাজমোডিয়ামের মতোই ; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এটি লম্বাকৃতি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, স্বচ্ছ সূতার জালক শাখা–প্রশাখা যুক্ত হয়। এ ধরনের প্লাজমোডিয়ামের প্রোটোপ্লাজম দানাদার হয় না বলে অঞ্চলায়ন ও গতিবিহীন হয়।

৩. **প্ল্যানোপ্লাজমোডিয়াম :** এ জাতীয় প্লাজমোডিয়ামগুলো আকারে বেশ বড়, মাংসল ও বিস্তৃত। প্রোটোপ্লাজম বেশ দানাদার ; জেলিসদৃশ ও তরল অঞ্চলে বিভেদিত। এখানে যাওয়া–আসা গতি লক্ষণীয়।

গমনাগমন

খাঁজ বা আঙুলাকৃতি, ভোঁতা ক্ষণপদের সাহায্যে প্লাজমোডিয়ামগুলো একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচল করে। প্লাজমোডিয়ামগুলো তাদের দেহের একইদিকে এক বা একাধিক ক্ষণপদ বের করে। এবার প্রোটোপ্লাজমগুলো ক্ষণপদাভিমুখী চলন দেখায়। ফলে ব্রততী ধরনের চলন দেখা দেয়। এরা সাধারণত আর্দ্রতা ও তীব্র আলোর দিকে যায় না বলে এদের আলোহীন অন্ধকারে দেখা যায়।

পুষ্টি

প্লাজমোডিয়াম মৃতজীবী বলে পচা বা পচনশীল দ্রব্যের উপর জন্মায় এবং ব্যাপন ক্রিয়ায় সেখান হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এগুলো কখনও কখনও ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়ান, ছত্রাকরেণু ও অন্যান্য অণুজীব ও মৃতজীবের ছোট ছোট টুকরো, পুষ্টিসমৃদ্ধ পচনশীল অজৈব দ্রব্য গ্রহণ করে ও জীবনযাপন করে। এগুলো কঠিন খাদ্য অ্যামিবার মতোই গ্রহণ করে থাকে।

জনন দশা

Plasmodium–এ দু'ধরনের জনন দেখা যায় ; যথা—

১. অযৌন ও

২. যৌন

১. অযৌন জনন

সাধারণত অঙ্গজ কোষবিভাজন মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। তবে প্রতিকূল পরিবেশে তথা অতিখরা বা শীত–মৌসুমে প্লাজমোডিয়ামগুলো বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত সিস্টে

পরিণত হয়। কখনও কখনও সমগ্র বাংলা প্লাজমোডিয়াম *(Plasmodium)*টি শুকিয়ে স্ক্লেরোশিয়াম (Sclerotium) সদৃশ গঠনে পরিণত হয়। সিস্ট বা স্ক্লেরোশিয়াম অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে ডিপ্লয়ড প্লাজমোডিয়াম *(Plasmodium)* দেয়। এসব অযৌন জনন পদ্ধতি ডিপ্লয়ড দশাকে দীর্ঘায়িত করে যা অন্য কোনো ছত্রাকে দেখা যায় না।

২ মিওরেণুর সাহায্যে জনন

মিওরেণুগুলো ফলদেহ বা রেণুস্থলীর মধ্যে কেন্দ্রিকা বিভাজন মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে। কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফলদেহ তৈরি হয় তা অজ্ঞাত হলেও এটি জানা গেছে যে, ফলদেহ গঠনের পূর্বে *Plasmodium* অন্ধকার ছেড়ে স্তিমিত আলোতে কাঠের বা পাতার নিচে অবস্থান নেয়। *Plasmodium* গোলাকার হয়ে স্তূপীকৃত হয়। ফলে কিছু সময়ের জন্য হলেও ছত্রাকসদৃশ হয়।

ক. স্লাইম মোল্ড শুকিয়ে গেলেও কোনো কোনো অংশে প্লাজমোডিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহের ফলে গম্বুজাকৃতি স্ফীতি দেখা দেয়। এগুলোকে *স্পোরোফোর* বা রেণুস্থলী বলে।

খ. সাধারণত সম্পূর্ণ প্লাজমোডিয়ামটিই ফলদেহে কিংবা এদের স্তূপে পরিণত হয়। কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে, একই জীবে অঙ্গজ ও জনন দশার পাশাপাশি অবস্থান বিদ্যমান।

চিত্র ২.৩ : Myxomycetes-র বিভিন্ন ধরনের ফলদেহ গঠন ও বিশ্রামরেণুর বিভেদন

Lycogala ও *Fuligo*-তে পুরো দেহটাই গোলাকার প্লাজমোডিয়াম, প্রাচীর নিঃসৃত করে একটি বৃহদাকার ফলদেহে পরিণত হয় ; এটি অনেকগুলো রেণুস্থলীর একীভূত অবস্থা। একে aethallium বলে। অধিকাংশ গণে, যেমন *Physarum, Stemsnitis* ও *Hemitrichia*

প্রভৃতিতে, প্লাজমোডিয়াম হতে কিছু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্নভাবে সুন্দর আকৃতির রঙিন রেণুস্থলী তৈরি হয় (খ)। এগুলো সাদা, গোলাপি, কমলা, বাদামি প্রভৃতি আভাযুক্ত হয়ে থাকে। অধিকাংশ প্রজাতিতে রেণুস্থলীর দৈর্ঘ্য ১৩ মিমি. এর বেশি হয় না। তাই এগুলো দৃশ্যমান হয়। রেণুস্থলীগুলো সবৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে। প্রজাতিভেদে এদের আকার আয়তন সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। *Physarum*–এর রেণুস্থলী স্টিপিটেট ও গোলাকার। এটির পেরিডিয়াম বা প্রাচীর একস্তরীয় ও চুনজাতীয় দ্রব্যে তৈরি।

১. **রেণুস্থলীর বিকাশ :** নিষ্ক্রিয় ডিপ্লয়েড প্লাজমোডিয়াম হতে লম্বাটে উপবৃদ্ধি দেখা দেয় (ক)। এটির মুক্ত প্রান্ত স্ফীত হয়ে গোলাকার হয়। এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকাসহ প্রাণসত্তা চলে আসে এবং নিচের, সরু, বৃন্তসদৃশ অংশ হতে প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে পৃথক হয়। এ স্ফীত অংশটিই বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত রেণুস্থলীরূপে কাজ করে (গ)। এটির একটি নির্দিষ্ট আকৃতি রয়েছে। বৃন্তসদৃশ অংশটির দৈর্ঘ্য প্রজাতিভেদে বিভিন্ন হতে পারে (ঘ)। এটি পাতলা ও সরুই থেকে যায়। আকৃতিতে রেণুস্থলীগুলো গোলাকার ডিম্বাকার, বা লম্বাটে হতে পারে। ফলদেহ বা রেণুস্থলী তিন ধরনের হতে পারে :

১. রেণুস্থলী

২. এথালিয়াম ও

৩. প্লাজমোডিওকার্প।

২. **মিওরেণু তৈরি :** রেণুস্থলীর অসংখ্য ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকা মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়। বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত রেণুস্থলী প্রোটোপ্লাজম ক্লিভেজ নিয়মে ভাগ হয়ে এককেন্দ্রিকাযুক্ত খণ্ডে পরিণত হয়। এ খণ্ডগুলো গোলাকার এবং প্রাচীরাবৃত হয়ে মিওরেণুতে পরিণত হয়। অনেক প্রজাতির এ প্রাচীরটিতে সেলুলোজ, কাইটিন কিংবা কোনোটাই থাকে না। ক্লিভেজ খাঁজটি অনেক সময় সেলুলোজ দ্রব্যে পূর্ণ থাকে এবং সূক্ষ্ম, বর্ণহীন সূত্রের জালকরূপে বিদ্যমান থাকে। এ জালকসদৃশ অবকাঠামোকেই Capillitium বলে (গ)। *Physarum*–এর Capillitium নিয়মিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়মিত সূত্রপাত বা অন্যান্য গঠন যা Capillitium–সদৃশ হয়, একে সিউডোক্যাপিলিশিয়াস বলে। কেন্দ্রীয় কলামকে কলুমেল্লা বলে। রেণুস্থলী প্রাচীর শক্ত ও ভঙ্গুর ; একে পেরিডিয়াম বলে। *Physarum*–এর পেরিডিয়াম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কণা দ্বারা নির্মিত। রেণুর বর্ণ, ক্যাপিলিশিয়ামের গঠনশৈলী এবং রেণুস্থলীর আকার–আয়তন প্রজাতিভেদে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

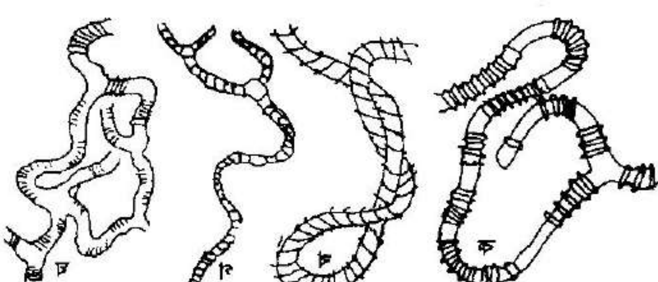

চিত্র ২.৪ : Myxsomyctes–এ বিভিন্ন ধরনের রেণু ক্যাপিলিশিয়াম

৩. **রেণুর বিস্তার :** ফলদেহের মধ্যে মিওরেণুগুলো পরিণত হলে পেরিডিয়াম ফেটে যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় ; ফলে ক্যাপিলিশিয়ামসহ রেণুগুচ্ছ বের হয়ে পড়ে। ক্যাপিলিটিয়াম খুবই উদগ্রাহী বলে বিভিন্নভাবে নড়াচড়া করে। ফলে রেণুগুচ্ছ ভেঙে যায় এবং পৃথক হয়ে নির্গত হতে থাকে। অবশ্য ক্যাপিলিশিয়াম দীর্ঘ হয়, তার সাথেই এগুলো উর্ধ্বে উঠে আসে। কাজেই ক্যাপিলিটিয়ামকে রেণু নির্গমন ও বিসরণ অঙ্গ বলা যেতে পারে। এ রেণুগুলো বায়ুবাহিত হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মিওরেণুগুলো আণুবীক্ষণিক, গোলাকার মসৃণ বা কন্টকিত, গুটিযুক্ত জালিকাকার বা খাঁজযুক্ত জালিকাকার ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত (চিত্র ২.৪)। এগুলো এককোষী ও অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্যময় স্থূল কোষপ্রাচীরযুক্ত। রেণুগুলো সাধারণত সোনালি, গোলাপি গাঢ় পীত, বাদামি বা কালো বর্ণের হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন রঙের আভাযুক্ত হতে পারে। রেণুগুলো ১০ মিলি মাইক্রোমিটারের অধিক ব্যাসযুক্ত হয়। এগুলো বহুদিন পর্যন্ত সজীব ও সতেজ থাকতে পারে এবং পরিমিত পানিতে অঙ্কুরিত হয়। কাজেই একে বিশ্রামরেণুও বলা যায়।

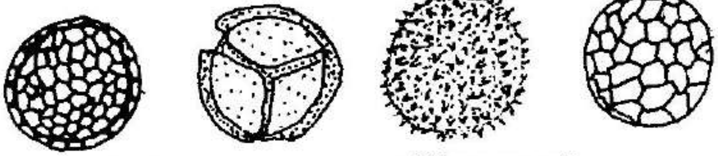

চিত্র ২.৫ : Myxomycites-এ বিভিন্ন ধরনের রেণু

৪. **মিওরেণুর অঙ্কুরণ :** নির্গত মিওরেণুগুলো পরিবেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টির পানি পেলে মৃত পাতা, কাঠ, খড়কুটো, মাটি বা অন্য কোনো আশ্রয়ে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরণের ফলে রেণুপ্রাচীর ফেটে যায় কিংবা ক্ষুদ্র ছিদ্র তৈরি হয়। এ ছিদ্রপথেই রেণুমধ্যস্থ সকল দ্রব্য মাকুর আকারে বের হয়ে আসে (গ)। প্রতিটির পিছনে দুটো ফ্লাজেলা থাকে (ঘ)। এদের একটি খাটো ও অন্যটি বড় ; এগুলো হুইপল্যাস ধরনের। খাটোটি পিছনদিকে নির্দেশিত। এ ধরনের গঠনকেই সোয়ার্ম কোষ বলে। এগুলো অনেকাংশেই বর্ণহীন জুফ্ল্যাজেলেটের মতো। প্রতিটি বিশ্রাম রেণু হতে ১ থেকে ৪টি সোয়ার্ম কোষ বের হতে পারে। সোয়ার্ম কোষগুলো নগ্ন ও অ্যামিবয়ড ; কিন্তু প্রতিটিতে একটি কেন্দ্রিকা ও সংকোচনশীল গহ্বর পিছন-প্রান্তে থাকে। কখনও কখনও অঙ্কুরণের ফলে মিক্সোমোবিয়া উৎপন্ন হয় (গ)। অনুকূল পরিবেশে এগুলো বিভক্ত হয়ে আরও সোয়ার্ম কোষ উৎপন্ন করে। এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হতে পারে। প্রতিকূল পরিবেশ হলে এগুলো বিশ্রাম-রেণুতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় এগুলো প্রাচীরাবৃত হয়। অনুকূল পরিবেশের আগমনে এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে মিক্সোঅ্যামিবা কিংবা সোয়ার্ম কোষ উৎপন্ন করে।

২. যৌনজনন

সোয়ার্ম কোষগুলো কিংবা মিক্সোঅ্যামিবাগুলো পরিবেশ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে বড় হতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট দশায় উপনীত হলে দুটি সোয়ার্ম কোষ কিংবা মিক্সোঅ্যামিবা মিলিত হয় ; এ সময় এগুলো প্ল্যানোগ্যামেট হিসেবে কাজ করে থাকে (Howard, ১৯৩১)। *Physarum polycephalum* এ বিশ্রাম রেণু হতে মুক্ত হবার পর চক্রাকারে সাঁতার কাটে এবং শেষাবধি পিছন প্রান্ত দিয়ে মিলিত হয় (ঙ)। কাজেই, মিলন কাজটি পিছনপ্রান্ত দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর প্রথমে

প্লাজমোগ্যামি ওপরে ক্যারিওগ্যামি সংঘটিত হয়। ফলে জাইগোট তৈরি হয়। প্রথমত জাইগোটটি ফ্লাজেলাযুক্ত হয় এবং কিছু সময় সাঁতার কাটে। অবশেষে ফ্লাজেলা খসে পড়ে এবং মিক্সঅ্যামিবাতে পরিণত হয় (চ)। *P. polycephalum*–এ দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেটের মধ্যে মিলন হয়। আবার কিছু কিছু প্রজাতিতে, বিশ্রাম রেণু হতে মিক্সোঅ্যামিবা উৎপন্ন হয়। অনুকূল পরিবেশে প্রতিটি মিক্সোঅ্যামিবা বার বার বিভক্ত হয়ে বহুসংখ্যক অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। অবশেষে এগুলো গ্যামেট হিসেবে কাজ করে এবং যুগলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে (ছ)।

চিত্র ২.৬ : Myxomycetes–এর চিত্র সোয়ার্ম কোষ

চিত্র ২.৭ : *Plasmodium*–এর যৌনজনন ও জীবনচক্র

জাইগোটের অঙ্কুরণ

নগ্ন জাইগোটটি আশ্রয়ের উপর গড়িয়ে চলে এবং পরিবেশ হতে ব্যাকটেরিয়া জৈব দ্রব্য খেয়ে আকারে বড় হয়। এতদসঙ্গে মাতৃ–ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক নিয়মে বার বার বিভক্ত হবার ফলে জাইগোটটি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত অ্যামিবয়ড রূপ নেয় ; একে প্লাজমোডিয়াম বলে। এটির কেন্দ্রিকাগুলো ডিপ্লয়ড প্রকৃতির। উপযুক্ত তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত আর্দ্রতা ও খাদ্য এদের বৃদ্ধি, চলন ও জননের সহায়ক।

অনেক ক্ষেত্রে তরুণ প্লাজমোডিয়া জাইগোটের সাথে কিংবা অন্য একটি প্লাজমোডিয়ার সাথে (একই প্রজাতির) যুক্ত হয়ে বড় ধরনের প্লাজমোডিয়াম গঠন করে। সব ক্ষেত্রেই প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হলেও ক্যারিওগ্যামি হয় না।

জনুক্রম

Howard (১৯৩১)–এর নিবিড় অনুশীলনের ফলে জানা গেছে যে, Myxomycetes ছত্রাকে জনুক্রম বিদ্যমান। ডিপ্লয়ড প্লাজমোডিয়ামটি স্পোরোফাইট। বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এগুলো রেণুস্থলী উৎপন্ন করে। এ রেণুস্থলী ও ডিপ্লয়ড তৈরির সময় অবশ্য মিওটিক বিভাজন হয় এবং বিশ্রামরেণু উৎপন্ন করে। সেহেতু, রেণুস্থলী বহনকারী ও রেণু উৎপাদনকারী প্লাজমোডিয়ামটি স্পোরোফাইটিক জনুরই প্রতিনিধিত্ব করে।

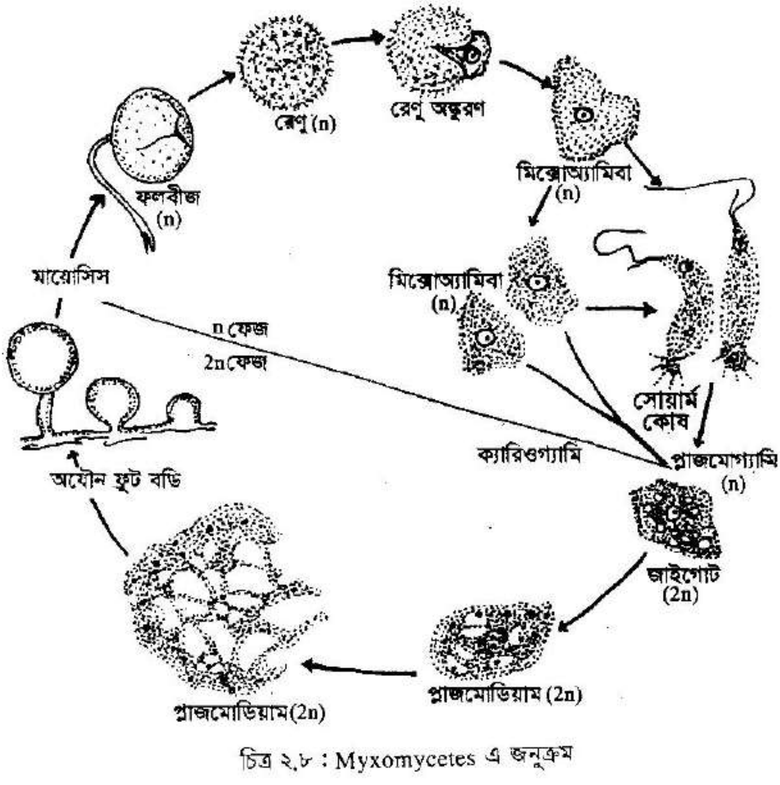

চিত্র ২.৮ : Myxomycetes এ জনুক্রম

বিশ্রামরেণুটি অঙ্কুরিত হয়ে হ্যাপ্লয়ড সোয়ার্ম কোষ বা মিক্সোঅ্যামিবা সৃষ্টি হয়। এ সোয়ার্ম কোষ বা মিক্সোঅ্যামিবা সরাসরি বা তাদের থেকে উৎপন্ন অপত্য কোষগুলো গ্যামেট হিসেবে কাজ করে। এগুলো জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে (plasmogamy and karyogamy) ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি করে। কাজেই, হ্যাপ্লয়েড বিশ্রামরেণু ও সোয়ার্ম কোষ গ্যামেটোফাইট দশা প্রদর্শন করে। এ জাইগোট অঙ্কুরিত হয়ে নতুন প্লাজমোডিয়া দেয়।

চিত্র ২.৯ : জীবনচক্র

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : স্লাইম মোল্ডের তেমন কোনো অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। কোনো কোনো সময় এরা বীজতলা চারাকে সতেজ রাখে এবং ব্যাকটেরিয়া ও প্রকৃত ছত্রাকের পচনে সহায়তা করে। সাম্প্রতিককালে এদের প্রোটোপ্লাস্টের চলনগতি, জননের শারীরতত্ত্ব ও রূপান্তর সম্পর্কে জানার আগ্রহজনিত কারণে গবেষণার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উৎপত্তি ও জাতিজনিক সম্পর্ক

স্লাইম মোল্ডের উৎপত্তি ও আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। উভয় ক্ষেত্রেই ধারণার আশ্রয় নিতে হয়। কিছু কিছু জীববিজ্ঞানী মনে করেন যে, স্লাইম মোল্ড শ্রেণীটি প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনাকারী গোষ্ঠী। কেননা, এটির অঙ্গজ দশাটি প্রাণিসদৃশ এবং ফলদেহ দশাটি ছত্রাকসদৃশ। এটির সপক্ষের ধারণানুযায়ী স্লাইম মোল্ড ফ্লাজেলেট উদ্বংশ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। সেহেতু এটি প্রোটোজোয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে প্রাণীর অন্য কোনো সদস্যের সাথে কোনো আত্মীয়তাসূত্র দেখা যায় না।

ফলদেহ তৈরি ও রেণুপ্রাচীরে সেলুলোজের উপস্থিতি উদ্ভিদ প্রকৃতিই নির্দেশ করে। ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতি ছত্রাকের বা ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এটি

Myxobacteriales-এর সাথে সাদৃশ্য দেখায়। আবার কোনো কোনো ছত্রাকবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ ধরনের সাদৃশ্য, সমান্তরাল অভিব্যক্তিরই ইঙ্গিত বহন করে। অবশ্য ব্যাকটেরিয়া হতে স্লাইম মোল্ডের পার্থক্য হলো স্লাইম মোল্ডের কেন্দ্রিকা পর্দাবৃত।

কিছু সংখ্যক ছত্রাকবিদ স্লাইম মোল্ডকে Phycomycatis ছত্রাকভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ এগুলোকে Plasmodisphoromycetes-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো অঙ্গজ ক্ষেত্রে প্লাজমোডিয়াম এবং সচলকোষ এ দুটি বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। তাছাড়া ফ্লাজেলার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখায়। এজন্য অনেকে এদেরকে Myxomycophyta বিভাগভুক্ত করেন। এতদসত্ত্বেও Myxomycetes ও Plasmodiophoromycetes-এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য অধিক গুরুত্ববহ।

নগ্ন সোয়ার্ম কোষে ফ্লাজেলাদ্বয়ের উপস্থিতি হতে বলা যেতে পারে যে, Phycomycetes-এর মত এককোষী ফ্লাজেলাযুক্ত পূর্বপুরুষ হতে এদের উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য এ উদ্ভব স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে হয়ে থাকবে (Morfin, ১৯৬১)। Alexopoulous এই ধারণার অনুসারী।

শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান

Lister (১৯২৫) Bessey (১৯৫০), Kudo (১৯৫৪) সমর্থিক Debary (১৮৮৭) স্লাইম মোল্ডকে প্রাণিসদৃশ বৈশিষ্ট্যের জন্য Mycetozoa নামে অভিহিত করেন। Bessey ও Kudo এদেরকে প্রোটোজোয়াভুক্ত করেন। কিন্তু Mycetozoa ও Alexopoulous এদেরকে Myxomycotina উপবিভাগের আওতাভুক্ত করেন। তাঁদের মতে স্লাইম মোল্ডের শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান নিম্নরূপ :—

রাজ্য— Plantae
বিভাগ— Mycota
উপবিভাগ— Myxomycotina
শ্রেণী— Myxomycetes
বর্গ— Physarales
গোত্র— Physaraceae
গণ— *Physarum*
প্রজাতি— *P. polycephallum*

তৃতীয় অধ্যায়

উপশ্রেণী Eumycotina
Phycomycetes

Phycomycetae নামটি সর্বপ্রথম Debary (১৮৭৩) চয়ন ও প্রয়োগ করেন। গ্রিক *phycos*-শব্দের অর্থ সামুদ্রিক শৈবাল এবং *mycetes*- অর্থ ছত্রাক। এ শব্দদ্বয় হতেই Phycomycetes নামকরণ। Phycomycetes-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'শৈবালীয়' কিংবা শৈবালসদৃশ' কিংবা 'শৈবাল সম্বন্ধযুক্ত' ছত্রাক। এরূপ নামকরণের কারণ হলো : *Vaucheria* নামক শৈবালের ও থ্যালাসের বাহ্যিক গঠনের সাথে এ শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকের অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকগুলো অতি সরল প্রকৃতির ও আদিম ধরনের। এ শ্রেণীতে প্রায় ২৪০টি গণ (তরিকুল, ১৯৮৭) এবং ১,৫০০ প্রজাতি রয়েছে। এদের অধিকাংশই জলজ (*Saprolegnia*) কিছু কিছু উভচর (*Phytophthora*) এবং কিছু সংখ্যক স্থলজ প্রকৃতির (*Rhizopus*)। এগুলো মৃতজীবীরূপে কিংবা পরজীবীরূপে বাস করে। পরজীবী প্রজাতিগুলো শৈবাল, ফার্ন বীজও গাছপালার উপর জীবন নির্বাহ করে। এদের কোনো কোনোটি অর্থকরী ফসলে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

নিম্নশ্রেণীর এ Phycomycetes-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. সর্বাধিক প্রাচীন ফাইকোমাইসেটিস ছত্রাকের দেহ এককোষীয় থ্যালাস বা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম।

২. অযৌন জনন প্রধানত স্পোরাঞ্জিওরেণু এবং কখনও কনিডিয়া দিয়ে সম্পন্ন হয়। চলরেণুগুলো সচল (জলজ ছত্রাকের ক্ষেত্রে) এবং স্থলজদের ক্ষেত্রে নিশ্চল হয়ে থাকে।

৩. রেণু-উৎপাদনকারী অঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে কোনো ফলদেহ উৎপাদন করে না।

৪. যৌন জনন যদি থাকে, আইসোগ্যামীয় বা হেটারোগ্যামিয় হয়ে থাকে।

৫. প্লাজমোগ্যামির অব্যবহিত পরে ক্যারিওগ্যামি ঘটে ; সেহেতু এখানে ডাইক্যারিওফেজ বিদ্যমান।

এ শ্রেণীর ছত্রাকের উদাহরণ হলো : ব্ল্যাক মোল্ড, ওয়াটার মোল্ড, ডাউনি মিলডিউ ও সাদা রাস্ট।

দৈহিক গঠন

Phycomycetes ছত্রাকে নানা ধরনের আঙ্গিক গঠন দেখা যায়। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছত্রাকের দেহ এককোষী ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত। জলজ ছত্রাকগুলোতে কোনো মাইসেলিয়াম থাকে না। এদের থ্যালাস আণুবীক্ষণিক, এককোষী ও সিনোসাইটিক (Synocyticum)। ওদের দেহে এক একটি বা দুটি ফ্লাজেলা থাকে। অধিকতর উন্নত ছত্রাকগুলো রাইজয়েড দ্বারা বসতির আশ্রয়ের সাথে লেগে থাকে। সিনোসাইটিক থ্যালাসকে হলোকার্পিক থ্যালাস বলে। পরিণত হলে এটি একটি চলরেণুস্থলীতে কিংবা জননকোষাধারে রূপান্তরিত হয় ; উদাহরণ Olpzdiaceae গোত্রভুক্ত ছত্রাক। অবশ্য এ ধরনের একগুচ্ছ অঙ্গও সৃষ্টি করতে পারে, যেমনটি Synchytriuceae-তে দেখা যায়।

আরও কিছুটা উন্নত জলজ ছত্রাকের আঙ্গিক গঠনে জটিলতা দেখা যায়। এখানে দেহটি দুটি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত কক্ষে বিভক্ত থাকে। এদের একটি দেহজ কাজ করে এবং অন্যটি জনন কাজ করে ; উদাহরণ হিসেবে *Blastocladieka*-এর কথা বলা যায়।

ফাইকোমাইসেটিসের অধিকাংশ জলজ ও স্থলজ ছত্রাকের দেহ উন্নত, সূত্রাকৃতি থ্যালাস বা মাইসেলিয়াম। এ ধরনের ছত্রাকের দেহ সুস্পষ্টভাবে অনুর্বর ও উর্বর অংশে বিভেদিত। এদেরকে ইউকার্পিক মাইসেলিয়াম বলে। এগুলো দু'ধরনের হতে পারে যথা—

১. মাইসেলিয়ামটির কিছু অংশ বায়বীয় ও কিছু অংশ হোল্ডফাস্টরূপে (*Rhizopus*) কাজ করে। হোল্ডফাস্ট সশাখ ও স্ফীত এবং আশ্রয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। বায়বীয় অংশটি সোজা নলাকার, সশাখ, সিনোসাইটিক ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন। Perenosporales-গোত্রীয় ছত্রাকের বায়বীয় মাইসেলিয়াম সরু, নলাকার, সিনোসাইটিক। এগুলো পোষকের দেহে বা মৃত-পচা জৈব পদার্থে, মাটিতে বা পানিতে লুকিয়ে থাকে।

অধিকাংশ ছত্রাক প্রজাতির মাইসেলিয়ামের হাইফি সিনোসাইটিক ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন। অবশ্য, কার্যকরভাবে বর্ধিষ্ণু মাইসেলিয়ামে প্রস্থপ্রাচীরের প্রকাশ অবদমিত থাকে, এগুলোর উপস্থিতি নেই এ কথা বলা যাবে না। এগুলো পরিণত হাইফিতে আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি, কোনো জাতিতে নিয়মিতভাবে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়ে থাকে; অবশ্য এ প্রস্থপ্রাচীর পূর্ণভাবে গঠিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় রন্ধ্র থাকে। জনন অঙ্গ তৈরির সময় এবং আঘাতজনিত ক্ষত নিরাময়ের জন্য ব্যবধায়ক তৈরি হতে পারে।

চিত্র ৩.১ : *Endogone* প্রজাতিতে ফলদেহ বিকাশের প্রবণতা

সূত্রাকৃতি Phycomycetes ছত্রাকগুলোকে জলজ অবস্থা হতে উভচর অবস্থার মাধ্যমে স্থলজ অবস্থায় উত্তরণের প্রাগ্রসর ধারাকে ক্রমানুসারে বিন্যাসিত করা যায়। এক্ষেত্রে *Saprolegina*-এর স্থান প্রথমে রাখা যায়। এটি মৃতজীবী জলজ মোল্ড। এটি শান্ত ও নিশ্চল পানিতে জন্মে। তাছাড়া, সেচ-বিজড়িত জমিতেও জন্মে থাকে। *Pythium* খুব সামান্যই মৃত্তিকাপ্রেমী। অনেক সময় এটি

...স্যাতসেঁতে মাটিতেও জন্মাতে পারে। এরা উভয়ই চলরেণু তৈরি করে। কিন্তু মূলত এরা জলজ গোষ্ঠীর ছত্রাক।

Phytophthora উভচর গোষ্ঠীর ছত্রাক। সাধারণ ও অনুকূল পরিবেশে মাইসেলিয়াম রেণুস্থলী তৈরি করে এবং এতে চলরেণু উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে (পানির অভাব, অত্যধিক তাপমাত্রা) চলরেণু বিসরণ সম্ভব নয় বলে সমগ্র রেণুস্থলীটিই খসে পড়ে এবং কনিডিয়ার ন্যায় আচরণ করে। এগুলো বাতাসে বিসরিত হয়। কনিডিয়া সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল তৈরি করে এবং কালক্রমে মাইসেলিয়ামে পরিণত। অনুরূপভাবে, *Plasmopora* প্রজাতিটি আঙুরের ডাউনি মিলডিউ রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এটি উভচর গোষ্ঠীভুক্ত। এটি জল ও স্থল উভয়ক্ষেত্রে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারে। এখানে চলরেণু তৈরি হয়।

পক্ষান্তরে, *Perenospora (P. destructor)* প্রজাতিটি পিঁয়াজের ডাউনি মিলডিউ রোগ সৃষ্টি করে এবং পূর্ণভাবেই স্থলজ গোষ্ঠীভুক্ত। এটি রেণুস্থলী দেয় এবং কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে ও অঙ্কুরণের সময় অঙ্কুর নল তৈরি করে।

Phycomycotes-এর সর্বাধিক উন্নত ছত্রাক হলো Mucorales গোত্রের ছত্রাক। এগুলো সম্পূর্ণরূপে স্থলজ প্রকৃতির। এটি রেণুস্থলী তৈরি করে এবং রেণুগুলো নিশ্চল, আবরণযুক্ত, বায়ুবাহিত স্পোরাঞ্জিওরেণু। এ রেণুগুলো স্থলজ পরিবেশে জীবন-যাপনে অভিযোজনক্ষম। এ রেণুগুলোর প্রাচীর কম বা বেশি তাপমানজনিত প্রতিকূলতা বা শুষ্কতাজনিত বিড়ম্বনা সহনশীল। বায়ুবাহিত হয়ে অনুকূল অবস্থায় না আসা পর্যন্ত রেণুগুলো সজীব থাকে।

Phycomycetes-ছত্রাকের কোষ সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ কোষপ্রাচীর দিয়ে আবৃত থাকে। প্রজাতিভেদে এ কোষপ্রাচীরে শুধু কাইটিন বা কাইটিন ও সেলুলোজের মিশ্রণ বা কাইটিন ও গ্লুকোনের সংমিশ্রণ থাকে। তবে Oomycetes ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে কাইটিন দ্রব্য অনুপস্থিত ; কিন্তু গ্লুকোন ও সামান্য পরিমাণ সেলুলোজ বিদ্যমান। কোষে ছোট ছোট গহ্বর, বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকা ও নানা ধরনের অঙ্গাণু দেখা যায়। কোনো কোনো প্রজাতির কোষে বড় ধরনের কেন্দ্রীয় গহ্বর থাকে। অধিকাংশ কোষই বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হলেও এক কেন্দ্রিকাযুক্ত কোষের প্রজাতিও পাওয়া যায়।

জনন প্রক্রিয়া

Phycomycetes-শ্রেণীর ছত্রাকে তিন ধরনের জনন দেখা যায় :

১. অঙ্গজ জনন
২. অযৌন জনন ও
৩. যৌন জনন।

১. অঙ্গজ জনন : খণ্ডায়নের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করা এ শ্রেণীর একটি বৈশিষ্ট্য।

২. অযৌন জনন : বিভিন্ন ধরনের রেণু গঠনের মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে থাকে। এদের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. স্পোরাঞ্জিওরেণু : স্পোরাঞ্জিওরেণুগুলো সাধারণত রেণুস্থলীর মধ্যে অন্তর্জনেষ্ণুভাবে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলী এককোষী হলেও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত। এটি অযৌন জনন অঙ্গ এবং এককভাবে বিশেষ অনুসূত্রের শীর্ষাগ্রে জন্মে থাকে। এ বিশেষ অনুসূত্রটিকে রেণুস্থলীবহ বলে (চিত্র ১.১৯)। কোনো কোনো প্রজাতিতে রেণুস্থলীবহটি নিবেশিত ধরনের হয়ে থাকে। রেণুস্থলীর বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্রোটোপ্লাস্ট ক্লিভেজের মাধ্যমে অসংখ্য ছোট ছোট ও কেন্দ্রিকাবহুল

স্পোরাঞ্জিওরেণু তৈরি করে। প্রজাতিভেদে এ স্পোরাঞ্জিওরেণুগুলো একটি বা দুটি ফ্লাজেলাযুক্ত হয়ে থাকে (১. ১৯ খ)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো প্রাচীর নিঃসৃত করেও নিশ্চল রেণুতে পরিণত হয়। সচল রেণুগুলোকে (ফ্লাজেলাযুক্ত) চলরেণু বা প্ল্যানোরেণু বলে। নিশ্চল রেণুগুলোকে (ফ্লাজেলাবিহীন) অ্যাপ্ল্যানোরেণু বলে (১.১৯ক)। জলজ প্রজাতিতে চলরেণু ও স্থলজ Mycorales বর্গের ছত্রাকে নিশ্চল রেণু উৎপন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব প্রজাতি চলরেণু উৎপন্ন করে, সেগুলো হতে অ্যাপ্ল্যানোরেণু তৈরি হয় না। আবার যেগুলো অ্যাপ্ল্যানোরেণু তৈরি করে, সেগুলো হতে চলরেণু ও উৎপন্ন না। এক্ষেত্রে প্রথম প্রজাতিগুলো দ্বিতীয় প্রজাতি হতে প্রাচীন বলে ধরা হয়। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য একই প্রজাতি হতে চলরেণুও নিশ্চলরেণু উভয়ই উৎপন্ন হয়। যেসব চলরেণুর সামনের দিকে দুটি ফ্লাজেলা ও আকৃতি নাসপাতির মতো সেগুলোকে প্রাথমিক চলরেণু বলে। আবার যেগুলোর ফ্লাজেলাদ্বয় পাশে থাকে এবং আকৃতি হয় বৃক্কের মতো সেগুলোকে গৌণ চলরেণু বলে।

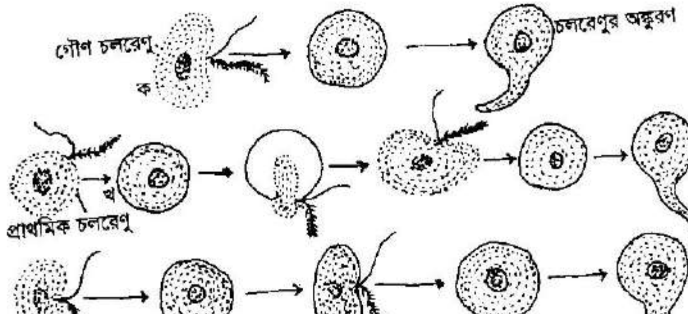

চিত্র ৩.২ : Phycomycetes চলরেণুর অঙ্কুরণ দশা। ক. মনোপ্ল্যানেটিজম *Pythium* ; খ. ডাইপ্ল্যানেটিজম Saprolegnia ; গ. পলি মনোপ্ল্যানেটিজম *Dictynchuse*

চলরেণুস্থলী হতে নির্গত হবার পর কোনো কোনো প্রজাতির চলরেণু কিছুক্ষণ পানিতে সাঁতার কাটার পর ফ্লাজেলা হারায় এবং বিশ্রাম গ্রহণ করে। অতঃপর অঙ্কুরিত হয়ে একটি নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু কিন্তু ভিন্ন রকম আচরণ প্রদর্শন করে : (১) একটি গৌণ চলরেণু চলরেণুস্থলীর সেসিকল হতে নির্গত হবার পর পানিতে কিছু সময় সাঁতার কাটে। অতঃপর ফ্লাজেলা হারিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে ও গোলাকার হয়ে বাইরের দিকে একটি আবরণ তৈরি করে নেয়। অবশেষে সেটি অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় এবং এ অঙ্কুরনলটি কালক্রমে মাইসেলিয়ামে পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের চলরেণুকে মনোপ্ল্যানেটিক চলরেণু এবং ঘটনাটিকে বলে মনোপ্ল্যানেটিজম (চিত্র ৩.১ ক)। উদাহরণ হিসেবে *Pythium*-এর কথা বলা যায়।

২. কোনো কোনো গণের (*Saprolegnia*) একটি প্রাথমিক চলরেণু প্রথমদিকে আবরণীর মধ্যে আবৃত হওয়া পর্যন্ত মনোপ্ল্যানেটিক চলরেণুর ন্যায় আচরণ করে ; কিন্তু পরবর্তীকালে আবরণী ভেদ করে একটি নতুন হাইফির জন্ম না দিয়ে একটি গৌণ চলরেণু উৎপন্ন করে। এভাবে উৎপন্ন

...টি চলরেণুটি কিছু সময় পানিতে সাঁতার কাটে, ফ্লাজেলা হারায় এবং গোলাকৃতি ও আবরণীযুক্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়। বিশ্রামকাল শেষ হলে অঙ্কুরণের মাধ্যমে অঙ্কুরনল দেয়। এটি কালক্রমে নতুন মাইসেলিয়ামের রূপ নেয়। এখানে দু'ধরনের চলরেণু দুটি বিশ্রাম দশাকে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে। এ ধরনের চলরেণুকে ডাইপ্ল্যানেটিক চলরেণু (চিত্র ৩.২ খ) ও পদ্ধতিকে ডাইপ্ল্যানেটিজম বলে।

৩. Dictynchus ছত্রাকে কোনো প্রকার প্রাথমিক চলরেণু তৈরি হয় না। একটি গৌণ চলরেণু সাঁতার কাটার পর যেভাবে বিশ্রাম নেয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও সেভাবে বিশ্রাম নেয়। বিশ্রামকাল অতিবাহিত করার পর আবার গৌণ চলরেণু তৈরি করে। এটি আবার বিশ্রামকাল কাটায় এবং গৌণ চলরেণু দেয়। এ প্রক্রিয়া বহুবার চলার পর শেষে অঙ্কুরিত হয়ে একটি নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। এ পদ্ধতিকে বলে পুনঃপুনঃ নির্গমন। পলিপ্ল্যানেটিজম (চিত্র ৩.২ গ)।

কনিডিয়া : কিছু কিছু অধিক উন্নত গোত্রের (Perenosporateae, Abbngin-aceae) প্রজাতির অনুসূত্রের শীর্ষাঞ্চলের রেণুস্থলীগুলো সম্পূর্ণ ঝড়ে পড়ে ও বায়ুবাহিত হয়ে অন্যত্র বিসরিত হয়। এগুলো লম্বা শিকলাকারে সজ্জিত থাকে। এ ঝরে পড়া রেণুস্থলী ও শিকলাকারে বায়ুবাহিত হওয়া রেণুগুলোকে **কনিডিয়া** বলে এবং বহনকারী অঙ্গকে বলে **কনিডিয়াবাহক**। এ কনিডিয়াগুলো অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে জাগরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। ইউকার্পিক ছত্রাক নিয়মে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

ক্ল্যামাইডোরেণু : Phycomycetes-এর কোনো কোনো ছত্রাক প্রজাতি স্থূলপ্রাচীর যুক্ত ক্লামাইডোরেণু নামক বিশ্রাম রেণু তৈরি করে। এগুলো শীর্ষাঞ্চলীয় বা নিবেদিত ধরনের হতে পারে। অনুসূত্রে আড়াআড়িভাবে প্রস্থপ্রাচীর থাকে। প্রতিটি কোষ আকারে বড় ও গোলাকার হয় এবং পর্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। অতঃপর এরা পুরু প্রাচীর নিঃসরণ করে আবৃত হয় ও ক্ল্যামাইডোরেণুতে পরিণত হয়। এজন্য একে এককোষী, পুরুপ্রাচীরযুক্ত খণ্ড বলে গণ্য করা হয়। প্রতিকূল পরিবেশে (নিম্ন বা উচ্চ তাপমাত্রা ও খরায়) মাইসেলিয়াম টিকে না থাকতে পারলে ও এ রেণুগুলো সজীব থাকে।

যৌন জনন

Phytomycetes শ্রেণীভুক্ত ছত্রাকের যৌন জননে বিভিন্নতা বিদ্যমান এবং বহুলাংশে সবুজ শৈবালের মত। এ শ্রেণীর অধিকাংশ প্রজাতিই হোমোথ্যালিক এবং একটি রেণু হতে উদ্ভূত থ্যালাস হতে উভয় ধরনের গ্যামেট তৈরি হয়। কিছু কিছু প্রজাতি হেটারোথ্যালিক। এখানে একটি থ্যালাস হতে এক ধরনের গ্যামেট এবং অন্য আরেকটি থ্যালাস হতে ভিন্ন ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হয়। অন্য কথায়, ১মটি হতে (+) গ্যামেট উৎপন্ন হলে ২য়টি হতে (–) গ্যামেট তৈরি হয়। কিছু সংখ্যক প্রজাতি আইসোগ্যামীয়, আর কিছু সংখ্যক অ্যানাইসোগ্যামীয় এবং কিছু সংখ্যক উগ্যামীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোনো কোনো থ্যালাস হলোকার্পিক এবং কোনো কোনোটা ইউকার্পিক হয়ে থাকে। আবার, যৌন জননে গ্যামেটের মিলনের প্রয়োজন হয় এসব এ গ্যামেট সুগঠিত হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। আবার এগুলো জননকোষাধারে উৎপন্ন হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। এ শ্রেণীর ছত্রাকের যৌন জনন নিচের যে কোনো একটি পদ্ধতিতে হতে পারে :

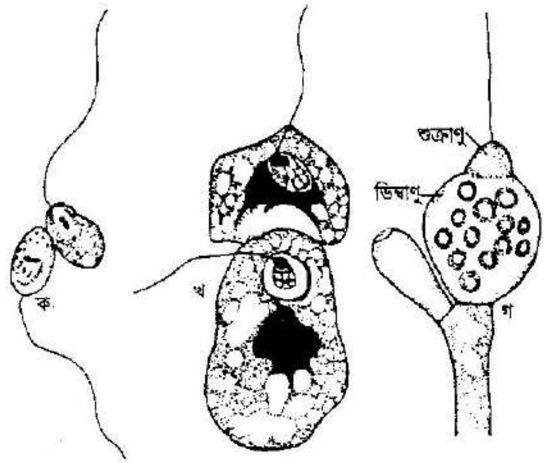

চিত্র ৩. ৩ : যৌন জনন। ক. আইসোগ্যামীয় ; খ. অ্যানাইসোগ্যামীয় ; গ. গ্যামীয়

১. গ্যামেটের মিলন

দুটি পরিণত গ্যামেটের মিলনের ফলে যৌনজনন হয়ে থাকে। এ গ্যামেট দুটি সদৃশ বা বিসদৃশ হতে পারে। মিলনজড়িত গ্যামেটদ্বয় সদৃশ হলে তাকে আইসোগ্যামীয় জনন (*Olpidium*- এ দেখা যায়) এবং গ্যামেটদ্বয় বিসদৃশ হলে তাকে অ্যানাইসোগ্যামীয় জনন বলে। এ ধরনের জনন Allomyces– এ দেখা যায়। Monoblepharella প্রজাতিতে পুংধানীতে উৎপন্ন একটি সচল শুক্রাণু ডিম্বাণুস্থলীর অভ্যন্তরস্থ পরিপক্ব ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে তাকে উগ্যামাস জনন বলে।

২. জননকোষাধারের সংস্পর্শ

Saprolegnia sp., *Pythium* sp., *Phytophthora* sp., *Albugo* sp. প্রভৃতি ছত্রাকের বিভিন্ন প্রজাতিতে স্ত্রীকেন্দ্রিকাবাহী জননকোষাধারের সংস্পর্শে পুংকেন্দ্রিকাবাহী জননকোষাধার এলে নিষেকনলের মাধ্যমে যৌনজনন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ নিষেকনলটি পুংধানী হতেই উৎপন্ন হয়। এ নিষেকনলটি স্ত্রীধানীর ভিতর প্রবেশ করে। স্ত্রীধানীটি পরিপূর্ণ স্ত্রীগ্যামেট তৈরি করে এবং তার সংখ্যাও একাধিক হয়ে থাকে, উদাহরণ *Saprolegnia* বা মাত্র একটি (উদাহরণ *Pythium*)। কিন্তু পুংধানীটি পরিপূর্ণ পুংগ্যামেট তৈরি করতে পারে না ; তাই নিষেক নলের মধ্য দিয়ে পুংজননকোষাধারের প্রাণসত্তাসহ কেন্দ্রিকা স্ত্রীজননকোষাধারে নীত হয় ও স্ত্রীগ্যামেটকে নিষিক্ত করে। এক্ষেত্রে উভয় জননকোষাধারেরই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

৩. জননকোষাধারের মিলন

দুটি বিপরীতধর্মী জননকোষাধারের মিলনের মাধ্যমে এ জাতীয় যৌন জনন সম্পন্ন হয়। এখানে জননকোষাধার, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত ও প্রাণসত্তায় কেন্দ্রিকগুলো অবস্থান করে। এখানে কোনো পূর্ণবিকাশমান গ্যামেট থাকে না। গ্যামেট বলতে প্রাণসত্তাস্থিত অনেকগুলো কেন্দ্রিকাকে বুঝায়।

মিলনজড়িত জননকোষাধারদ্বয় সদৃশ (*Mucor*) কিংবা বিসদৃশ (*Zygorhynchus hetesogomus*) হতে পারে। জননকোষাধারের বিসদৃশতা শুধু আকার–আয়তননির্ভর ; কোনো গুণ, পরিমাপ ও আচরণগত নয়।

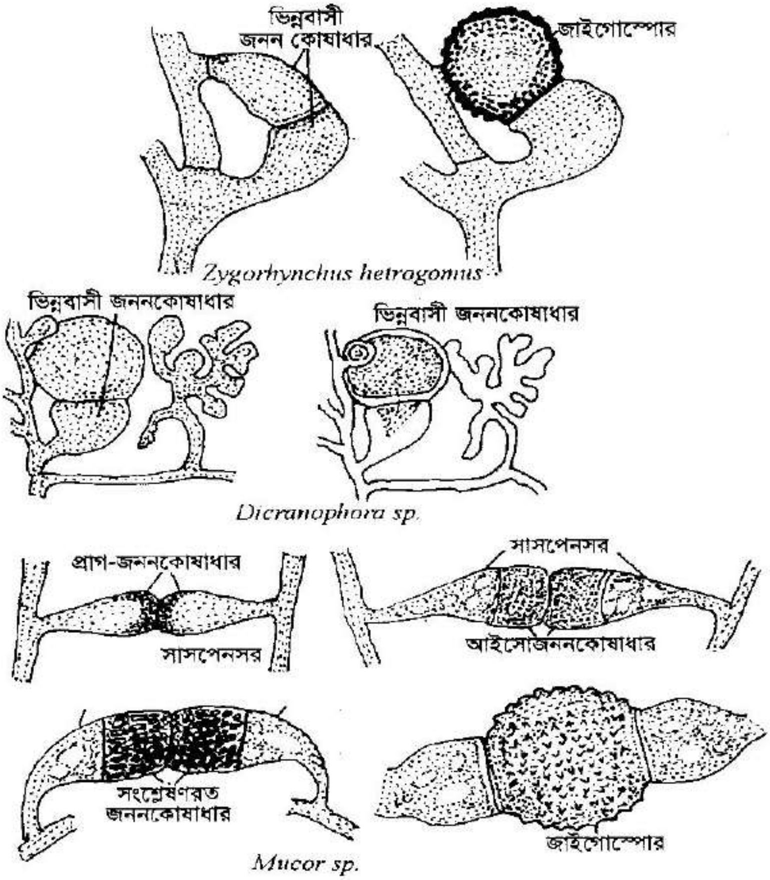

চিত্র ৩.৪ : ছত্রাকের যৌন জনন

Rhizophidium গণের প্রজাতিতে যে ধরনের জননকোষাধারের মিলন দেখা যায়, তা *Mucor* ও *Zygorhynchus* হতে ভিন্ন। *Rhizophidium* প্রজাতির জননকোষাধার দুটি আচার–আচরণে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে পুং ও স্ত্রীরূপে শনাক্তযোগ্য হয়ে থাকে। এখানে পুংজননকোষাধারের বস্তুনিচয় যখন ক্ষুদ্র নিষেকরন্ধ্র বা নিষেকনলের মধ্য দিয়ে স্ত্রীজননকোষধারে নীত হয় তখন নিষেক কাজ সম্পন্ন হয় এবং ডিপ্লয়ড নিশ্চল বা সচল জাইগোট, জাইগোস্পোর বা উস্পোর তৈরি হয়। সব ক্ষেত্রেই এ ডিপ্লয়ড জাইগোট কেন্দ্রিকা মিওটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে অপত্য হ্যাপ্লয়ড রেণু তৈরি করে। এখানে আরেকটি বিবরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিলনজড়িত গ্যামেট বা

জননকোষাধার এককেন্দ্রিকাযুক্ত হতে পারে, বা একটি এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও অন্যটি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত বা উভয়ই বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হতে পারে। তাছাড়া কোনো ক্ষেত্রে গ্যামেটদ্বয় নিষেক নলে এসে (polyphagus) নিষিক্ত এবং প্রাচীর তৈরি করে জাইগোটে পরিণত হয়। আবার কোথাও (*Rhizopus stolonifer*) জননকোষাধারদ্বয় জাইগোরেণু গঠন করে থাকে।

কম্পিটেবল কেন্দ্রিকার আচরণ (জাইস্পোরের অঙ্কুরণ)

Phycomycotes শ্রেণীর ছত্রাকগুলোর প্লাজমোগ্যামি ও ক্যারিওগ্যামির মধ্যে কোনো বিরতি থাকে না বললেই চলে। কেননা প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হবার সাথে সাথেই ক্যারিওগ্যামি হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলনের যৌন দশা তেমন সুস্পষ্ট নয়। সাধারণভাবে নতুন প্রতিনিধি আসার পূর্বে মিওসিস হয়ে থাকে। স্বল্পসংখ্যক Phycomycetes- এ (Allomyces) জাইগোট কেন্দ্রিকার মিওটিক বিভাজন বিলম্বিত হয় এবং পরিপূর্ণ ডিপ্লয়ড গঠনের বিকাশ ঘটে। জীবনচক্রে এটিও অন্তগ দশার ন্যায় একটি দশা বলে গণ্য। জাইগোটোত্তর দশা কিভাবে সূচিত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. পরিপূর্ণ দুটি মিলনজড়িত গ্যামেটের মিলনে একটি ফ্লাজেলাযুক্ত জাইগোট তৈরি হয়। ফ্লাজেলা খসে পড়ে এবং জাইগোট একটি ডিপ্লয়ড গঠন করে যা প্রজাতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে :

   ক. *Synchytrium endobioticum, Olpidium viciae* নামক পরজীবী ছত্রাকের জাইগোট পোষকের কলা আক্রমণ করে এবং কালক্রমে রেণুস্থলী বা জননকোষাধাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। রেণু তৈরির সময় বা গ্যামেট সৃষ্টিকালে মিওটিক বিভাজন ঘটে।

   খ. Allomycess এবং Blastocladiella-এর মতো কিছু সংখ্যক জল-মোল্ড-এর জাইগোট সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে স্পোরোথ্যালাস নামক ডিপ্লয়ড গঠন তৈরি করে। এ স্পোরোথ্যালাসটি দু'ধরনের রেণুস্থলী দেয়। এদের কিয়দংশে ডিপ্লয়ড চলরেণু উৎপন্ন হয় এবং রেণু অঙ্কুরিত হয়ে স্পোরোথ্যালাস দেয়। পক্ষান্তরে বাকি অংশ হ্যাপ্লোচলরেণু দেয় এবং এদের অঙ্কুরণ মাধ্যমে অন্তগজ দেহ গঠন করে।

২. জননকোষাধারের সংস্পর্শ অন্য কোনোভাবে যে উস্পোর তৈরি হয়, সেগুলো নিচের যে কোনো একটি আচরণ দেখায়ে :

   ক. উস্পোরিটি সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল বা নতুন অনুসূত্র দেয় ; উদাহরণ হলো *Monoblepharis, Sapoolegnia, Pythium*। উস্পোর অঙ্কুরণের সময় মিওটিক বিভাজন হয়।

   খ. উস্পোরটি অঙ্কুরণের সময় অঙ্কুরনল গঠন করে এবং পরবর্তীকালে রেণুস্থলী দ্বারা সীমিত হয়। অঙ্কুরণ প্রাক্কালে মিওটিক বিভাজন হয়। রেণুস্থলী হতে গৌণ চলরেণু উৎপন্ন হয় ; এটি প্রাচীরাবৃত হয়, বিশ্রাম নেয় এবং পরে অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল দেয়। এ অঙ্কুরনলই দিনে দিনে মাইসেলিয়ামের রূপ দেয় ; উদা : *Phytophthora* sp. *Plasmopara* sp.

   গ. অঙ্কুরণকালে উস্পোরের পুরো বস্তু নিয়েই সরাসরি গৌণ চলরেণুতে পরিবর্তিত হয়। এ গৌণ চলরেণু হতে নতুন ছত্রাকের জন্ম হয়। উদাহরণ *Albugo*-এর উস্পোর অঙ্কুরণকালে মিওটিক বিভাজন হয়।

৫. যেসব স্থানে জননকোষাধার পুং ও স্ত্রী জননকোষাধাররূপে শনাক্তযোগ্য নয়, সেসব স্থানে জননকোষাধারের মিলনে যে জাইগোরেণু উৎপন্ন হয় সেটি অঙ্কুরিত হয়ে রেণুস্থলীবাহক দেয়। এটির শীর্ষাগ্রে বীজ রেণুস্থলী থাকে। এটি হতে স্পোরাঞ্জিওরেণু তৈরি হয় এবং এগুলো হতেই নতুন ছত্রাক মাইসেলিয়াম উৎপন্ন হয়। জাইগোরেণুর অঙ্কুরণকালে মিওটিক বিভাজন হয়। উদাহরণ *Mucor* sp., *Rhizopus* sp. ।

Phycomycetes–এর জাতিজনি

যুক্তিহীনভাবে Phycomycetes–এর ছত্রাকগুলোর উৎপত্তি ও জাতিজনি সম্পর্কে বহু কথা বলা হলেও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর গবেষণালব্ধ তথ্য ও মন্তব্য পর্যালোচিত না হওয়া অবধি গৃহীত হয় নি। বিভিন্ন গবেষক ও গবেষণা কর্মীর গবেষণায় বিভিন্ন ধ্যান–ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. Bessey (১৮৯৫) ও সহকর্মীরা Phycomycetes-কে ক্রমহ্রাসমান শৈবাল বলে অভিহিত করেন। এ ধারণাটি শুধু ছত্রাক ও শৈবালের মধ্যে নামমাত্র সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে গোষ্ঠীদ্বয়ের শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য যে একেবারেই ভিন্নধর্মী তা বিবেচনায় আনা হয় নি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শৈবাল ও ছত্রাক সম্ভবত দুটি ভিন্ন ভিন্ন এককোষী সবুজ কণাযুক্ত ও সবুজ কণাবিহীন জীব হতে উদ্ভূত হয়েছে।

২. Debary ও তাঁর ছাত্র Vuillemin (১৯১২) মত প্রকাশ করেন যে, এ গোষ্ঠী দুটি অভিব্যক্তির দুটি সমান্তরাল ধারায় ক্রমবিকশিত হয়েছে। Alkinson (১৯১৫) Fitspatrick এ ধারণাটি আরো সমর্থনপুষ্ট করেন। ছত্রাকগোষ্ঠীটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে ও আচরণে শৈবাল গোষ্ঠী হতে পৃথক। এ পার্থক্যগুলো চলরেণু গঠন, যৌন জননের ধরন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। শৈবালের অভিব্যক্তির ধারার সাথে ছত্রাকের অভিব্যক্তির ধারার কোনো সম্পর্ক নেই। Chydridiales–এর নিচের কোনো বর্ণহীন আদিম স্টক হতে ছত্রাকের Phycomycetes শ্রেণীর ছত্রাকগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

৩. Dangard (১৮৮৬) ও Ashworth (১৯২৩) Phycomycetes উৎপত্তিস্থলরূপে বর্ণকণিকাহীন ফ্ল্যাজেলেটকে নির্ধারণ করেন। কেননা, এদের সাথে বহু ক্ষেত্রেই ছত্রাকগোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে। সেহেতু সবুজ উদ্ভিদ ও প্রাণী স্বাধীনভাবে যে ধারায় উদ্ভূত হয়েছে তারই পাশাপাশি নিম্নশ্রেণীর জীব হতে ছত্রাকের উৎপত্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান।

৪. Phycomycetes –এর প্রোটোজোয়ান পূর্বসূরি রয়েছে এবং শৈবাল হতে পৃথক একটি সুস্পষ্ট অবস্থানে রাখা উচিত।

৫. Scherffel (১৯৩২) জলজ Phycomycetes–কে দুটি সিরিজে ভাগ করেছেন : (ক) Chytridincen ও (খ) Saprolegninean-Perenosporinean দুটি ভিন্ন ভিন্ন মোনাও পূর্বসূরি হতে এদের উদ্ভব হয়েছে। প্রথমটির উদ্ভব হয়েছে একক ফ্লাজেলাযুক্ত ধরণ হতে এবং দ্বিতীয়টির উদ্ভব হয়েছে দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত ধরন হতে এবং এদের বিকাশ ঘটেছে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেই। এ ধারণাকে Sparrow সমর্থন দেন।

Sparrow (১৯৫৮) মত প্রকাশ করেন যে, Phycomycetes কোনো সমসত্ত্ব মনোফাইলেকটিক গোষ্ঠীভুক্ত। ছত্রাক নয়, বরং একটি সিনোসাইটিকও চলরেণু প্রদানকারী কৃত্রিম ছত্রাকগোষ্ঠী। এটির ৪টি গোষ্ঠী মূলত বিভিন্ন পূর্বসূরি হতে আগত।

সচল Chytrid কোষে দ্বিতীয় অকার্যকরও নিষ্ক্রিয় ব্লেফারোপ্লাস্টের উপস্থিতি (Koch, ১৯৫৮) এ ধারণারই জন্ম দেয় যে, এ শ্রেণীটি দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত পূর্বসূরি হতে উদ্ভূত হয়েছে। তাছাড়া ফ্লাজেলার অবস্থান প্রকৃতি ও আচরণ হতেও এ তথ্য সমর্থিত হয়েছে।

Phycomycetes ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Phycomycetes শ্রেণীর ছত্রাকগুলোর কিছু কিছু প্রজাতি আমাদের যেমন উপকার করে তেমনি কিছু প্রজাতি ক্ষতিরও কারণ হয়। এ অপকার ও উপকার সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

অপকারী ভূমিকা

১. *Olpidium brassicae* লেটুস পাতার ক্ষতিসাধন করে।

২. *Phytophthora infestans* প্রজাতির ছত্রাক আলুর ধ্বসা রোগ সৃষ্টি করে ফসলের ফলন কমিয়ে দেয়।

৩. *Albngo* গণের বিভিন্ন প্রজাতি ফুলকপি, বাঁধাকপি, শাল গম প্রভৃতি Cruciferae গোত্রীয় উদ্ভিদে 'সাদা মরিচা' রোগ সৃষ্টি করে উৎপাদন হ্রাস করে।

৪. *Perenospora* গণেয় ছত্রাক প্রজাতিগুলো পালং, বিট, গাজর প্রভৃতি উদ্ভিদে 'ডাউনি মিলডিউ' রোগ সৃষ্টি করে এবং *Pythium delsaryantum* তামাকে 'ড্যাম্পিং অফ' রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

৫. *Synchytrium* গণভুক্ত অনেক প্রজাতির ছত্রাক আবৃতবীযযুক্ত উদ্ভিদে পরজীবী হিসেবে বসবাস করে এবং যেসব গাছের কাণ্ড, পাতা ও ফলে 'গল' রোগ সৃষ্টি করে বলে অর্থকরী উদ্ভিদের কাঠের মান ও ফলের ফলন কমে যায়।

৬. *Saprolegnia* গণের কিছু কিছু প্রজাতি মাছের উপর পরজীবীরূপে বাস করে মাছের ফলন কমিয়ে দেয় এবং মাছের খামারে *Salmonella* নামক রোগ মহামারিরূপে দেখা দেয়। ফলে খামারের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়।

৭. *Mucor* ও *Rhizopus*-এর বেশ কিছু প্রজাতি মানুষের খাদ্যবস্তু নষ্ট করে দেয়। চামড়ার সামগ্রী, কাপড়-চোপড় প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে। মানুষ ও প্রাণীর Mucormycosis রোগ ও *Mucor* ছত্রাকঘটিত রোগ। এ রোগ মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি করে থাকে। ডায়াবেটিস, লিউকেমিয়া ও ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে Mucormycosis রোগের আধিক্য দেখা যায়।

উপকারী ভূমিকা

১. *Mucor rouxi* ছত্রাক ব্যবহার করে শ্বেতসার হতে শর্করা দ্রব্য তৈরি করা হয়।

২. Entomophthorales বর্গের কতিপয় ছত্রাককে রোগ দমনের ক্ষেত্রে Biological Control জৈবিক (জীবজ) নিয়ন্ত্রণের এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩. *Chaenophora* গণের কিছু কিছু প্রজাতিকে (+ ও –) তরল আবাদ মাধ্যমে চাষ করে (বিটা) ক্যারোটিন সংশ্লেষ করা হয়।

৪. *Empusa muscae* ছত্রাকটি মশা মাছি ধ্বংস করে উড়িঘরে মাছির উপদ্রব হতে মানুষকে রক্ষা করতে পারে।

৫. কিছু কিছু জলজ ছত্রাক পানিশোধনেরও ক্ষমতা রাখে।

শ্রেণীবিন্যাস

A. ফাইকোমাইসেটিস শ্রেণীকে দেহগঠন, অযৌন রেণুর প্রকৃতি এবং যৌন পদ্ধতি ও তার পরিণতির ফলাফলের ভিত্তিতে ৩টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : যথা Archimycetes, Oomycetes ও Zygomycetes । এ উপশ্রেণীত্রয়কে আবার বর্গে এবং বর্গকে গোত্রে ভাগ করা হয়েছে। এখানে এ শ্রেণীবিন্যাসের একটি সরলীকৃত ছক দেওয়া হলো :

১. মাইসেলিয়াম অনুপস্থিত কিংবা রাইজোমাইসেলিয়াম থাকতে পারে, থ্যালাসটি–হলোকার্পিক বা ইউকার্পিক ধরনের, বিভিন্ন ধরনের যৌনজনন, চলরেণু–একক ফ্লাজেলাযুক্ত : উপশ্রেণী : Archimycetes।

ক. মাইসেলিয়াম থাকে না, রাইজোমাইসেলিয়াম থাকে, থ্যালাস হলোকার্পিক বা ইউকার্পিক ধরনের হয়ে থাকে—বর্গ : Chytridiales

গোত্র : Synchytriaceae

গণ : *Synchytrium*

২. প্রস্থপ্রাচীরবিহীন রাইজোমাইসেলিয়াম থাকে এবং থ্যালাসটি হলোকার্পিক।

ক. প্ল্যানোগ্যামেটের মিলন দ্বারা যৌন জনন হয়, স্থূল সহনশীল প্রাচীরযুক্ত রেণুস্থলী থাকে :

বর্গ : Blastocladiales

গোত্র : Blastocladiaceae

গণ : *Allomyces*

৩. মুক্ত সন্তরণশীল পুং প্ল্যানোগ্যামেট ও স্ত্রী অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেটের মিলনে যৌনজনন সম্পন্ন হয়, স্থিতিশীল রেণুস্থলী দেখা যায় না :

বর্গ : Monoblepharidales

গোত্র : Monoblepharidaceae

গণ : *Monoblepharis*

ক. উন্নত মাইসেলিয়াম থাকে, তবে প্রস্থপ্রাচীরবিহীন, থ্যালাসটি হলোকার্পিক, জনন অঞ্চল ও দেহাঞ্চলটি প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে বিভেদিত।

খ. জননকোষাধারটি পুং ও স্ত্রী অংশরূপে বাহ্যিকভাবে চেনা যায়, যৌনজনন মূলত এ বিসদৃশ জননকোষাধারের মিলনে উস্পোর তৈরি করে (উগ্যামাস), অযৌন জনন দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু দ্বারা হয়ে থাকে :

উপশ্রেণী : Umycetes

গ. প্রতিটি উগোনিয়ামে এক বা একাধিক উস্ফেয়ার থাকে, পেরিপ্লাজম থাকে না, চলরেণু দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত, ডাইপ্ল্যানেটিক বা মনোপ্ল্যানেটিক :

বর্গ : Soprolegniales

গোত্র : Saprolegniaceac

গণ : *Saprolegnia*

৪. প্রতিটি–উগোনিয়ামে ১টি উস্ফেয়ার থাকে ; পেরিপ্লাজম থাকে, রেণুস্থলী অঙ্কুরনল বা চলরেণু মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়, চলরেণু দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত মনোপ্ল্যানেটিক, রেণুস্থলীর মধ্যেই গঠিত হয় কিংবা রেণুস্থলীজাত ভেসিকলের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

বর্গ : Peronosporales

৫. রেণুস্থলীধর অঙ্গজ হাইফিসদৃশ হয় কিংবা বিসদৃশ হলে অসীম বৃদ্ধিযুক্ত।

গোত্র : Pythiaceae

গণ : *Pythium, Phytophthora*

ক. রেণুস্থলীধর দেহজ হাইফি হতে ভিন্নতর ও সসীম বৃদ্ধিযুক্ত, সশাখ বা অশাখ রেণুস্থলী ধরে। রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় কিংবা বিভিন্ন রকমের রেণুস্থলীধর হতে পারে।

খ. ক্ল্যাভেট রেণুস্থলী ধরে শিকলাকারে রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় এবং এগুলো ঘন সোরাই-এর মধ্যে থাকে।

গোত্র : Albuginaceae

গণ : *Albugo*

গ. সশাখ বা অশাখ ক্লাভেট রেণুস্থলীধরের শীর্ষে এককভাবে কিংবা গুচ্ছকারে জন্মে।

গোত্র : Peronosporaceae

গণ : *Perenospora, Plasmopara*

ঙ. ব্যহ্যিকভাবে জননকোষাধারকে পুং ও স্ত্রীরূপে শনাক্ত করা যায় না ; যৌনজনন মূলত জননকোষাধারের মিলনে হয়ে থাকে এবং জাইগোরেণু উৎপন্ন হয় এবং অযৌন জনন রেণুস্থলীরেণু মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উপশ্রেণী : Zygomycetes

৬. মৃতজীবী, কিছুসংখ্যক দুর্বল ধরনের পরজীবী, অযৌন জনন রেণুস্থলীতে উৎপন্ন রেণুস্থলীয় রেণু দ্বারা বা স্পোরাঞ্জিওলে উৎপন্ন রেণু দ্বারা হয়ে থাকে—

গণ : Mucorales.

ক. রেণুস্থলী প্রাচীর কাইটিনযুক্ত নয়, রেণুস্থলী প্রাচীর ভেঙে বা বিগলনে রেণুস্থলীর রেণুগুলো মুক্ত হয়, ভ্রূণধর (সাসপেনসর) কদাচ জিহ্বাকৃতি হয়।

গোত্র : Mucoraceae

গণ : *Mucor*

খ. রেণুস্থলী প্রাচীর কাইটিনযুক্ত, রেণুস্থলীটি হঠাৎ করে দ্রুততরভাবে মুক্ত হয় বা রেণুস্থলীধর হতে এককভাবে পৃথক হয়ে যায়, সাসপেনসর সর্বদাই জিহ্বাকৃতি হয়ে থাকে।

গোত্র : Pilobolacese

গণ : *Pilobolus*

B. Gwynne-vaughan ও Barnes (১৯২৭) নামক দু'জন ছত্রাকবিদ ফাইকোমাইসেটিস শ্রেণীটিকে ৩টি উপশ্রেণীতে ভাগ করেছেন :

১. উপশ্রেণী—Archemycets- এখানে প্রকৃত অনুসূত্র উৎপন্ন হয় না। এটির ৩টি বর্গ রয়েছে :

ক. বর্গ ১ : Chytridiales —উদাহরণ *Syndytrium, Olpidium*

খ. বর্গ – ২ : Ancylistales—উদাহরণ *Ancylistes, Lagenidium*

গ. বর্গ ৩ : Protomycetales–উদাহরণ *Protomyces*

২. উপশ্রেণী Oomycetes—অনুসূত্র উন্নত প্রকৃতির ও সিনোসাইটিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌনজনন চলরেণু দিয়ে হয়ে থাকে। যৌন জনন উগ্যামিয় ও জাইগোটকে উস্পোর বলে। এতে ৫টি বর্গ আছে :

ক. বর্গ ১ : Blastochadiales-- উদাহরণ *Blastocladia, Allomyces*

খ. বর্গ ২ : Monoblephoridales—উদাহরণ *Monoblepharis*

গ. বর্গ ৩ : Leptomitales –উদাহরণ *Leptomitus, Sapromyces*

ঘ. বর্গ ৪ : Saprolegniales–উদাহরণ *Saprolegnia, Achyla*

ঙ. বর্গ ৫ : Perenosporales উদাহরণ Pythium, Perenospara, *Phytothora, Albugo* প্রভৃতি

৩. উপশ্রেণ Zygomycetes—অনুসূত্র উন্নত ধরনের ও সিনোসাইটিক। সংশ্লেষ পদ্ধতিতে যৌনজনন হয় এবং জাইগোটকে জাইগোরেণু বলে। রেণুগুলো ফ্লাজেলাবিহীন ও এককোষী রেণুস্থলীর মধ্যে উৎপন্ন হয় । এতে ২টি বর্গ রয়েছে :

ক. বর্গ ১ : Mucorales —*Mucor, Rhizopus, Piulobulus*

খ. বর্গ ২ : Entemophthorales — *Entomophthora, Empusa,*

c. জীবনচক্রে সচল কোষের উপস্থিতি অনুস্থিতি, ফ্লাজেলার প্রকার, সংখ্যা ও বিন্যাসরীতির উপর ভিত্তি করে Sparrow (১৯৫৮–৫৯) Phycomycetes–কে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেন :

Phycomycetes

- স্পোরাঞ্জিওরেণু সচল
  - সচল স্পোরাঞ্জিওরেণু এক ফ্লাজেলাযুক্ত
    - ক. উপশ্রেণী Uniflagellafae.
      - বর্গ ১ : Chytridialas
      - বর্গ ২ : Blastocladiales.
      - বর্গ ৩ : Monoblepharidales.
  - সচল স্পোরাঞ্জিওরেণু দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত
    - খ. উপশ্রেণী Biflagelletae
      - বর্গ ১ : Saprolegniales
      - বর্গ ২ : Leptomitales.
      - বর্গ ৩ : Lagenidiales
      - বর্গ ৪ : Perenosporales.
- স্পোরাঞ্জিওরেণু নিশ্চল
  - গ. উপশ্রেণী Aflagellatae Aplanatae
    - বর্গ ১ : Mucorales
    - বর্গ ২ : Entomophthorales

D. Hawker (১৯৬৭) Sparrow–কে অনুসরণ করে নিজস্ব প্রজ্ঞার আলোকে সামান্য পরিবর্তন করে Phycomycetes–এর শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপন করেন :

Gruop A : Uniflageuatae.

শ্রেণী ক. Chytridiomyectes

বর্গ ১ : Chytridiales

বর্গ ২ : Blastocladiales

বর্গ ৩ : Monoblepharicdales

শ্রেণী খ. Hyphochytridiomycetes

বর্গ : ১ Hyphochytridiales.

শ্রেণী গ. Plasmodiophoromycetes-পশ্চাদভাগে একটি লম্বা ফ্লাজেলাযুক্ত।

বর্গ ১. Plasmodiophorales

Group B : Biflagellatae —একটি ফ্লাজেলা হুইপের মতো ও অন্যটি টিনসেল ধরনের।

শ্রেণী ঘ. Oomycetes.

বর্গ ১. Saprolegniales

বর্গ ২. Leptomitales

বর্গ ৩. Lagenidiales

বর্গ ৪. Perenosporales

Group C, Aplanatae— সচল কোষ অনুপস্থিত।

শ্রেণী- ঙ Zygomycetes

বর্গ ১. Mucorales

বর্গ ২. Entomophthorales

বর্গ ৩. Zoopagales

শ্রেণী–চ. Trichomycetes

বর্গ ১. Amoebidiales

বর্গ ২. Ecerinales

বর্গ ৩. Horpellales

বর্গ ৪. Genistellales

বর্গ ৫. Asellariales.

Alexopoolas (১৯৬২) সমগ্র ছত্রাককে শ্রেণীবিন্যাসিত করার সময় Phycomycetes উপবিভাগকে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেন :

১. Chytridiomycetes,
২. Hyphochytridiomycetes,
৩. Oomycetes,
৪. Plasmogiophorales,
৫. Zygomycetes,
৬. Trichomycetes.

বিশদভাবে জানার জন্য ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস Alexopolous –এর শ্রেণীবিন্যাস দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থে Alexopolous–এর শ্রেণীবিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে।

E. Ainsworth (১৯৬৬) ও Webster (১৯৭০) Phycomycetes ছত্রাককে দুটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন, যথা—

১) উপবিভাগ Mastigomycotins-ছত্রাকগুলো চলরেণু উৎপাদন করে। এতে ৩টি শ্রেণী রয়েছে :

ক. শ্রেণী : Chytridiomycetes- চলরেণুর পিছনদিকে ১টি হুইপল্যাস ফ্লাজেলাম থাকে। এতে ৩টি বর্গ রয়েছে :

বর্গ-১. Chytridiales —দেহ হলোকার্পিক বা ইউকার্পিক। এতে বেশ কিছু গোত্র রয়েছে ; তবে নিম্নোক্তগুলো প্রধান :

গোত্র ১ : Olpidiaceae-উদাহরণ *Olpidium* sp.

গোত্র ২ : Synchytoiaceae-উদাহরণ *Synchytiun* sp.

গোত্র ৩ : Rhigidiaceae-উদাহরণ *Rhigophlyctis* sp.

গোত্র ৪ : Cladochytriaceae-উদাহরণ *Cladochytrium* sp.

গোত্র ৫ : Chytridiaceae-উদাহরণ *Chytridium* sp.

গোত্র ৬ : Megachytriaceae-উদাহরণ *Nowakowskiella* sp.

বর্গ ২. Blastocladiales—থ্যালাস সুবিকশিত, নির্দিষ্ট পাদকোষ ও রাইজয়েড থাকে। এতে ৩টি গোত্র রয়েছে, তন্মধ্যে Blastocladiaceae প্রধান ; উদাহরণ *Aelomyces* sp.

বর্গ ৩. Monoblepharidales —থ্যালাসে সুগঠিত পাদকোষ থাকে না, হাইফি নিয়ে দেহ গঠিত, পুংগ্যামেট সবল ও স্ত্রীগ্যামেট নিশ্চল প্রকৃতির ; জনন উগ্যামীয়। এতে ২টি গোত্র রয়েছে :

গোত্র : ১ : Monoblepharidaceae-উদাহরণ *Monoblepharis* sp.

গোত্র ২ : Gonapodyaceae-উদাহরণ *Gonapodya*. sp.

খ. শ্রেণী : Hyphochytridiomyctes—চলরেণুর সামনের দিকে একটি টিনসেল ফ্লাজেলাম থাকে। এতে ১টি বর্গ রয়েছে :

বর্গ : Hyphochytriales.

গ. শ্রেণী : Oomycetes —চলরেণু দ্বিফ্লাজেলাযুক্ত ; সামনের দিকে পার্শ্বদেশে যুক্ত থাকে। এতে ৪টি বর্গ রয়েছে :

বর্গ-১. Lagemidiales এতে ১টি গোত্র রয়েছে :

গোত্র : ১-Lagenidiaceae-উদাহরণ *Lagenidium* sp

বর্গ-২. Peronosporales —এতে ৩টি গোত্র রয়েছে :

গোত্র ১-: -Pythiaceae-উদাহরণ *Pythium* sp

গোত্র ২ : Synchytoiaceae- উদাহরণ *Synchytriun* sp.

গোত্র ৩-:-Albnginaceae-উদাহরণ *Albugo* sp.

বর্গ-৩ : Saprolegniales- জলজ ছত্রাক ; এতে ১টি গোত্র রয়েছে ; যথা—

গোত্র ১ : Saprolegniaceae-উদাহরণ *Saprolegnia* sp.

বর্গ-৪ : Leptomixales —এতে ১টি গোত্র রয়েছে ; যথা—

গোত্র-১ : Leptomitaceae-উদাহরণ *Apodachlya* sp.

২. উপবিভাগ : Zygomycotina—দেহ প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হাইফি দিয়ে গঠিত। রেণু রেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়, যৌনজননে জাইগোরেণু উৎপন্ন হয়। এতে ২টি শ্রেণী রয়েছে ; যথা—

শ্রেণী-১ : Zygomycetes —এতে ২টি বর্গ রয়েছে ; যথা—

বর্গ-১ : Mucorales : এতে ৯টি গোত্র রয়েছে :

গোত্র-১ : Mucoraceae--উদাহরণ *Mucor* sp.

2. Pilobolaceae-উদাহরণ Pilobohns sp.

3. Thamnidiaceae-উদাহরণ *Thamnidium* sp.

4. Choanephoraceae-উদাহরণ *Choanephora* sp.

5. Piptocephlidiceae-উদাহরণ *Syncephalastrum* sp.

6. Kickxcllaceae-উদাহরণ *Spirodactylon* sp.

7. Cunninghamellaceae-উদাহরণ *Cunninghamella* sp.

গোত্র : 4. Mortierellaceae-উদাহরণ *Morticralla* sp.

9. Endogonaceae-উদাহরণ *Endogone* sp.

বর্গ-২. Entomophthorales-- পরজীবী। জাইগোরেণু প্রাচীর মসৃণ। এতে ৩টি গোত্র রয়েছে ; যথা—

গোত্র-১. Zoopagaceae-উদাহরণ *Zoophagus* sp.

" -২. Basidiobolaceae-উদাহরণ *Basidiobolus* sp.

বর্গ-৩. Enfomophthoraceae-উদাহরণ *Entomophthora* sp.

শ্রেণী-২. Trichomycetes—এসব ছত্রাকের জাতিত্ব অনিশ্চিত এবং শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নয়। ছত্রাকগুলো পতঙ্গের লার্ভা ও পৌষ্টিক নালির পরজীবী।

চতুর্থ অধ্যায়

কাইট্রিডিওমাইসেটিস
Chytridiomycetes

এ শ্রেণিভুক্ত ছত্রাকগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এক ফ্লাজেলাযুক্ত জননকোষ (চলরেণু ও অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেট) উৎপাদন করা। এ একক ফ্লাজেলামটি–হুইপল্যাস ধরনের এবং পিছন দিকে কোষমধ্যের *Blepharoplast*–এর সাথে যুক্ত থাকে। কতিপয় প্রজাতি সচল কোষের RNA–ঘটিত কেন্দ্রিকা–টুপি থাকে। কোষের সামনের দিকের কেন্দ্রিকাকে বর্মের ন্যায় ঢেকে থাকে। এদের অধিকাংশই জলজ প্রকৃতির। তবে কিছু সংখ্যক প্রজাতিকে মাটিতে বসবাস করতে দেখা যায়। বহু সংখ্যক প্রজাতিকে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে পরজীবীরূপে বাস করতে দেখা যায়। এ শ্রেণিভুক্ত আদিম সদস্যগুলো আণুবীক্ষণিক ; এদের অঙ্গজ দেহ এককোষীয় থ্যালাস (চিত্র ৪.১ক)। এটি হলোকার্পিক। প্রাথমিক পর্যায়ে এদের কোনো প্রকার কোষপ্রাচীর থাকে না (*Olpidium*)। প্রাগ্রসর প্রজাতিতে এককোষী থ্যালাসের কোনো একস্থান হতে মেকি রাইজয়ড শাখা উৎপন্ন হয়। এগুলো আঁকড়ে ধরে রাখা ও পুষ্টি সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয় (*Rhizophidium*)। কিছুটা জটিল প্রকৃত সদস্যে অধিক শাখাবহুল রাইজোমাইসেলিয়াম দেখা যায়। এগুলো ইউকার্পিক । আরও উন্নত ও প্রাগ্রসর প্রজাতিতে সামান্য পরিমাণে ছোট খাটো সূত্রাকৃতি হাইফিযুক্ত মাইসেলিয়াম দেখা যায়। *Monoblepharis*–এ ইউকার্পিক মাইসেলিয়ামের জালক দেখা যায়। হাইফিগুলো সিনোসাইটিক। অঙ্গজ দশায় কোনো প্রস্থপ্রাচীর দেখা যায় না। তবে জনন মৌসুমে নিরেট ধরনের প্রস্থপ্রাচীর দেখা যায়। চলরেণু ও গ্যামেটের পিছনে একটি করে হুইপল্যাস ফ্লাজেলা থাকে।

অযৌন জনন

রেণুস্থলী হচ্ছে অযৌন জনন অঙ্গ। এখানে বহুসংখ্যক ছোট ছোট এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও একক ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু উৎপন্ন হয়। মুক্ত চলরেণুগুলো কিছু সময়ের জন্য সাঁতার কাটে এবং পরে এরা ফ্লাজেলা হারিয়ে প্রাচীরাবৃত হয়ে অবসর যাপন করে। অবসরকাল কাটানোর পর এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে নতুন ছত্রাক দেয়।

যৌন জনন

যৌন জনন আইসোগ্যামীয় বা অ্যানাইসোগ্যামীয় হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উগ্যামীয় (Monoblephariodales) প্রকৃতির হতে পারে।

শ্রেণিবিভাগ

মাইসেলিয়াম অনুপস্থিত, রাইজোমাইসেলিয়াম উপস্থিত, থ্যালাস আণুবীক্ষণিক, হলোকার্পিক বা ইউকার্পিক, এককোষী, চলরেণু কেন্দ্রিকা–টুপিবিহীন।

বর্গ : Chytridiales

গোত্র : Synchytiaceae

গণ : *Synchytrium*

প্রজাতি : *S. endobioticum*

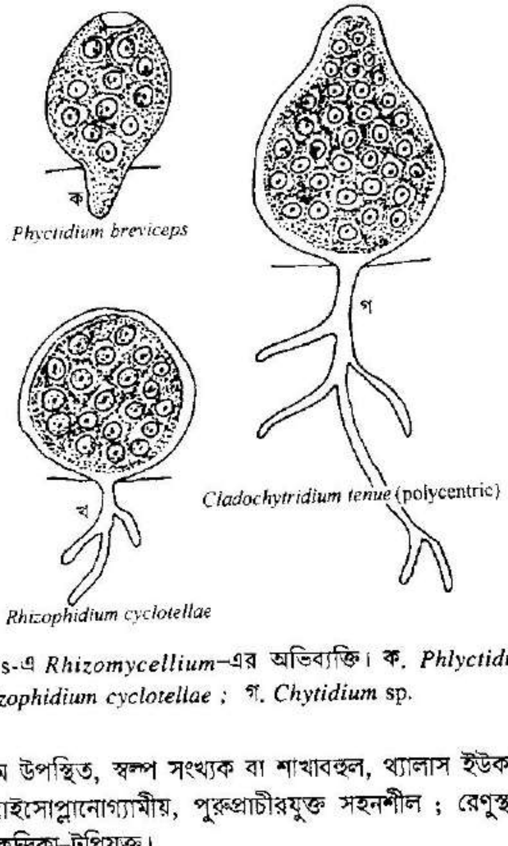

চিত্র ৪.১ : Chytids-এ *Rhizomycellium*–এর অভিব্যক্তি। ক. *Phlyctidium breviceps* ; খ. *Rhizophidium cyclotellae* ; গ. *Chytidium* sp.

২. মাইসেলিয়াম উপস্থিত, স্বল্প সংখ্যক বা শাখাবহুল, থ্যালাস ইউকার্পিক, যৌন জনন আইসো, বা অ্যানাইসোপ্লানোগ্যামীয়, পুরুপ্রাচীরযুক্ত সহনশীল ; রেণুস্থলী, প্রতিসরণশীল তেলবিন্দুবিহীন ও কেন্দ্রিকা-টুপিযুক্ত।

বর্গ : Blastochladiales

গোত্র : Blastochladiaceae

গণ : *Allomyces*

৩. মাইসেলিয়াম উপস্থিত, যৌন জনন হেটারোগ্যামীয়, পুং প্ল্যানোগ্যামেট সচল ও স্ত্রী অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেট নিশ্চল প্রকৃতির এবং সহনশীল রেণুস্থলী অনুপস্থিত।

বর্গ : Monoblepharidales

গোত্র : Monoblepharidaceae

গণ : *Monoblepharis*

বর্গ : Chytidiales

এ বর্গভুক্ত ছত্রাকগুলো সর্বাপেক্ষা আদিম ও সরল, পরজীবী বা মৃতজীবী, জলজ বা স্থলজ প্রকৃতির ; এদের Chytids বলে। কিছু কিছু প্রজাতি সামুদ্রিকও হয়ে থাকে। স্বাদুপানির *Rhizophium* শৈবাল বা জল-মোল্ডকে আক্রমণ করে থাকে (চিত্র ৪.২ক)। পরজীবী প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. আলুর 'আঁচিল রোগ' সৃষ্টিকারী *Synchytrium endobioticum*

২. ভুট্টার 'বাদামি দাগ রোগে'র জন্য দায়ী *Physoderma zeaemayitis*

৩. *Urophlyctis* (Urophyctis) *alfaalfae*

৪. বাধাকপি ও তামাক-চারার মূলে রোগ সৃষ্টিকারী *Olpidium brassicae*

কতিপয় প্রজাতি আন্তঃপরজীবী ও হলোকার্পিক (*Synchytium* sp.) হয়ে থাকে। থ্যালাস এককোষী, নগ্ন বা কোষপ্রাচীরযুক্ত, গোলাকার বা লম্বাটে কিংবা অন্য আকৃতির হয়ে থাকে। এটি হলোকার্পিক বা ইউকার্পিক হয়ে থাকে। কোনো কোনোটা এপিবায়োটিক। কতিপয় Chytids-এর থ্যালাসে রাইজোমাইসেলিয়াম গঠিত হয়ে থাকে (চিত্র ৪.২খ)। তবে সব Chytids এককোষী (চিত্র ৪.৩ঘ)। কোষপ্রাচীর কাইটিন বা কাইটিন ও সেলুলোজনির্মিত। কিছু কিছু প্রজাতিতে জনন একক (রেণুস্থলী বা বিশ্রাম রেণু) একটি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিক হতে পারে। প্রথমটিকে মনোসেন্ট্রিক (চিত্র ৪.২খ) এবং অন্যগুলোকে পলিসেন্ট্রিক বলে। মনোসেন্ট্রিক প্রজাতিগুলোকে বাহ্যিকভাবে *Botrydium*-এর মতো মনে হয়। কখনও কখনও থ্যালাসে হাইফিসদৃশ শাখা উৎপন্ন হয়।

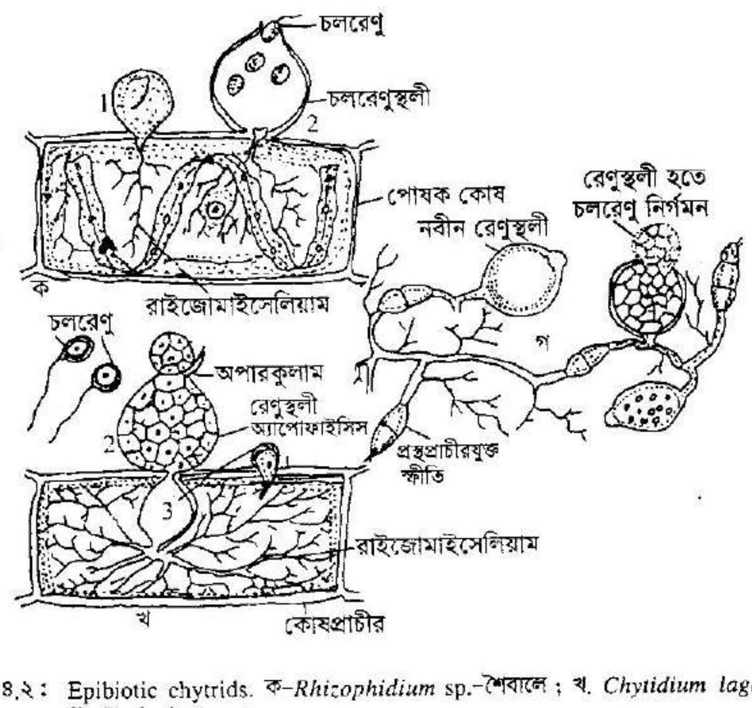

চিত্র ৪.২ : Epibiotic chytrids. ক-*Rhizophidium* sp.-শৈবালে ; খ. *Chytidium lagenaria* গ. *Cladochytium tenue*

অযৌন জনন

গোলাকৃতি, বেলনাকার, ফ্লাস্ক-আকৃতি বা অনিয়মিত খাঁজযুক্ত রেণুস্থলী হতে উৎপন্ন পিছনে একটি ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। ফ্লাজেলামটি হুইপল্যাস প্রকৃতির। চলরেণু নির্গমনের ধরণ অনুযায়ী Chytrids কে Operculate ও Inoperculate-এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমক্ষেত্রে নির্গমন নলের মাথায় ঢাকনা থাকে। এটি খুলে গেলেই রেণুমুক্তি ঘটে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নির্গমন নল বা রেণুস্থলীর শীর্ষভাগে একটি রন্ধ্র থাকে। এ পথেই রেণুমুক্তি ঘটে। Operculate প্রজাতিকে অধিক উন্নত বলে গণ্য করা হয়। পোষকের নিকটবর্তী হলে বা সংস্পর্শে এলে চলরেণু ফ্লাজেলা হারায় এবং অঙ্কুর নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। সেহেতু অঙ্কুরণ মনোপোলার।

যৌন জনন

এ বর্গে বহু গোত্র রয়েছে ; এর মধ্যে Olpidhiaceae ও Synchytriaceae তে-শুধু হলোকার্পিক প্রজাতি রয়েছে এবং যৌনজনন আইসোগ্যামীয়। বাহ্যিকভাবে আইসোগ্যামেটগুলো চলরেণুর সাথে সাদৃশ্য দেখায়। অন্য গোত্র—Physodermataceae ও Phlyctidiaceae অধিকতর উন্নত Chytrids রয়েছে। এগুলো ইউকার্পিক প্রকৃতির। এগুলো হেটারোগ্যামির প্রবণতা দেখায়।

গোত্র : Synchytriaceae

আণুবীক্ষণিক, এককোষী, পরজীবী, হলোকার্পিক থ্যালাসের Chytrids-এ গোত্রভুক্ত। থ্যালাসের পিছনদিকে একটি ফ্লাজেলাম থাকে। জননকালে থ্যালাসটি কয়েকটি কক্ষে ভাগ হয়ে যায় এবং প্রতিটি কক্ষ রেণুস্থলী বা জননকোষাধাররূপে কাজ করে। সব জনন এককগুলো একটি সাধারণ পর্দার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সোরাস গঠন করে। রেণুস্থলী ঢাকনাবিহীন এ গোত্রের উল্লেখযোগ্য গণ হলো *Synchytrium endobioticum*।

প্রতীক প্রজাতি : *Synchytrium endobioticum*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Chytridiomycetes
বর্গ—Chytridiales
গোত্র—Synchytriaceae
গণ—*Synchytrium*
প্রজাতি— *S. endobioticum*

প্রকৃতি ও বসতি

Synchytrium একটি বাধ্যতামূলক পরজীবী ছত্রাক। এর প্রায় ৭০টি প্রজাতি রয়েছে এবং অধিকাংশই আবৃতবীজী উদ্ভিদের বহিঃত্বকীয় কোষে পরজীবীরূপে বাস করে। এ গণের বহুল পরিচিত *S. endobioticum* ইউরোপীয় দেশসমূহে গোল আলুর 'কালো আঁচিল' রোগের কারণ (চিত্র ৪.৩) হিসেবে স্বীকৃত।

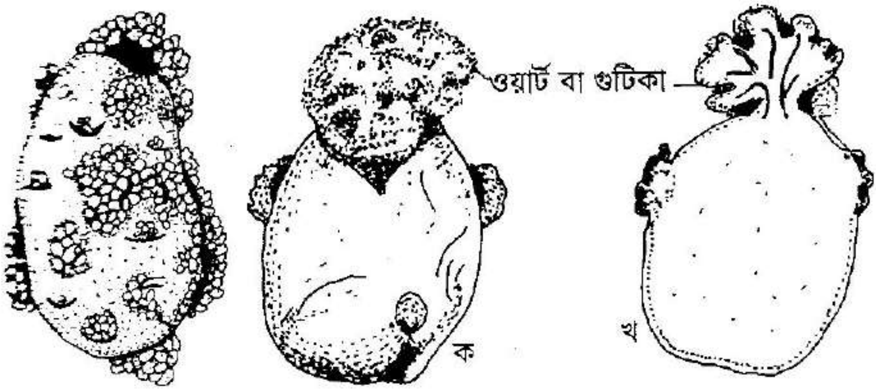

চিত্র ৪.৩ : *S. endobioticum* গোল আলুর কালো আঁচিল রোগ

দৈহিক গঠন

Synchytrium-এর থ্যালাস সূত্রাকৃতির নয় বরং এককোষী। এটি আন্তঃপরজীবী, হলোকার্পিক ও পলিসেন্ট্রিক। গোলাকার, এককোষী থ্যালাসটি পুরু বা পাতলা প্রাচীরযুক্ত হতে পারে। প্রাচীর যেমনিই হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই সমান অনিষ্টকারী। এরা পোষকদেহে আঁচিল উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানী Curtis (১৯২১) সর্বপ্রথম *Synchytrium*-এর জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। এটি সর্বপ্রথম হাঙ্গেরিতে (১৮৯৫) কালো আঁচিল রোগরূপে গোল আলুতে দেখা যায়। ছত্রাকটির চলরেণুর পূর্ণতাপ্রাপ্তি বিসরণ ও সংক্রমণের জন্য পানি অপরিহার্য।

পোষক দেহের আক্রান্ত স্থান হতে অসংখ্য এক ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু মাটির পানিতে বের হয়ে সাঁতার কাটতে থাকে (ক) এবং সুস্থ আলুর কন্দের সংস্পর্শে এলে ও পরিবেশ অনুকূল হলে গোল আলুর বহিঃত্বককে ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। ফ্লাজেলামটি বাইরে খসে পড়ে (খ-গ) কোষে প্রবেশ করার পর চলরেণু প্রথমে অ্যামিবাসদৃশ ও পরে গোলাকার রূপ ধারণ করে এবং পোষক কোষ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কেন্দ্রিকাটিও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তখনও এককোষী অবস্থাতেই থাকে। এসময় এরা পোষক কোষের তলদেশে অবস্থান নেয় (ঘ) । এখানে একটি নির্দিষ্ট আকার পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর একটি দ্বিস্তরীয় 'সোনালি বাদামি' রঙের প্রাচীর আবৃত হয় ; একে 'প্রোসোরাস' বলে। শীতপ্রধান দেশে একে গ্রীষ্মকালীন রেণুও বলে (ঙ)। গ্রীষ্মকালীন রেণু বহিঃপ্রাচীরটি পুরু ও সোনালি ধূসর বর্ণের, কিন্তু আন্তঃপ্রাচীরটি পাতলা ও স্বচ্ছ। সংক্রমণের পর থেকে আক্রান্ত পোষক কোষটি আকারে বড় হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পাশের কোষগুলোও উত্তেজিত হয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বিভাজিত হতে শুরু করে। ফলে আক্রান্ত স্থান ও তার চারপাশ স্ফীত হয়ে কালো আঁচিলের মতো অর্বুদের সৃষ্টি করে। এজন্যই গোল আলুর এ রোগকে 'কালো আঁচিল' রোগ বলে।

অযৌন জনন

গ্রীষ্মকালীন রেণু পূর্ণতা প্রাপ্তির পর এর প্রাচীর ছিন্ন ভিন্ন করে প্রোটোপ্লাস্ট পোষক কোষের মধ্যে বের হয়ে আসে এবং পোষক কোষের উপরের দিকে অবস্থান করে। এখানে অন্তঃপ্রাচীর স্তর

থলির আকারে কোষের উর্ধ্বাংশে প্রসারিত হয় (চ)। অতঃপর বৃহদাকৃতির কেন্দ্রিকাটি সব প্রোটোপ্লাস্ট থলির মধ্যে চলে আসে।

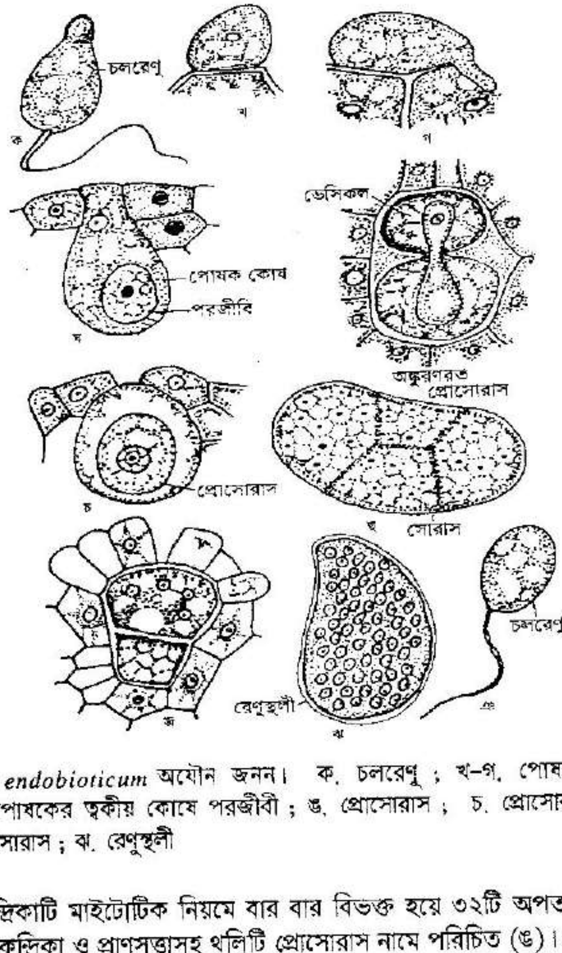

চিত্র ৪.৪ : *S. endobioticum* অযৌন জনন। ক. চলরেণু ; খ–গ. পোষকে অনুপ্রবেশ ; ঘ. পোষকের ত্বকীয় কোষে পরজীবী ; ঙ. প্রোসোরাস ; চ. প্রোসোরাসের স্থানান্তর ; ছ. সোরাস ; ঝ. রেণুস্থলী

এখানে কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক নিয়মে বার বার বিভক্ত হয়ে ৩২টি অপত্য কেন্দ্রিকা গঠন করে। অপত্য কেন্দ্রিকা ও প্রাণসত্তাসহ থলিটি প্রোসোরাস নামে পরিচিত (ঙ)। এটি প্রোটোপ্লাস্ট ক্লিভেজ পদ্ধতিতে ৪ থেকে ৯টি খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতি খণ্ডে একাধিক কেন্দ্রিকা থাকে। প্রতি খণ্ডের কেন্দ্রিকাগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিভক্ত হয়ে ২০০ থেকে ৩০০ কেন্দ্রিকা তৈরি করে। প্রোসোরাসস্থিত এক একটি খণ্ডকে গ্রীষ্মকালীন চলরেণুস্থলী (ক) বলে। চলরেণুস্থলীর প্রতিটি কেন্দ্রিকা কিছুটা প্রাণসত্তা দিয়ে আবৃত হয়ে এক-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণুতে পরিণত হয়। কাজেই পোষকের একটি কোষে ১৫০ থেকে ১৭০০ চলরেণু থাকতে পারে। চলরেণুগুলো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে প্রোসোরাসের প্রাচীর বিদীর্ণ হয় ও চলরেণুগুলো মুক্ত হয়ে চারপাশের পানিতে সাঁতার কাটাতে থাকে। মুক্তিলাভের সময়সীমা ও আবহাওয়ার রকমভেদে চলরেণুগুলোর পরবর্তী কার্যক্রমে ভিন্নতা দেখা দেয়। পূর্ণতালাভের পরপরই চলরেণুগুলো মুক্তিলাভ করে এবং পরিবেশে পানির প্রাচুর্য থাকলে এ রেণুগুলো নতুনভাবে পোষককে আক্রমণ করে। এ ধরনের অনুকূল পরিবেশে অযৌন জননের মাধ্যমেই ছত্রাকটি জীবনচক্র সম্পাদন করে থাকে।

যৌন জনন

অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পরিবেশে প্রোসোরাস খণ্ডগুলো জননকোষাধাররূপে কাজ করে (ক) এবং ক্ষুদ্রাকৃতির সচল গ্যামেট (প্ল্যানোগ্যামেট) উৎপন্ন করে (খ)। এ সচল গ্যামেটগুলো চলরেণু হতে সামান্য ছোট। এগুলো জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে প্লাজমোগ্যামি এবং পরে ক্যারিওগ্যামি হয়ে থাকে। ফলে জাইগোট তৈরি হয় (ঘ)। সাধারণত একই জননকোষাধারের গ্যামেটগুলোর মধ্যে মিলন ঘটে না, তবে একই প্রোসোরাসে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষাধারের গ্যামেটগুলোর মধ্যে মিলন ঘটতে পারে। অন্য কথায়, ভিন্ন ভিন্ন জননকোষাধারে উৎপন্ন গ্যামেটগুলোর আচরণগত বৈপরীত্য রয়েছে বা গ্যামেটগুলো ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (–) ধর্মী।

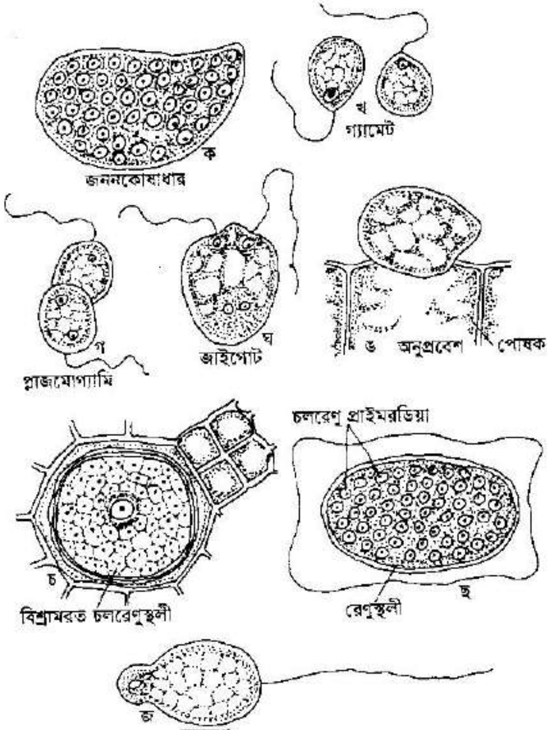

চিত্র ৪.৫ : *Synchytrium* endobioticum–যৌন জনন। ক. জননকোষাধার ; খ. গ্যামেট ; গ. প্লাজমোগ্যামি ; ঘ. জাইগোট ; ঙ. জাইগোটের অনুপ্রবেশ ; চ. বিশ্রাম রেণুস্থলী ; ছ. রেণুস্থলীর অঙ্কুরণ ; জ. নির্গত চলরেণু

মিলনকালে উভয় গ্যামেটই সচল থাকতে পারে বা একটি গ্যামেট ফ্লাজেলা হারিয়ে নিশ্চল হতে পারে (Kusano, ১৯৩০)। সেহেতু জাইগোটটি কখনও ৪-ফ্লাজেলাযুক্ত, কখনও ২-ফ্লাজেলাযুক্ত হয়ে থাকে। জাইগোটটি কিছু সময়ের জন্য সাঁতার কাটে ও অবশেষে পোষক কোষের উপর বিশ্রাম নেয়। জাইগোটটি একটি পাতলা প্রাচীরাবৃত হয় এবং অ্যামিবয়ড পদ্ধতিতে পোষক কোষের মধ্যে প্রবেশ করে ও কোষের নিচের দিকে অবস্থান করে। পরজীবীর উপস্থিতির কারণে পোষক

কোষটিতে হাইপারট্রফি (hypertrophy) ও হাইপারপ্লাসিয়া (hyperplasia) দেখা দেয়। পাশের কোষগুলো উত্তেজিত হয়ে বার বার বিভাজিত হয়ে আক্রান্ত কোষকে ঘিরে ফেলে। ডিপ্লয়ড জাইগোটটি আকারে বড় হয় ও দ্বিস্তরী প্রাচীর দিয়ে আবৃত হয়ে বিশ্রাম-রেণুস্থলীতে (চ) পরিণত হয়। অনেক গ্রন্থাকার একে শীতকালীন রেণুস্থলী বলে উল্লেখ করেন। পুরো শীতকাল এটি সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং মাটির কন্দে আঁচিলরূপে ৫ বছর এবং বায়ুশুষ্ক মাটিতে ১৫ মাস সজীব থাকতে পারে।

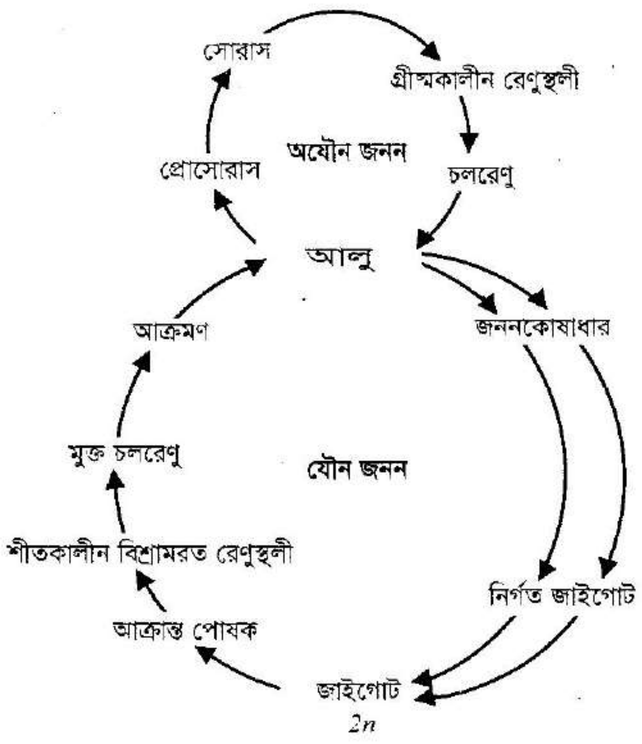

চিত্র ৪.৬ : *S. endobioticum*–এর জীবনচক্র ক. চলরেণু ; খ–গ. পোষকে অনুপ্রবেশ ; ঘ. পোষকে একস্তরে প্রবেশ ; ঙ. প্রোসোরাস ; চ. পোষক কোষের উর্ধ্বাংশের ভেসিকলের মধ্যে প্রোসসারাস স্থানান্তর ; ছ–ঞ. প্রোসোরাসের পরবর্তী পরিবর্তন ও চলরেণু।

বিশ্রামরেণুস্থলীর অঙ্কুরণ

গোটা শীতকাল অবসরে কাটানোর পর গ্রীষ্ম মৌসুমের আগমনে শীতকালীন রেণুস্থলীর ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি প্রথমে মিওটিক ওপরে মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে অসংখ্য অপত্য হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা তৈরি করে। এগুলোকে চলরেণু প্রাইমর্ডিয়া বলে। অতঃপর প্রতিটি কেন্দ্রিকার চারপাশে

কিছু কিছু প্রাণসত্তা জমা হয়ে চলরেণু উৎপন্ন হয়। চলরেণুগুলো এক-ফ্লাজেলামযুক্ত হয়। রেণুস্থলীর বহিঃপ্রাচীর বিদীর্ণ হলে চলরেণুগুলো নির্গমন নল দিয়ে বের হয়ে আসে। এগুলো অযৌন চলরেণু অপেক্ষা আকারে বড় হয়, কিন্তু আচরণে কোনো ভেদ নেই।

জাইগোটের সংক্রমণ চলরেণুর সংক্রমণ অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকর। জাইগোট সংক্রমণে শুধু পাশের কোষগুলোয় নয় বরং অনাক্রান্ত দূরবর্তী কোষকেও বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে। ফলে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে বৃহৎ টিউমার বা আঁচিলের উৎপত্তি হয়। আঁচিলগুলো নরম তুলতুলে বলে ব্যাকটেরিয়া বা অন্য অণুজীব সহজেই এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

১. নীরোগ বীজ নির্বাচন ;

২. কোয়ারটাইন পদ্ধতির প্রয়োগ ;

৩. রোগ প্রতিরোধী বীজের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

৪. ক্ষেতে পানি-নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৫. চুন ও ছত্রাকনাশক ওষুধের ব্যবহার (চারা লাগানোর পূর্বে) রোগ দমনে ফলপ্রদ।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

কিছু কিছু পরজীবী Chytrids ফসলী উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্তগুলোর নাম করা যায় :

১. আলুর কালো আঁচিল রোগ—*Synchytrium endobioticum*

২. আলফা-আলফার ক্রাউন আঁচিল রোগ—*Urophylyctis alfalfae*

৩. ভুট্টার বাদামি দাগ রোগ—*Physoderma zeaemaydis*

৪. কুমড়ার ফলের আঁচিল রোগ—*S. trichosanthoides*

৫. তিলের হাইপারট্রফি রোগ—*S. sesami*

উৎপত্তি ও জাতিজনি

অনেক ছত্রাকবিদ মনে করেন যে, কাইট্রিডগুলো নিম্ন শ্রেণির ছত্রাকের মধ্যে সবচেয়ে সরল ও আদিম প্রকৃতির। আবার অন্য এক দলের মতে, এরা সরলীকৃত গোষ্ঠীর ছত্রাক এবং এগুলো একসময় জটিল প্রকৃতির ছিল। Hawker (১৯৬৭) উল্লেখ করেন যে, এরা জলজ ফ্লাজেলাযুক্ত জীব হতে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক ছত্রাকবিদগণ ধারণা করেন যে, Chytrid হয়ে ফ্লাজেলেট হতে Phycomycetes-এর বিকাশ ঘটেছে।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

Chytrids-এর শ্রেণিগত অবস্থান খুব সুস্পষ্ট নয়। প্রাচীন ছত্রাকবিদগণের মতে Chytrids-Phycomycetes শ্রেণির Oomycetes উপশ্রেণির Chytidiales বর্গভুক্ত। Gaumann ও Dodge (১৯২৮) এবং Gaumann (১৯৫২) আদিম Chytrids কে সুস্পষ্ট Archimycetes শ্রেণিভুক্ত করেন। Alexopoulous (১৯৬২) এদের Phycomycetes হতে পৃথক করে সুস্পষ্ট শ্রেণি

Chytridiomycetes-এ Chytridiales, Blastochadiales ও Monoblepharidales বর্গভুক্ত করেন। Sparrow (১৯৪৩) জননকোষে ফ্লাজেলার সংখ্যা ও বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে Chytridiales, Blastocladiales ও Monoblepharidales কে Phycomycetes শ্রেণির উপশ্রেণী Uniflagellate ভুক্ত করেন। Schelberky (১৮৯৫) *Synchytrium endobioticum*-এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন এবং এ প্রজাতিটিকে *Chrysophlyctis* গণভুক্ত করেন। কিন্তু Percival-এটিকে *Synchytrium* গণে স্থানান্তরিত করেন। যাহোক, এর যে শ্রেণিগত অবস্থান প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে সেটি Alexopoulous (১৯৬২) কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে।

বর্গ : Blastocladiales

এ বর্গে জলজ ও স্থলজ উভয় শ্রেণিরই ছত্রাক রয়েছে। এদের কিছু সংখ্যক পরজীবী (জলজ প্রাণীর উপর বা ছত্রাকের উপর) বা মৃতজীবী (জলজ পচা কাঠের উপর) বা পানির তলদেশের মাটিতে বাস করে। ছত্রাকগুলো সূত্রাকৃতি বা প্রায়ই সুগঠিত মাইসেলিয়ামযুক্ত। এ বর্গের ছত্রাকে সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান। অঙ্গজ দেহকে গ্যামেটোফাইট বলে। এগুলো হতে প্ল্যানোগ্যামেটিক অ্যানাইসোগ্যামেট উৎপন্ন হয়। কাজেই প্ল্যানোগ্যামেটিক অ্যানাইসোগ্যামি জননের ফলে ডিপ্লয়েড স্পোরোফাইট উৎপন্ন হয়, এখানে অবৃন্ত রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়। হ্যাপ্লয়ড ও ডিপ্লয়ড চলরেণু ভিন্ন ভিন্ন রেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয় এবং এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে হ্যাপ্লয়ড ও ডিপ্লয়ড থ্যালাস দেয়।

গোত্র : Blastocladiaceae

এ গোত্রের ছত্রাকগুলো রাইজয়ডের সাহায্যে অবস্থানের উপর লেগে থাকে। এ থ্যালাসগুলোকে অনেক সময় খালি চোখেই দেখা যায়। অঙ্গজ দেহের প্রকৃত হাইফিগুলো বিপাকীয় কাজ যেমন করে তেমনি শাখায় জনন অঙ্গও বহন করে। ভিন্ন ভিন্ন জননকোষাধারে বড় ও ছোট এক-ফ্লাজেলাযুক্ত গ্যামেট উৎপন্ন হয়। প্লাজমোগ্যামি বা গ্যামেটের মিলন থ্যালাসের বাইরে হয়ে থাকে এবং পরপরই ক্যারিওগ্যামি হয়ে থাকে। ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট উৎপন্ন হয় এবং অঙ্কুরিত হয়ে স্পোরোথ্যালাস দেয়। ডিপ্লয়ড স্পোরোথ্যালাস হতে দু'ধরনের রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়। এদের কতকগুলোতে হ্যাপ্লয়ড চলরেণু উৎপন্ন হয় এবং অন্যগুলোতে ডিপ্লয়ড চলরেণু উৎপন্ন হয়। হ্যাপ্লয়ড চলরেণু অঙ্কুরিত হয়ে গ্যামেটোফাইট দেয়। অপরপক্ষে ডিপ্লয়ড চলরেণু অঙ্কুরিত হয়ে ডিপ্লয়ড স্পোরোথ্যালাস দেয় বলে জীবনচক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

প্রতীক গণ : ***Allomyces***

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Chytridiomycetes
বর্গ—Blastocladiales
গোত্র—Blastocladiaceae
গণ—*Allomyces*
প্রজাতি—*Allomyces javanicus* var. *macrogynus*

প্রকৃতি ও বসতি

Allomyces ছত্রাকের বিস্তার ও বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। এগুলো প্রধানত মাটি ও পানিতে নিমজ্জিত মৃত প্রাণীর উপর জন্মে থাকে। Ralph Emerson–এর গবেষণা কাজের ফলে এ গণের বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। *Allomyces* ছত্রাকটি হোমোথ্যালিক বা সহবাসী প্রকৃতির।

দৈহিক গঠন

অঙ্গজ দেহটি সোজা ও গুঁড়িসদৃশ। এটির মূলীয় অংশ আশ্রয়ের সাথে রাইজয়ডের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। হাইফার গুঁড়ি হতে দ্ব্যগ্র শাখান্বিত সরু ও অসংখ্য হাইফি–শাখা উৎপন্ন হয়। হাইফির শাখাগুলো মেকিপ্রস্থপ্রাচীর দিয়ে খণ্ডায়িত। এগুলো একটি নিয়মিত ব্যবধানে থাকে এবং সেলুলিনের স্থূল বলয়াকার হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো প্রকৃত প্রস্থপ্রাচীরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বয়স ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে প্রাণসত্তার প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। পুং–জননকোষাধার ছাড়া প্রাণসত্তা বর্ণহীন এবং এটির কমলা বর্ণযুক্ত।

যৌন জনন

Allomyces হোমোথ্যালিক। জনন কোষাধারগুলো জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়। অন্য কথায়, হাইফির শীর্ষভাগে পুং–ও স্ত্রী–জননকোষাধার একই সাথে সজোড়ভাবে উৎপন্ন হয়। পুং–জননকোষাধারটি আকারে স্ত্রী–জনন কোষাধার হতে ছোট। পুং–জননকোষাধারটি ক্যারোটিনের উপস্থিতির জন্য কমলা রঙযুক্ত ; কিন্তু স্ত্রী–জননকোষাধারটি বর্ণহীন। জননকোষাধার হতে এক–ফ্লাজেলাযুক্ত গ্যামেট নির্গত হয়। এ ফ্লাজেলাগুলো পিছন দিকে থাকে। তাছাড়া মুক্ত হবার সময় গ্যামেটোক্রিয়াল পৃষ্ঠে প্যাপিলা নামক উপাঙ্গ তৈরি হয়। পুং–গ্যামেটগুলো স্ত্রী–গ্যামেট হতে আকারে ছোট এবং প্রতিটি পুং গ্যামেটে একটি করে কমলা রঙের গ্লোবিউল কণা থাকে। বিষম গ্যামেটগুলো পানিতে মুক্ত হয়ে যুগলবন্দী হয় ও দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত জাইগোট তৈরি করে। এখানে প্লাজমোগ্যামি ও ক্যারিওগ্যামির মধ্যে কোনো বিরতি দেখা যায় না। সচল জাইগোটটি কিছু সময় সাঁতার কাটার পরই অবসর যাপনে চলে যায়। অবসরান্তে এটি অঙ্কুরিত হয়ে ডিপ্লয়ড থ্যালাস দেয়। একেই স্পোরোথ্যালাস বলে।

অযৌন জনন

স্পোরোথ্যালাসে দু'ধরনের রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়। এক ধরনের চলরেণুস্থলী বর্ণহীনও পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং অন্যটি মূলার ন্যায় বাদামি রঙযুক্ত, পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট ও সহনশীল। উভয় ধরনের চলরেণুস্থলী হতে এক–ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু উৎপন্ন হয়। যেসব চলরেণু পুরু প্রাচীরযুক্ত সহনশীল রেণুস্থলী হতে নির্গত হয় সেগুলো অঙ্কুরিত হয়ে হ্যাপ্লয়ড থ্যালাস দেয়। এগুলো পুং–ও স্ত্রী–জননকোষাধার সজোড়ভাবে উৎপন্ন করে। এসব চলরেণু মিওটিক বিভাজনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, পাতলা প্রাচীরযুক্ত চলরেণুস্থলী হতে ডিপ্লয়ড চলরেণু উৎপন্ন করে এবং এগুলো মুক্ত হয়ে অঙ্কুরিত হলে স্পোরোথ্যালাস দেয়। এরা পাতলা প্রাচীরযুক্ত চলরেণুস্থলী ও সহনশীল রেণুস্থলী বহন করে। এ নিয়ম অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে পারে। সাধারণত হ্যাপ্লয়ড থ্যালাস ও ডিপ্লয়ড স্পোরোথ্যালাস পালাক্রমে আবর্তিত হয়।

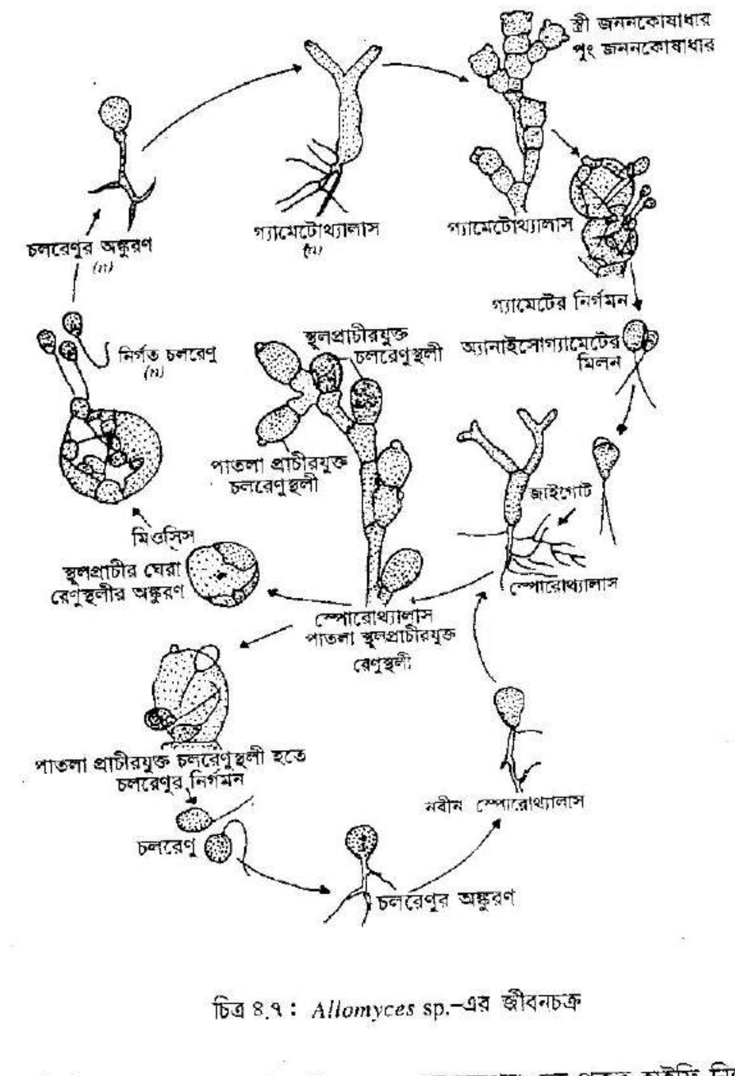

চিত্র ৪.৭ : *Allomyces* sp.–এর জীবনচক্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *Allomyces*–এর অঙ্গজ দেহ প্রকৃত হাইফি নিয়ে গঠিত। সম্ভবত এদের দেহকোষে বিপাকীয় কাজ ও জনন অঙ্গের ব্যাপারে শ্রমবিভাগ বিদ্যমান। *Allomyces* গণে সুনির্দিষ্ট জনুক্রম আছে ; আছে অ্যানাসোগ্যামীয় জনন। সেহেতু *Allomyces* গণ Chytrids হতে অধিকতর প্রাগ্রসর ও উন্নত।

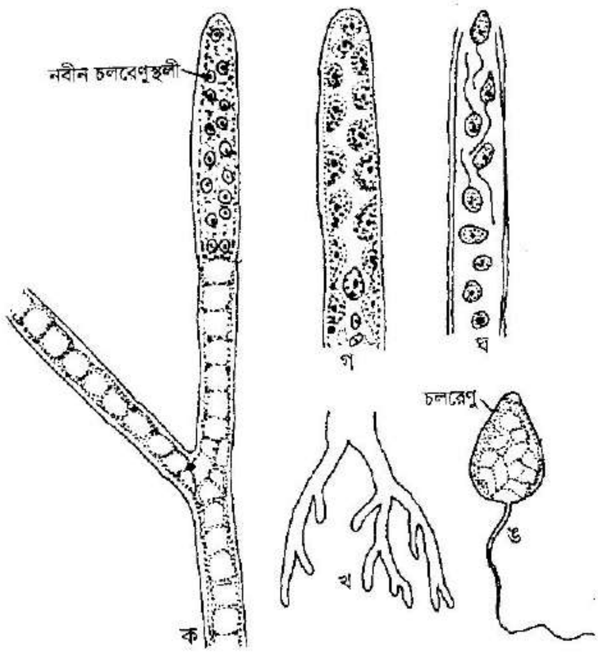

চিত্র ৪.৮ : *Monoblepharis* sp. অযৌন জনন। ক. শীর্ষ চলরেণুস্থলীসহ মাইসেলিয়ামের একাংশ ; খ. রাইজয়ডাল হাইফি ; গ. চলরেণুস্থলী ; ঘ. চলরেণুর নির্গমন ; ঙ. একটি চলরেণু

বর্গ : Monoblepharidales

এ বর্গটি গুটিকয়েক জলজ–মৃতজীবী ছত্রাক নিয়ে গঠিত। এদেরকে সাধারণত শীতকালে মৃত, পানি শোষিত অগভীর পানিতে নিমজ্জিত শান্ত পুকুরের পচনশীল ডাল–পালার উপর দেখা যায়। এগুলো লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে আশ্রয়ের ভিতর প্রবেশ করে। দেহজ গঠনে প্রকৃত মাইসেলিয়াম থাকে। হাইফি শাখান্বিত ও সিনোসাইটিক। প্রোটোপ্লাস্ট প্রচুর গহ্বরযুক্ত। শুধু জনন মৌসুমে যৌনাঙ্গের নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। সূত্রাকৃতির রেণুস্থলী হতে উৎপন্ন এক–ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে থাকে। ফ্লাজেলামাটি পিছনদিকে থাকে। যৌন জনন হেটারোগ্যামীয় এবং জনন কৌশলটি অনন্য সাধারণ। একমাত্র এ ছত্রাকগুলোই উগ্যামীয় এবং এখানে বৃহৎ, নিশ্চল ডিম্বাণুটি ছোট–আকারের এক–ফ্লাজেলাযুক্ত শুক্রাণু দিয়ে (পুং–প্ল্যানোগ্যামেট) নিষিক্ত হয়। এ ধরনের জনন সাধারণত অন্য কোনো ছত্রাকে দেখা যায় না।

এ বর্গে ৩টি গণ ও ১০টি প্রজাতি রয়েছে। গণ ৩টি হলো : *Monoblephais*, *Monoblepharalla* ও *Gonapodya* শেষোক্ত গণদ্বয় নিয়ে Gonapodyaceae গঠিত এবং Monoblepharidaceae–তে শুধু *Monoblepharis* গণটি রয়েছে। এ গণে কমপক্ষে ৭টি প্রজাতি রয়েছে।

গোত্র : Monoblepharidaceae

মাইসেলিয়াম সূত্রাকৃতি ও মৃতজীবী থ্যালাসটি রাইজয়ড দিয়ে আশ্রয়ের সাথে লেগে থাকে। হাইফিগুলো প্রস্থপ্রাচীরবিহীন এবং বর্ণহীন হলেও হালকা বাদামি আভাযুক্ত। প্রাণসত্তা গহ্বরবহুল। লম্বাটে রেণুস্থলীর একক ফ্লাজেলাম মাধ্যমে অযৌন জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যৌন জনন উগ্যামীয়। ডিম্বাণু আকারে বড় ও নিশ্চল। শুক্রাণুটি (পুং-প্ল্যানোগ্যামেট) আকারে ছোট ও এক-ফ্লাজেলাম যুক্ত। উগোনিয়ামের মধ্যে একটি ডিম্বাণু একটি সচল শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত হবার পরপরই এটি উগোনিয়ামের মুখ ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে আসে ও উস্পোরে পরিণত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগোনিয়ামের মধ্যেই উস্পোরের পূর্ণতা ঘটে। অঙ্কুরনল মাধ্যমে উস্পোরের অঙ্কুরণ হয়।

প্রতীক প্রজাতি : *Monoblepharis polymorpha*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota

উপবিভাগ—Eumycotina

শ্রেণি—Chytridimycetes

বর্গ—Monoblepharidales

গোত্র—Monoblepharidaceae

গণ—*Monoblepharis*

প্রজাতি—*M. polymorpha.*

প্রকৃতি ও বসতি

M. polymorpha-ছত্রাকটি জলজ ও মৃতজীবী। থ্যালাসটি নরম ও সিনোসাইটিক। রাইজয়ডের সাহায্যে আশ্রয়ের সাথে লেগে। প্রোটোপ্লাস্ট গহ্বরবহুল। এগুলো সাধারণত শীতকালে অধিক জন্মে থাকে।

দৈহিক গঠন

M. polymorpha-এর মাইসেলিয়াম সূত্রাকার ও একগুচ্ছ হাইফি নিয়ে গঠিত। হাইফিগুলো সিনোসাইটিক ও বহুল দ্ব্যগ্রভাবে শাখান্বিত। শীতকালে এগুলো রাইজয়ড হাইফির সাহায্যে (খ) পানিতে নিমজ্জিত মৃত ও পচনশীল কাষ্ঠ খণ্ডে এগুলো লেগে থাকে। হাইফির প্রাচীর শক্ত ও মজবুত এবং সেলুলোজের সাথে বিক্রিয়া করে। Hawker (১৯৬৭)-এর মতে প্রাচীর কাইটিনজাত। প্রোটোপ্লাস্ট গহ্বরযুক্ত ও ফেনিল। এ গহ্বরগুলোর অবস্থান খুবই নিয়মিত আকারবিশিষ্ট ও গঠনযুক্ত হয়ে থাকে। এগুলো অঙ্গজ দশায় প্রস্থপ্রাচীরবিহীন।

অযৌন জনন

অযৌন জনন সাধারণত ৮ থেকে ১২ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঘটে থাকে। রেণুস্থলী সরু ও লম্বাটে, অঙ্গজ হাইফির চেয়ে প্রশস্থ (বেড়) বেশি নয় ; আকৃতি বেলনাকার ও অবস্থান শীর্ষ অঞ্চলীয়। হাইফির শীর্ষাগ্রে এককভাবে উৎপন্ন হয়। হাইফির প্রান্তভাগ কিছুটা স্ফীত হয়ে রেণুস্থলী গঠন করে। এ সময় প্রাণসত্তা ও কেন্দ্রিকা এ অঞ্চলে এসে জমা হবার ফলে এ সামান্য স্ফীতিটুকু দেখা

দেয় (ক)। অল্প সময়ের মধ্যেই স্ফীত অংশটি প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে পৃথক হয় এবং রেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে। ক্লিভেজ মাধ্যমে রেণুস্থলীর কেন্দ্রিকাগুলো প্রাণসত্তাসহ পৃথক হয়ে অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট পরিণত হয় (গ)। প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট গোলাকার হয়ে বা পাইরিফর্ম এক-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণুতে পরিণত হয়। এ চলরেণুর পিছনদিকে একটি হুইপল্যাস ধরনের (অ্যাক্রোনেম্যাটিক) ফ্লাজেলাম থাকে (ঙ)। রেণুস্থলীর মধ্যে চলরেণুগুলো অ্যামিবয়ড চলন দেখায়। পরিণত রেণুস্থলীর শীর্ষাঞ্চলে দ্রবীভূত হয়ে গোলাকার ছিদ্রপথ তৈরি করে (ঘ)। আর চলরেণুগুলো এ ছিদ্রপথেই একে একে বের হয়ে আসে। প্রথম রেণুস্থলীর নিচে দ্বিতীয় রেণুস্থলীও উৎপন্ন হতে পারে। মুক্তিপ্রাপ্ত চলরেণুগুলো কিছু সময় সাঁতার কাটে এবং পরে ফ্লাজেলাম হারিয়ে কোনো উপযুক্ত আশ্রয়ে অবস্থান করে। এটি গোলাকার হয় এবং দুটি অঙ্কুরনল মাধ্যমে অঙ্কুরিত নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। একপার্শ্বীয় শাখার মতো হয়েও রেণুস্থলীর বিকাশ হয়। তাছাড়া, আন্তঃপ্রোলিফারেশন পদ্ধতিতেও রেণুস্থলীর বিকাশ হতে পারে।

যৌন জনন

Monoblepharis-এর যৌন জনন উগ্যামীয় এবং উচ্চ তাপমাত্রায় (20°C) ঘটে থাকে। যৌনাঙ্গগুলো (পুংধানী ও স্ত্রীধানী) হাইফির শীর্ষাগ্রে উৎপন্ন হয় (ক)। প্রজাতিভেদে এদের অবস্থানে বিভিন্নতা দেখা যায়। *M. polymorpha, M. fasciculata* ও *M. insiguis*-এ পুংধানী প্রান্তীয় এবং স্ত্রীধানী তার নিচেই একই হাইফিতে অবস্থান করে (খ)। বিকাশের সময় স্ত্রীধানী আকারে বড় হয় এবং প্রায় গোলাকৃতি হয় (চিত্র ৪.১১ খ-গ)। ফলে পুংধানীটি একদিকে সরে যায়। তাই এটিকে স্ত্রীধানীর পৃষ্ঠ হতে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। *M. sphaerica* ও *M. hypoggna*-তে স্ত্রীধানী প্রান্তীয় (চিত্র ৪.৯গ) ও পুংধানী তারই নিচে উৎপন্ন হয়। *M. macrandra*-তে পুংধানী ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন হাইফির শীর্ষাগ্রে উৎপন্ন হয়। (ঘ)। অবশ্য জননাঙ্গ তৈরির সূচনালগ্নে প্রান্তভাগটি স্ফীত হয়।

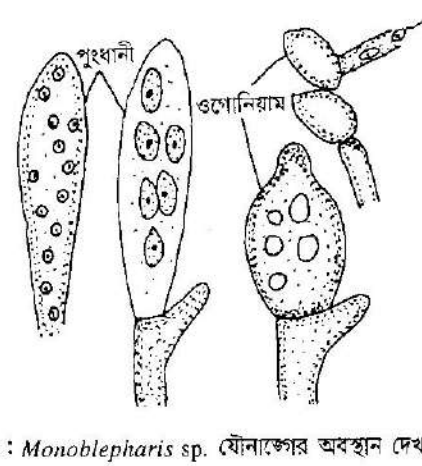

চিত্র ৪.৯ : *Monoblepharis* sp. যৌনাঙ্গের অবস্থান দেখানো হয়েছে

পুংধানী

পুংধানী লম্বাটে, সরু, কিছুটা ক্লাব-আকৃতির এবং হাইফির শীর্ষে অবস্থিত। এতে বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত প্রোটোপ্লাস্ট থাকে এবং প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে সহায়ক অনুসূত্র হতে পৃথক থাকে (চিত্র

৪. ১০খ)। পূর্ণতা ও পরিপক্বতা লাভের পথে এ প্রোটোপ্লাস্ট ৪ থেকে ৮টি পুং গ্যামেটে পৃথক হয়ে যায়। এ গ্যামেটগুলোর পিছনদিকে একটি করে ফ্লাজেলাম থাকে। ফ্লাজেলামটি হুইপল্যাস ধরনের এবং গ্যামেট হতে কয়েকগুণ বড়। এটিকে শুক্রাণু বলে। শুক্রাণুগুলো পরিণত হলে পুংধানী শীর্ষ-ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে (চিত্র ৪.১১গ)। সচল প্রকৃতির শুক্রাণুটি আকারে চলরেণু অপেক্ষা ছোট এবং অধিকতর অ্যামিবয়ড চলন প্রদর্শন করে।

স্ত্রীধানী

পুংধানীর প্রস্থপ্রাচীরের ঠিক নিচে হতেই ক্লাব-আকৃতির স্ত্রীধানী উৎপন্ন হয় (চিত্র ৪.১০খ)। এটি প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা পৃথক হয়ে যায়। এটি একক কেন্দ্রিকাযুক্ত। স্ত্রীধানীটি আকারে বড় ও গোলাকার হয়ে পূর্ণতা পায় (চিত্র ৪.১১ক)। পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্ত্রীধানীটি শুক্রাণু অপেক্ষা বহুগুণে বড় হয়। স্ত্রীধানীর প্রোটোপ্লাস্টগুলো কেন্দ্রের দিকে সরে এসে একটি এক-কেন্দ্রিকাযুক্ত গোলাকার উস্ফেয়ার গঠন করে (চিত্র ৪.১১গ)। এতে অনেকগুলো তেলবিন্দু থাকে। পরিণত স্ত্রীধানীর শীর্ষে ছোট আকারের একটি ছিদ্র তৈরি হয় (চিত্র ৪.১১খ)।

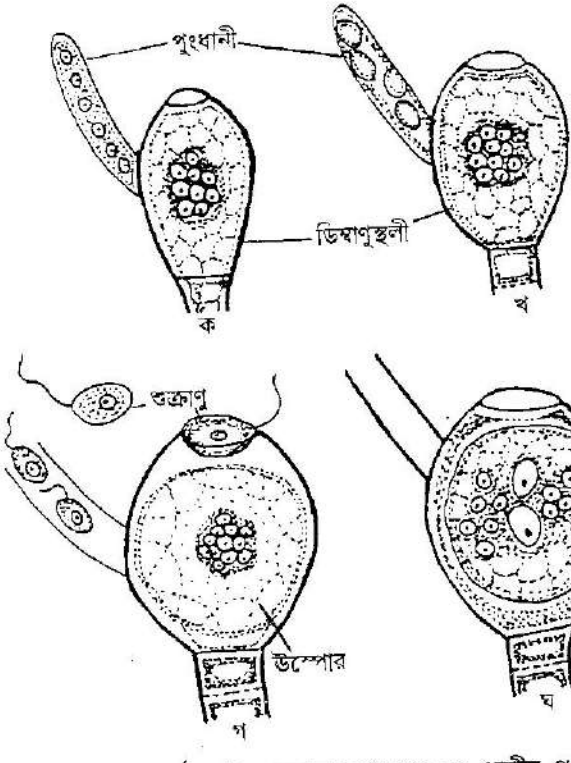

চিত্র ৪.১০ : *Monoblepharis* sp. যৌন জননের দশাসমূহ। ক. প্রান্তীয় পুংধানী ও উপপ্রান্তীয় স্ত্রীধানী; খ. স্ত্রীধানী স্ফীত হয়েছে এবং পুংধানী পাশে সরে গেছে; গ. শুক্রাণু মুক্ত হচ্ছে ও একটি স্ত্রীধানীতে প্রবেশ করছে; ঘ-নিষিক্ত ডিম্বাণুতে পুং স্ত্রী কেন্দ্রিকা পাশাপাশি এসেছে।

নিষেক

মুক্ত শুক্রাণুগুলো সাঁতার কেটে স্ত্রীধানীর নিকটবর্তী হয় এবং সংস্পর্শে এসে প্রাচীরের গা–বেয়ে শীর্ষ ছিদ্রের উপর আসে। একটি শুক্রাণু ক্ষেত্রে উস্ফেয়ার পাতলা প্রাচীরবেষ্টিত থাকে এবং নিষিক্তকরণ বিলম্বিত হয়।

উস্পোর বা জাইগোট

কিছু কিছু প্রজাতিতে নিষিক্ত ডিম্বাণুটি স্ত্রীধানীতেই থাকে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (*M. polymorpha*) নিষেকের কয়েক মিনিট পরেই নিষিক্ত ডিম্বাণুটি স্ত্রীধানীর শীর্ষ ছিদ্রের দিকে উঠে আসে এবং বের হয়ে পরিণত হতে থাকে (ঙ)। যাহোক, এটি স্ত্রীধানীর প্রাচীরে ছিদ্রের উপর লেগে থাকে। এখানেই পুং ও স্ত্রীকেন্দ্রিকার মিলন হয়। উস্পোর প্রাচীন পুরু হয় এবং ব্লিস্টারসদৃশ গঠনের উদ্ভব হয় (চ)। অতঃপর এটি খসে পড়ে *(M. poymorpha)* এবং কিছুকাল বিশ্রাম নেয়। এ সাথে খরা বা শীতও অতিক্রম করে। *M. pasciculala*–তে উস্পোর স্ত্রীধানীতেই কিছুকাল অবস্থান করে।

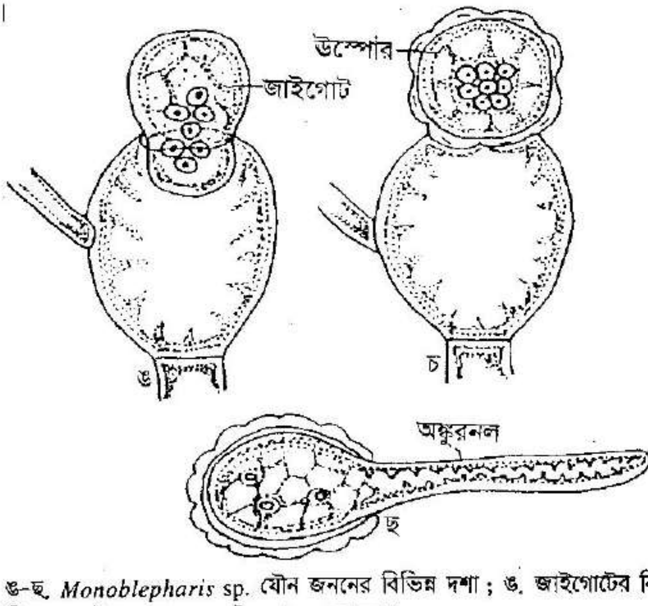

চিত্র ৪.১১ : ঙ–ছ. *Monoblepharis* sp. যৌন জননের বিভিন্ন দশা ; ঙ. জাইগোটের নির্গমন ; চ. বিশ্রামরত উস্ফেয়ার ; ছ. উস্পোরের অংকুরণ

মাঝে মধ্যে অপুংজনিকভাবেও জনন কাজ হয়ে থাকে। পার্থোরেণুটি মসৃণ প্রাচীরযুক্ত। এগুলো স্ত্রীধানীতে অবস্থান করে।

অনুকূল পরিবেশের আগমনে উস্পোর অংকুরিত হয় (জ)। উস্পোরের পুরু প্রাচীরটি ভেঙে যায়। ভাঙ্গন পথে একটি হাইফা বের হয়ে আসে ও নতুন মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়। অঙ্কুরিত হবার পূর্বে উস্পোর কেন্দ্রিকাটি মিওটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে ৪টি অপত্যকেন্দ্রিকা তৈরি করে (Laibach, ১৯২৭)। অতঃপর অপত্য কেন্দ্রিকাগুলো একবার বা দু'বার বিভাজিত হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্লাজমোডিওফোরোমাইসেটিস (Plasmodiophoromycetes)

সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের অন্তঃপরজীবী ও বাধ্যতামূলক পরজীবী ছত্রাকগুলো এ শ্রেণির আওতাভুক্ত। এগুলোর অঙ্গজ পর্যায়কে প্লাজমোডিয়াম বলে। এ ছত্রাকের জীবনচক্রের কোথাও ফলদেহ তৈরি হয় না। সোয়ার্ম কোষগুলো দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত, ফ্লাজেলাগুলো সামনের দিক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং আকারে অসমান। সোয়ার্ম কোষগুলো গতিশীল থাকার সময় বড় ফ্লাজেলামটি (হুইপল্যাস) পিছনে দাঁড় টানে এবং খাটো, ভোঁতাটির (টিনসেল) গাত্র মসৃণ (সরু শীর্ষবিহীন) ও সামনের দিকে সোজা নির্দেশিত থাকে। ঠিক যেন নৌকার হালসদৃশ। এরা সম্মুখপ্রান্ত থেকে পাশাপাশি উৎপন্ন হয়। এদের সম্পর্কটি হাল-বৈঠার মতো। যৌন জনন আইসোগ্যামীয়। যৌন সংশ্লেষ দুটি সচল সমাকৃতি হলেও বিপরীতধর্মী, গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ গ্যামেটগুলো বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত *(Plasmodium)*-এর ক্রমিক বিভাজনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ শ্রেণিতে Plasmodiophoreales নামে একটি বর্গ রয়েছে।

বর্গ : Plasmodiophorler

রেণুস্থলীর পরিবর্তে পোষক দেহের কোষে বিশ্রামরেণুগুলো তৈরি হয়। রেণুপ্রাচীরে কোনো সেলুলোজ থাকে না, কোনো ফলদেহও তৈরি হয় না। এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। একটি হচ্ছে : ক্রুসিফর্ম (Cruciform type) কেন্দ্রিকার বিভাজন এবং অন্যটি হচ্ছে অ্যাকরিওট (akaryote) দশা যাতে কেন্দ্রিকার উপস্থিতি আছে কিনা বোঝা মুশকিল। এ বর্গে রয়েছে ১টি গোত্র ; এর নাম তার Plasmodisphoraceae।

গোত্র : Plasmodiphoraceae

গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্গের অনুরূপ। এ গোত্রে রয়েছে ৮-৯টি গণ এবং এদের প্রতিটিই অন্তঃপরজীবী। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা পরিবাহী উদ্ভিদকে আক্রমণ করে থাকে। পোষকের মূলে এদের অবস্থানের জন্য মূলটি অস্বাভাবিকভাবে মোটা বা স্ফীত হয়ে যায় ; যাকে বলে hypertropy ও hyperplasia-এ গোত্রের সবচেয়ে বেশি পরিচিত গণ দুটি হচ্ছে *Plasmodiophora* ও *Spongospora, Plasmodiophora brassicae.* Cruciferae গোত্রীয় গাছপালা ও বাঁধাকপিতে 'club-root' রোগ (চিত্র ৫.১) সৃষ্টি করে। *Spongospora subterranea* আলুতে 'Powdery seals' রোগ সৃষ্টি করে। এ উভয় প্রজাতি এসব ফসলী গাছপালার ক্ষতির কারণ হয়।

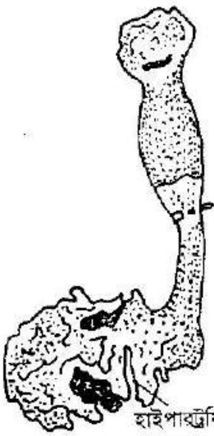

চিত্র ৫.১ : *Plasmodium* বাঁধাকপির Clubroot রোগ

প্রতীক প্রজাতি : *P. brassicae*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ— Mycota
উপবিভাগ— Eumycotina
শ্রেণি— Plasmodiophoromycetes
বর্গ— Plasmodiophorales
গোত্র— Plasmodiophoraceae
গণ— *Plarmodiophora*
প্রজাতি—*P. brassica*

প্রকৃতি ও বসতি

এ ছত্রাকটি বাধ্যতামূলক অন্তঃপরজীবী। এরা প্রধানত বাঁধাকপিজাতীয় উদ্ভিদের মূলে কলায় জীবন যাপন করে এবং মূলটির কলার কোষগুলোকে অস্বাভাবিক করে দেয় ; ফলে হাইপারট্রপি (hypertropy) রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগকে Clobrof বা *Fingztoe* রোগ বলে। এ রোগটি এখন সর্বজনবিদিত।

উদ্ভিদ দেহ

উদ্ভিদ দেহ প্রস্থপ্রাচীরবিহীন, নগ্ন ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্রোটোপ্লাজম পিণ্ডবিশেষ। কেন্দ্রিকা প্রাচীরবিহীন বলে প্রাণসত্তার মধ্যে অভিন্ন অবস্থায় থাকে।

জনন

ক. **অঙ্গজ :** পূর্ণতাপ্রাপ্ত *Plasmodia* ফিশান নিয়মে বিভক্ত হয়ে কিছু সংখ্যক অপত্য *Plasmodia* উৎপন্ন করে। এ প্রক্রিয়াটি অনুকূল পরিবেশে ঘটে থাকে।

খ. **অযৌন :** পোষক উদ্ভিদের মূল কোষের মধ্যে *Plasmodia* মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে রেণু তৈরি করে। এ রেণুগুলো খুব ছোট, গোলাকার ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত এবং কাইটিন প্রাচীরবেষ্টিত। পোষক উদ্ভিদ বা আক্রান্ত মূল মরে গেলে রেণুগুলো মুক্ত হয় এবং অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু তৈরি করে। এরা অন্য একটি পোষককে আক্রমণ করে। নতুন পোষকে চলরেণুটি হ্যাপ্লয়েড *Plasmodia* গঠন করে।

গ. **যৌন :** হ্যাপ্লয়েড *Plasmodium*-এর প্রতিটি কেন্দ্রিকা প্রাচীরযুক্ত হয়ে বহু সংখ্যক জননকোষাধার তৈরি করে। আবার এ জননকোষাধারগুলোর প্রতিটিতে প্রায় ৮টি করে আইসোগ্যামেট থাকে। এ গ্যামেটগুলো জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে। প্রতিটি জাইগোট তাদের ফ্লাজেলা হারিয়ে অ্যামিবাসদৃশ হয় এবং কেন্দ্রিকার বিভাজন মাধ্যমে ডিপ্লয়েড *Plasmodium*-এ পরিণত হয়।

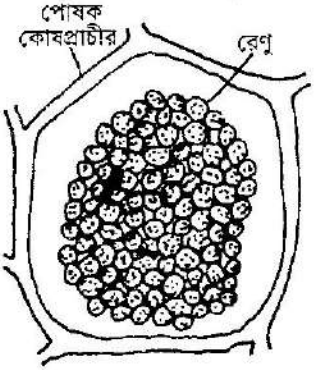

চিত্র ৫.২ : *Plasmaliophora* পোষক কোষে রেণু দেখানো হয়েছে

রোগলক্ষণ

আক্রান্ত মূলটির কোষগুলো অস্বাভাবিক গঠনযুক্ত হয়ে যায়। বাঁধাকপি ও তার নিকটতম গাছমূল আক্রান্ত হলে (একস্থানে) স্যান্ডেল-আকৃতিযুক্ত হয়ে যায়। এবং মালটিপল আক্রমণ হলে মাকুসদৃশ হয়। যদি সংক্রমণ প্রাথমিক অবস্থায় হয় তবে প্রধান মূলে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং একে chsbroot রোগ বলে। ফলে অন্য মূলের বিকাশ ব্যাহত হয়। আর সংক্রমণ দেরিতে হলে পার্শ্বীয় শাখা মূলে 'গল' তৈরি হয়। একে Finger and Toe রোগ বলে। দুপুরের দিকে পাতা ঝরে পড়া এ রোগের প্রথম লক্ষণ। অতঃপর এটি Wilteng ও বৃদ্ধি রোধকের রূপ নেয়।

জীবনচক্র

Plasmodiophora-এর জীবনচক্রে যেসব ধাপ লক্ষ্য করা যায় সেগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

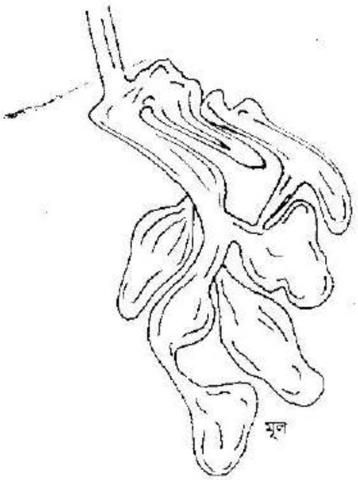

চিত্র ৫.৩ : *Plasmodiophora* sp.-এর হাইপারট্রফির জন্য স্ফীত মূল

১. রেণুর অঙ্কুরণ

P. brassicae–এর রেণু খুব ছোট, স্বচ্ছ, গোলাকার, এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও ৪ মিলিমাইক্রোমিটার ব্যাসযুক্ত। এ রেণুগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অঙ্কুরিত হতে পারে কিংবা মাটিতে দীর্ঘকাল অবসর যাপন করতে পারে। যদি পরিবেশ অনুকূল হয়, তবে এটি পরিবেশ হতে পানি শোষণ করে কয়েকগুণ আকারে বড় হয় (খ)। ফলে একসময় রেণু প্রাচীরে চিড় দেখা দেয়। এ চিড়পথেই এককেন্দ্রিকার প্রোটোপ্লাস্ট একটি সোয়ার্ম কোষরূপে বা চলরেণুরূপে বের হয়ে আসে। এ চলরেণুটি গোলাকার বা নাসপাতিসদৃশ আকৃতির হয় (ঘ)।

চিত্র ৫.৪ : *P. brassicae* বিশ্রামরেণুর অঙ্কুরণ

চলরেণুগুলো নগ্ন ও মুক্ত হবার পর কয়েক মিনিট খুবই সক্রিয় থাকে। Kole ও Geilink (১৯৬২) উল্লেখ করেন যে, মুক্ত চলরেণুর সামনের দিকে দুটি অসমাকৃতির হুইপল্যাস ফ্লাজেলা থাকে। বড়টির শীর্ষভাগে প্রান্ত খণ্ডিত থাকে ; কিন্তু তারই পাশের ছোট ফ্লাজেলামটি প্রান্তখণ্ডবিহীন। ছোট ফ্লাজেলামটি সামনের দিকে নির্দেশিত এবং বড়টি পিছনের দিকে নির্দেশিত থাকে যদি চলরেণুটির গতিশীল হয়।

২. সংক্রমণ

অসমাকৃতির দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু কিছু সময়ের জন্য মাটির উপর সামান্য জলবিন্দুর মধ্যে সাঁতার কাটে বা অ্যামিবাসদৃশ চলাচল করে। Ayers (১৯৪৪) এর মতে—এরা যখন উপযুক্ত মূলরোমের সংস্পর্শে আসে তখন ফ্লাজেলা হারিয়ে অ্যামিবাসদৃশ হয়। এমতাবস্থায় একে myxamoeba (ক$_{১}$) বলে। পোষক মূলরোমের প্রাচীর আংশিক দ্রবীভূত করে এটি মূলরোমে প্রবেশ করে (ক$_{২}$)।

৩. গ্যামেটোথ্যালাস (ক$_{৩}$)

পোষক কোষের লিউমেনের মধ্যে এককেন্দ্রিকাযুক্ত myxamoebaটি আকারে বড় হয়ে থ্যালাস তৈরি করে। প্রোটোপ্লাজম বৃদ্ধি পায় ও কেন্দ্রিকাটি ক্রুসিফর্ম বিভাজনের মাধ্যমে ছোঠ, নগ্ন, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত অন্তঃকোষীয় প্রোটোজম তৈরি করে থ্যালাস গঠন করে ; একে *Plasmodium* বলে। প্লাজমোডিয়াম হ্যাপ্লয়ড একক। একেই গ্যামেটোথ্যালাস বলে (ক$_{৩}$)। এ ধরনের অনেকগুলো থ্যালাস মূলরোমের মধ্যে থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে এরা মিলিত হয় না।

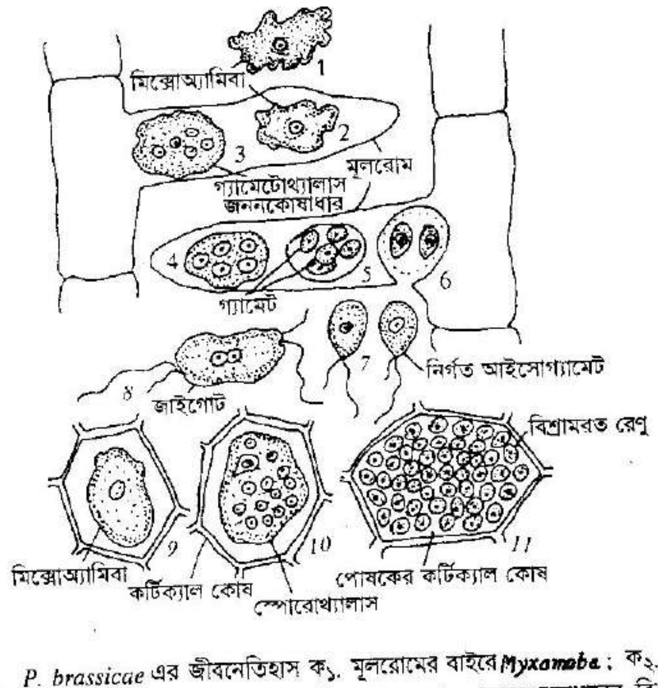

চিত্র ৫.৫ : *P. brassicae* এর জীবনেতিহাস ক$_{১}$. মূলরোমের বাইরে ***Myxamobe*** ; ক$_{২}$. মূলরোমের মধ্যে *myxamobe* ; ক$_{৩}$. গ্যামেটোথ্যালাস ; খ$_{৪}$. জননকোষাধারের বিকাশ ; খ$_{৫}$. জননকোষাধারে গ্যামেটের বিকাশ ; খ$_{৬}$. গ্যামেটের নির্গমন ; গ$_{৭}$. মুক্ত আইসোগ্যামেট ; ঘ$_{৮}$. মিলিত গ্যামেট ও জাইগোট ; ঙ$_{৯}$. মিরামেটি *myxamoesl* ; চ$_{১০}$. স্পোরোথ্যালাস ; ছ$_{১১}$. বিশ্রাম রেণু

৪. যৌন জনন

গ্যামেটোথ্যালাস যৌন জননের মাধ্যমে বংশরক্ষা করে থাকে। কিছু সময়ের জন্য অঙ্গজ বৃদ্ধি চলে ও মূলরোমের মধ্যেই অবস্থান করে। এসময় এটি বিভক্ত হয়ে বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত অপত্য-প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি করে (খ৪)। প্রতিটি অপত্য-প্রোটোপ্লাস্ট একটি প্রাচীর নিঃসৃত করে জননকোষাধার রূপে কাজ করে (খ৫)। জননকোষাধার আকারে ছোট, গোলাকার, পাতলা প্রাচীণযুক্ত ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত। জননকোষাধারের হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে ৪টি থেকে ৮টি অপত্যকেন্দ্রিকা গঠন করে (খ৫)। প্রতিটি অপত্যকেন্দ্রিকা কিছুটা প্রাণসত্তা তাদের চারদিকে নিয়ে মাকুসদৃশ, সচল, দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত আইসোগ্যামেট তৈরি করে। এ গ্যামেটগুলোতে কোনো কোষপ্রাচীর থাকে না ; এগুলো নগ্ন থেকে গ্যামেটোথ্যালাস আইসোগ্যামেট তৈরি হতে প্রায় ২ থেকে ৮ দিন সময় লাগতে পারে। জননকোষাধারের পাতলা প্রাচীরটি বিদীর্ণ হয় এবং মূলরোম-কোষের মধ্যে মুক্ত হয়।

জাইগোট : মুক্ত হবার পর আইসোগ্যামেটগুলো জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড, ফ্লাজেলাযুক্ত, এক-কেন্দ্রিকাযুক্ত জাইগোট তৈরি করে (ঘ৮)। এগুলোকে সাধারণত মূলের ত্বকীয় কোষাঞ্চলে দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্যামেটের মিলন মূলরোমের কোষমধ্যে হয় না, ত্বকীয় কোষে প্রবেশের পর হয়—এ তথ্য আজও সুস্পষ্ট হয় নি। অধিকাংশ বিজ্ঞানী যে মতটি সমর্থন করেন তা হলো—গ্যামেটগুলো পোষক-মূলরোমের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। আর এগুলো জননকোষাধার ও পোষক প্রাচীরের স্পর্শস্থানে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র তৈরি হয় তার মাধ্যমে বাইরে আসে (খ৬)। কাজেই, মুক্ত গ্যামেটগুলো পোষক কোষের বাইরে জোড়া বাঁধে ও মিলিত হয় (গ-ঘ)। জাইগোটটি পুনঃমূলে সংক্রমিত হয় ; একে তখন myxamoeba বলে (ঙ৯)। এই myxamoeba কোষটি পোষক কোষমধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

৫. স্পোরোথ্যালাস (৫.৫১০)

মিক্সোমেবিয়ার ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি বার বার বিভক্ত হয়ে তুলনামূলকভাবে বড়, লগ্ন, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্লাজমোডিয়াম গঠন করে (ক১০)। এ ডিপ্লয়েড প্লাজমোডিয়ামকে *স্পোরোথ্যালাস* বলে। পূর্ণ ও পরিণত হলে এগুলো আক্রান্ত সমগ্র পোষক কোষের লিউসেন দখল করে নেয় এবং পোষক কোষের কেন্দ্রিকার চারপাশে জমায়েত হয় (চিত্র ৫.৬ক)।

আক্রান্ত পোষক কোষে মিক্সোমোবিয়ার উপস্থিতির ফল তাৎক্ষণিক, কিন্তু প্রতিবেশী কোষে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট। আক্রান্ত কোষটি অস্বাভাবিকরূপে বড় হয়। কোষের এরূপ পরিবর্তনকে হাইপারট্রফি বলে। আক্রান্ত কোষের স্ফীতিকার কোষের বার বার বিভাজনের ফলেই হয়ে থাকে। এ ধরনের কোষের মাত্রাতিরিক্ত বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধিকে হাইপারপ্লাসিয়া বলে। পোষক কোষের বিভাজনের সাথে সাথে প্লাজমোডিয়ামেরও বিভাজন হয় যাতে প্রতিটি অপত্যকোষে এদেরও উপস্থিতি থাকে। ফলে প্লাজমোডিয়ামেরও অঙ্গজ জনন (খণ্ডায়ন) হয়ে থাকে। Woranin (১৮৭৮) এরূপ প্রতিটি হাইপারট্রফিও কোষকে Krankheitsherd বলে উল্লেখ করেন (চিত্র ৫.৬গ)। এ কোষগুলোর প্রতিটি কালক্রমে বিশ্রামরেণুর পিণ্ডে রূপান্তরিত হয় (ঙ)।

চিত্র ৫.৬ : *P. brassicae* স্পোরোথ্যালাসে (পোষককোষ)

চ. **ক্লাব গঠন :** ত্বকীয় কোষে প্লাজমোডিয়ামের উপস্থিতি কোষগুলোকে বিভাজনে সক্রিয় করে তোলে এবং আকারে বড় করে। তাছাড়া, প্রতিবেশী কোষগুলোকেও বার বার বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে। ফলে কন্দের মতো স্ফীতি দেখা দেয় ; এজন্যই মূলের কোষে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয় ও মূলটি মাকুসদৃশ হয়ে যায় এবং গলের সৃষ্টি করে ; একেই *ক্লাব-রোগ* বলে। ক্লাব–কলাগুলো সফ্ট–রট ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো রট–উৎপাদনকারী অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়। এগুলো ক্লাব-কলার পচন সৃষ্টি করে ও টক্সিক দ্রব্য নিঃসরণের ফলে গাছের বৃদ্ধিরোধ বা উইল্টিং রোগ হয়।

ছ. **বিশ্রাম রেণু গঠন** (স্পোরুলেশন) : ডিপ্লয়ড প্লাজমোডিয়াম পরিণত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে ত্বকীয় হাইপারট্রফিড কোষের সমগ্র লিওসেনে পরিব্যাপ্ত হয় এবং নতুন দশায় উপনীত হয়। এ সময় কেন্দ্রিকার উপস্থিতি শূন্য বলে মনে হয়। ক্রোমাটিনগুলো স্বাভাবিক রঙও গ্রহণ করে না। এটিই হলো akaryote দশা। অল্প সময় পরেই, কেন্দ্রিকার আবির্ভাব হয় এবং প্রাণসত্তার খণ্ড প্রতিটি কেন্দ্রিকার চারপাশে জমা হয়। এভাবেই সমগ্র প্লাজমোডিয়ামটি বহুসংখ্যক ছোট ছোট এক--কেন্দ্রিকাযুক্ত গোলাকার ও স্বতন্ত্র গঠনে রূপান্তরিত হয়। প্রাচীরটি মসৃণ ও কাইটিনাস, কিন্তু সেলুলোজবিহীন। এগুলোয় বিশ্রাম রেণু (ঙ)। এগুলো রেণুর প্রতিটি আলাদা আলাদাভাবে অবস্থান করলেও একসঙ্গে পোষক কোষপ্রাচীরের মধ্যে থাকে। এরূপ বলা হয় যে, রেণু তৈরির সময় মিওটিক বিভাজন ঘটে। সফ্টরট অণুজীব দ্বারা ক্লাবটির পচন ঘটে রেণুগুলো মাটিতে যুক্ত হয়। এসময় যদি প্রতিকূলতা থাকে তবে রেণুপ্রাচীর তা সহ্য করতে পারে। আবার যদি অনুকূল পরিবেশ পায়, তবে অঙ্কুরিত হয়ে চলরেণু দেয়।

প্লাজমোডিওফোরার কোষতত্ত্ব

Mclean ও Cook (১৯২৮) প্লাজমোডিয়ামের ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকার একটি অদ্ভুত ও কৌতূহলজনক বিভাজনের ধারাবাহিক বর্ণনা দেন। তাঁরা এ বিভাজনের নাম দেন

প্রোটোমাইটোসিস বা ক্রুসিফর্ম বিভাজন। এ বিভাজনকালে কেন্দ্রিকাপর্দা অটুট থাকে ; এটির বিলুপ্তি ঘটে না। বিশ্রামরত কেন্দ্রিকায় ক্রোম্যাটিন দানা থাকে। এগুলো কেন্দ্রিকায় পরিধি অঞ্চলে বিন্যাসিত থাকে। প্রতিটি কেন্দ্রিকায় জালিকার উপস্থিতি স্বাভাবিক ; কিন্তু এখানে জালিকা শনাক্ত করা যায় না। কেন্দ্রিকার কেন্দ্রস্থলে পরিষ্কার স্বচ্ছ অঞ্চল দেখা যায় এবং এখানে একটি গোলাকৃতি গঠন থাকে ; একে karyosome বলে (কেন্দ্রিকাণু)। প্রোফেজ দশায় কেন্দ্রিকাটি অর্ধাচন্দ্রাকৃতি বলে মনে হয় এবং ক্রোমাটিনগুলো কেন্দ্রিকার পরিধিতে ঘনীভূত হয়। মেটাফেজ দশায় ক্রোমাটিনগুলো মধ্যাঞ্চলে জমা হয় ও ক্যারিওজোমকে আংটির মতো বলয়াকারে ঘিরে থাকে। এ সময় ক্যারিওজোমকে টেনে ধরে রাখে এবং মুগুরাকৃতি হয়। একে ক্রোম্যাটিনের বলয় ঘিরে থাকে এবং পাশ থেকে ক্রসের মত দেখায়। সেহেতু, এখানেও বিভাজনটি পূর্বের ন্যায় হয়ে থাকে। এনাফেজ দশায়, ক্রোম্যাটিন বলয় দুই বিপরীত মেরুর দিকে যেতে থাকে এবং এ সঙ্গে ক্যারিওজোম ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে যায়। বলয় ক্যারিওজোম হতে দূরে যাবার পূর্বেই প্রতিটি খণ্ড নিজ নিজ ক্রোম্যাটিন বলয় দ্বারা আবৃত হয়ে মেরু ভিমুখে যাত্রা করে। টিলোফেজ দশায়, প্রতিটি মেরুতে একটি করে ক্রোম্যাটিন বলয়াবৃত ক্যারিওজোম খণ্ড থাকে। এ দশায় কেন্দ্রিকাপর্দা মধ্যবর্তীস্থানে সঙ্কোচিত হয়। প্রজাতিভেদে এ সঙ্কোচনের ধরন বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। শেষপর্যন্ত মাতৃকেন্দ্রিকাটি দুটি অপত্যকেন্দ্রিকায় ভাগ হয়ে যায়।

কেন্দ্রিকার আচরণ সম্পর্কে ঐ একই লেখক এক মজার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, প্লাজমোডিয়ামের ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি রেণু তৈরির সময় একটি বিশেষ ধরনের দশার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। এ দশাটিকে *অ্যাক্যারিওটিক* দশা বলে। এই দশায় কেন্দ্রিকা উধাও হয়ে যায় বলে মনে হয়। এগুলোকে তখন প্রাণসত্তায় স্বচ্ছ অঞ্চল (Clear zone) বলে অনুমিত হয়। সম্ভবত ক্রোমাটিনগুলো এসময় রঙ গ্রহণ করতে পারে না। অল্প কিছু সময় পরেই তথা মিওটিক প্রোফেজ দশার সূচনাতেই কেন্দ্রিকার আবির্ভাব ঘটে। মিওটিক বিভাজন সম্পন্ন হলেই ক্লিভেজ মাধ্যমে রেণু তৈরি হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Plasmodiophora brassicae ও *Spongophora subterranea* প্রজাতিদ্বয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে ; কেননা, এরা ফসলী উদ্ভিদের রোগের কারণ হয়। প্রথমটি বাঁধাকপি ও অন্যান্য ক্রুসিফারে club-root রোগ এবং দ্বিতীয়টি আলুতে পাউডারি মিলডিউ রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এ উভয় প্রজাতিই মারাত্মক রোগের কারণ। S. subterranea fonastortii–তরমুজের রোগজীবাণু। এরা দ্বিবিধ ক্ষতির কারণ ; প্রথমত এরা ফসলের ক্ষতি করে এবং দ্বিতীয়ত মাটিকে দূষিত করে বহু বছর ধরে একই ফসলের অনাবাদযোগ্য করে রাখে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

সহনশীল ও নীরোগ বীজ ও দীর্ঘ শস্য *(long rotation)* আবাদ করা এ রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় পেন্টাক্লোরোনাইট্রোবেনজিন কিংবা মারকিউরিক বা মারকিউরাস ক্লোরাইড এলড্রিন। ভেপাস সোডিয়াম ডাইন্টিয়োকারামেট এবং টেট্রাক্লোরোনাইট্রো বেনজিন ব্যবহারে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এ রোগমুক্ত মাটিতে চারা রোপণ করেও রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

জনুক্রম

Plasmodiophora-এর জীবনেতিহাসে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায়। জাইগোট ও রেণু গঠনের পূর্বে ডিপ্লয়ড *Plasmodium* নিয়ে স্পোরোফাইটিক ফেজ এবং বিশ্রামরণু, চলরেণু, হ্যাপ্লয়ড plasmodium, জননকোষাধার ও আইসোগ্যামেট নিয়ে গ্যামেটোফাইটিক ফেজ গঠিত। এ জনুদ্বয়ের সন্ধিস্থলে মিওসিস (মিওরেণু গঠনকালে এবং ক্যারিওগ্যামি (জননকোষাধারের মিলনকালে) বিদ্যমান। এসব ঘটনালগ্নে জীবনচক্রের বিভিন্ন জনুর সূচনা হয়। মিওসিসের সাথে সাথে ডিপ্লয়ড বা স্পোরোফাইট দশার সমাপ্তি ঘটে ও গ্যামেটোফাইটিক দশার শুরু হয়। ক্যারিওগ্যামির সময় গ্যামেটোফাইট দশা শেষ হয় ও স্পোরোফাইট দশার সূচনা হয়। কেননা জাইগোটটি ডিপ্লয়ড।

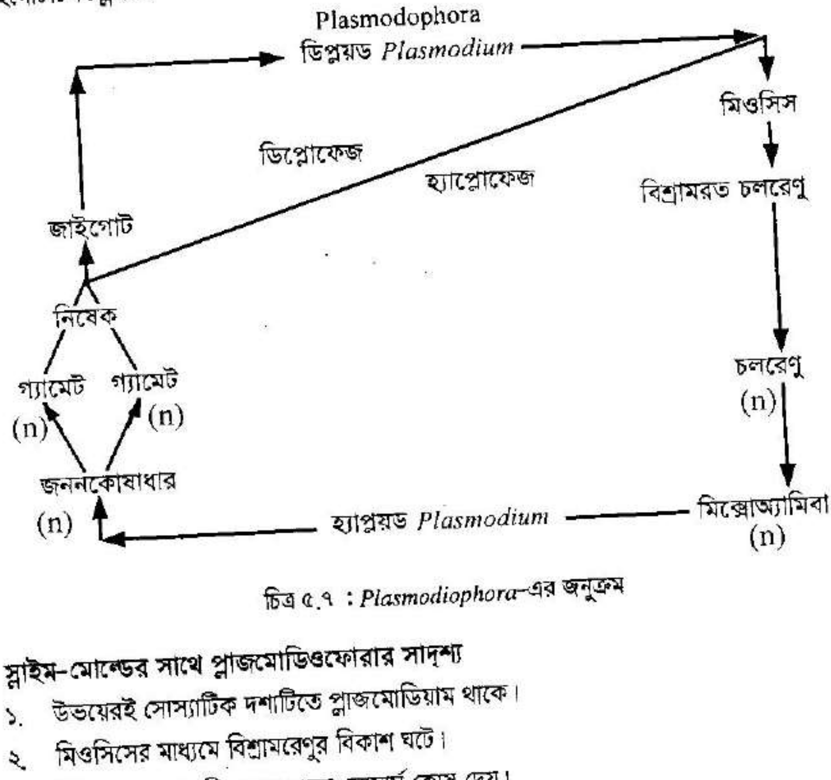

চিত্র ৫.৭ : *Plasmodiophora*-এর জনুক্রম

স্লাইম-মোল্ডের সাথে প্লাজমোডিওফোরার সাদৃশ্য

১. উভয়েরই সোস্যাটিক দশাটিতে প্লাজমোডিয়াম থাকে।
২. মিওসিসের মাধ্যমে বিশ্রামরেণুর বিকাশ ঘটে।
৩. বিশ্রামরেণু অঙ্কুরিত হয়ে সচল সোয়ার্ম কোষ দেয়।
৪. সোয়ার্ম কোষটি দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত এবং ফ্লাজেলাদ্বয় অসমান।

***Plasmodisphora* ও slime-mold-এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য**

১. এটি প্রকৃতিতে অন্তঃপরজীবী (Plasmodiophora)।
২. রেণু-বিকাশকালে ডিপ্লয়ড Plasmodiophora-এর কেন্দ্রিকাতে অদ্ভুত ধরনের বিভাজন রীতি বিদ্যমান (*cruciform*-বিভাজন ও *azygode*-দশা)। রেণুর কোষপ্রাচীর থাকে না।

৩. গ্যামেটের মিলন কৌশল।
৪. ফলদেহ-এর অনুপস্থিতি।

Plasmodiophora-কে কেন *Myxomycetes* ভুক্ত করা যায় না।

Schroeter ও Saccardo যদিও অন্তঃপরজীবী স্লাইম মোল্ডকে Myxomycetes ভুক্ত করেছেন—তবু Plasmodiophora-কে Sparrow (১৯৫৮–৫৯) ও Alexopulos (১৯৬২)-এরকে Plasmodiophoromyceter নামক অন্য একটি শ্রেণিভুক্ত করেছেন ; কেননা, এদের অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র এবং অন্য ছত্রাকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলো Myxomycetes-এর সাথে কিছুটা সদৃশ দেখালে ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে প্রচুর ; এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ফলদেহের অনুপস্থিতি, রেণুপ্রাচীরে সেলুলোজের অনুপস্থিতি, অন্তঃপরজীবী স্বভাব, গ্যামেট মিলনের ধরন, ক্রুসিফর্ম কেন্দ্রিকা বিভাজন, অ্যাক্যারিওটিক দশা, হ্যাপ্লয়ড Plasmodia-এর উপস্থিতি প্রভৃতি। এসব কারণে Plasmodiophora-কে Myxomycetes ভুক্ত না করে Plasmophoromycetes শ্রেণি ও Plasmodiophoraceae গোত্রভুক্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

ARDCC LIBRARY

ষষ্ঠ অধ্যায়
উমাইসেটিস
Oomycetes

Oomycetes শ্রেণিভুক্ত ছত্রাকগুলোর যৌন জনন উগ্যামীয়। এদের গ্যামেটগুলো দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত, পাইরিফর্ম বা বৃক্কাকার হয়ে থাকে। পাইরিফর্ম গ্যামেটের ফ্লাজেলা শীর্ষ অঞ্চলীয় এবং বৃক্কারগুলো পার্শ্বীয় হয়ে থাকে। ফ্লাজেলাদ্বয়ের একটি হুইপল্যাস ও অন্যটি টিনসেল ধরনের। চলরেণু সচল থাকার সময় প্রথমটি পিছনদিকে ও দ্বিতীয়টি সামনের দিকে নির্দেশিত থাকে। উভয় ধরনের চলরেণুই কোষপ্রাচীরবিহীন। দেহকাণ্ডে মাইসেলিয়াম প্রচুর ও সিনোসাইটিক। অঙ্গজ দশায় মাইসেলিয়াম প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হলেও জনন মৌসুমে জননাঙ্গের নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। হাইফির কোষপ্রাচীর কাইটিনের নয় বরং সেলুলোজের তৈরি।

সার্বিকভাবে, এ গোষ্ঠীর সদস্যগুলো প্রাগ্রসর অভিব্যক্তি দেখায়। এগুলো জলজ অবস্থা হতে স্থলজ অবস্থায় উত্তরণের প্রবণতা দেখায়। সবচেয়ে উন্নত ধরনের স্থলজ ছত্রাকটি পরজীবী প্রকৃতির। এরা বায়ুবাহিত অযৌন জননাঙ্গ রেণুস্থলী উৎপন্ন করে। রেণুস্থলীগুলো ঝরে-পড়া প্রকৃতি। ঝরে-পড়া রেণুস্থলীগুলো সাধারণত চলরেণু উৎপাদন করে না। অপরপক্ষে, এরা রেণুসদৃশ (কনিডিয়া) কাজ করে এবং অঙ্কুরিত হয়ে প্রথমে অঙ্কুরনল থেকে ঝরে-পড়া রেণুস্থলীগুলো চলরেণুস্থলীসদৃশ কাজ করেও চলরেণু উৎপন্ন করে জলজ পূর্বপুরুষের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

মাইসেলিয়াম

অঙ্গজ দশাটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটি সরল, এককোষীয় থ্যালাস বিকশিত, সূত্রাকৃতি মাইসেলিয়ামযুক্ত হতে পারে। মাইসেলিয়াম শাখাবহুল সিনোসাইটিক হাইফাযুক্ত। অনুসূত্রগুলো মাধ্যমের মধ্যে বা চারদিকে বৃদ্ধি লাভ করে। হাইফির কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ থাকে (Frey, ১৯৫০, Parker ১৯৬৩)। অবশ্য এ দ্রব্যটির প্রাধান্য বেশি নয় ; এতে গ্লুকান বা ম্যানান দ্রব্যও থাকে। প্রকৃতপক্ষে গ্লুকানেরই প্রাধান্য থাকে। অধিকাংশ প্রজাতিই ইউকার্পিক ও উভয় ধরনের ছত্রাকই অযৌন ও যৌনভাবে জনন কাজ চালায়। বৃদ্ধি মৌসুমে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ-রোগজীবাণুই বহুবার, ক্রমিকভাবে অযৌনভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যৌন জনন একবারই হয় এবং সম্ভবত বৃদ্ধি মৌসুমের শেষদিকে।

অযৌন জনন

Saprolegnia-এর মতো জলজ প্রজাতিগুলোতে চলরেণু মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। এ চলরেণুগুলো চলরেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। চলরেণুস্থলীগুলো অঙ্গজ হাইফির মতোই। উন্নত সদস্যগুলোতে রেণুস্থলী একটি নির্দিষ্ট অঙ্গবিশেষ। এদের বৈশিষ্ট্য সূচক আকার আছে, রেণুস্থলীধরের অগ্রভাগে উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলীধরটি সুগঠিত ও শাখান্বিত। রেণুস্থলীর মধ্যে চলরেণুগুলো প্রোটোপ্লাস্টের ক্লিভেজ মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং রেণুস্থলীর শীর্ষরন্ধ্রপথে এদের মুক্তি

শুরু হয়। কিছু কিছু প্রজাতিতে চলরেণুগুলো শীর্ষাঞ্চলে উদ্ভূত ভেসিকলের মধ্যে বিকশিত হয়। কেননা এ ভেসিকলের মধ্যে প্রোটোপ্লাস্টগুলো স্থানান্তরিত হয়। রেণুগুলো পূর্ণতা পাওয়ার সাথে সাথে ভেসিকলও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং চলরেণুগুলো মুক্ত হয়।

চলরেণুর আচরণ

প্রজাতিভেদে মুক্ত চলরেণুগুলো দুটি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ দেখায়—

১. অধিকাংশ মুক্ত চলরেণুগু কিছুসময় সাঁতার কাটে। অতঃপর ফ্লাজেলা গুটিয়ে নিয়ে গোলাকার হয় এবং পর্দাবৃত হয়ে বিশ্রাম নেয়। বিশ্রাম শেষে এগুলো অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। এ অঙ্কুরনল কালক্রমে নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়। এরূপ প্রজাতি হতে একই প্রকার চলরেণু উৎপন্ন হয় এবং সরাসরি অঙ্কুর-নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ দেয় ; এদেরকে মনোমরফিক বা মনোপ্ল্যানেটিক বলে। চলরেণুর এরূপ অবস্থা বা প্রপঞ্চকে মনোপ্ল্যানেটিজম বলে।

২. *Saprolegnia* ও *Leptolegnia*–এর মতো এ শ্রেণিতে কিছু কিছু সরল ও আদিম প্রকৃতি গণ রয়েছে যাদের চলরেণুগুলো মুক্ত হয়ে ভিন্নভাবে চমকপ্রদ আচরণ দেখায়। এ চলরেণুগুলো নাশপাতির আকৃতিসদৃশ ও দ্বিফ্লাজেলা যুক্ত ; ফ্লাজেলা সামনের দিকে থাকে ; এদেরকে প্রাথমিক চলরেণু বলে। এরা সামান্য সময়ের জন্য চলাচল করে। অতঃপর এরা বিশ্রামদশায় চলে যায়। এসময় এরা প্রাচীরাবৃত থাকে। এ প্রাচীরাবৃত চলরেণু অঙ্কুরনল মাধ্যমে অঙ্কুরিত না হয়ে দ্বিতীয়বার চলরেণু উৎপন্ন করে, এদেরকে গৌণ বা মাধ্যমিক চলরেণু বলে। প্রাথমিক চলরেণু হতে এদের পার্থক্য হলো : আকার-আকৃতি বৃক্কাকৃতি এবং পার্শ্বীয় দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত। সিস্ট হতে মুক্ত হয়ে চলরেণুগুলো বাংলা দ্বিতীয়বার সন্তরণকাল (Swimming period) এ যায়। অতঃপর প্রাচীরাবৃত হয়ে অবসর যাপন করে। প্রাচীরাবৃত মাধ্যমিক চলরেণু অঙ্কুর-নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে মাইসেলিয়াম দেয়। এসব গণ ও প্রজাতি পালাক্রমে দু'ধরনের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) চলরেণু উৎপাদন করে বলে, এদেরকে ডাইমরফিক বা ডাইপ্ল্যানেটিক বলে। এরূপ অবস্থা বা প্রপঞ্চকে ডাইপ্ল্যানোটিজম বলে যেসব উন্নত ও জলজ ছত্রাক চলরেণু তৈরি করে না, তাদের অ্যাপ্ল্যানেটিক বলে।

কনিডিওরেণুর অভিব্যক্তি

এ শ্রেণির বিভিন্ন প্রজাতি সরল রেণুস্থলী হতে রেণুসদৃশ কনিডিয়ামে ক্রমোত্তরণের উপর যে আলোকপাত করে তা খুবই চমকপ্রদ।

Saprolegnia–এ মতো জলজ প্রজাতিগুলো চলরেণুস্থলীর মধ্যে চলরেণু উৎপাদন করে জনন কাজ চালায়। *Pythum*–অনেক প্রজাতি কিছুটা স্থলজ স্বভাব-প্রকৃতির প্রবণতা দেখায়, কিন্তু ভেজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে জন্মায়। এগুলোও চলরেণু মাধ্যমে জনন কাজ চালায়। এ থেকে জানা যায় যে, ওরা মৌলিকভাবেই জলজ প্রকৃতির।

Phytophthoro ও *Pythium debarynum* প্রজাতি দুটি উভচর প্রকৃতির। এরা শুষ্ক ও ভেজা পরিবেশে বাস করার অভিযোজন জড়িত গুণযুক্ত। উভয় ধরনের হাইফিই চলরেণুস্থলী বহন করে ; কিন্তু ভেজা পরিবেশে চলরেণু উৎপন্ন করে। অপরদিকে পরিবেশ অনুকূল না হলে, তথা শুষ্ক ও উষ্ণ তাপমাত্রায় চলরেণুস্থলীগুলো ঝরে পড়ে। এগুলো চলরেণু উৎপাদনকারী চলরেণুস্থলীসদৃশ হলেও ভিন্নভাবে কাজ করে। এ ঝরে পড়া রেণুস্থলী অঙ্কুরণে কনিডিয়ামসদৃশ আচরণ দেখায়। এটি অঙ্কুরনল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

Plasmopara viticola-প্রজাতিটিও *Phytophthora*-এর মতো আচরণ দেখায়। *Pythium vexuns* ও অনুরূপ আচরণ দেখায়। কিন্তু *Pythium ultimum* ও স্থলজ Plasmopara-চলরেণুস্থলী উৎপাদন করে না ; বরং অযৌন জনন অঙ্গগুলো কনিডিয়ার মতো আচরণ করে।

Bremia ও *Perenospora*-এর রেণুস্থলীধর শাখাযুক্ত। প্রতিটি শাখায় একটি সরল স্টেরিগমা (*Perenospora*) বা বহুসংখ্যক স্টেরিগমা (*Brema*) থাকে। প্রতিটি স্টেরিগমা শীর্ষভাগে রেণুসদৃশ কনিডিয়াম থাকে।

আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, চলরেণুস্থলী হতেই কনিডিয়ার উদ্ভব হয়েছে এবং জলজ অবস্থা হতে স্থলজ অবস্থায় উত্তরণে অভিযোজনজনিত কারণে এমনটি হয়েছে।

যৌন জনন

কিছু কিছু ছত্রাক ছাড়া অধিকাংশই আদিম প্রকৃতির ছত্রাকগুলো হলোকার্পিক ও যৌন জনন উগ্যামীয়। যৌনাঙ্গকে যথাক্রম পুংধানীও স্ত্রীধানী বলে। এগুলো প্রান্তীয়ভাবে বা নিবেশিতভাবে উৎপন্ন হয়। যুগল গ্যামেটগুলো ফ্লাজেলাবিহীন। স্ত্রীধানীর প্রোটোপ্লাস্ট একটি বা একাধিক উস্ফেয়ার গঠন করে। পরিণত অবস্থায় ডিম্বাণু এককেন্দ্রিকাযুক্ত। সমগ্র প্রোটোপ্লাস্ট (*Saprolegnia*) উস্ফেয়ার গঠনে ব্যয়িত হয় বা কিছু অংশ অব্যবহৃত থাকে। অব্যবহৃত অংশ পরিধিস্তর গঠন করে পেরিপ্লাজম নামে পরিচিত হয়। এটি উস্ফোরের পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়।

পুংধানীর অবস্থান ও অবস্থিতির উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুটি গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় :

১. অ্যান্ড্রোগাইনাস ও

২. ডাইক্লিনাস।

প্রথমটি স্ত্রীধানীর বৃন্ত হতে পুংধানীর বিকাশ ঘটে বা এর শাখা হতে উদ্গত হয়। দ্বিতীয়টি স্ত্রীধানীর হাইফি হতে নয় বরং ভিন্ন একটি হাইফি হতে বিকাশ লাভ করে।.

সাধারণত প্লাজমোগ্যামি জননকোষাধারের সংশ্লেষ মাধ্যমে বা জননকোষাধার সংস্পর্শে ঘটে থাকে। এ সংঘটন নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে :

১. পূর্ণতাপ্রাপ্তিকালে পুংধানীটি স্ত্রীধানীর দিকে এগিয়ে যায়।

২. বিরল ক্ষেত্র, যেমন *Phytophthora*-তে স্ত্রীধানীটি বিকাশমান পুংধানী ভেদ করে শীর্ষভাগে চলে আসে ও গোলাকার গঠন তৈরি করে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে যে নিষেক প্যারাগাইনাস এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অ্যাম্ফিগাইনাস নিষেক হয়ে থাকে। নিষেকনল মাধ্যমে পুংকেন্দ্রিকাটি স্ত্রীধানীর ডিম্বাণু কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয় বা স্ত্রীধানীর প্রাচীরগাত্রের রন্ধ্রপথে স্ত্রীধানীতে পুংকেন্দ্রিকার স্থানান্তর হয়।

শ্রেণিবিভাগ

Sparrow (১৯৬০) Oomycetes শ্রেণিকে ৪টি বর্গে ভাগ করেন ; যেমন Saprolegniales, Leptomitales, Lagenidiales ও Perenosporalles। এ বর্গচতুষ্টয়ের মধ্যে Saprolegniales ও Perenosporales-অধিক পরিচিত। তাই এদের সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করা হলো। Webster (১৯৭০) ও Ainsworth (১৯৬৬)-এর শ্রেণিভাগও Sparrow-এর অনুরূপ।

বর্গ : Saprolegniales

এ বর্গভুক্ত ছত্রাকগুলো 'ওয়াটার মোল্ড' নামে সুপরিচিত। বাত্যাতাড়িত পানিতে এদের প্রাচুর্য দেখা যায়। এগুলো প্রোটিনসমৃদ্ধ আশ্রয়ে বেশি জন্মে থাকে যেমন-পিঁপড়ার ডিম, ডিমের সাদা অংশে, কীট-পতঙ্গের মরদেহ, মরা মাছ ও অন্য প্রাণী। সাধারণত Saproleginales-এর সদস্যগুলো আর্দ্র আবহাওয়া ও নিম্নতাপমাত্রায় ভাল জন্মে। কোনো কোনো প্রজাতি আবার আধাজলজ প্রকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মে থাকে। অধিকাংশ Saproleginales সদস্যই মৃতজীবী। তবে কিছু প্রজাতি পরজীবী হয়ে থাকে, এরা মাছ উভচর, পরিবাহী উদ্ভিদের মূলে আশ্রয় নিয়ে প্রভূত ক্ষতি করে। এ বর্গের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. শাখাবহুল মাইসেলিয়ামযুক্ত দেহগঠন।
২. মাতৃহাইফি হতে রেণুস্থলী বিশেষ পার্থক্য জড়িত নয়।
৩. ডাইপ্ল্যানেটিজম হতে পরিপ্ল্যানেটিজম দেখা যায়।
৪. অধিকাংশ প্রজাতিতেই সরু হাইফিসদৃশ পুংধানী দেখা যায়।
৫. স্ত্রীধানীতে এক বা একাধিক ডিম্বাণু থাকে।
৬. ডিম্বাণু তৈরিতে স্ত্রীধানীর সমগ্র প্রোটোপ্লাস্ট ব্যবহৃত হয়।
৭. প্যারাগাইনাস নিষেক। নিষেক নলের মাধ্যমে নিষেক হয়।

এ বর্গে ২০টি গণ ও ১৫০টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো ৩টি গোত্রের আওতাভুক্ত। এ গোত্রত্রয়ের মধ্যে Saprolegniaceae উল্লেখযোগ্য।

গোত্র : Saprolegniaceae

Saprolegniaceae গোত্রের ছত্রাক থ্যালাসবহুল শাখাযুক্ত, সিনোসাইটিক, হলোকার্পিক ও সুগঠিত মাইসেলিয়াম নিয়ে গঠিত। বহুল শাখান্বিত মাইসেলিয়ামের দুটি অংশ থাকে, যথা—

১. রাইজয়ডাল অংশ—এটি আঁকড়ে ধরে থাকার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর সংযুক্তিস্থানকে ইন্ট্রাম্যাট্রিক্যাল হাইফি বলে। এ অংশটি কিছুটা স্ফীত হয়।
২. অঙ্গজ মাইসেলিয়াম ইন্ট্রাম্যাট্রিকাল হাইফি হতে ক্রমশ সরু হয়ে এক্সট্রাম্যাট্রিক্যাল হাইফিতে পরিণত হয় বা অঙ্গজ মাইসেলিয়াম দেয়।

হাইফির কোষপ্রাচীর প্রধানত সেলুলোজনির্মিত। জনন অঙ্গের নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়ে জননাঙ্গকে অঙ্গজ মাইসেলিয়াম হতে পৃথক করে।

অযৌন জনন সাধারণত ডাইপ্ল্যানেটিক চলরেণু দ্বারা ঘটে থাকে। এ রেণুগুলো লম্বা, বেলনাকার চলরেণুস্থলীতে তৈরি হয়। এ রেণুস্থলীগুলো প্রান্তীয় হয়ে থাকে। এগুলো অঙ্গজ হাইফি হতে খুব একটা পৃথক নয়। এগুলো এক্সট্রাম্যাট্রিক্যাল হাইফির শীর্ষভাগ সামান্য স্ফীত হয়ে উৎপন্ন হয়।

প্রজাতিভেদে চলরেণুগুলোর আচরণে বিভিন্নতা দেখা যায়। *Saprolagnia, Achlya, Leptolegnia,* ও *Leptolegniella*-তে চলরেণুগুলো ডাইপ্ল্যানেটিক তথা, দুটো সচল দশাযুক্ত। *Pythiopsis, Thraustotheca* প্রভৃতিতে চলরেণুগুলো মনোপ্ল্যানেটিক। আবার *Dictynchus, Thraustotheca*-তে চলরেণুগুলো পলিপ্ল্যানেটিক। রেণুস্থলীয় প্রোলিফারেশন এ গোত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ডাইপ্ল্যানেটিজম ও পলিপ্ল্যানেটিজম হলো এ গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। অ্যাপ্ল্যানেটিক (*Aplanes* ও *Geolegnia*) আচরণও বিরল নয়।

স্ত্রীধানীতে এক বা একাধিক উস্ফেয়ার তৈরি হয় এবং কোনো পেরিপ্লাজম থাকে না। নিষেক নলের মধ্য দিয়ে গ্যামেটের পুংকেন্দ্রিকা স্ত্রীগ্যামেটে প্রবেশ করে। অধিকাংশ প্রজাতিই সহবাসী। অবশ্য কিছু কিছু প্রজাতি হেটারোথ্যালিকও হয়ে থাকে। এ গোত্রের সদস্যগুলোতে উস্পোর অঙ্কুরণের পূর্বে মিওটিক কোষ বিভাজন হয় (Schrader, ১৯৩৪)।

এ গোত্রের কয়েকটি গণ হলো—*Saprolegnia, Achlya, Leptolegnia, Dictynchus* ও *Geolegnia*. এদের মধ্যে *Saprolegnia* ও *Achlya* উল্লেখযোগ্য গণ।

প্রতীক গণ : *Saporlegnia*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Oomyctes
বর্গ—Saprolegniales
গোত্র—Saprolegniaceae
গণ —*Saprolegnia*
প্রজাতি—*S. litoralis*

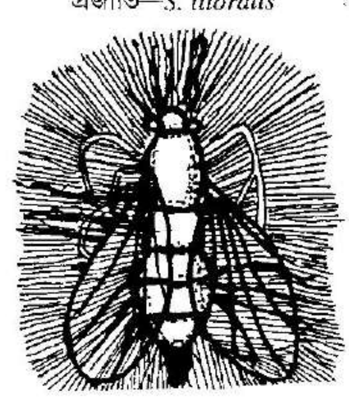

চিত্র ৬.১ : পানিতে মৃত মাছির উপর *Saprolegnia* sp.

প্রকৃতি ও বসতি

Saprolegnia একটি জলজ মৃতজীবী ছত্রাক। এটির প্রায় ৩০টি প্রজাতি রয়েছে। প্রজাতিগুলোর বেশিরভাগ ছত্রাকই পানিতে পচনশীল বিভিন্ন জৈব দ্রব্যের উপর বসবাস করে। কখনও কখনও মাছ, মাছের ডিম, মৃত মাছি, পোকা, অন্যান্য কীটপতঙ্গ, এমনকি উদ্ভিদের মৃত দেহাবশেষের উপর মৃতজীবীরূপে জন্মে থাকে। মাটির উপরের স্তরেও অনেক *Saprolenia* পাওয়া যায়। এদের কোনো কোনো প্রজাতি (*S. parasitica*) আহত মাছের ক্ষতস্থান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে স্যাপ্রোলেগনিয়াসিস রোগ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত লবণাক্ততা এটির বিস্তার রোধ করে (Teslrake, ১৯৫৯)। Harvey (১৯২৫) মাটিতে বসবাসকারী প্রজাতিও আবিষ্কার করেন। Tieben-hausen (১৯১২) আল্পস পর্বতশৃঙ্গের বরফাবৃত অঞ্চলে *Saprolegnia* জাতীয় প্রজাতি পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেন। আবাদ মাধ্যমে বা মৃত মাছি, আপেল খণ্ড প্রভৃতির উপর এগুলোর চাষ করা যায়।

দৈহিক গঠন

Saprolegnia র দেহ সিনোসাইটিক ও শাখাবহুল মাইসেলিয়াম নিয়ে গঠিত। হাইফিতে কোনো প্রস্থপ্রাচীর থাকে না। অবশ্য জনন মৌসুমে জননাঙ্গের ঠিক নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়ে জননাঙ্গকে অঙ্গজ হাইফি হতে পৃথক করে। আকার ও অবস্থানভেদে মাইসেলিয়ামের অনুসূত্রগুলো দু'ধরনের, যথা—

১. **রাইজয়ডীয় বা অন্তঃধাত্রকীয় হাইফি :** এগুলো আশ্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করে ও আকারে খাট। এগুলো পুষ্টির সাথে জড়িত।

২. **বহিঃধাত্রকীয় হাইফি :** এগুলো আকারে বৃহৎ ও আশ্রয়ের বাইরে বিস্তার লাভ করে এবং শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ হাইফিগুলো মাইসেলিয়ামের দৃশ্যমান অংশ গড়ে তোলে এবং জননাঙ্গ উৎপাদন করে (চিত্র ৬.২ ক)।

এসব হাইফি লম্বা, সরু, সিনোসাইটিক ও শাখাবহুল। হাইফিগুলোতে প্রস্থপ্রাচীর থাকে না ; তবে জননাঙ্গ গঠনকালে জননাঙ্গের ঠিক নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। হাইফির কোষপ্রাচীরে কাইটিন থাকে না, বরং সেলুলোজ থাকে। তাছাড়া গ্লুকান বা ম্যানান দ্রব্যও থাকে। প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে স্বল্পসংখ্যক গহ্বর, কিছু কিছু কেন্দ্রিকাযুক্ত পাতলা প্রাণসত্তা থাকে (ক)। তেলবিন্দু আকারে সঞ্চিত খাদ্য থাকে। মাইসেলিয়াম হলোকার্পিক ধরনের।

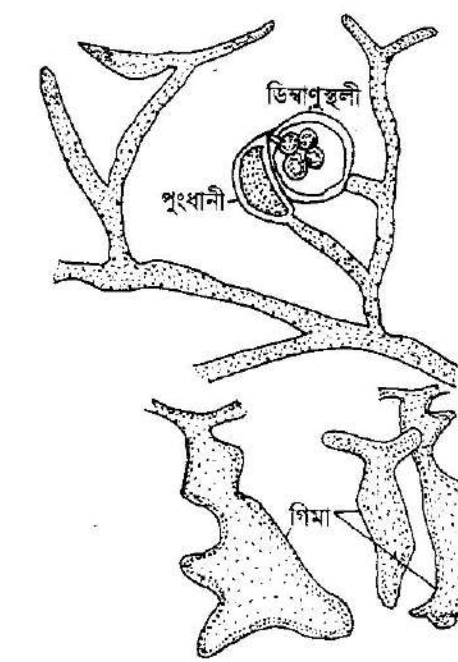

চিত্র ৬.২ : *Saprolegnia* sp. ক. হাইফিতে জননাঙ্গ ; খ. হাইফিতে গিমা

জনন

উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যের উপস্থিত, অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে *Saprolegnia* জনন অধ্যায়ে প্রবেশ করে এবং অযৌন ও যৌনভাবে জনন কাজ সম্পন্ন করে।

ক. **অযৌন জনন :** এ ধরনের জনন অঙ্গজ ও স্পোরুলেশন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

১. **অঙ্গজ পদ্ধতি :** *Saprolegnia*–খণ্ডায়ন ও গিমা উৎপাদনের মাধ্যমে নতুন মাইসেলিয়াম গঠন করে।

(১) **খণ্ডায়ন :** কোনো কারণে মাইসেলিয়াম বা হাইফিগুলো ভেঙে গেলে খণ্ডিত অংশগুলো কেন্দ্রিকার অবাধ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন হাইফি গঠনের মধ্য দিয়ে মাইসেলিয়াম গঠন করে।

(২) **গিমা গঠন** (চিত্র ৬.২খ) : এগুলো হাইফি শীর্ষদেশে গঠিত হয়। এগুলো এককোষী। হাইফির শীর্ষাঞ্চলে কিছু কেন্দ্রিকা, যথেষ্ট পরিমাণ প্রাণসত্তা ও সঞ্চিত খাদ্য জমা হলে কিছুটা স্ফীত হয় ; একেই গিমা বলে। অতঃপর এর নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় এবং এটি হাইফা হতে পৃথক হয়। এদের আকার–আকৃতিও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার বা অনিয়মিত আকৃতিবিশিষ্ট হতে পারে। এগুলো এককভাবে বা শৃঙ্খলাকারে উৎপন্ন হতে পারে। এগুলো পরিণত হলে মাইসেলিয়াম হতে খসে পড়ে এবং অঙ্কুরিত হয়ে নলাকার হাইফি দেয়। এটি কালক্রমে মাইসেলিয়ামের রূপ নেয়। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ গিমাগুলোকে ক্ল্যামাইডোরেণু বলে উল্লেখ করেছেন।

চিত্র ৬.৩ : *Saprolrgnia* sp. ক–ঘ. প্রাথমিক চলরেণুর বিকাশ ও মুক্তি ; ঙ. বিশ্রামরত প্রাথমিক চলরেণু ; চ. মাধ্যমিক চলরেণুর মুক্তি ; ছ. ক্রিয়াশীল মাধ্যমিক চলরেণু ; জ. বিশ্রামরত মাধ্যমিক চলরেণু ; ঝ. অঙ্কুরণ মাধ্যমিক চলরেণু ; ঞ. শূন্য প্রাথমিক চলরেণুস্থলীতে মাধ্যমিক চলরেণুর বিকাশ

২. স্পোরুলেশন

নাশপাতিসদৃশ, দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণুর উৎপাদন মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হয়। এগুলো লম্বা, বেলনাকার চলরেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। চলরেণুস্থলী অঙ্গজ হাইফির শীর্ষদেশে উৎপন্ন হয়। এ অঙ্গজ হাইফিকে চলরেণুস্থলীধর বলে শনাক্ত করা যায় না। চলরেণুস্থলীগুলো অঙ্গজ হাইফি হতে প্রস্থে সামান্য চওড়া।

১. চলরেণুস্থলীর বিকাশ

বহিঃধাত্রিকীয় হাইফিগুলোর শীর্ষদেশে লম্বা, নলাকার ও সামান্য বেলনাকার ও স্ফীত গঠন তৈরি হয়। এ গঠনকে চলরেণুস্থলী বলে (চিত্র ৬.৩ক)। এ তরুণ চলরেণুস্থলীর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটসত্তা ও বহুকেন্দ্রিকা থাকে। পরে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি করে এটিকে হাইফির অবশিষ্টাংশ হতে পৃথক করে দেয় (চিত্র ৬.৩খ)। অতঃপর পরিণত চলরেণুস্থলীটি সুগঠিত পাতলা প্রাচীরযুক্ত শীর্ষস্থল গঠন করে।

চলরেণুর বিকাশ

বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত বর্ণহীন প্রোটোপ্লাস্ট ক্লিভেজ পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে বহু এককেন্দ্রিকাযুক্ত চলরেণু উৎপন্ন করে (চিত্র ৬.৩ গ)। এককেন্দ্রিকাযুক্ত অপত্য-প্রোটোপ্লাস্ট গোলাকৃতি হয় এবং শেষে নাশপাতির আকৃতি ধারণ করে। এর শীর্ষদেশে দুটি সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফ্লাজেলাম থাকে; এদের একটি টিনসেল বা প্যানটোনেম্যাটিক ও অন্যটি হুইপল্যাস বা অ্যাক্রোনেম্যাটিক ধরনের। এসব নাসপাতি আকৃতির, দ্বি-ফ্লাজেলামযুক্ত ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত চলরেণুকে প্রাথমিক চলরেণু বলে। চলরেণুস্থলীর শীর্ষদেশে সৃষ্টি ছিদ্রপথে চলরেণুগুলো চারপাশের পানিতে মুক্ত হয় (চিত্র ৬.৩ খ)। চলরেণুস্থলীর আন্তঃচাপের ফলে অধিকাংশ চলরেণুই বের হয়ে আসে। যদি কিছু থেকে যায়, তবে সেগুলো ধীরে ধীরে একের পর এক বের হয়ে আসে। মুক্তিপ্রাপ্ত চলরেণুগুলো ২-৩ মিনিট (ingold) এবং ১-২ ঘণ্টা (Manton) সাঁতার কাটার পর বিশ্রাম নেয়। এসময় ফ্লাজেলা হারায় ও প্রাচীরাবৃত হয়। প্রাচীরটি নানা ধরনের অলংকরণযুক্ত হয় (Marfin ১৯৫১, Kole ও Gielink, ১৯৬২)। এ বিশ্রাম দশাটি কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। অবসর যাপনের পর প্রাচীরটি ভেঙে যায় এবং সমগ্র পদার্থ বৃক্কাকার মাধ্যমিক চলরেণু প্রাচীরগাত্রের সরু প্যাপিলার শীর্ষ দ্রবীভূত হয়ে সৃষ্ট ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে। এদের ফ্লাজেলা দুটি পার্শ্বীয়ভাবে সন্নিবেশিত থাকে (চিত্র ৬.৩ছ)। ভগ্নপ্রাচীরটি পড়ে থাকে। এ চলরেণুগুলো আকারে ছোট হলেও ফ্লাজেলার ধরন, কার্যকাল, অবসরযাপন প্রাথমিক চলরেণুর অনুরূপ (চিত্র ৬.৩জ)। বিশ্রামরত মাধ্যমিক চলরেণু অঙ্কুরিত হয়ে ছোট আকারের অঙ্কুরনল সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.৩ঝ)। এটিই পরবর্তী হাইফি এবং হাইফি হতে মাইসেলিয়াম দেয়।

Saprolegnia-তে পর্যায়ক্রমে দুবার সচলাবস্থা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক চলরেণু) দেখা যায়। এ ধরনের প্রজাতিকে ডাইমরফিক বলে। আর একই ছত্রাকে এ ধরনের চলরেণু উৎপন্ন হলে তাকে ডাইপ্ল্যানেটিজম বলে। আবার দুটি সচল অবস্থা বিশ্রাম দশা দ্বারা পৃথক হলে তাকে ডাইপ্ল্যানেটিক বলে।

চলরেণুস্থলীর প্রোলিফারেশন

প্রোলিফারেশনের উপস্থিতি *Saprolegnia*-এক অনন্য ও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও চলরেণুগুলো বের হয়ে যাবার পর শূন্য চলরেণুস্থলীর মূলীয় প্রস্থপ্রাচীর হতে মাধ্যমিক চলরেণুস্থলীর

২. **বিকাশ :** প্রধান হাইফি বা পার্শ্বীয় শাখার শীর্ষভাগ স্ফীত হয়। এটি বড় হয়ে গোলাকার হয়। প্রাণসত্তা ও বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকা এ অংশে এসে জমা হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ স্ফীতাংশের নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়ে একে মূল অংশ হতে পৃথক করে (খ)। একেই ডিম্বাণুস্থলী বলে। প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হবার সময় কেন্দ্রাঞ্চলের কিছু প্রাণসত্তা ও কেন্দ্রিকা বিলুপ্ত হয়ে কেন্দ্রীয় গহ্বর সৃষ্টি হয় (গ)। ফলে পরিধি অঞ্চলে গুটিকয়েক কেন্দ্রিকা অবশিষ্ট থাকে। এ কেন্দ্রিকাগুলো মাইটোটিক নিয়মে কয়েকবার বিভক্ত হয়। এর পর আবার বিলুপ্তির সূচনা হয় এবং মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট থাকে। এগুলো কিছু প্রাণসত্তাসহ ডিম্বাণুতে পরিণত হয় (ঘ,ঙ)। এটি বৃদ্ধি পায় ও গোলাকৃতি হয়। ডিম্বাণুস্থলীতে সমগ্র প্রোটোপ্লাজম ব্যবহৃত হয়ে যায় বলে এতে কোনো পেরিপ্লাজম থাকে না।

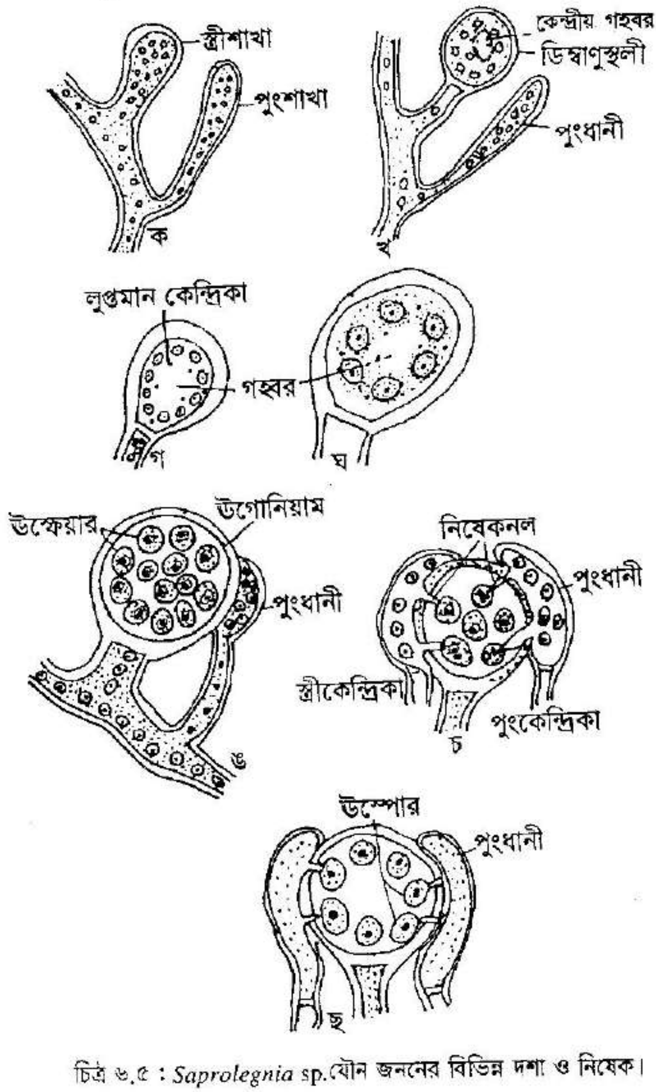

চিত্র ৬.৫ : *Saprolegnia* sp.যৌন জননের বিভিন্ন দশা ও নিষেক।

বিভাজন ঘটে (চিত্র ৬.৩ ঞ)। এটি বৃদ্ধি পায় ও শূন্য রেণুস্থলীর মধ্যে স্ফীত হয়ে মাধ্যমিক চলরেণুস্থলী তৈরি করে। এ পদ্ধতিটির বহুবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। যাহোক, এ চলরেণুস্থলীগুলোতে তৃতীয় ধরনে চলরেণু উৎপন্ন হয়। নিবেশিত ও ক্যাটেনিউলেট চলরেণুস্থলী কোনো কোনো প্রজাতি দেখা যায় ; উদাহরণ হিসেবে S. *torulosa*–এর উল্লেখ করা যায়।

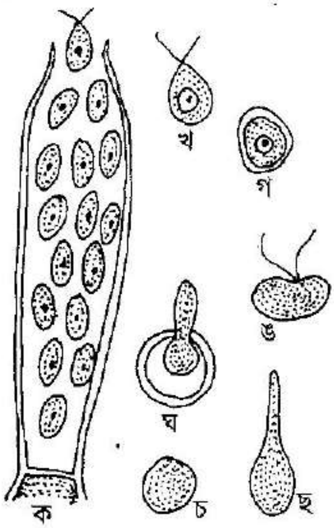

চিত্র ৬.৪ : *Saprolegnia* sp.চলরেণুর মুক্তি ও ডাইপ্ল্যানেটিজম

খ. যৌন জনন

Saprolegnia–এর যৌন জনন উগ্যামীয়। জননাঙ্গকে পুংধানী ও স্ত্রীধানী বলে ; অন্য কথায় শুক্রাণুস্থলী ও ডিম্বাণুস্থলী বলে। এগুলো অঙ্গজ হাইফির শীর্ষদেশে উৎপন্ন (ক)। এগুলো সাধারণত অঙ্গজ বৃদ্ধির প্রতিকূল ও যৌন জননের অনুকূল পরিবেশে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বেশিরভাগ প্রজাতিই সহবাসী বা হোমোথ্যালিক এবং কিছু প্রজাতি ভিন্নবাসী বা হেটোরোথ্যালিক হয়ে থাকে। হোমোথ্যালিক প্রজাতির যৌন জনন নিচে বর্ণনা করা হলো।

ডিম্বাণুস্থলী

১. **গঠন :** হাইফির শীর্ষাঞ্চলে বহুকেন্দ্রিকা ও সঞ্চিত খাদ্যসমৃদ্ধ প্রাণসত্তা স্থানান্তরিত হলে তা স্ফীত হয়ে গোলাকার গঠন তৈরি হয়। এর নিচের দিকে একটি প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হলে শীর্ষস্থ গোলাকার গঠনটি হাইফির বাকি অংশ হতে পৃথক হয়ে যায়। তখন এ স্ফীত গোলাকার গঠনটিকে ডিম্বাণুস্থলী বলে। এর মধ্যের কেন্দ্রিকাগুলো সমদূরত্বে অবস্থান করে। এবং প্রতিটি প্রাণসত্তাসহ এক একটি ডিম্বকে পরিণত হয়। ডিম্বাণুস্থলীর প্রাচীর কূপযুক্ত বা কণ্টকিত ও প্যাপিলাযুক্ত হতে পারে। ডিম্বকগুলো এককেন্দ্রিকাযুক্ত, গোলাকার ও গাঢ় কালচে রঙের হয়ে থাকে। প্রতিটি ডিম্বকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত খাদ্য তেলবিন্দুরূপে বর্তমান থাকে। এ তেলবিন্দুর অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বকগুলো সেন্ট্রিক (কেন্দ্রস্থলে থাকলে) বা একসেন্ট্রিক (একপাশে থাকলে) হয়ে থাকে। পরিণত ডিম্বাণুটি পেরিপ্লাজমবিহীন। প্রতিটি ডিম্বাণুস্থলীতে ৪ থেকে ১০টি, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩২টি নগ্ন ডিম্বক থাকে (ঙ)।

শুক্রাণুস্থলীর গঠন ও বিকাশ

১. **গঠন :** শুক্রাণুস্থলী লম্বা বা খাটো, সরু হাইফির শীর্ষভাগে উৎপন্ন হয়। একে বহনকারী হাইফিকে শুক্রাণুস্থলীধর বলে (ক)। এক বা একাধিক শুক্রাণুস্থলীধর ডিম্বাণুস্থলীর সাথে একই হাইফিতে বা পৃথক হাইফিতে উৎপন্ন হয়ে লম্বাকৃতি শুক্রাণুস্থলীগুলো ডিম্বাণুস্থলীর প্রাচীর স্পর্শ করে। একসাথে এক বা একাধিক শুক্রাণুস্থলী একটি ডিম্বাণুস্থলীর সাথে সংলগ্ন হতে পারে।

অবস্থানের ভিত্তিতে শুক্রাণুস্থলীগুলো দু'ধরনের, যথা–অ্যান্ড্রোগাইনাস ও ডাইক্লিনাস। পরিণত শুক্রাণুস্থলী সরু নলাকার, লম্বা ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত গঠনবিশেষ ও মূলীয় প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে হাইফির অন্যান্য অংশ হতে পৃথকীকৃত (চিত্র ৬.৫খ)। শুক্রাণুগুলোর মধ্যে কোনো সজ্জারীতি নেই এবং একটি শুক্রাণুস্থলীতে ১০ থেকে ১২টি কেন্দ্রিকা থাকে।

২. **বিকাশ :** শুক্রাণুস্থলীধরটি পার্শ্বীয় উপবৃদ্ধিরূপে উৎপন্ন হয়। এটি লম্বাটে হবার সাথে সাথে এর শীর্ষভাগটিও চওড়া হয়ে নলাকার বা অনিয়মিত স্ফীতাকার গঠন তৈরি হয়। এ স্ফীতাংশে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাণসত্তা সঞ্চিত খাদ্য ও বহু কেন্দ্রিকা এসে জমা হয়। অবশেষে একটি প্রস্থপ্রাচীর এর নিচে তৈরি হয়ে অবশিষ্টাংশ শুক্রাণুস্থলীধর হতে পৃথক করে। একে শুক্রাণুস্থলী বলে। এখানকার কেন্দ্রিকা ১ থেকে অসংখ্য বার মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়।

নিষেক

ডিম্বাণুস্থলী ও শুক্রাণুস্থলীর বয়োপ্রাপ্তির সাথে সাথে শুক্রাণুস্থলীটি ডিম্বাণুস্থলীর প্রাচীর স্পর্শ করে (চিত্র ৬.৫ঙ)। স্পর্শস্থানে শুক্রাণুস্থলীতে একটি সরু ও নলাকার উপবৃদ্ধির উৎপত্তি হয়। একে নিষেক নল বলে (চ)। নিষেকনলটি ডিম্বাণুস্থলীর প্রাচীর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে ও শাখাযুক্ত হয়। প্রতিটি শাখা এক একটি ডিম্বকের সাথে মিলিত হয়। কখনও কখনও প্রতিটি ডিম্বক ভিন্ন শুক্রাণুস্থলীর ভিন্ন নিষেকনলের সাথে মিলিত হয় (চিত্র ৬.৫ চ-ছ)। শুক্রাণুস্থলী হতে এক একটি করে সচল পুংকেন্দ্রিকা নিষেক নল ও এর শাখার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক একটি ডিম্বকের সংস্পর্শে আসে এবং ডিম্বককে নিষিক্ত করে। প্রতিটি নিষিক্ত ডিম্বক প্রাচীরাবৃত হয়ে ডিপ্লয়ড উস্পোরে পরিণত হয় (চিত্র ৬.৬ক)।

উস্পোরের অঙ্কুরণ

দীর্ঘসময় বিশ্রামের পর ডিম্বাণুস্থলীর প্রাচীরের পচন ও বিলুপ্তির ফলে উস্পোরগুলো মুক্ত হয়। এটি দুই হতে পাঁচ মাস নিষ্ক্রিয় থাকে। আবাদ মাধ্যমে উস্পোর অবমুক্ত হয় না। এগুলো ডিম্বাণুস্থলীতে অঙ্কুরিত হয় (চিত্র ৬.৭)। অঙ্কুর-নল বৃদ্ধি পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। অনুকূল পরিবেশের আগমনে নতুন আশ্রয়ে উস্পোরসমূহ অঙ্কুরিত হয়। এটি পানি শোষণ করে ফুলে উঠে। উস্ফোর প্রাচীর পাতলা হয় এবং একসময় প্রোটোপ্লাজমিক বস্তুগুলো নলাকার উপবৃদ্ধি আকারে প্রাচীর ঠেলে বের হয়ে আসে। এ নলাকার উপবৃদ্ধিকে অঙ্কুরনল বলে (খ)। অঙ্কুরণের সময় উস্পোরগুলো মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয় (Ziegles, ১৯৪৮, ১৯৫৩)। অঙ্কুরনল হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকাযুক্ত। অঙ্কুরনলের বৃদ্ধিকালে তা নিম্নোক্ত আচরণ দেখায় :

১. এটি সরাসরি মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়।

২. এটি স্ফীত হয়ে ক্লাব-আকৃতির অঙ্কুর রেণুস্থলী গঠন করে (চিত্র ৬.৬গ)। প্রান্তীয় অঙ্কুর রেণুস্থলীর নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়ে এটি বহনকারী মাইসেলিয়াম হতে পৃথক হয়। এখন

হতে দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু উৎপন্ন হয় (চিত্র৬.৬ঘ)। প্রতিটি চলরেণু (চিত্র ৬.৬ঙ) অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম তৈরি হয়।

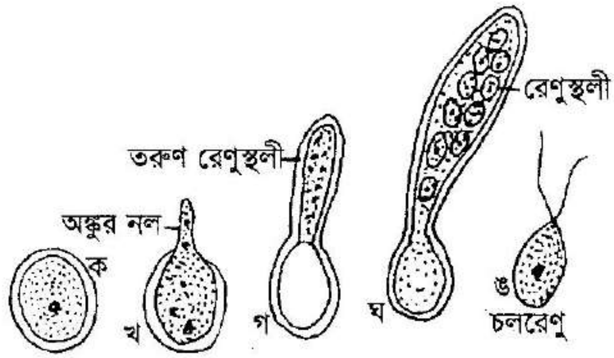

চিত্র ৬.৬ : *Saprolegnia* sp. এর উস্পোরের অঙ্কুরণ দশা

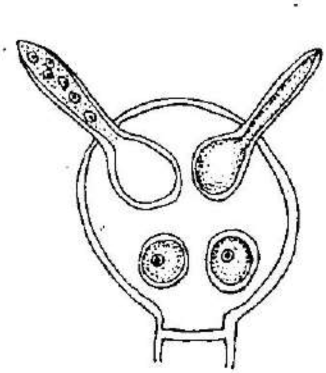

চিত্র ৬.৭ : *Saprolegnia* sp. ডিম্বাণুস্থলীতে উস্পোরের অঙ্কুরণ

Saprolrgnia-এর কোনো কোনো প্রজাতিতে ডিম্বক নিষিক্ত হতে ব্যর্থ হলে অপুংজনিকভাবে পার্থেনোরেণু উৎপন্ন করে। আবার *S. ferax*-এর শুক্রাণুস্থলী উৎপন্ন হয় না। এদের ডিম্বাণুস্থলীর ডিম্বকগুলো পার্থেনোরেণুতে পরিণত হয়। প্রতিটি পার্থেনোরেণু আপাতভাবে উস্পোরসদৃশ। এটি হতে অপুংজনিকভাবে মাইসেলিয়াম তৈরি হয়।

সম্প্রতি গবেষণায় জানা গেছে যে, উস্পোর অঙ্কুরিত হওয়ার প্রাক্কালে মিওটিক নিয়মে বিভাজিত হয় না ; বরং গ্যামেট তৈরির সময় হয়ে থাকে।

Saprolegnia-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. *Saprolegnia*-এর অধিকাংশ প্রজাতিই জলজ ও মৃতজীবী।

২. দেহ মাইসেলিয়াম যুক্ত। মাইসেলিয়াম সুগঠিত, সিনোসাইটিক ও বহুলশাখাবিশিষ্ট।

৩. মাইসেলিয়াম দু'ধরনের হাইফি নিয়ে গঠিত : রাইজয়ডীয় বা অন্তঃধাত্রকীয় হাইফি ও বহিঃধাত্রকীয় হাইফি।

৪. হাইফির কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ থাকে।

৫. খণ্ডায়ন, গিমা গঠন বা ক্ল্যামাইডোরেণুর মাধ্যমে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন হয়।

৬. অযৌন জনন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক চলরেণু দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এজন্য *Saprolegnia* কে ডাইমরফিক বলা হয়।

৭. প্রাথমিক চলরেণুগুলো লম্বা, বেলনাকার চলরেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। এ রেণুস্থলী এককভাবে অঙ্গজ হাইফির শীর্ষদেশে উৎপন্ন হয়। চলরেণু নাশপাতিসদৃশ, দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত ও এককেন্দ্রিকাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ফ্লাজেলা শীর্ষাঞ্চলীয়।

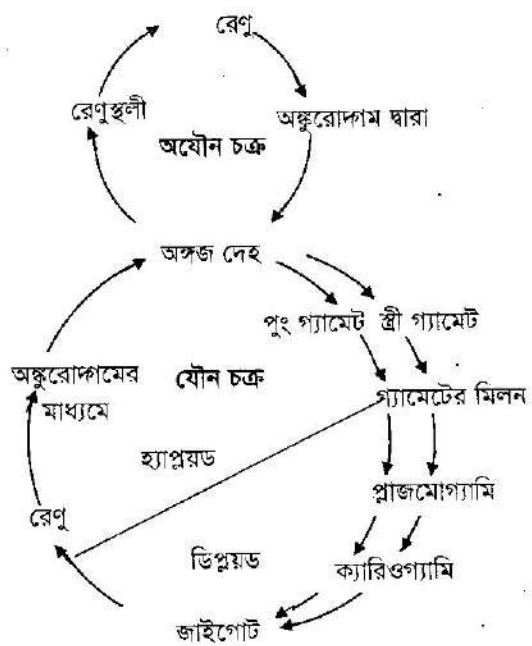

চিত্র ৬.৮ : *Saprolegnia*-এর জীবনচক্র

৮. প্রাথমিক চলরেণুগুলো অঙ্কুরনলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হওয়ার পরিবর্তে একটি বৃক্কাকার, দুটি পার্শ্বীয় ফ্লাজেলাযুক্ত মাধ্যমিক চলরেণু দেয়।

৯. মাধ্যমিক চলরেণুটি পূর্বেরটি মতো বিশ্রাম নিয়ে অঙ্কুরনলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় ও মাইসেলিয়াম দেয়। এ জন্যই *Saprolegnia* ডাইপ্ল্যানেটিক।

১০ জীবনচক্রে চলরেণুস্থলীর প্রোলিফারেশন বিদ্যমান।

১১. যৌন জনন উগ্যামীয়। *Saprolegnia* সহবাসী বা ভিন্নবাসী হতে পারে।

প্রতীক গণ : *Achlya*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Oomycetes
বর্গ—Saproleniales
গোত্র—Saprolegniaceae
গণ—*Achlya*
প্রজাতি—*A. bisexualis*

প্রকৃতি ও বসতি

Achlya ছত্রাকটি জলজ প্রকৃতির। এর বিস্তার ও বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। এটির প্রায় ৪৭টি প্রজাতি রয়েছে। এটির দুটি সাধারণ প্রজাতি হলো : *A. bisexualis* ও *A. racemosa Achlya*-কে সাধারণত জলাধার, পুকুর, নালা, ডোবা, অ্যাকুয়ারিয়াম প্রভৃতি জলজ পরিবেশের ভাসমান বীজ, মৃতপ্রাণী বা জৈব পদার্থের উপর জন্মে থাকে। আবাদ মাধ্যমেও এদের জন্মানো যায়।

চিত্র ৬.৯ : *Achlya* sp. হাইফির গঠন

দৈহিক গঠন

Achlya-র দেহ মাইসেলিয়াম দিয়ে গঠিত। মাইসেলিয়াম ইউকার্পিক, সরু, সূত্রাকৃতির, সিনোসাইটিক, বর্ণহীন ও বহু শাখাযুক্ত। হাইফিগুলো গোড়ার দিকে চওড়া ও সামনের দিকে ক্রমশ সরু। কিছু কিছু হাইফি খাটো ও গোড়ারদিকে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে হোল্ডফাস্টের ন্যায় আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে থাকে বা আশ্রয়ে প্রবেশ করে থাকে। হাইফির কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ থাকে ; তবে এটিই মুখ্য উপকরণ নয়। এটির সাথে গ্লুকান প্রধান উপাদান হিসেবে থাকে। পরিধি অঞ্চলে অসংখ্য কেন্দ্রিকা থাকে এবং মধ্যস্থলে থাকে গহ্বর।

জনন

Achly অযৌন ও যৌন উপায়ে জনন কাজ চালায়।

১. **অযৌন জনন :** অঙ্গজ ও স্পোরুলেশন পদ্ধতিতে অযৌন জনন কাজ হয়ে থাকে।

ক. **অঙ্গজ জনন :** *Saprolegnia*-এর মতই *Achlya*-খণ্ডায়ন ও গিমা বা ক্ল্যামাইডোরেণু গঠনের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন কাজ সমাধা করে। প্রতিকূল পরিবেশে ক্ল্যামাইডোরেণু বা

গিমা গঠিত হয়। এগুলো পুরু প্রাচীরযুক্ত ও খুবই ঘন প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ। এগুলো প্রান্তীয় বা নিবেশিত ধরনের। এগুলো এককভাবে বা শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। এগুলো প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার কাজে সহায়তা করে। ক্ল্যামাইডোরেণু সরাসরি চলরেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে এবং অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়।

খ. স্পোরুলেশন : এটি চলরেণুস্থলীর মধ্যে চলরেণু উৎপাদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। চলরেণুস্থলী লম্বা বেলনাকার, এককভাবে অঙ্গজ হাইফির শীর্ষদেশে উৎপন্ন হয়। হাইফির শীর্ষভাগ সামান্য স্ফীতির মাধ্যমে চলরেণুস্থলী গঠনের সূচনা হয় (চিত্র ৬.১০ ক)। হাইফির নিম্নাংশ হতে কেন্দ্রিকা ও প্রাণসত্তা এ অংশে এসে জমা হবার ফলে স্ফীত অংশটি আরও বড় হয়। একসময় স্ফীতির বৃদ্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে গোড়ায় প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় এবং এটি চলরেণুস্থলীরূপে পরিচিত হয় (চিত্র ৬.১০ খ)। চলরেণুস্থলীটি অঙ্গজ হাইফি হতে খুব একটি বৈশাদৃশ্যমূলক নয়। এটিকে শুধু ঘন প্রোটোপ্লাস্ট ও প্রস্থপ্রাচীরের জন্য পার্থক্য করা যায়। বহনকারী হাইফির চেয়ে এটি প্রশস্ততা সামান্য বেশি। চলরেণুস্থলীর উভয়প্রান্ত সামান্য চাপা। প্রোটোপ্লাস্টের ক্লিভেজ কেন্দ্রাঞ্চল হতে শুরু হয়। গহ্বর হতে পরিধির বহু কেন্দ্রিকা-বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাস্ট সূক্ষ্ম, আন্তঃছেদন ল্যাকুনি দ্বারা পলিগোনালভাবে খণ্ডিত হয় (চিত্র ৬.১০ গ)। চলরেণুস্থলী শীর্ষাঞ্চলে প্যাপিলাসদৃশ উপবৃদ্ধির বিকাশ ঘটে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের ফলে চলরেণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্ট পুনরায় সমসত্ত্ব হয়ে যায় (চিত্র ৬.১০ঘ)। অতঃপর এ প্রোটোপ্লাস্ট পুনরায় এক কেন্দ্রিকাযুক্ত অপত্য-প্রোটোপ্লাস্টরূপে বিকাশ লাভ করে (চিত্র ৬.১০ঙ)।

Haloker (১৯৬৭) উল্লেখ করেন যে, *A. racemosa*-তে প্রাণসত্তায় এলোমেলোভাবে ছড়ানো-ছিটানো বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকার বিন্যাসিতকরণের ফলে এককেন্দ্রিকা বিশিষ্ট অপত্য-প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি হয়। এটি ক্রম রূপান্তরিত হয়ে দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত প্রাথমিক চলরেণুতে পরিণত হয়। *Achlya*-এর যেসব প্রজাতি স্থলজ প্রকৃতির তাদের চলরেণুতে ফ্লাজেলা থাকে না। ফ্লাজেলাযুক্ত প্রাথমিক চলরেণুগুলো পাইরিফর্ম (Hawker ; ১৯৬৭) বা গোলাকার হতে পারে এবং ফ্লাজেলাদ্বয় শীর্ষাঞ্চলে যুক্ত থাকে তথা বৃক্কাকার ও পার্শ্বীয়ভাবে হেটারোকা- ফ্লাজেলাযুক্ত। নির্গত হবার পূর্বে এগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে থাকে।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত চলরেণুস্থলীর শীর্ষ প্যাপিলা দ্রবীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক চলরেণুগুলো গুচ্ছাকারে শীর্ষরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যায় (চিত্র ৬.১০চ)। বের হবার পরপরই এরা সাঁতার কাটা বন্ধ করে শূন্য রেণুস্থলীর ছিদ্রপথে ফাঁপা গোলক হয়ে জমা হয় ও প্রাচীরাবৃত হয় (চিত্র ৬.১১ক)। কাজেই *Achlya*-তে প্রথম সচল অবস্থার বিলুপ্তির প্রবণতা দেখা যায়। ডাইপ্ল্যানেটিজমের প্রথম পিরিয়ডটি খুবই সংক্ষিপ্ত। কিছু সময় বিশ্রামে থাকার পর (কয়েক ঘণ্টা) প্রতিটি সিস্ট অঙ্কুরিত হয়ে (চিত্র ৬.১১খ) মাধ্যমিক চলরেণু সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.১১গ)। এ চলরেণুগুলো বৃক্কাকার ও পার্শ্বীয় দ্বি-ফ্লাজেলা বিশিষ্ট (চিত্র ৬.১১ঘ)। ফ্লাজেলাম দুটি অসমান ; ছোটটি টিনসেল ধরনের এবং বড়টি হুইপল্যাস ধরনের হয়ে থাকে।

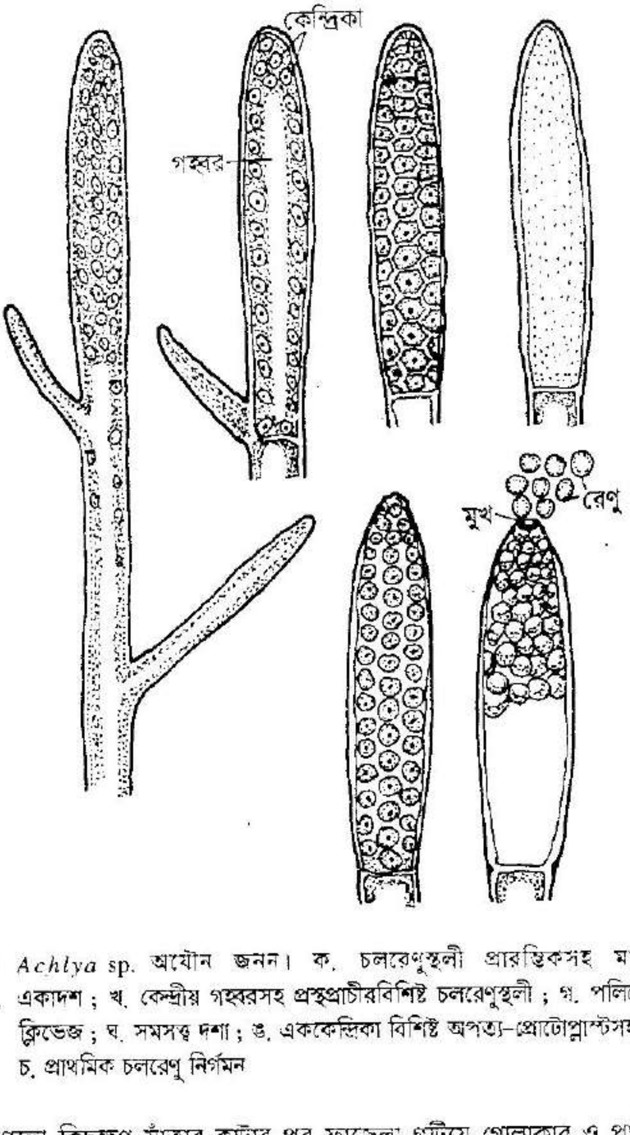

চিত্র ৬.১০ : *Achlya* sp. অযৌন জনন। ক. চলরেণুস্থলী প্রারম্ভিকসহ মাইসেলিয়ামের একাদশ ; খ. কেন্দ্রীয় গহ্বরসহ প্রস্থপ্রাচীরবিশিষ্ট চলরেণুস্থলী ; গ. পলিগোনাল খণ্ড ও ক্লিভেজ ; ঘ. সমসত্ত্ব দশা ; ঙ. এককেন্দ্রিকা বিশিষ্ট অপত্য-প্রোটোপ্লাস্টসহ চলরেণুস্থলী ; চ. প্রাথমিক চলরেণু নির্গমন

চলরেণুগুলো কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর ফ্লাজেলা গুটিয়ে গোলাকার ও প্রাচীরাবৃত হয়। মাধ্যমিক সিস্ট (চিত্র ৬.১১ঙ-চ) অঙ্কুরিত হয়ে টার্সিয়ারি চলরেণু দেয় (চিত্র ৬.১১ছ)। এগুলো মাধ্যমিক চলরেণুর অনুরূপ। টার্সিয়ারি চলরেণু অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল দেয় এবং সেটিই পরবর্তীকালে মাইসেলিয়াম গঠন করে (চিত্র ৬.১১ঝ)। *A. racemosa*-তে মাধ্যমিক চলরেণুর সিস্ট অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল দেয় ও নতুন মাইসেলিয়াম গঠন করে (Hawkes, ১৯৩৭)। Salvin (১৯৪০) উল্লেখ করেন যে, যৌনতাবিহীন *Achlya*-তে ৫টি ক্রমিক সচল অবস্থা

বিদ্যমান। সেহেতু *Achlya*-ছত্রাকটিতে Polyplanetism বিদ্যমান। এ অবস্থাটি *Dictychus* খুবই প্রকট। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টার্সিয়ারি চলরেণুগুলো গঠনে ও আকারে অভিন্ন ; সেহেতু মনোমরফিক।

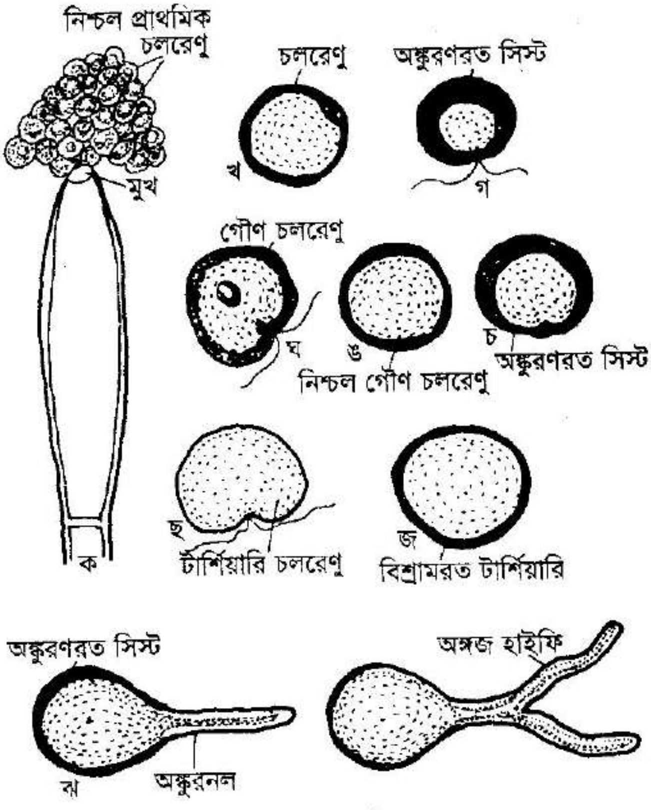

চিত্র ৬.১১ : *Achlya* sp. প্রাথমিক চলরেণুর নির্গমন এবং মাধ্যমিক চলরেণুর বিকাশ দশা। ক. চলরেণুস্থলী ছিদ্রপথে প্রাচীরাবৃত প্রাথমিক চলরেণু ; খ. প্রাচীরাবৃত চলরেণু ; গ. অঙ্কুরত সিস্ট ও মাধ্যমিক চলরেণুর নির্গমন ; ঘ. মুক্ত মাধ্যমিক চলরেণু ; ঙ. প্রাচীরাবৃত মাধ্যমিক চলরেণু ; চ. সিস্ট অঙ্কুরণ ও টার্সিয়ারি চলরেণুর বিকাশ ; ছ. টার্সিয়ারি চলরেণুর মুক্তি ; জ. প্রাচীরাবৃত টার্সিয়ারি চলরেণু ; ঝ. অঙ্কুরণরত সিস্ট ; ঞ. অঙ্কুরনলের অঙ্গজ হাইফিতে পরিবর্তন

চলরেণুস্থলীতে আন্তঃপ্রোলিফারেশন অনুপস্থিত। নতুন চলরেণুস্থলী গঠিত হতে পারে। তবে এটি একই হাইফিতে হলে পূর্বরেণুস্থলীর পাশ হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। Hawker (১৯৬৭) উল্লেখ করেন যে, একই হাইফির শীর্ষ হতে দ্বিতীয় রেণুস্থলী উৎপন্ন হতে পারে।

যৌন জনন

একলিয়া ছত্রাকটি হোমোথ্যালিক (*A. racemosa*) বা হেটারোথ্যালিক (*A. bisexualia*) হতে পারে। যৌন জনন উগ্যামীয় প্রকৃতির। পুংধানী ও স্ত্রীধানী জননাঙ্গ দুটি একই থ্যালাসে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন থ্যালাসে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ক. হেটারোথ্যালিক প্রজাতিতে যৌনাঙ্গের বিকাশ

A. bisexualis ও *A. awbisexalis* নামক হেটারোথ্যালিক প্রজাতিদ্বয়ের যৌন জনন জড়িত যৌনাঙ্গ বিকাশে ৪টি হরমোন যুক্ত থাকে। যখন পৃথক পৃথকভাবে বিকাশ পায় তখন পুং কিংবা স্ত্রী থ্যালাসে কোনো যৌনাঙ্গ তৈরি হয় না। এমন ক্ষেত্রে রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়ে থাকে (Raper, ১৯৩৯–১৯৫১)। পুং-মাইসেলিয়ামটি পানিতে জন্মালে সেখানে শুধু পুংধানী উৎপন্ন হয়, যদি সেখানে স্ত্রী–মাইসেলিয়ামও জন্মে থাকে। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় পুং ও স্ত্রী জননাঙ্গের বিকাশ হরমোননিয়ন্ত্রিত ;কারণ বিপরীত যৌনাঙ্গের মধ্যে এ হরমোনের বিনিময় হয়। পুং–উদ্ভিদে উৎপন্ন হরমোনটি স্ত্রীধানী বিকাশে স্ত্রী–উদ্ভিদকে উদ্বুদ্ধ করে। এ নিয়ম বিপরীতভাবেও কার্যকর হতে পারে। Roper এ ধরনের পরিপূরক যৌনতাকে গাইনানড্রোমিক্সিস (Gynandromixis) বলে অভিহিত করেছেন। এ ধরনের ৪টি হরমোননিয়ন্ত্রিত পুংধানী ও স্ত্রীধানীর বিকাশ নিম্নরূপে হয়ে থাকে।

১. *A. bisexulis*–এর স্ত্রী–উদ্ভিদটি A-হরমোন নিঃসরণ করে। এটি পুং উদ্ভিদে পুংধানী হাইফি তৈরিতে বা পুংধানী প্রারম্ভিক–B উৎপাদনে ইন্ধন যোগায়।

২. পুং উদ্ভিদ হরমোন–B নিঃসরণ করে স্ত্রী উদ্ভিদে থলেসদৃশ স্ত্রীধানী প্রারম্ভিক তৈরিতে ইন্ধন যোগায় (c)।

৩. স্ত্রীধানী এখন হরমোন–C নিঃসরণ করে সরাসরি পুংধানী প্রারম্ভিকের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বা স্ত্রীধানীর হাইফির দিকে যায় ও পরবর্তীটিকে আবৃত করে। পুংধানীতে শেষ পর্যন্ত পুংধানী শাখার শীর্ষে সীমায়িত হয় (D)।

৪. স্ত্রীধানী প্রারম্ভিকের সংস্পর্শে পুংধানীটি এলে হরমোন–D নিঃসরণ করে। এটি স্ত্রীধানী প্রারম্ভিককে ডিম্বাণু উৎপাদনে ইন্ধন যোগায় (E)।

খ. হোমোথ্যালিক প্রজাতিতে যৌনাঙ্গের বিকাশ

A. racemosa নামক হোমোথ্যালিক প্রজাতির একই মাইসেলিয়ামে দু'ধরনের যৌনাঙ্গের বিকাশ হয়ে থাকে।

১. **স্ত্রীধানী :** পার্শ্বীয় খাটো হাইফি বা মাইসেলিয়ামের শীর্ষে স্ত্রীধানী উৎপন্ন হয়। স্ত্রী শাখায় শীর্ষাঞ্চল স্ফীত হয়ে থলেসদৃশ স্ত্রীধানী প্রারম্ভিক (ক) উৎপন্ন হয়। এটি ঘন সমসত্ত্ব প্রোটোপ্লাস্টে (প্রাণসত্তা ও কেন্দ্রিকা) পরিপূর্ণ থাকে। এসময় কেন্দ্রীয় গহ্বরের আবির্ভাব ঘটে (চিত্র ৬.১৩খ)। অতঃপর এর গোড়ায় প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় ও এটি বহনকারী হাইফি হতে পৃথক হয় (গ)। শীর্ষস্থ থলেসদৃশ স্ফীত গঠনটিই ডিম্বাণুস্থলী। এটি গোলাকার বা পাইরিফরম আকৃতিযুক্ত, পাতলা মসৃণ ও স্বচ্ছ প্রাচীরাবৃত। ডিম্বাণুস্থলীর কিছু কেন্দ্রিকা। বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সজীব সতেজ কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিকভাবে বিভক্ত হয়। সমগ্র বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্রোটোপ্লাস্ট ১ থেকে ১০টি, প্রধানত

২ থেকে ৬টি ডিম্বাণুতে পরিণত হয় (ঘ)। প্রতিটি পরিণত ডিম্বাণু এককেন্দ্রিকাযুক্ত এবং গোলাকার ; তবে অর্ধবৃত্তাকারও হতে পারে। এটি নগ্ন বা প্রাচীরাবৃত নয় এবং কেন্দ্রিকাটি মাঝখানে অবস্থিত (ঘ)।

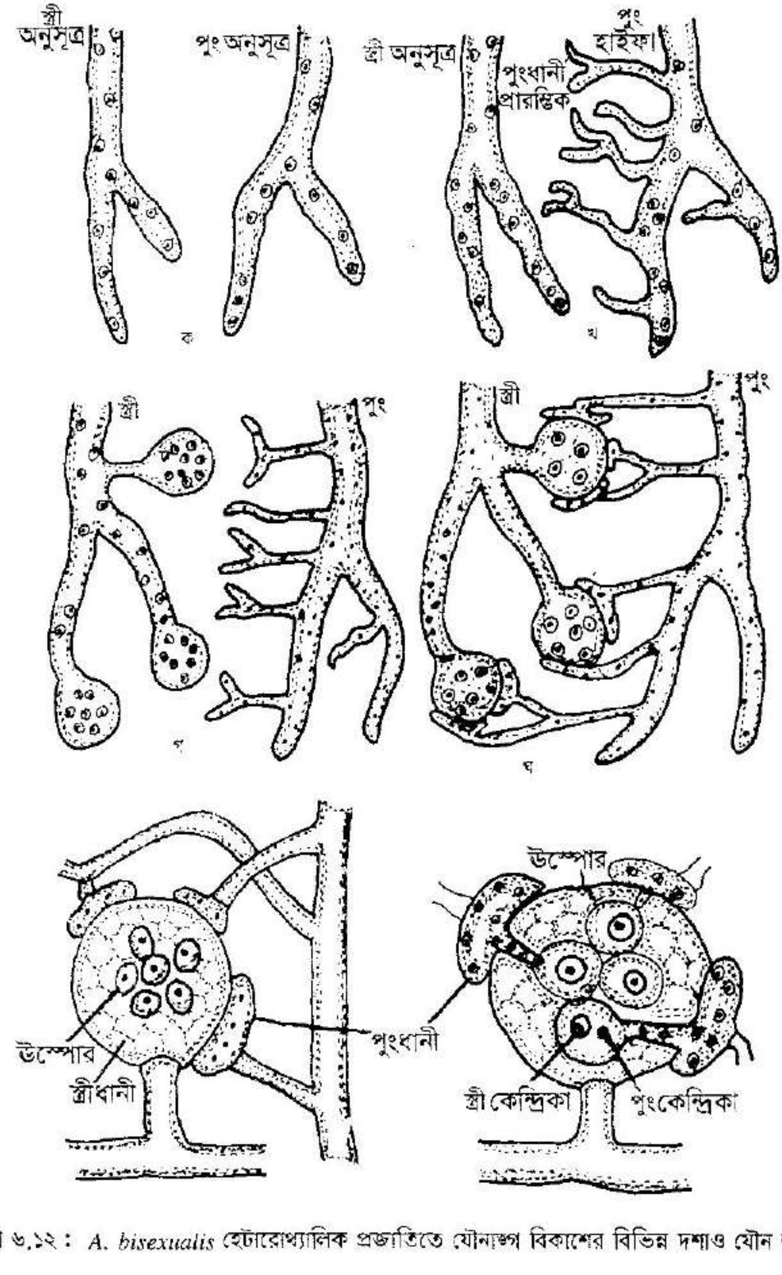

চিত্র ৬.১২ : *A. bisexualis* হেটারোথ্যালিক প্রজাতিতে যৌনাঙ্গ বিকাশের বিভিন্ন দশাও যৌন জনন

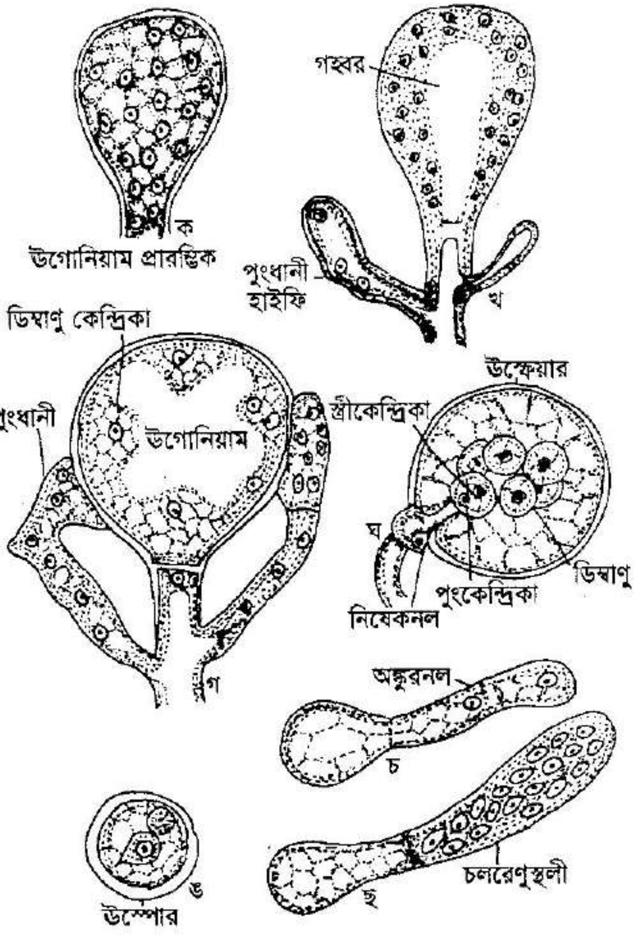

চিত্র ৬.১৩ : *Achlya* sp. হোমোথ্যালিক প্রজাতিতে যৌনাঙ্গের বিকাশ, যৌন জননও উস্পোরের অঙ্কুরণ। ক. প্রান্তীয় স্ত্রীধানী প্রারম্ভিক ; খ. কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত তরুণ স্ত্রীধানী ও দুটি পুংধানী শাখা ; গ. উগোনিয়াম ও ডিম্বাণু প্রারম্ভিকসহ পুংহাইফিতে পুংধানী ; ঘ. পরিণত ডিম্বাণুস্থলী ও নিষেক ; ঙ. উস্পোর ; চ–অঙ্কুরনল ; ছ. চলরেণুস্থলীসহ অঙ্কুরনল

২. **পুংধানী :** স্ত্রীধানী শাখা হতে উদ্গত পাতলা হাইফি শাখার শীর্ষে পুংধানী উৎপত্তি হয়ে থাকে। পুংধানী শাখা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে (খ)। এর স্ফীতাংশে কেন্দ্রিকা ও প্রাণসত্তা এসে জমা হতে থাকে। অতঃপর এ স্ফীতাংশের গোড়ায় প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হলে প্রোটোপ্লাস্ট প্রবাহ বন্ধ হয় ও বহনকারী শাখা হতে পৃথক হয়। এ পৃথকীকৃত অংশকেই

পুংধানী বলে। এটি আকৃতি প্রায় ক্লাব–আকৃতিসদৃশ। এটি কিছু কেন্দ্রিকা বিলুপ্ত হয় এবং অবশিষ্ট সতেজ ও সবলগুলো মাইটোটিকভাবে বিভক্ত হয়। অবশেষে এটি স্ত্রীধানীর সংস্পর্শে আসে এবং পরিবেশকে স্পর্শস্থানটি পাতলা হয়ে যায়।

৩. **নিষেকক্রিয়া :** পরিণত পুংধানীটি Chaemolropically স্ত্রীধানীকে স্পর্শ করে এবং স্পর্শস্থানে অনুপ্রবেশ নল উৎপন্ন করে। এ নলটিই নিষেকনল নামে পরিচিত। এ নিষেক নলটি পাতলা ডিম্বাণুস্থলী প্রাচীর ভেদ করে ডিম্বাণু পর্যন্ত যায়। নিষেকনল হতে শাখাও বের হতে পারে এবং অন্য ডিম্বাণুতে যায় কিংবা একাধিক পুংধানী স্ত্রীধানী প্রাচীরের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং প্রতিটি হতে নিষেক নল ডিম্বাণুস্থলীতে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু একটি ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংকেন্দ্রিকাই মিলিত হতে পারে। ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে একটি প্রাচীর নিঃসৃত হয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে ; একেই উস্পোর বলে (ঙ)।

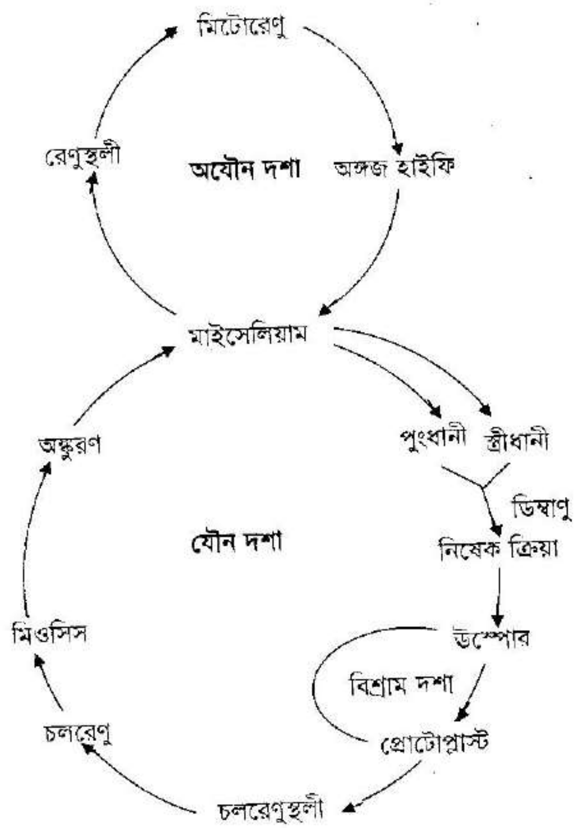

চিত্র ৬.১৪ : *Achyla* sp. –এর জীবনচক্র

গ. উস্পোরের অঙ্কুরণ

উস্পোরস্থলীর প্রাচীর বিলুপ্ত হলে উস্পোর মুক্ত হয়। এগুলো বিশ্রাম দশায় কিছু সময় কাটায় এবং অনুকূল পরিবেশের আগমনে অঙ্কুরিত হয়। উস্পোরের বহিঃপ্রাচীরটি ভেঙে পড়ে এবং প্রাচীরসহ প্রোটোপ্লাস্ট সরল ও বহু শাখাযুক্ত সরু অঙ্কুরনল আকারে বের হয়ে আসে (চ)। এ নলটিই চলরেণুস্থলীতে পরিণত হয় (ছ)। এতে পরবর্তীকালে চলরেণু উৎপন্ন হয়। চলরেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে তবে অঙ্কুরণের পূর্বে এটি মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়।

Saprolegniales-এর জাতিজনি ও উৎপত্তি

Saprolregniales-উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বহু ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে। তবে, অনেকেই শৈবাল-স্টক হতে Saprolegniales-উৎপত্তিকে সমর্থন করেন। বিশেষ করে *Vaucheria* নামক শৈবাল হতে এদের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন ; কেননা, এগুলোতে নিম্নোক্ত সাদৃশ্যগুলো বিদ্যমান :

১. জলজ প্রকৃতি।

২. উভয়ের থ্যালাসই শাখাযুক্ত, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন, সিনোসাইটিক ও সূত্রাকৃতির।

৩. শীর্ষবৃদ্ধি রয়েছে।

৪. সিরাম বিক্রিয়া অনুরূপ (Mez, ১৯২৯)।

৫. থ্যালাস আশ্রয়ের সাথে লেগে থাকে। *Vaucheria* শৈবালটি হাইমেনপটেরন এবং *Saprolegnia* রাইজয়ডাল হাইফি দিয়ে যুক্ত থাকে।

৬. চলরেণুস্থলীতে উৎপন্ন সচল চলরেণু দ্বারা অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। উভয় ক্ষেত্রেই চলরেণুস্থলী একইরকম ; কিন্তু *Saprolegnia*-তে দ্বি-ফ্লাজেলযুক্ত ও *Vaucheria*-তে বহু ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু।

৭. উভয় ক্ষেত্রেই যৌন জনন উগ্যামীয়।

৮. উভয় ক্ষেত্রেই পুংধানী ও স্ত্রীধানী একই রকমের হলেও সংখ্যায় ভিন্নতা বিদ্যমান। *Vaucheria*-তে ১টি ও *Saprolegnia*-তে অনেক।

Vaucheria ও *Saprolegnia*-এর মধ্যে এতগুলো সাদৃশ্য থাকলেও পুষ্টি প্রণালী, নিষেকের আচরণ, ডাইপ্ল্যানেটিক অবস্থা বিবেচনায় বহু পার্থক্য রয়েছে। এজন্যই আধুনিক ছত্রাকবিদগণ এ ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তাছাড়া, শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্য দিয়ে কোনো কিছুরই জাতিজনি নির্ধারণ যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয়, ফ্লাজেলা বিন্যাসরীতি, ধরন প্রভৃতিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

আদিম Oomycetes-এর শৈবালীয় উদ্ভবে যাঁরা বিশ্বাসী নন তাঁদের ধারণা হচ্ছে, *Saprolegnia* বর্ণহীন ফ্লাজেলাযুক্ত উদ্ভিদ হতেই উদ্ভব হয়েছে। কেননা, Myxomycetes-এ এমন সরল প্রজাতি ও রয়েছে যারা এদের সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।

বর্গ : Perenosporales

এ বর্গে প্রায় ১২টি গণ ও ৩২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এরা স্বভাব-প্রকৃতিতে জলজ হতে স্থলজ হতে পারে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী উভচর প্রকৃতির প্রজাতিও আছে। এদের অনেকেই উদ্ভিদ পরজীবী হিসেবে বাস করে বহু অর্থনৈতিক ফসলের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়। মাত্র কয়েকটি থ্যালোফাইটে

পরজীবী। বাকিগুলো মৃতজীবী। পোষকের মৃত্যুর পর কোনো কোনো প্রজাতি *(Pythium)* মৃতজীবীরূপে বাস করে।

মাইসেলিয়াম সুগঠিত, শাখান্বিত, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও সিনোসাইটিক। সাধারণত এগুলোতে কোনো প্রস্থপ্রাচীর থাকে না ; তবে ক্ষত হলে বা জননাঙ্গ তৈরি হলে এগুলো পৃথক করে রাখার জন্য প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। এ মাইসেলিয়ামগুলোতে রাইজয়ডীয় ও বায়বীয় হাইফিরূপে ভিন্নতা দেখায় না। ডাইনি মিলডিউ-এর হাইফিগুলো পোষককলার কোষাবকাশে প্রবেশ করে চোষক মূল নাম ধারণ করে। Pythiaceae গোত্রের অধিকাংশই অন্তঃকোষীয় হাইফি ও চোষকমূলযুক্ত। তবে ব্যতিক্রমী ও উন্নত গণ যেমন *Phytophthora*-তে এটি খুব কমই দেখা যায়।

অযৌন জনন সাধারণত সচল বা নিশ্চল রেণু (মিটোরেণু) রেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়ে নিষ্পন্ন হয়। এগুলো অঙ্গজ হাইফিতে বা বিশেষ ধরনের জনন হাইফি বা রেণুস্থলীধরের উপর উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলীগুলো গোলাকৃতি হয়ে থাকে। উন্নত প্রজাতিতে রেণুস্থলীধরের উপরে অসংখ্য রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় (ডাউনি মিলডিউ ও *Phytophthora* এর কয়েকটি প্রজাতি)। এখানে এগুলো পতনশীল বা ঝরে পড়ে ও সহজে ছড়িয়ে পড়ে। চলরেণুগুলো বৃক্কাকার ও দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত। ফ্লাজেলা দুটি অবতল দিকে পার্শ্বীয়ভাবে লাগানো থাকে ; এদের একটি হলো টিনসেল (Pantonematic) ও অন্যটি হলো হুইপল্যাস (acronematic) ধরনের। কোনো কোনো প্রজাতির রেণুস্থলী চলরেণুস্থলীর ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করে এবং চলরেণু উৎপাদন করে বা সরাসরি অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় ; সেহেতু কনিডিয়াম হিসেবে কাজ করে। কনিডিয়ামের মতো আচরণকারী রেণুস্থলীকে কনিডিওরেণুস্থলীও বলা হয়।

যৌন জনন উগ্যামীয় প্রকৃতির। ডিম্বাণুস্থলীতে পেরিপ্লাজম ঘেরা একটি ডিম্বাণু থাকে। পুংধানী আকারে ক্ষুদ্র ও ক্লাব-আকৃতির। মূলীয় প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে পুংধানী সীমিত ও ডিম্বাণুস্থলী নিচ হতে উৎপন্ন হয়। পুংধানীর বৃদ্ধি সীমিত। নিষেক নলের মাধ্যমে নিষেকক্রিয়া হয়ে থাকে। এ ধরনের নিষেককে প্যারাগাইনাস (Paragynous) নিষেক বলে। *Phytophthera*-এর নিষেক অ্যাম্ফিগাইনাস ধরনের উস্পোরের অঙ্কুরণ সরাসরি অঙ্কুরনল মাধ্যমে *(Perenopora)* বা চলরেণু উৎপাদন মাধ্যমে *(Albugo)* হয়ে থাকে।

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যহেতু Saprolegniales অপেক্ষা Pernooslorales অনেক বেশি প্রাগ্রসর ও উন্নত ধরনের :

১. Peronoporales-এর ছত্রাকগুলোর প্রকৃতিতে ব্যাপকতা বিদ্যমান ; এগুলো জলে, স্থলে ও উভচররূপে জন্মে থাকে। অন্যদিকে Saprolegniales-এর অধিকাংশই জলজ ; তবে কিছু স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মে থাকে।

২. বহু সংখ্যক Peronosporales-পরজীবী ও কিছু সংখ্যক মৃতজীবী। কয়েকটি প্রজাতি পোষকের মৃত্যুর পর মৃতজীবীরূপে কাল কাটাতে পারে। Saproleniales-এ অধিকাংশই মৃতজীবী এবং পরজীবীর উপস্থিতি বিরল।

৩. Peronosporales- এ রেণুস্থলী সাধারণত ঝরে পড়ে এবং কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে ; এগুলো গোলাকার বা ডিম্বাকার হয়ে থাকে। অপরদিকে Saprolegniales-এর রেণুস্থলী নলাকার বা ক্লাব-আকৃতির এবং ঝরে পড়ে না বা কোনো সময়ই কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে না।

৪. Peronosporales-এর বহু সংখ্যক প্রজাতিতে রেণুস্থলীগুলো রেণুস্থলীধর নামক বিশেষ ধরনের জনন শাখার শীর্ষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু Saprolegniales-এ ধরনের কোনো বিশেষ জনন শাখা থাকে না। এগুলো প্রায় অঙ্গজ হাইফির মতোই হয়ে থাকে।

৫. Peronosporales–এ চলরেণুগুলো বৃক্কাকার, ফ্লাজেলাদ্বয় পার্শ্বীয় ও অবতলিক। এজন্য এগুলোকে মনোপ্ল্যানেটিক চলরেণু বলে। অন্যদিকে, Saporolegniales–এর চলরেণু পলিপ্ল্যানেটিক বা ডাইপ্ল্যানেটিক হয়ে থাকে। প্রাথমিক চলরেণু পাইরিফরম ও দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত। ফ্লাজেলাগুলো শীর্ষস্থ হয়ে থাকে। মাধ্যমিক চলরেণুগুলো বৃক্কাকার ও পার্শ্বীয় দ্বি-ফ্লাজেলাবিশিষ্ট।

৬. Peronosporales–এর ডিম্বাণুস্থলীতে একটি ডিম্বাণু থাকে। এ ডিম্বাণুটি আবার পেরিপ্লাজম দিয়ে আবৃত থাকে। অপরদিকে Saporolegniales-এর ডিম্বাণুস্থলী পেরিপ্লাজমবিহীন ও একাধিক ডিম্বাণুবিশিষ্ট।

শ্রেণিবিভাগ

রেণুস্থলীধরের প্রকৃতি, রেণুস্থলীর সজ্জারীতি ও উৎপত্তির ধরনের উপর ভিত্তি করে এ বর্গকে ৩টি গোত্রে ভাগ করা হয়েছে :

ক. রেণুস্থলী বহনকারী হাইফিটি প্রায় অঙ্গজ হাইফির অনুরূপ এবং ভিন্নরূপ হলে সসীম বৃদ্ধিযুক্ত হয় না।

১. রেণুস্থলীটি কনিডিয়ামরূপে কাজ করে না বললেই চলে।

গোত্র—Pythiaceae

গণ—*Pythium*

প্রজাতি—*P. debaryanum*

খ. রেণুস্থলীধরের শীর্ষাঞ্চলে রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়।

১. রেণুস্থলীধর শাখাযুক্ত সীমিত বৃদ্ধি, রেণুস্থলী কনিডিয়ারূপে কাজ করে এবং এককভাবে শীর্ষভাগে উৎপন্ন হয়।

গোত্র—Peronosporaceae

গণ—*Peronospora*

প্রজাতি—*P. parasitica*

২. রেণুস্থলীধর অশাখ, ক্লাব-আকৃতিযুক্ত ও প্যালিসেডসদৃশ স্তরের ন্যায় বিন্যাসিত ; রেণুস্থলী সাধারণত কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে উৎপন্ন হয়ে শিকল তৈরি করে।

গোত্র—Atbuginaceae

গণ—*Albugo*

প্রজাতি—*A. candida*

গোত্র : Pythiaceae

এ গোত্রের ছত্রাকগুলোর বসতিতে বিভিন্নতা বর্তমান। এরা জলজ ও স্থলজ পরিবেশে যেমন জন্মায় তেমনি উভচর পরিবেশেও জন্মায়। নিম্ন শ্রেণিগুলো জলজ এবং উচ্চতরগুলো স্থলজ পরিবেশে জন্মায়। কিছু কিছু সদস্য আবার উভচর প্রকৃতির। এদের অধিকাংশই উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী। এদের কয়েকটি হলো : হাজা বা ড্যাম্পিং-অফ রোগ *Pythium desaryanum*, বিট, মূলার চারা ও মূলের রট রোগ–*P. ashanidermatum*–এটি পেঁপের ফুট রট রোগও সৃষ্টি করে। *P. ultinum*

মটরের ব্লাইট রোগ সৃষ্টি করে, *P. arrhenomanes* ভুট্টা, গম ও আখের মূলে রোগ সৃষ্টি করে, *Phytopthora parasitica* পানের নুয়ে পড়া রোগ, *Palnivora* নারকেলের বাড রট এবং সুপারির ফ্রুট রট সৃষ্টি করে; *Cilrophthora* লেবুর বাদামি রট ও গ্যামোসিস রোগ সৃষ্টি করে। অনেকেই আবার মৃত্তিকাবাসী। সাধারণভাবে, Pythiaceae গোত্রের পরজীবী প্রবণতা Peronosporaceae অপেক্ষা কম। আবার বাধ্যতামূলক পরজীবী অপেক্ষা মৃতজীবী প্রবণতা অধিক।

মাইসেলিয়াম সুগঠিত, শাখাবিশিষ্ট, সিনোসাইটিক হাইফি এবং বায়ব ও রাইজয়ডাল অংশে বিভেদিত। ক্ষতস্থান ও জনন কোষকে সীমায়িত করার জন্য প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। তবে এগুলো নিরেট ধরনের ও রন্ধ্রবিহীন। অধিকাংশ প্রজাতির মাইসেলিয়াম অন্তঃকোষীয় ও সমব্যাসীয়। চোষকমূল বিরল।

অযৌন জনন সাধারণত রেণুস্থলীয় রেণুর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। রেণুস্থলীগুলো অঙ্গজ হাইফিসদৃশ বা সামান্য বিসদৃশ হাইফির শীর্ষদেশে উৎপন্ন হয়। এগুলো মাতৃহাইফিতেই যুক্ত থাকে ও চলরেণু উৎপাদন করে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রেণুস্থলীগুলো খসে পড়ে এবং পানি ও বায়ুর মাধ্যমে বাহিত হয়। কোনো উপযুক্ত আশ্রয়ে এসে পড়লে চলরেণুস্থলীগুলো চলরেণু প্রদান করে বা সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর-নল দেয়। কিছু কিছু ছত্রাকবিদ এদেরকে কনিডিওরেণুস্থলী বলে উল্লেখ করেন এবং অন্যরা কনিডিয়া বলে থাকেন।

যৌন জনন উগ্যামীয়। হাইফির শীর্ষভাগে যৌন জননাঙ্গগুলো উৎপন্ন হয়। এ গোত্রের সর্বাধিক পরিচিত দুটি গণ হলো : *Pythium* ও *Phytophthora*। *Phytophthora* গণটি বাহ্যিকভাবে জীবসংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক প্রাগ্রসর ও উন্নত।

গণ : *Pythium*

এ গণে ৬৬টি প্রজাতি রয়েছে (Middleton, ১৯৪৩)। এগুলো বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। কিছু কিছু প্রজাতি জলজ প্রকৃতির। এগুলো জলজ শৈবালকে অচল বা পঙ্গু করে দেয়। অনেক প্রজাতিই উভচর প্রকৃতির। এরা ভেজা হিউমাসসমৃদ্ধ মাটিতে মৃতজীবীরূপে জন্মায় এবং চারা গাছের পত্রাবকাণ্ডকে আক্রমণ করে বসে। উদাহরণ হিসেবে এসব চারাগাছ হচ্ছে পেঁপে, সরিষা, গম, আদা, তামাক প্রভৃতি। অতঃপর এরা পরজীবীরূপে বসবাস করে। এগুলো প্রায় গ্রিন হাউস, বীজতলায় মহামারি সৃষ্টি করে। এদের সৃষ্ট রোগ হচ্ছে : ড্যাম্পিং-অফ, সফট রট, হুইট রট বা ফ্রুট রট। অধিকাংশ প্রজাতিই রুট রট রোগের কারণ। এদের কেউ কেউ লাউ, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতি ফলকেও আক্রমণ করে থাকে। এরা যে শুধু ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করে তা নয়, এদের অনেকেই পচনশীলতার কাজও করে থাকে। এদের একটি সাধারণ প্রজাতি হলো *P. debaryanum.*

Pythium debaryanum

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
- উপবিভাগ—Eumycotina
  - শ্রেণি—Oomycetes
    - বর্গ—Peronosporales
      - গোত্র—Pythiaceae
        - গণ—*Pythium*
          - প্রজাতি—*P. debaryanum*

প্রকৃতি ও বসতি

Pythium গণে ৬৬টি প্রজাতি রয়েছে। এটি বিশ্বজনীন। এগুলো জল, স্থল উভয় পরিবেশেই বাস করে। *Pythuim*-এর সর্বাধিক ক্ষতিকারক প্রজাতিটি হলো *P. debaryanum*. এটির আক্রমণে তামাক, বিলেতি বেগুন, সরিষা, মরিচ, মূলা, শালগম, পেঁপে প্রভৃতি পোষক উদ্ভিদের গোড়ায় "হাজা" বা "ড্যাম্পিং-অফ রোগ" সৃষ্টি করার ফলে পচন দেখা দেয়। ফলে, গোড়া দুর্বল হয়ে গেলে গাছটি নেতিয়ে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি হিউমাসসমৃদ্ধ ভেজা মাটিতে মৃতজীবীরূপে জন্মায়। পরে এরা উপযুক্ত চারাগাছের শিকড় পেলে তাকে আক্রমণ করে পরজীবী হিসেবে বাস করতে শুরু করে। কিন্তু পোষকের মৃত্যু হলে এটি পোষকের দেহাবশেষের উপর মৃতজীবীরূপে জীবনযাপন করে বেঁচে থাকে।

চিত্র ৬.১৫ : *Pythium* sp. ক. স্বাভাবিক চারাগাছ ; খ. আক্রান্ত চারাগাছ

দৈহিক গঠন

মাইসেলিয়ামই হচ্ছে অঙ্গজ গঠনের প্রতিনিধি। মাইসেলিয়াম বহুলভাবে শাখান্বিত, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন, সিনোসাইটিক হাইফি নিয়ে গঠিত। অবশ্য ক্ষতস্থান ও জননাঙ্গকে সীমিত বা পৃথক রাখার জন্য হাইফিতে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। তবে এ প্রস্থপ্রাচীরটি শীর্ষরন্ধ্রবিহীন ও নিরেট। মাইসেলিয়াম বায়বীয় ও রাইজয়ডাল অংশে বিভেদিত নয়। এগুলো মৃতজীবী বা পরজীবীরূপে জীবনধারণ করে। পরজীবীর মাইসেলিয়াম পোষকদেহে অন্তঃকোষীয় ও আন্তঃকোষীয় হয়ে থাকে। এখান থেকে কোনো চোষকমূল উৎপন্ন হয় না। তবে কখনও কখনও নিবেশিত হয়ে থাকে।

মাইসেলিয়ামের গঠন

হাইফির কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ থাকে (Mitchell ও Saber, (১৯৬৬)। Bartnick-Garcia (১৯৬৬) উল্লেখ করেন যে, কোষপ্রাচীরের উপাদানসমূহের মধ্যে সেলুলোজ খুবই কম পরিমাণে থাকে বা একেবারেই থাকে না। গ্লুকান হলো মুখ্য উপাদান হাইফিগুলোতে বর্ণহীন প্রাণসত্তা, অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রিকা, মাইটোকন্ড্রিয়া, আন্তঃপ্লাজমা জালিকা, রাইবোজম প্রভৃতি বিদ্যমান। প্রাণসত্তীয় পর্দা হাইফির দেয়ালে লেগে থাকে ও লোমাজম গঠন করে। সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে গ্লাইকোজেন ও তেলবিন্দু থাকে। হাইফিগুলোতে শীর্ষবৃদ্ধি দেখা যায়।

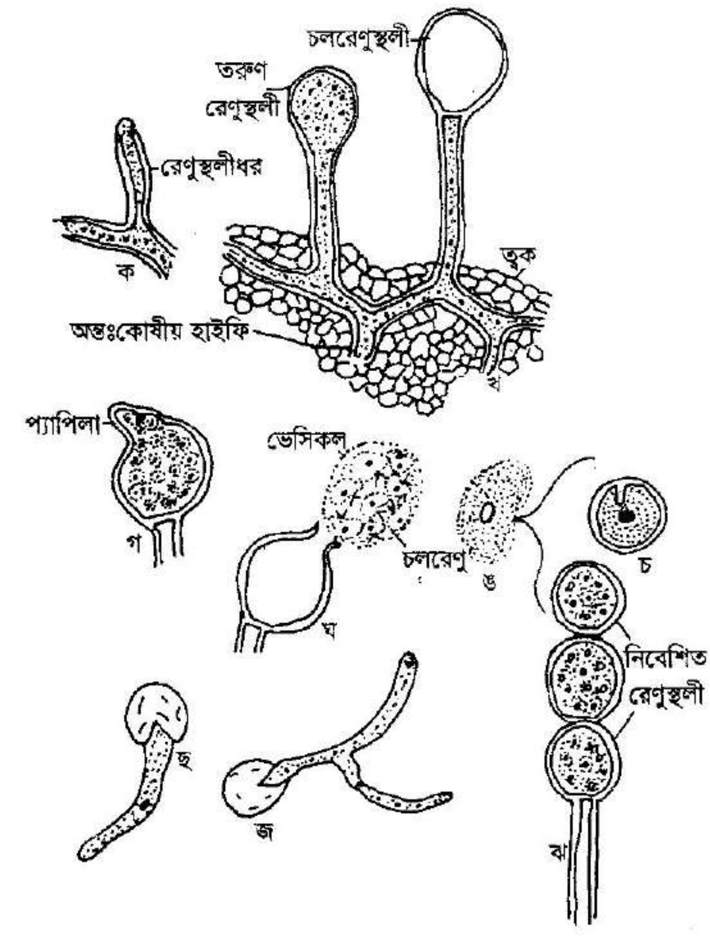

চিত্র ৬.১৬ : *Pythium* sp.অযৌন জননের বিভিন্ন পর্যায়। ক. মাইসেলিয়াম ; খ. পোষককলায় মাইসেলিয়াম ; গ. রেণুস্থলীধর ও রেণুস্থলী ; ঘ. প্যাপিলাযুক্ত রেণুস্থলী ; ঙ. রেণুস্থলী হতে চলরেণু নির্গমন ; চ. চলরেণু ; ছ. অঙ্কুরণের পূর্বে চলরেণু ; জ. রেণুস্থলীর সরাসরি অঙ্কুরণ ; ঝ. শিকলাকারে রেণুস্থলী ; ঞ. কনিডিয়া ও কনিডিওফোর ; ট. কনিডিয়ামের অঙ্কুরণ

জনন প্রক্রিয়া

পোষকের মৃত্যুর বহু পূর্বেই পরজীবীটি জনন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। *Pythium*–এ অযৌন ও যৌনভাবে জনন কাজ চলে।

১. **অযৌন জনন** (চিত্র ৬.১৬ গ–ট) : এ ধরনের জনন কাজ সাধারণত চলরেণু বা কনিডিয়া মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ চলরেণুগুলো ছোট গোলাকার বা ডিম্বাকার থলেসদৃশ রেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলীগুলো এককভাবেও হাইফি শীর্ষে ও পোষক কলার বাইরে উৎপন্ন হয়।

এতে কোনো বিশেষিত রেণুস্থলী থাকে না। রেণুস্থলীটি ১৫ থেকে ২৬ মিলিমাইক্রোমিটার ব্যাসযুক্ত হয়ে থাকে। কখনও কখনও রেণুস্থলী নিবেশিত ধরনের হতে পারে। উচ্চ আর্দ্রতা মাইসেলিয়াম বৃদ্ধির ও চলরেণু গঠনের সহায়ক। প্রতিটি রেণুস্থলী বহু কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট গঠন। এটি প্রস্থপ্রাচীর দ্বারা হাইফির অবশিষ্টাংশ হতে পৃথক থাকে। রেণুস্থলীটি বর্ণহীন প্রাণসত্ত্বাসহ বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকায় পূর্ণ থাকে। এ প্রোটোপ্লাস্ট অঙ্গজ হাইফির প্রোটোপ্লাস্ট কিছুটা ঘন হয়ে থাকে।

১. রেণুস্থলীর পরোক্ষ অঙ্কুরণ

স্যাতসেঁতে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রেণুস্থলীগুলো বহনকারী হাইফিতে যুক্ত থাকে। এগুলো চলরেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে। পরিণত চলরেণুস্থলীর শীর্ষে বা পাশে প্যাপিলা নামক একটি সরু উপবৃদ্ধি জন্মে। এটি প্রথমে নলাকার থাকে এবং একে নির্গমন-নল বলে। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি স্ফীত হয়ে পাতলা প্রাচীরযুক্ত, ক্ষুদ্র, বেলুনসদৃশ আকৃতির ভেসিকলে পরিণত হয়। চলরেণুস্থলীর সমুদয় পদার্থ এককেন্দ্রিকাযুক্ত হয়ে ন্যূনাধিক ২০টি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়। এগুলো নির্গমন-নল দিয়ে ভেসিকলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমরূপান্তরিত হয়ে চলরেণুতে পরিণত হয়। কারো কারো মতে চলরেণুস্থলীর সমুদয় পদার্থ ভেসিকলে প্রবেশ করার পর বিভক্ত হয়ে চলরেণুতে পরিণত হয়। প্রতিটি চলরেণু আকারে অতি ক্ষুদ্র ও বৃক্কাকার। প্রতিটি চলরেণুতে একটি কেন্দ্রিকা ও পার্শ্বীয়ভাবে যুক্ত দুটি অসম ফ্লাজেলাম থাকে। সামনের দিকের ফ্লাজেলামটি টিনসেলজাতীয় অন্যদিকে পিছনেরটি হুইপল্যাস ধরনের।

চলরেণুগুলো পূর্ণ পরিণত হলে তাদের পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কির ফলে ভেসিকলটি হঠাৎ করে বিদীর্ণ হয় ও চলরেণুগুলো মুক্ত হয়ে কিছু সময় সাঁতার কাটে। অতঃপর ফ্লাজেলা বিলুপ্ত হয় এবং চলরেণুগুলো গোলাকার হয়ে নরম প্রাচীরাবৃত হয় (১)। প্রাচীরাবৃত চলরেণুগুলো নতুন পোষকের সংস্পর্শে এলে অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় এবং পোষকদেহের মধ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। Hohnk (১৯৩২) উল্লেখ করেন যে, কোনো কোনো প্রজাতিতে চলরেণুগুলো প্রাচীরাবৃত হয়ে কিছু সময় অবসর যাপন করে এবং সিস্ট নামে অভিহিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সিস্টগুলো ১টি করে গৌণ চলরেণু উৎপাদন করে। এটি *Saprolegnia* ও *Achlya*-র সাথে তুলনীয়। সিস্ট হতে একসময় চলরেণুগুলো বের হয়ে আসে এবং অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চলরেণু এ ধরনের আচরণ কোনোক্রমেই *Saprolognia*-এর চলরেণুর ডাইপ্ল্যানেটিক আচরণের সাথে অভিন্ন নয়। কেননা, এটি কোনো ডাইপ্ল্যানেটিজম নয় ; *Pythium*-এর প্রাথমিকও গৌণ চলরেণু বাহ্যিকভাবে অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট।

২. রেণুস্থলীর সরাসরি অঙ্কুরণ

অপেক্ষাকৃত শুষ্ক তথা প্রতিকূল পরিবেশে চলরেণুস্থলীগুলো বহনকারী হাইফি হতে খসে পড়ে এবং পানি বা বাতাসে বাহিত হয়ে কোনো উপযুক্ত পোষকে নীত হলে রেণুস্থলীগুলো কনিডিয়ার মতো অঙ্কুরিত হয়। এটি সরাসরি অঙ্কুর-নল উৎপন্ন করে পোষকের মধ্যে পত্ররন্ধ্র বা ত্বকীয় কোষের উৎসেচক নিঃসৃত করে ঢুকে পড়ে ও শাখা-প্রশাখা গঠন করে মাইসেলিয়াম তৈরি করে। চলরেণু ব্যতিরেকেই এখানে মাইসেলিয়ামের বিকাশ ঘটে। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ এ ধরনের আচরণজড়িত রেণুস্থলীকে কনিডিওরেণুস্থলী বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ এদেরকে প্রকৃত কনিডিয়া হিসেবেই বিবেচনা করেন। কেননা, যেসব রেণুস্থলী সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয় তাদেরকেই শুধু কনিডিয়া বলে (Webster, 1970) ব্যাখ্যা করা যায়।

Drechsler (১৯৩৯, ১৯৪১) উল্লেখ করেন যে, *Pythium*–এ গিমা গঠন মাধ্যমেও অযৌন জনন হয়ে থাকে। এগুলো নিবেশিত ধরনের ও গোলাকার। কখনও কখনও গিমা পুরু প্রাচীরাবৃত হয়। এদেরকে ক্ল্যামাইডোরেণু (Webster, 1970) বলে। গিমা বা ক্ল্যামাইডোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে দীর্ঘ, নলাকার হাইফি প্রদান করে। এসব হাইফির শীর্ষদেশে রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়। এ রেণুস্থলী হতে চলরেণু উৎপন্ন হয়।

রেণুস্থলীর প্রকারভেদ

Pythium–এ মূলত দু'ধরনের রেণুস্থলী দেখা যায় ; যেমন—

১. গোলাকৃতি রেণুস্থলী ও

২. সূত্রাকৃতি রেণুস্থলী।

১. **গোলাকৃতি রেণুস্থলী :** এগুলো মোটামুটি গোলাকার ও প্রশস্ত এবং শীর্ষদেশীয়। *P. debaryanum*–এ ধরনের রেণুস্থলী দেখা যায়। *P. proliterum*–এর গোলাকৃতি রেণুস্থলীতে প্রোলিফারেশন দেখা যায়। রেণুস্থলী খসে পড়লে চলরেণুগুলো গোড়া হতে ফুলে উঠে নতুন রেণুস্থলী গঠন করে। এরা শূন্য প্রাথমিক রেণুস্থলীর মধ্যে বা বাইরে পরিণত হয়। *P. intermedium*–এ শিকলাকারে গোলাকৃতি রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় (ঝ)। এগুলো চলরেণুস্থলী বা কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে। *P. ultuinum*–এর গোলাকার রেণুস্থলী সবসময়ই কনিডিয়ারূপে কাজ করে এবং সরাসরি অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়।

২. **সূত্রাকৃতি বা লম্বাটে রেণুস্থলী :** এ রেণুস্থলীগুলো অঙ্গজ হাইফি হতে শনাক্তযোগ্য এবং চওড়ায় বহনকারী হাইফিসদৃশ। এদের মধ্যেকার পদার্থসমূহ অধিক ঘন। সূত্রাকৃতি রেণুস্থলীগুলো সরল প্রকৃতির হতে পারে ; যেমন *P. gracile* ও *P. monosperma*–এর রেণুস্থলী। আবার এগুলো শাখাবিশিষ্টও হতে পারে ; যেমনটি *P. aphanidermatum* ও *P. myriotylum*– এ দেখা যায়। অবশ্য শাখাযুক্ত রেণুস্থলীতে শাখাগুলো ডিজিটাকারে সাজানো ও সামান্য স্ফীত।

কনিডিয়ামের অভিব্যক্তি

আলোচনা হতে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে যে, *Pythium*–এর বিভিন্ন প্রজাতির চলরেণুস্থলী হতে প্রকৃত কনিডিয়ার ক্রমিক অবস্থান্তর অনুযায়ী একটি ধারাবাহিকতা দেখা যায়। এ ধারাটির প্রথমে *P. gracile*–কে রাখা যায়। এ রেণুস্থলীটি লম্বাটে ও প্রচুর চলরেণু উৎপন্ন করে। স্বাভাবিকভাবে, *P. debaryanum* রেণুস্থলী মাধ্যমে অযৌন জনন কাজ চালায় । এটি আর্দ্র আবহাওয়াতে চলরেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে ; কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে ও তাপমাত্রা যখন অত্যধিক হয় তখন রেণুস্থলীটি কনিডিয়াম–এর মতো আচরণ দেখায় এবং অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়।

P. intermedium–এর রেণুস্থলী স্বাভাবিকভাবে চলরেণুস্থলী হিসেবেও কনিডিয়ারূপে কাজ করে।

P. vexans রেণুস্থলী একান্তভাবে কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে ; তবে খুব কম সময়ই চলরেণুস্থলীরূপে কাজ করে। রেণুস্থলীতে প্যাপিলা নামক উপবৃদ্ধির পরিবর্তে অঙ্কুর–নল তৈরি হয়। *P. ultimum*–এ রেণুস্থলী অবিমিশ্রভাবে কনিডিয়ামরূপে কাজ করে এবং অঙ্কুর–নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। এতে কখনই চলরেণুস্থলী উৎপন্ন হয় না।

উপ–বায়বীয় পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হবার কারণে রেণুস্থলী হতে ক্রমান্বয়ে কনিডিয়ামে উপনীত হয়েছে। কোনো কোনো প্রজাতিতে ক্ল্যামাইডোরেণু উৎপন্ন হয় (Websts, 1970)। অঙ্কুরণ মাধ্যমে অঙ্গজদেহ গঠন করে।

যৌন জনন

বৃদ্ধি মৌসুমের শেষভাগে খাদ্য যখন নিঃশেষিত, পর্যাপ্ত পানির অভাব, পোষকটি মৃতপ্রায় বা মৃত এবং পরজীবীটি মৃতজীবীরূপে জীবনযাপনে প্রবেশ করেছে তখন *Pythium*–এর যৌন জনন হয়ে থাকে। এ সময় মৃত পোষকের কোষের যৌন জননাঙ্গ তৈরি হয়।

Pythium–এর যৌন জনন জননকোষাধারীয় স্পর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং এ প্রকার জনন উগ্যামীয়। পুং জননাঙ্গকে পুংধানী এবং স্ত্রী জননাঙ্গকে স্ত্রীধানী বা ডিম্বাণুস্থলী বলে। পুংধানী বা শুক্রাণুস্থলী ও স্ত্রীধানী বা ডিম্বাণুস্থলী খুবই কাছাকাছি বা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান করে। সাধারণত ডিম্বাণুস্থলীটি কোনো একপার্শ্বীয় হাইফির শীর্ষে উৎপন্ন হয় এবং ডিম্বাণুস্থলীর বৃন্ত হতে উৎপন্ন হাইফির শীর্ষেও ডিম্বাণুস্থলীর ঠিক নিচে অত্যধিক শুক্রাণুস্থলী উৎপন্ন হয়। সেহেতু *P. debaryanum* একটি সহবাসী প্রজাতি (Webater, 1970)। কিন্তু *P. ultimum* একটি পুংধানী থাকে (Webster, 1970)

ক. ডিম্বাণুস্থলী

ডিম্বাণুস্থলী গঠনকারী হাইফির শীর্ষদেশ স্ফীত হয়ে গোলাকার রূপ নিলে তাকে তরুণ ডিম্বাণুস্থলী বলে। এর মধ্যে বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকা ও প্রাণসত্তা এসে জমা হলে প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টি করে ডিম্বাণুস্থলী হাইফির অন্যান্য অংশ হতে আলাদা হয়ে যায়। এ প্রস্থপ্রাচীরটি নিরেট এবং রন্ধ্রবিহীন। ডিম্বাণুস্থলীর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রোটোপ্লাস্ট দুটি পৃথক অঞ্চলে বিভেদিত হয়। যেমন—

১. উপ্লাজম ও

২. পেরিপ্লাজম।

১. এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে উপ্লাজম বলতে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনদানাদার ও প্রায় গোলাকার বৃহৎ অংশকে বুঝায় এবং পেরিপ্লাজম বলতে পরিধিস্থ পাতলা ও স্পঞ্জি ডিম্বাণুস্থলী পর্দাকে বুঝায়।

ডিম্বাণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্টের বিভেদনের সাথে সাথে কেন্দ্রিকাগুলোও বিন্যাসিত হয়। উপ্লাজমের বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকার মধ্যে একটি কেন্দ্রিকা ছাড়া অন্যগুলো পেরিপ্লাজমে চলে যায়। ফলে উপ্লাজম এককেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে পেরিপ্লাজমের কেন্দ্রিকাগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। এককেন্দ্রিকাযুক্ত উপ্লাজম ডিম্বাণু হিসেবে কাজ করে। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ মনে করেন যে, উপ্লাজমের একটি কেন্দ্রিকা ছাড়া বাকি সবগুলো কেন্দ্রিকা বিনষ্ট হয়ে যায়।

খ. পুংধানী বা শুক্রাণুস্থলী

ডিম্বাণুস্থলী হতে আকারে ছোট, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত, ক্লাব–আকৃতির, লম্বাটে গঠনকে শুক্রাণুস্থলী বলে। ডিম্বাণুস্থলীর বৃন্ত হতে উদ্ভূত হাইফির শীর্ষদেশে এটি গঠিত হয়। এটি ডিম্বাণুস্থলীর ঠিক নিচেই থাকে। শুক্রাণুস্থলীটি একটি প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে হাইফির বাকি অংশ হতে পৃথক হতে যায় (গ)। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্রোটোপ্লাজম দুটি অঞ্চলে বিভেদিত হয়। যেমন—

১. ঘন, দানাদার প্রাণসত্তা ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত কেন্দ্রীয় পুংগ্যামেট এবং

২. অপেক্ষাকৃত পাতলা প্রাণসত্তা ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত পরিধিস্থ পেরিপ্লাজম (ঘ)। পরবর্তী সময়ে পেরিপ্লাজমের কেন্দ্রিকাগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবত *Pythium*–এর স্থলজ স্বভাবের জন্যই শুক্রাণুস্থলীতে কোনো সচল শুক্রাণু তৈরি হয় না।

হাইফি ২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও রেণুস্থলী গঠন করে ; কিন্তু কম তাপমাত্রায় ১০° হতে ১৭° সেলসিয়াস হাইফি বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং ভেসিকলের মধ্যে চলরেণু উৎপন্ন হয়।

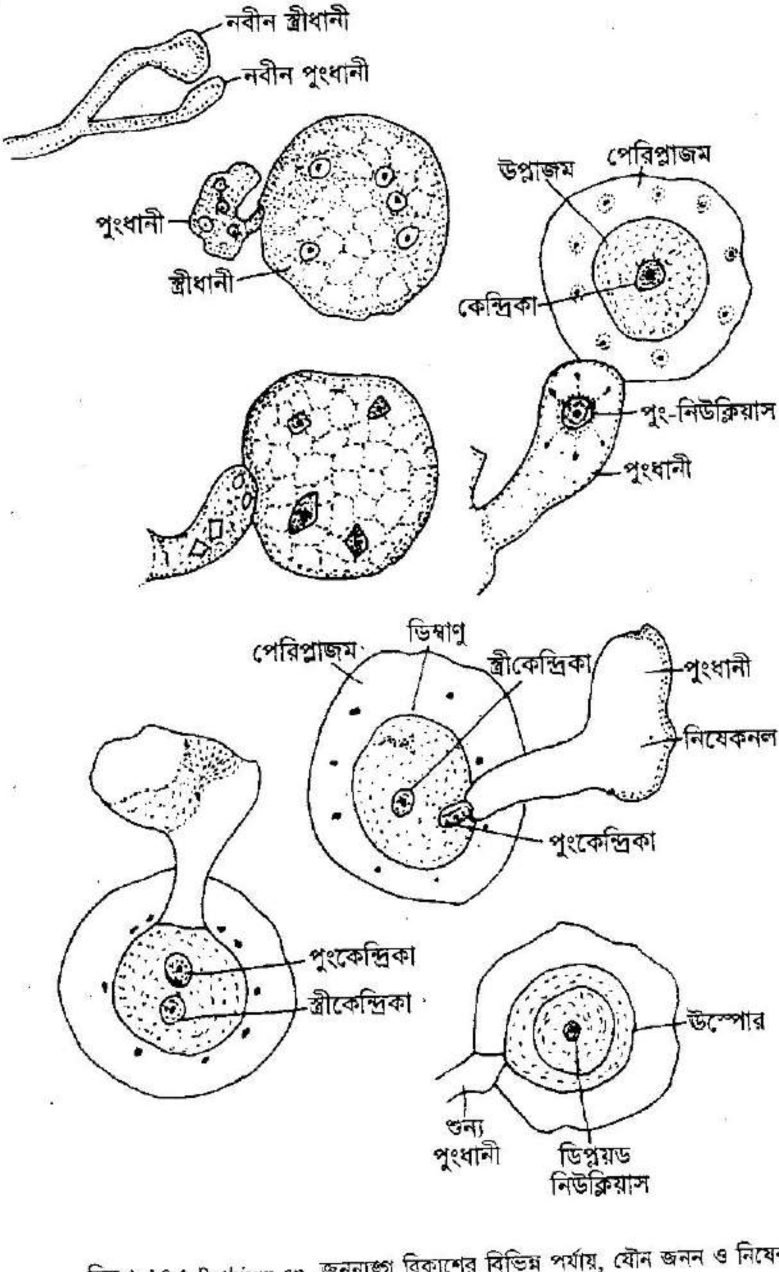

চিত্র ৬.১৭ : *Pythium* sp. জননাঙ্গ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, যৌন জনন ও নিষেক

গ. নিষেক

শুক্রাণুস্থলীটি সামান্য বেঁকে গিয়ে ডিম্বাণুস্থলীকে স্পর্শ করে এবং স্পর্শ স্থান স্ফীত হয়ে উঠে। এ ধরনের জননকোষাধার সংযোগ পুং বা স্ত্রীধানীর বক্রতার ফলে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যদি পুংধানীটি বাঁকা হয় তবে তাকে প্যারাগাইনাস সংযোগ বলে।

অতঃপর পুংধানীটি একটি সরু ও নলাকার নিষেক বা সংশ্লেষ নল তৈরি করে। এসময় স্পর্শস্থান দ্রবীভূত হয়ে যায়। সংশ্লেষ নলটি ডিম্বাণুস্থলী প্রাচীর ও পেরিপ্লাজম ভেদ করে উপ্লাজমে প্রবেশ করে। সংশ্লেষনলের মাধ্যমে কিছুটা প্রাণসত্তাসহ পুংগ্যামেটটি উপ্লাজমে প্রবেশ করে। পুং-কেন্দ্রিকা ও ডিম্বাণু কেন্দ্রিকার মিলনের ফলে উস্পোর তৈরি হয় (ছ)। উস্পোরটি দ্বি-স্তরীয় প্রাচীরাবৃত (চিত্র ৬.১৮ ক)। প্রজাতিভেদে বহিঃস্তরটি (exine) মসৃণ বা কণ্টকিত এবং অন্তঃস্তরটি সবসময়ই মসৃণ হয়। উস্পোরটি বিশ্রামরেণু সেহেতু এখানে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু হিসেবে তেলবিন্দু থাকে। *P. debaryanum*-এর উস্পোরটি মসৃণ প্রাচীরযুক্ত। এটি আংশিকভাবে ডিম্বাণুস্থলীর গহ্বর পূর্ণ করে ; সেহেতু একে aplerptic বলে।

Drechsler (১৯৪৬) উল্লেখ করেন যে, *Pythium*-এ অপুংজনিভাবে জনন দেখা যায়। অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে পার্থেনোরেণু বলে। এটি উস্পোরের ন্যায় আচরণ করে।

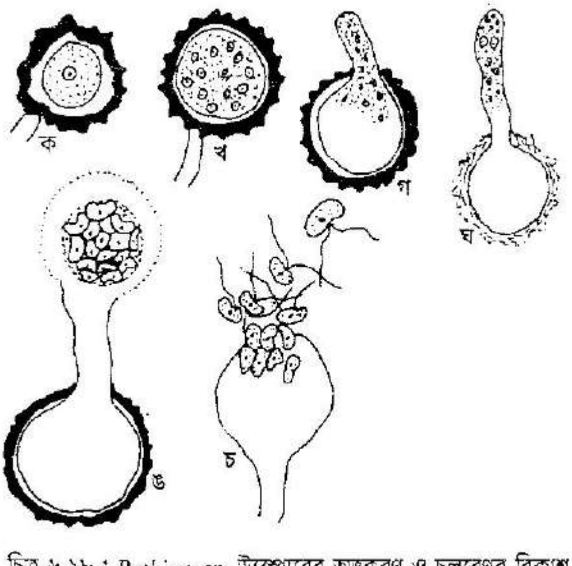

চিত্র ৬.১৮ : *Pythium* sp. উস্পোরের অঙ্কুরণ ও চলরেণুর বিকাশ

উস্পোরের অঙ্কুরণ

উস্পোরটি দীর্ঘসময় অবসর বিনোদনে থাকার পর অনুকূল পরিবেশের আগমন হলে অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরণে পূর্বে উস্পোরের ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি কয়েকবার বিভক্ত হয়ে হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকায় পরিণত হয় (Edison, ১৯১৫)। Eva Sansome (১৯৬৩) উল্লেখ করেন যে, *P. debaryanum*-এর যৌন জননাঙ্গে গ্যামেট তৈরির সময় মিওটিক নিয়মে বিভাজন হয় ; কিন্তু উস্পোরে মিওটিক বিভাজন হয় না। তাঁর এ ধারণা মতে মাইসেলিয়াম ডিপ্লয়েড হয়ে থাকে এবং গ্যামেটই একমাত্র

হ্যাপ্লয়ড দশার প্রতিনিধি বলে গণ্য হয়। উস্পোরের অঙ্কুরণ প্রজাতিভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে সাধারণভাবে নিম্নবর্ণিত উপায়ে উস্পোরের অঙ্কুরণ হয়ে থাকে :

১. উস্পোরটি পানি শোষণ করে স্ফীত হয় ; ফলে এটির বহিঃত্বক বিদীর্ণ হয় এবং অন্তঃত্বকটি ফাটল পথে একটি ক্ষুদ্র নলের আকারে বের হয়ে আসে ও হাইফিতে রূপ নেয়। এ হাইফিই পোষককে আক্রমণ করতে পারে এবং পোষককে শাখা-প্রশাখা দিয়ে মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়। *Pythium*-এর জীবনচক্র নিচে দেওয়া হলো (চিত্র ৬.১৯)।

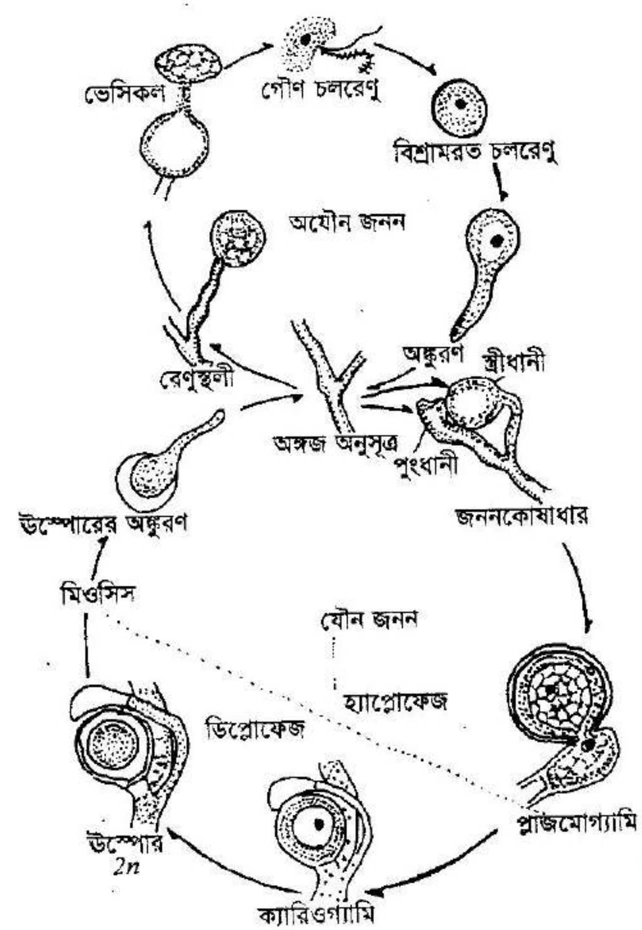

চিত্র ৬.১৯ক : *Pythimn* sp.-এর জীবনচক্র

২. বহিঃত্বক বিদীর্ণ হলে অন্তঃত্বকটি একটি হাইফির আকারে (গ-ঘ) বের হয়ে আসে। এ হাইফিটির শীর্ষদেশ স্ফীত হয়ে ভেসিকলসদৃশ রেণুস্থলী গঠন করে (*P. debaryanum*)। এতে সমুদয় প্রোটপ্লাস্ট এসে জমা হয়। শীর্ষ রেণুস্থলীটি চলরেণুস্থলী হিসেবে আচরণ করে চলরেণু দিতে পারে (b) বা খসে পড়তে পারে। খসে পড়া রেণুস্থলীটি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর-নলও দিতে পারে।

চিত্র ৬.১৯খ : *Pythium* sp.–এর জীবনচক্রের রেখারূপ

৩. কোনো কোনো প্রজাতিতে (*P. anaandrum* ও *P. manillatum*) উস্পোরের সমুদয় প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত হয়ে দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু উৎপন্ন করে। উস্পোর প্রাচীর ভেঙে যায় এবং চলরেণুগুলো একটি ভেসিকলের মাধ্যমে মুক্ত হয়। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ভেসিকলটি বিলুপ্ত হলে চলরেণুগুলো মুক্ত হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি চলরেণু অঙ্কুরিত হয় ও পোষককে আক্রমণ করে ও পোষককলায় মাইসেলিয়াম গঠন করে।

Drechser (১৯৪৬)–এর মতে উচ্চ তাপমাত্রায় (২৪°C) উস্পোরটি সরাসরি অঙ্কুর-নল উৎপন্ন করে অঙ্কুরিত হয়। পরে এটি নতুন মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় (১০ থেকে ১৭° সেলসিয়াস) অঙ্কুরনলের শীর্ষটি স্ফীত হয়ে ভেসিকল গঠন করে। উস্পোরের সমুদয় প্রোটোপ্লাস্ট এ ভেসিকলের মধ্যে চলে আসে এবং চলরেণু উৎপন্ন করে।

Pythium–এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Pythium–এর অধিকাংশ প্রজাতিই বহুবিধ অর্থকরী ফসলের পরজীবী ও হাজা বা ড্যাম্পিং-অফ রোগের, মূলের ও ফলের পচন সৃষ্টি করে প্রভূত আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

১. *Pythium debaryonum*–নামক প্রজাতি তামাক, মরিচ এবং সরিষাজাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদের ড্যাম্পিং-অফ রোগের কারণ।

২. *P. myriotylum* ও *P. aphanidermatum* প্রজাতিদ্বয় আদার কাণ্ডক্ষত রোগের সৃষ্টি করে এবং পেঁপে গাছে কাণ্ডপচন বা নরম পচন রোগ সৃষ্টি করে।

৩. *P. aphanidermatum*–প্রজাতি পেঁপে ফলে "soft-rot" রোগের কারণ (Subramanium, ১৯২০)।

৪. *P. iudicum*–ঢেঁড়শ-ফলের "fruit-rot" নামক পচন রোগের কারণ (Balakrisnan, ১৯৪৮)।

৫. *P. graminicolum* প্রজাতি হলুদের রাইজোম ও মূলের এবং গমের পচন রোগ সৃষ্টি করে থাকে (Ramakrishna ১৯৫৪)।

'Root rot' ও 'damping off' রোগদ্বয় ফসলের মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ। এ রোগের কারণ *Pythium* নামক ছত্রাক। অঙ্কুরণে স্বল্পতা এবং দুর্বল আকৃতির চারার ক্ষেত্রে এ ছত্রাকই দায়ী। কিছু কিছু প্রজাতি ক্ষত ও পচনের জন্যও দায়ী।

Damping off রোগের আক্রমণ, লক্ষণ ও বিস্তার

Damping off-রোগের জন্য *Pythium debaryanum* নামক ছত্রাকটিই দায়ী। Cruciferae ও Solanaceae গোত্রীয় তামাক, মরিচ, সরিষা, মুলা, শালগম প্রভৃতি উদ্ভিদের হ্যজা রোগ সৃষ্টি করে। ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বীজতলা থেকেই রোগের আক্রমণ শুরু হয়। ছত্রাকটির চলরেণু বীজপত্রাবকাণ্ডে প্রথম আক্রমণ করে। চারাগাছে ছত্রাকটি যতই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ততই রোগ মারাত্মক রূপ নেয়। চারাগাছের নিম্নাংশে পচন শুরু হয় ও ভেজা মনে হয়। এ সময় চারাগাছটি নুয়ে পড়ে এবং এক সময় মারা যায়। অতঃপর ছত্রাকটি এর দেহাবশেষে মৃতজীবীরূপে বেঁচে থাকে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ড্যাম্পিং-অফ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে :

১. Biltox-50 ও Arasam রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করে বীজত্বকে একটি রক্ষণকারী প্রলেপ তৈরি করলে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।
২. যেহেতু ভেজা মাটি, আর্দ্র আবহাওয়া, চারার ঘনবসতি এ রোগ বিস্তারের অনুকূল সেহেতু এ পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
   ক. পাতলা করে বীজ বপন করা।
   খ. পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থাসহ উঁচু স্থানে বীজতলা তৈরি করা।
   গ. উত্তমরূপে পচা সারের প্রয়োগ।
   ঘ. বীজতলায় আলো-বাতাসের সুব্যবস্থা করা।
   ঙ. হালকা সচ্ছিদ্র, নির্বীজকৃত মাটিতে বীজতলা তৈরি করা।
   চ. শুষ্ক তাপ প্রয়োগ করে মাটি শোধন করে বীজতলা নির্মাণ করা।
   ছ. প্রতি বর্গফুটে অর্ধ গ্যালন বর্দোমিশ্রণ কিংবা ৫০ ভাগ পানি ও ১ ভাগ ফরমালডিহাইড মিশ্রণের সাথে বর্দোমিশ্রণ মিশিয়ে (প্রতি বর্গ ফুটে অর্ধ গ্যালন) ব্যবহার করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।
   জ. 0.2% Fytalon, 0.6% Perenox ও 0.2% Flit-406 বীজতলায় প্রয়োগ করলে damping off রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

Pythium-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. মাইসেলিয়াম শাখাযুক্ত, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও সিনোসাইটিক।
২. অধিকাংশ প্রজাতিই পরজীবী।
৩. *P. debaryanum*-'হাজা' রোগ সৃষ্টি করে।
৪. হাইফি অন্তঃ ও আন্তঃকোষীয় প্রকৃতির।
৫. চলরেণু ও কনিডিয়ার মাধ্যমে অযৌন জনন হয়। গিমা ও ক্ল্যামাইডোরেণু দ্বারা অযৌন জনন হয়ে থাকে।

৬. যৌন জনন উগ্যামীয় ও ছত্রাকটি সহবাসী।
৭. পুংধানী প্যারাগাইনাস প্রকৃতির।

২. প্রতীক গণ : *Phytophthora*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ —Eumycotina
শ্রেণি—Domycetes
বর্গ—Peronosporales
গোত্র—Pythiaceae
গণ—*Phytophthora*
প্রজাতি— *Phytophthora infestans*

প্রকৃতি ও বসতি

সপুষ্পক উদ্ভিদের পরজীবী এ ছত্রাকটি আলুচাষীদের জন্য আতঙ্কস্বরূপ। তাই De Bary (১৮৭৯) এটির নামকরণ করেন *Phytophthora* যার অর্থ হলো উদ্ভিদ ধ্বংসকারী। এ ছত্রাকটির সাথে *Pythium* নামক ছত্রাকটির খুবই ঘনিষ্ঠ ও জাতিজনিক সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু এদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। *Phytophthora* গণে প্রায় ৭৫টি প্রজাতি রয়েছে এবং এদের অধিকাংশই পরজীবী ও স্থলবাসী (Waterhouse, ১৯৩৬)। অবশ্য, কখনও কখনও এদের মৃতজীবীরূপেও দেখা যায়। *Phytophthora infestams* নামক ছত্রাকটি আলু গাছকে আক্রমণ করে একপ্রকার পচন রোগ সৃষ্টি করে। এ ধরনের মারাত্মক রোগকে বিলম্বিত ধ্বসা রোগ বলে। এ রোগে প্রথমত উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ, বিশেষত পাতাগুলো আক্রান্ত হয় এবং দ্বিতীয়ত কখনও কখনও ভূনিম্নস্থ স্ফীত কন্দে শুষ্ক পচন রোগের সৃষ্টি করে থাকে বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

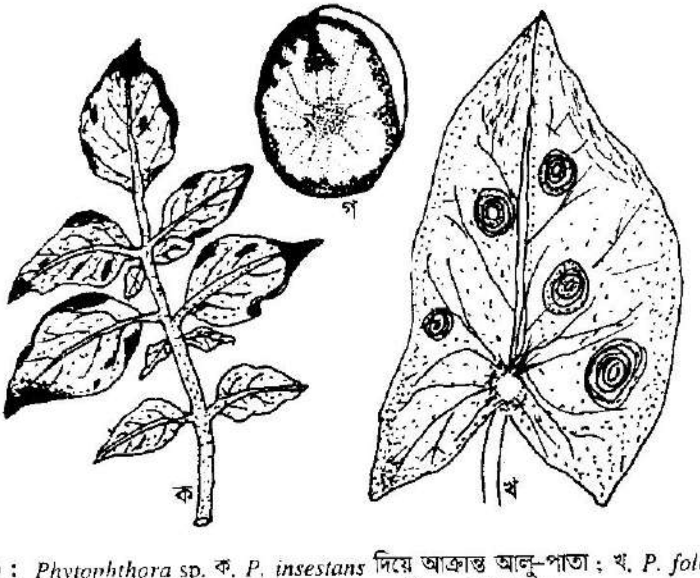

চিত্র ৬.২০ : *Phytophthora* sp. ক. *P. insestans* দিয়ে আক্রান্ত আলু-পাতা ; খ. *P. folocasiae* দিয়ে আক্রান্ত কচুপাতা ; গ. *P. infestans* দিয়ে আক্রান্ত আলু

দৈহিক গঠন

P. infestans–এর মাইসেলিয়াম সুগঠিত, শাখাবহুল, স্বচ্ছ, সিনোসাইটিক ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন পুরু হাইফি সমন্বয়ে গঠিত। হাইফি প্রায় ৪ থেকে ৮ মিলিমিটার চওড়া ; কোষপ্রাচীর গ্লুকানপ্রধান। এতে সেলুলোজ খুবই কম থাকে কিংবা একেবারেই থাকে না (Mitchell and Sabar, ১৯৬৬)। প্লাজমাপর্দাটি অভ্যন্তরভাগে কোষপ্রাচীরের সাথে লেগে থাকে। প্রাণসত্তায় বড় ধরনের গহ্বর, বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রিকাসমূহ, মাইটোকন্ড্রিয়া অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা, রাইবোজম ইত্যাদি কোষীয় অঙ্গাণু থাকে। বর্ধনশীল হাইফিতে প্রস্থপ্রাচীর না থাকলেও পরিণত হাইফিতে কিংবা ক্ষতস্থানকে সীমিত রাখার জন্য অথবা জননাঙ্গকে বহনকারী শাখা হতে আলাদা করার জন্য প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় (Coleman, ১৯১০ ; Tamison, ১৯৫২)। পোষকে দেহকলার কোষমধ্যবর্তী স্থানে মাইসেলিয়ামগুলো আশ্রয় নেয় এবং চোষকমূল কোষমধ্যে প্রবেশ করে শাখান্বিত হয় ও পুষ্টি সংগ্রহ করে।

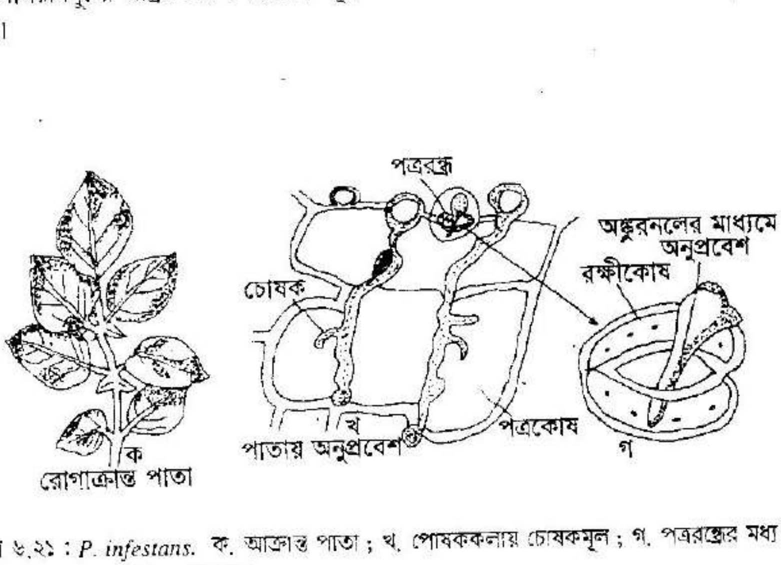

চিত্র ৬.২১ : *P. infestans.* ক. আক্রান্ত পাতা ; খ. পোষককলায় চোষকমূল ; গ. পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কুরনলের প্রবেশ

জনন প্রক্রিয়া

P. infestans অযৌন ও যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধির কাজ করে থাকে।

ক. অযৌন জনন

চলরেণুর সাহায্যে বংশবিস্তারই *Phytophthora* ছত্রাকের অযৌন জননের প্রধান উপায়। তবে অনেক সময় কনিডিয়াম ও ক্ল্যামাইডোরেণুর মাধ্যমেও অযৌন জনন হয়ে থাকে।

শুষ্ক আবহাওয়ায় হাইফিগুলো শাখা–প্রশাখাযুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেলেও জনন কাজে অংশ নেয় না। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় মাইসেলিয়াম হতে এক ধরনের শাখান্বিত হাইফি উৎপন্ন হয়। এ হাইফিগুলো প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। এসব বায়ব শাখাগুলো অবস্থাভেদে রেণুস্থলীধর বা কনিডিয়াধর হিসেবে কাজ করে। সাধারণত প্রতিটি পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ৪টির মতো রেণুস্থলীধর বেরিয়ে আসে। এগুলো অসমান, শাখান্বিত, দীর্ঘাকার ও শীর্ষভাগ ডিম্বাকার স্ফীতিযুক্ত।

আবার এসব কনিডিয়াধর বা রেণুস্থলীধর অনেক সময় পেন্টিসেল বা ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়েও বাইরে বের হয়ে আসে। আবহাওয়াজাত পরিবেশভেদে এগুলো হতে রেণুস্থলী বা কনিডিয়াম উৎপন্ন হয়।

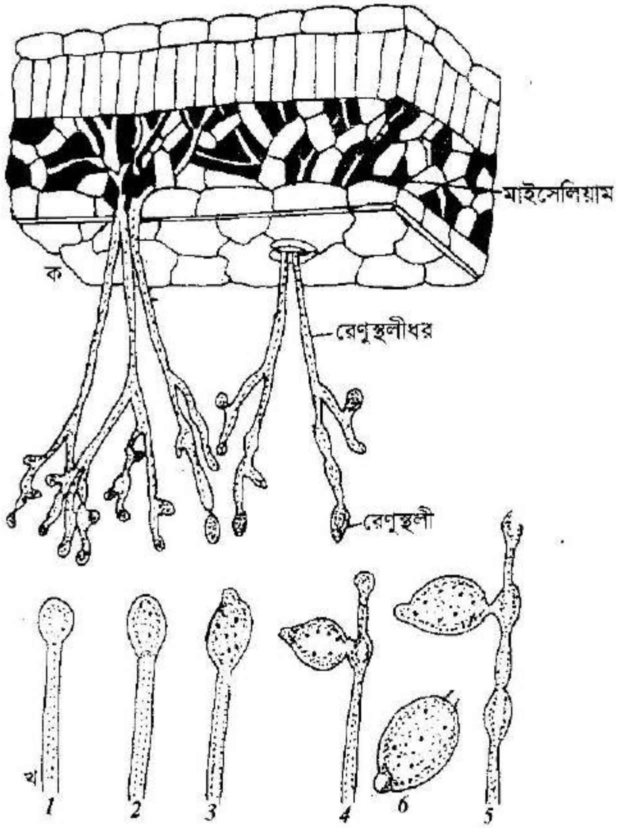

চিত্র ৬.২২ *Phytophthora infestans* : ক. আক্রান্ত আলুপাতার দৈর্ঘচ্ছেদে আন্তঃকোষীয় মাইসেলিয়াম ও রেণুস্থলীধর ; খ. রেণুস্থলী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়

রেণুস্থলীর বিকাশ : প্রতিটি রেণুস্থলীধরের শীর্ষভাগে একটি করে রেণুস্থলী তৈরি হয়। এটি পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত বর্ণহীন ও লেবুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং শীর্ষভাগ প্যাপিলাবিশিষ্ট (খ$_১$)। রেণুস্থলীধরের (খ$_১$) পার্শ্ব শাখার শীর্ষভাগ স্ফীত হয়ে রেণুস্থলী তৈরি হয়। অতঃপর এ বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত স্ফীত শীর্ষভাগের গোড়ায় একটি প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় ; ফলে রেণুস্থলীটি রেণুস্থলীধর হতে পৃথক হয় (খ$_৬$)। রেণুস্থলীধরটি বর্ধনশীল থাকে (খ$_৪$) বলে রেণুস্থলীটি একপাশে সরে যায় এবং শীর্ষভাগটি কিছুটা উপরে উঠে আবার স্ফীত হয় ও রেণুস্থলী দেয়। এ সময় প্রথম রেণুস্থলীটি পূর্ণতা পায়। এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে একাদিক্রমে ৯/১০টি রেণুস্থলী তৈরি হয়ে থাকে। প্রতিটি রেণুস্থলীর গোড়ায় অর্থাৎ রেণুস্থলীধরের যেস্থানে রেণুস্থলীটি যুক্ত থাকে, সেখানে কিছুটা স্ফীতি থেকেই যায় (ঘ$_৪$)। কাজেই রেণুস্থলীগুলো শীর্ষভাবে উৎপন্ন হলেও অবস্থান থাকে

পার্শ্বীয়। পরিণত রেণুস্থলীগুলোর সংযুক্তি আলগা হয়ে যায় ও সহজেই ঝরে পড়তে পারে। ঝরে–পড়া রেণুস্থলীর গোড়ায় ও রেণুস্থলীর গায়ে যে স্ফীতি থাকে সেখান হতে আবার রেণুস্থলীধরের উৎপত্তি হতে পারে।

কনিডিয়াম : বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও এর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে চলরেণুর পরিবর্তে কনিডিয়াম উৎপন্ন করে অযৌন জনন কাজ সম্পন্ন করে। অন্যকথায়, পরিবেশের বিভিন্নতা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে একই জননাঙ্গ রেণুস্থলী বা কনিডিয়াম রূপে কাজ করে। তাই শুষ্ক আবহাওয়া ও তাপমাত্রা অধিক হলে জননাঙ্গের প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত না হয়ে কনিডিয়ারূপে কাজ করে।

ক্ল্যামাইডোরেণু : পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা অনুকূল না হলে *Phytophthora*–এর কোনো কোনো প্রজাতি ক্ল্যামাইডোরেণু নামক বিশ্রামরেণু তৈরি করে। এ রেণুগুলো অনুকূল পরিবেশের আগমনে ছোট ছোট অঙ্কুর-নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। এসব অঙ্কুর–নলের শীর্ষে রেণুস্থলী গঠিত হয়।

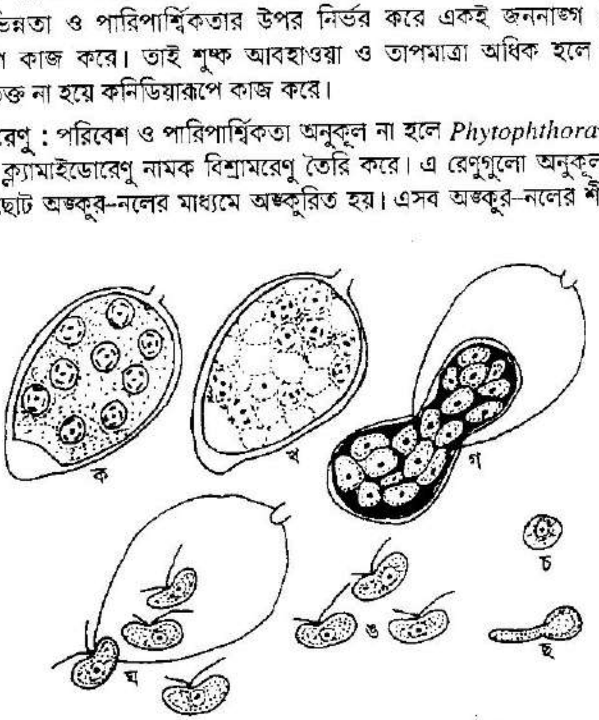

চিত্র ৬.২৩ : *Phytophthora* sp. পরোক্ষ অঙ্কুরণের বিভিন্ন দশা

রেণুস্থলীর বিসরণ : পূর্ণতাপ্রাপ্ত রেণুস্থলী ডিম্বাকৃতি ও বর্ণহীন ; এদের প্রাচীর পাতলা ও থলিসদৃশ হয়। এদের বৃন্ত খাটো ও শীর্ষ প্যাপিলাবিশিষ্ট। এগুলো খুব সহজে বিচ্যুত হয়ে ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, এদের সজীবতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

অঙ্কুরণ : বিচ্যুত রেণুস্থলীগুলো সতেজ–সবল আলু-পাতার উপর পতিত হলে এবং আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা অনুকূল হলে ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। Cochrane–এর মতে, এসময় আর্দ্রতা ১০০%–এর চেয়েও কম হলে রেণুস্থলী নষ্ট হয়ে যায়। আবহাওয়া ও তাপমাত্রা শুষ্ক হয় তবে রেণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত হয় না এবং কনিডিয়ারূপে কাজ করে বা আবহাওয়া আর্দ্র বলে প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত হয়ে দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত হ্যাপ্লয়েড চলরেণু উৎপন্ন করে। অতঃপর প্যাপিলা বিদীর্ণ করে চলরেণুগুলো বের হয়ে আসে। চারপাশের জলবিন্দু বা শিশিরবিন্দুতে কিছু সময় সাঁতার কেটে বেড়ানোর পর (কয়েক মিনিট) ফ্লাজেলা গুটিয়ে নিয়ে গোলাকার হয়। অতঃপর অঙ্কুর–নলের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাপমাত্রার প্রেক্ষাপটে অঙ্কুরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। ৪৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেণুস্থলী কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে এবং সোজাসুজি অঙ্কুর-নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। Elsner Vander Moleu, Hoton, (১৯৭০) ও Bowen উল্লেখ করেন যে, ২০ থেকে ২৩° সেলসিয়াসে অবিভক্ত প্রাণসত্তাসহ রেণুস্থলী হতে বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত অঙ্কুর-নল বের হয়ে আসে। আর্দ্র তাপমাত্রায় চলরেণু উৎপন্ন হয়।

ক. পরোক্ষ অঙ্কুরণ (চিত্র ৬.২৩) : পানি বা শিশিরের উপস্থিতিতে ১২° সে. তাপমাত্রায় রেণুস্থলীটি চলরেণুস্থলীরূপে কাজ করে (ক)। এটির প্রোটোপ্লাজম ৫ থেকে ৮টি হ্যাপ্লয়ড খণ্ডে বিভক্ত হয় (খ)। এ খণ্ডগুলো ক্রমরূপান্তরিত হয়ে বৃক্কাকার দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণুতে পরিণত হয়। ফ্লাজেলা দুটির মধ্যে একটি হুইপল্যাস ও অন্যটি টিনসেল ধরনের হয়ে থাকে। Perus (১৯৫৪) উল্লেখ করেন যে, ফ্লাজেলা বৃক্কাকার চলরেণুর অবতল অংশে যুক্ত থাকে। *P. cactorum*-এ প্যাপিলা বিদীর্ণ করে ভেসিকলের মধ্য দিয়ে চলরেণুগুলোর মুক্তি ঘটে। *P. infesfestans*-এ কোনো ভেসিকল গঠিত হয় না। মুক্তিপ্রাপ্ত চলরেণুগুলো (খ) কিছুসময় সাঁতার কাটে। অতঃপর ফ্লাজেলা হারিয়ে গোলাকার হয়ে প্রাচীরাবৃত হয় (চ)। অতঃপর বিশেষ ধরনের খাটো অ্যাপ্রেসোরিয়াম হাইফির মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। অ্যাপ্রেসোরিয়াম পাতার সাথে লেগে থাকে। এটি নিচ-তল থেকে পেগসদৃশ সংক্রমণ হাইফি বের হয়ে পোষকত্বক ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে।

চলরেণুর মাধ্যমে জনন অনুন্নত প্রকৃতির। এতে এ ধরনের উপস্থিতি পূর্বপুরুষের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

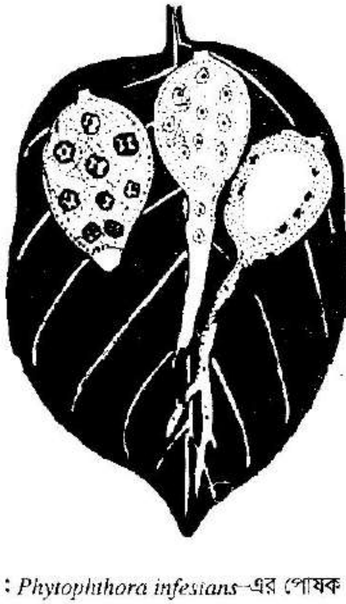

চিত্র ৬.২৪ : *Phytophthora infestans*-এর পোষক পাতার ওপর অঙ্কুরণ

খ. সরাসরি অঙ্কুরণ (চিত্র ৬.২৪) : ২৪° সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা থাকলে রেণুস্থলীতে (১) টি চলরেণু তৈরি না করে কনিডিয়ার মতো কাজ করে এবং সরাসরি অঙ্কুরনল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় (২)। এ অঙ্কুর-নলটি পোষক দেহে প্রবেশ করে মাইসেলিয়াম গঠন করে। আবহাওয়া অনুকূল হলে হাইফিগুলো শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয়ে বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে পড়ে।

সংক্রমণ : Priston ও Gallegly (১৯৫৪) চলরেণুর অঙ্কুরণ অনুশীলন করে উল্লেখ করেন যে, সংক্রমণকালে অ্যাপ্রোসোরিয়াম গঠিত হয়। অঙ্কুর-নলের শীর্ষভাগ পাতার ত্বকের উপর বর্ধিত হয় এবং প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা অঙ্গ গঠন করে। একেই অ্যাপ্রোসোরিয়াম বলে। অ্যাপ্রোসোরিয়াম তলদেশ হতে সূক্ষ্ম, নলাকার, পেগ্‌সদৃশ উপবৃদ্ধি উত্থিত হয় ; একে সংক্রমণ হাইফি বলে। এ হাইফিটি কৃত্তিকা ভেদ করে পোষকের ত্বকীয় কোষকলায় প্রবেশ করে ও সংক্রমণ ঘটায়। অতঃপর সংক্রমণ পেগটি স্ফীত হয়ে স্বাভাবিক হাইফিসদৃশ হয়।

কনিডিয়া ও রেণুস্থলীর উৎপত্তির উপর পরিবেশের প্রভাব

শুষ্ক আবহাওয়ায় রেণুস্থলীগুলো বেশিক্ষণ সজীব ও সতেজ থাকে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এদের মৃত্যু হয় (Cochrame, ১৯৫৮)। রেণুস্থলীগুলো ১৫° সে. থেকে ২৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অঙ্কুরিত হয়। তবে ২০° সে. তাপমাত্রার উপরে শুষ্ক আবহাওয়াজনিত পরিবেশে ১ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় ৫ থেকে ১৫ ঘণ্টার মধ্যে সতেজ ও সজীবতা হারায়।

নিম্নতাপমাত্রা রেণু উৎপাদনের অনুকূল কিন্তু উষ্ণ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়া কনিডিয়া তৈরির ও সরাসরি অঙ্কুরণের অনুকূল। সরাসরি অঙ্কুরণের সর্বোত্তম তাপমাত্রা হলো ২৪° ও চলরেণুর জন্য ১২° সেলসিয়াস। উচ্চ তাপমাত্রায় চলরেণুগুলো প্রায় ১৫ মিনিট সাঁতার কাটে। পক্ষান্তরে নিম্ন তাপমাত্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সাঁতার কাটতে পারে।

উপরের আলোচনা হতে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, কম তাপমাত্রা ও অধিক আর্দ্রতা চলরেণু উৎপাদনের অনুকূল। সেহেতু ঠাণ্ডা ও ভেজা আবহাওয়ায় এরূপ অসংখ্য চলরেণু উৎপন্ন হয় এবং রোগও অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই এরূপ আবহাওয়া আলুর জন্য খুবই বিপজ্জনক।

Phytophthora ও *Pythium*-এর অযৌন জননের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Phytophthora	***Pythium***
১. রেণুস্থলীধরের শীর্ষভাগে উৎপন্ন হলেও পার্শ্বীয়ভাবে রেণুস্থলীগুলো অবস্থান করে।	১. অঙ্গজ হাইফিসদৃশ রেণুস্থলী হাইফির শীর্ষভাগে উৎপন্ন হয়।
২. রেণুস্থলী আকৃতি লেবুসদৃশ, প্যাপিলাযুক্ত ও পার্শ্বীয়।	২. গোলাকার বা ডিম্বাকার রেণুস্থলী, অবস্থান প্রান্তীয় বা নিবেশিত।
৩. রেণুস্থলীর মধ্যে চলরেণুর বিকাশ ঘটে এবং প্যাপিলা বিদীর্ণ করে নির্গত হয় ; কোনোরূপ ভেসিকল তৈরি হয় না ; উদাহরণ *P. infestans.*	৩. চলরেণুর বিকাশ রেণুস্থলী হতে নির্গত ভেসিকলের মধ্যে হয়ে থাকে। ভেসিকলের আকস্মিক বিদারণের ফলে চলরেণুর মুক্তি ঘটে।
৪. অঙ্কুর-নল হতে উৎপন্ন অ্যাপ্রোসোরিয়াম হতে যে সংক্রমণ পেগ হাইফি তৈরি হয় তার সাহায্যে পোষকের ত্বকীয় কোষের মধ্যে অঙ্কুর-নল প্রবেশ করে।	৪. এখানে কোনো অ্যাপ্রোসোরিয়াম গঠিত হয় না। অঙ্কুরনলটি পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বা ত্বকীয় কোষের উপর উৎসেচক ক্রিয়ার মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করে।

যৌন জনন

Phytophthora-এর যৌন জনন সর্বপ্রথম Clinton (১৯১১) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। *Phytophthora*-এর যৌন জনন উগ্যামীয়। *P. infestans* ছত্রাকটি সহবাসী বা ডিম্ববাসী প্রকৃতির। তবে জননাঙ্গগুলো পোষক দেহে দেখা যায় না, কিন্তু কৃত্রিম মাধ্যমে এগুলোকে প্রচুর

পরিমাণে দেখা যায়। সম্প্রতি জানা গেছে যে, *P. infestans* ছত্রাকটি ভিন্নবাসী বা হেটারোথ্যালিক। পুংজননাঙ্গকে শুক্রাণুস্থলী ও স্ত্রীজননাঙ্গকে ডিম্বাণুস্থলী বলে। এগুলো দুটি বিপরীতধর্মী মাইসেলিয়ামের বিশেষ পার্শ্বীয় অনুসূত্রের অগ্রভাগ হতে উৎপন্ন হয় (খ)। *P. cactorum* সহবাসী প্রজাতি। এ ক্ষেত্রে পুংধানী ডিম্বাণুস্থলীর সাথে পার্শ্বীয়ভাবে যুক্ত থাকে—এরূপ অবস্থাকে প্যারাগাইনাস বলে।

শুক্রাণুস্থলী : একটি পুংস্ট্রেনের খাটো ও পার্শ্বীয় হাইফির শীর্ষভাগে প্রায় ক্ল্যাভেট আকৃতির স্ফীতি আকারে শুক্রাণুস্থলীর সূচনা হয়। এটি ডিম্বাণুস্থলীর পূর্বেই উৎপন্ন হয়ে থাকে (ক)। তরুণাবস্থায় এটির প্রাচীর পাতলা থাকে এবং এর মধ্যস্থ প্রাণসত্তা ও গহ্বরবিহীন হয়। এতে সে সময় ১টি বা ২টি কেন্দ্রিকা থাকে। এ অবস্থা ডিম্বাণুস্থলীতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে। প্রস্থপ্রাচীরের মাধ্যমে এটি বৃন্ত হতে পৃথক হয় না। পূর্ণতাপ্রাপ্ত শুক্রাণুস্থলী ফানেলাকৃতির। এটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত ডিম্বাণুস্থলীর গোড়ায় "কলারের মতো" গঠন তৈরি করে (গ, খ) এবং এতে তখন ১২টির মতো কেন্দ্রিকা থাকে (মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে)। নিষেককালে এতে একটি সজীব ও সতেজ কেন্দ্রিকা থাকে এবং অন্যগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ডিম্বাণুস্থলী : অন্য একটি স্ট্রেনের পার্শ্বীয় অনুসূত্রের শীর্ষভাগে ডিম্বাণুস্থলী উৎপন্ন হয় (খ)। কাজেই শুক্রাণুস্থলীয় ও ডিম্বাণুস্থলীয় দুটি বিপরীতধর্মী ও পাশাপাশি অবস্থানকারী হাইফির শীর্ষভাগে জননাঙ্গ উৎপন্ন হয়। এরা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয় এবং বর্ধিষ্ণু পুংধানীর সংস্পর্শে আসে। ইতোমধ্যে স্ত্রীশাখার অগ্রভাগ পুংশাখার অগ্রভাগের (খ) মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়ে স্ফীত হয় এবং নাশপাতি আকৃতি বিশিষ্ট বা গোলাকার হয় ; এটিই অপরিণত ডিম্বাণুস্থলী। এতে বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত (৪০টি) দানাদার প্রাণসত্তা রয়েছে। এর নিম্নাংশ ফানেলাকৃতি ও পুংধানী বা শুক্রানণুস্থলীর মধ্যে অবস্থিত। ডিম্বাণুস্থলীটি প্লাগসদৃশ প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে বৃন্ত হতে পৃথক হয়। এখন, শুক্রাণুস্থলীটি "ফানেলাকৃতির কলার" হয়ে ডিম্বাণুস্থলীর গোড়ায় ও ডিম্বাণুস্থলীর বৃন্তের চারপাশে (ঘ,ঙ) লেগে যায়। এ ধরনের শুক্রাণুস্থলীকে অ্যাম্ফিগাইনাস বলে। এ সময় ডিম্বাণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্ট দুটি অংশে বিভেদিত হয়— (i) কেন্দ্রস্থলে এককেন্দ্রিকাযুক্ত উপ্লাজম (ঘ) এবং (ii) উপ্লাজমকে ঘিরে বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত বহিঃস্থ পেরিপ্লাজম থাকে। উপ্লাজমের কেন্দ্রিকাটি মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে দুটিতে পরিণত হয়। এদের ১টি বিলুপ্ত হয় (চ) এবং অন্যটি সবল ও সতেজ থাকে এবং ডিম্বাণুকেন্দ্রিকা হিসেবে কাজ করে। পেরিপ্লাজমের কেন্দ্রিকাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ইত্যবসরে, শুক্রাণুস্থলীর কেন্দ্রিকা দুটিও বিভক্ত হয়ে ১২টি পর্যন্ত কেন্দ্রিকা তৈরি করে। কিন্তু একটি ছাড়া সব কেন্দ্রিকা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, *P. infestans* ভিন্নবাসী ছত্রাক এবং এ গোত্রের যেগুলো সহবাসী সেগুলোও বিপরীতধর্মী মাইসেলিয়ামের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন হয়, তথা পরনিষেক। আবার *P. infestans* এর প্রতিটি স্ট্রেইনের শাখায় শুক্রাণুস্থলী ও ডিম্বাণুস্থলী উৎপন্ন হলেও তাদের মধ্যে মিলন হয় না ; কেননা, এরা সমধর্মী হয়ে থাকে।

নিষেকক্রিয়া

ডিম্বাণুস্থলীর ফানেলাকৃতি অংশের (শুক্রাণুস্থলীর মধ্যের অংশ) কোনো এক স্থানে সামান্য স্ফীতি দেখা দেয় ; একেই অভ্যর্থনা বিন্দু বলে। পরে এটি দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই ছিদ্রপথে শুক্রাণুস্থলী হতে একটি খাট নিষেক-নল তৈরি হয়। এ নিষেক-নলটি পেরিপ্লাজম ভেদ করে উপ্লাজমে প্রবেশ করে। এখানে নিষেক-নলটি উন্মুক্ত হয় এবং কিছু প্রাণসত্তাসহ একটি পুংকেন্দ্রিকা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে উস্পোর তৈরি করে (চ)। কোনো কোনো *phyfophthora* প্রজাতিতে ২-৩টি

প্যাপিলাসদৃশ উপবৃদ্ধি শুক্রাণুস্থলীতে দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে কোনো একটি ডিম্বাণুর সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এটির মাধ্যমেই পুংকেন্দ্রিকা ডিম্বাণুস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে ও নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

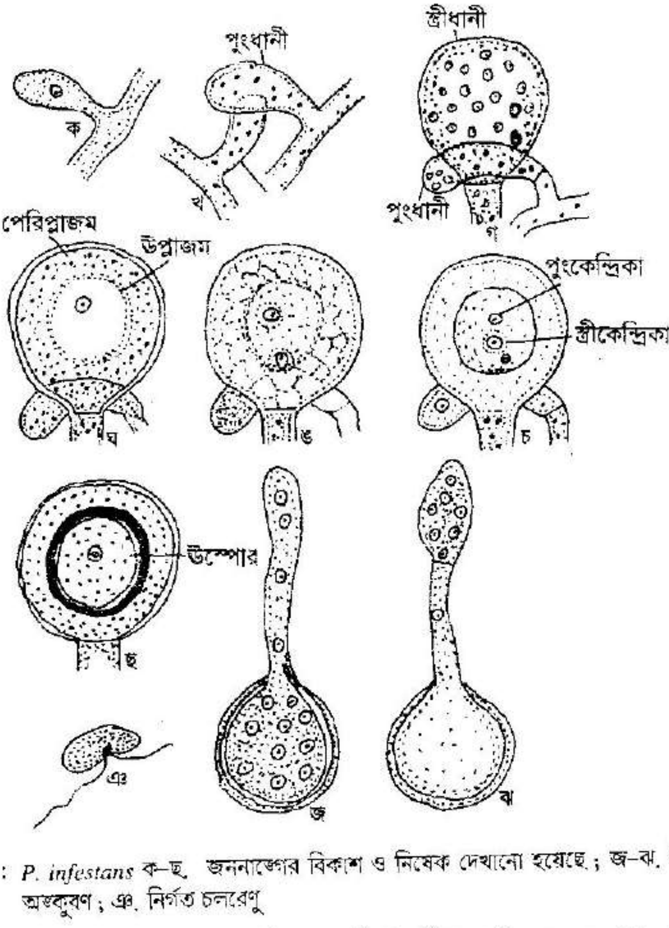

চিত্র ৬.২৫ : *P. infestans* ক–ছ. জননাঙ্গের বিকাশ ও নিষেক দেখানো হয়েছে ; জ–ঝ. উস্পোরের অঙ্কুরণ ; ঞ. নির্গত চলরেণু

নিষিক্ত ডিম্বাণুটি তার চারদিকে একটি পুরু প্রাচীর তৈরি করে নিজেকে আবৃত করে ; একেই উস্পোর বলে (ছ)। এটি একটি বিশ্রামরেণু। প্রকৃতিতে উস্পোর গঠন খুব একটি দেখা যায় না। তাই বেঁচে থাকার সংগ্রামে এটির ভূমিকাও নগণ্য। এ কারণেই ছত্রাক মাইসেলিয়াম আলুর মধ্যেই শীতকালটা কাটিয়ে দেয়। পুং ও স্ত্রীকেন্দ্রিকার মিলন বিলম্বিত হয়। তাছাড়া, পার্থেনোজেনিকভাবে উস্পোর তৈরির তথ্যও পাওয়া যায়।

উস্পোরের অঙ্কুরণ

উস্পোরের অঙ্কুরণ খুব সুস্পষ্ট নয়। অবসরযাপন সমাপ্ত হলে উস্পোর-কেন্দ্রিকার মিওটিক বিভাজন হয়। উস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর-নল দেয়। *P. cactorum*–এ অঙ্কুর-নলটি সরাসরি মাইসেলিয়াম দেয় ; *P. palmivora*–এর অঙ্কুর-নল শীর্ষভাগে রেণুস্থলী বহন

করে (ঝ)। Lkisiewicz (১৯১০) উল্লেখ করেন যে, *P. drechaleri*-তে অঙ্কুর-নলটি ডিম্বাণুস্থলী প্রাচীর ভেদ করে বা ডিম্বাণুস্থলীর বৃন্ত ভেদ করে বের হয় ও অগ্রভাগে রেণুস্থলী তৈরি করে। রেণুস্থলীর পদার্থসমূহ বিভক্ত হয়ে চলরেণু তৈরি করে। প্রতিটি চলরেণু (ছ) মুক্ত হয়ে সরাসরি অঙ্কুরণ মাধ্যমে মাইসেলিয়াম দেয়। Smoot এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী (১৯৫৮) উল্লেখ করেন যে, প্রান্তীয় রেণুস্থলী সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর-নল দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে উস্পোর গঠনের কথা Morphy (১৯২৭) উল্লেখ করেন।

রোগচক্র

অযৌন জননের সময় রেণুস্থলী হতে বের হয়ে চলরেণুগুলো কিছু সময় পানিতে সাঁতার কাটে এবং পরে ফ্লাজেলা গুটিয়ে নিয়ে গোলাকার হয় ও প্রাচীরাবৃত হয়ে বিশ্রাম নেয়। পরে অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত পোষক পেলে অঙ্কুরিত হয় ও অঙ্কুরনল দেয়। এ অঙ্কুর--নলের শীর্ষভাগে অ্যাপ্রোসোরিয়াম নামক একটি স্ফীত ও চ্যাপ্টা অংশ তৈরি হয়। এ অ্যাপ্রোসোরিয়াম হতে সূক্ষ্ম পিনসদৃশ নালিকা উৎপন্ন হয়ে পোষকের কাণ্ড বা পাতার বহিঃত্বক ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর পোষক দেহের কোষাবকাশের মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত হাইফি সমন্বয়ে সশাখ মাইসেলিয়াম গঠন করে। এসব হাইফির কতকগুলো কোষমধ্যে প্রবেশ করে চোষকমূল তৈরি করে পুষ্টি সংগ্রহ নিশ্চিত করে।

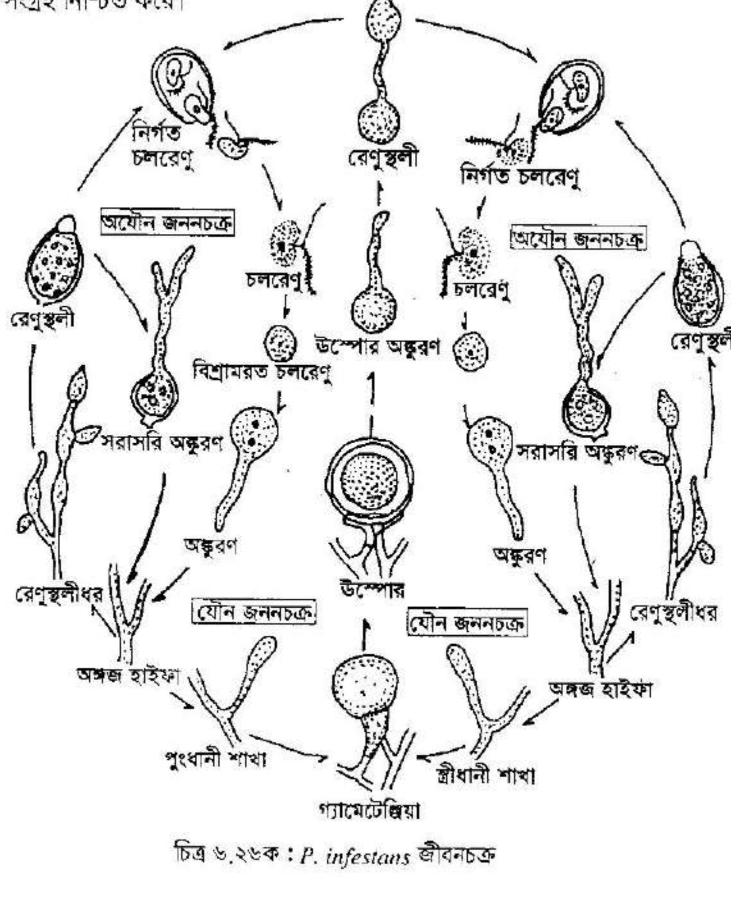

চিত্র ৬.২৬ক : *P. infestans* জীবনচক্র

অনুকূল পরিবেশ পেলে এসব মাইসেলিয়াম হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেণুস্থলীধর পত্ররন্ধ্র বা লেন্টিসেলের ভিতর দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। রেণুস্থলী হতে উৎপন্ন চলরেণুগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও সুস্থ আলু গাছকে আক্রমণ করে। এভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিস্তীর্ণ এলাকায় রোগের বিস্তারলাভ হয়। আক্রান্ত পাতাগুলো প্রথমদিকে হলুদ ও পরে বাদামি রং ধারণ করে। কালক্রমে কাণ্ড ও কন্দ আক্রান্ত হয়ে থাকে।

Phytophthora মাটিতে, আলুতে মাইসেলিয়াম, বিশ্রামরেণু সুপ্ত মাইসেলিয়াম বা স্ক্লেরোশিয়ামরূপে প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকার প্রয়াস চালায়। এ রোগ-জীবাণুটির জীবনচক্রের রেখাচিত্র নিচে দেয়া হলো :

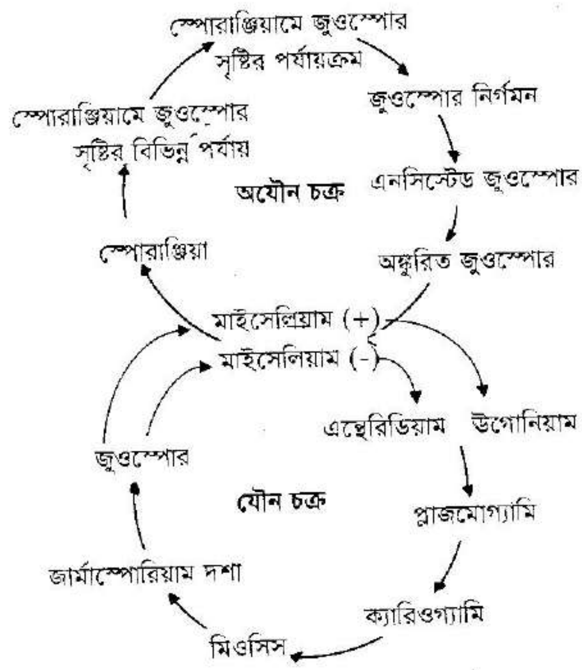

BANSDOC Library
Accession No. 18244

চিত্র ৬. ২৬খ : *P. infestons*—এর জীবনচক্রের রেখাচিত্র

রোগের লক্ষণ

Phytophthora infestans দ্বারা আক্রান্ত আলুগাছের পাতার কিনারা, শীর্ষ ও ফলকে প্রথমে হলুদ ও পরে কালচে দাগ দেখা দেয়। এ দাগগুলো খুব তাড়াতাড়ি বিস্তৃত হয়। কালক্রমে গোটা পাতাটি কুঁকড়ে যায়। তারপর, পাতার বোঁটা, কাণ্ড ও কন্দ আক্রান্ত হয়। সবশেষে একটি ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ বের হয় ও কন্দটি পচে যায়। এ রোগের আক্রমণ তীব্র হলে অল্পদিনের মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকার ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন উদ্ভিদে *Phytophthora* জনিত ছত্রাক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দু'ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে : ১. রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা ও ২. রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

১. **প্রতিকার ব্যবস্থা :** (ক) আক্রান্ত আলুক্ষেতে 'বোঁর্দো মিশ্রণ' ছিটিয়ে রোগের চলরেণুগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা যায়। 'বোঁর্দো মিশ্রণ' হলো কপার সালফেট বা তুঁতে ৫ পাউন্ড : কলিচুন (Cab) ৫ পাউন্ড : পানি ৫০ গ্যালন এর আনুপাতিক মিশ্রণ।

২. **প্রতিরোধ ব্যবস্থা :** আলুক্ষেতে যেন *Phytophthora* রোগের আক্রমণ না হয় সেজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

   ক. **রোগমুক্ত বীজের ব্যবহার :** রোগমুক্ত সুস্থ, সতেজ ও সজীব বীজের ব্যবহারও *Phytophthora* রোগ নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হতে পারে।

   খ. **রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণের ব্যবহার :** যেসব বীজ রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে বিজ্ঞানীরা সুপারিশ করেছেন সেগুলো ব্যবহার করেও রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

   গ **অতিরিক্ত সারের ব্যবহার বর্জন :** জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ আলুগাছের রোগ সংক্রমণ প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় বলে তা বর্জন করতে হবে।

   ঘ. **আলুকে ঢেকে রাখা :** আলুর কন্দগুলোকে ভালোভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে চলরেণুগুলো বা কনিডিয়াগুলো আক্রমণ করতে না পারে।

   ঙ. **আক্রান্ত আলুগাছগুলো পুড়িয়ে ফেলা :** আক্রান্ত আলু গাছের দেহাবশেষ পুড়িয়ে ফেললে পবরর্তী মৌসুমে রোগের আক্রমণ বহুলাংশে কমে যাবে।

   চ. **উত্তম পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা :** যেহেতু আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ চলরেণু ও কনিডিয়ার অঙ্কুরণের অনুকূল সেহেতু উত্তম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে পরিবেশ প্রতিকূল থাকবে এবং রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনাও কমে যাবে।

   ছ. **'কোয়ারেন্টাইন' ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ :** বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বীজের সুস্থতা, সজীবতা, সতেজতা ও দূষণ পরীক্ষা করার জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাকাঙ্ক্ষিত বীজগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

Phytophthora-এর অর্থকরী গুরুত্ব

Phytophthora একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক ও আলুবিধ্বংসী পরজীবী ছত্রাক। *P. infestans* আলুর একটি বিলম্বিত ধ্বসা রোগের রোগজীবাণু। এ রোগের আক্রমণে আলুগাছ মরে যায় ও আলু পচে যায়। ফলে আর্থিক দিক থেকে আলু চাষীরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিখ্যাত আইরিশ দুর্ভিক্ষ (১৯৪৫) এরূপ মহামারিরই প্রত্যক্ষ ফল। এর ফলেই ২ লক্ষাধিক লোক দেশত্যাগী হয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে মুক্তবাজার নীতি প্রবর্তনে বাধ্য হতে হয়। শুধু *Phytophthora infestans* নয়, এর আরও কয়েকটি প্রজাতি ফসলী উদ্ভিদের ক্ষতি করে থাকে :

১. রাবার	*Phytophthora meadii*	
২. লেবু	*P. citrophthora*	গ্যামোসিস, দাগ প্রভৃতি
৩. টমেটো	*P. cryptogea*	
৪. ফুলকপি	*P. megasperma*	ধ্বসা রোগ
৫. তিল	*P. parasitica var. sesami*	

৬. তুলা ও রেড়ি	*P. parasitica*	চারার গোড়া পচন
৭. তাল, নারকেল ও কাঁঠাল	*P. palmivora*	কলি- পচন, কাঁঠালের ফল পচন
৮. সুপারি	*P. arecae*	কলরোগ
৯. কচু	*P. colocasiae*	দাগ রোগ
১০. কোকো	*P. faberi.*	কলি পচন
১১. তামাক	*P. palmivora*	বাদামি-পচন ও গ্যামোসিস

তাছাড়া বেগুন, মরিচ, মুগ, ঢেঁড়শ, সিঙ্কোনাতে *Phytophthora*-এর আক্রমণ হয়ে থাকে।

Phytophthora-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. মাইসেলিয়াম বহুলভাবে শাখান্বিত, বর্ণহীন ও সিনোসাইটিক। পোষক কলায় আন্তঃ ও অন্তঃকোষীয়রূপে বাস করে। আন্তঃকোষীয় হাইফি হতে চোষকমূল উৎপন্ন হয় ও পুষ্টি সংগ্রহ করে।

২. *Phytophthora* মারাত্মক পরজীবী ও অন্যগুলোর মধ্যে মৃতজীবীও রয়েছে।

৩. কনিডিয়া ও চলরেণু মাধ্যমে অযৌন জনন হয়।

৪. যৌন জনন উগ্যামীয়। জননাঙ্গ অ্যাম্ফিগাইনাস (amphigynous) ধরনের। প্রতিটি জনানঙ্গে একটি করে কেন্দ্রিকা সতেজ, সবল ও কার্যক্ষম থাকে।

৫. অঙ্কুরণের পূর্বে উস্পোরের মিওটিক বিভাজন হয়।

কয়েকটি সাধারণ প্রজাতি

১. *Phytophthora infestans*

২. *P. colocasiae*

৩. *P. arecae*

৪. *P, parasitica* var. *sesami*

৫. *P. cactorum* ইত্যাদি

গোত্র : Peronosporacae

Peronosporales বর্গের এ গোত্রটি সর্বাপেক্ষা উন্নত। এ গোত্রে প্রায় ৬টি গণ ও অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। এ প্রজাতিগুলোর সবকটিই বাধ্যতামূলক পরজীবী ও উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী। এগুলো পিঁয়াজ, আঙুর, বজরা, জোয়ার, ভুট্টা, মটর, শালগম, বিট, তামাক ও বহুবিধ ক্রুসিফারের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক। এদের সৃষ্ট রোগকে সাধারণভাবে ডাউনি মিলডিউ বলে। ছত্রাকগুলোর মাইসেলিয়াম শাখাযুক্ত, গোলাকার ও সিনোসাইটিক। হাইফিগুলো আন্তঃকোষীয় এবং কাণ্ডের কলায় থাকে ; তবে পাতায় প্রায়ই দেখা যায়। এ হাইফিগুলো কোষের অভ্যন্তরে থলেসদৃশ বা আঙুলাকৃতি সশাখ চোষক মূল প্রবেশ করে পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকে। এ চোষক মূলগুলো কোষের প্লাজমাপর্দায় ছিদ্র তৈরি করে না, বরং ঢুকে পড়ে মাত্র (চিত্র ৬.২৮ ক ও ৬.২৯ ক)। সুস্পষ্ট রেণুস্থলীধর (বা কনিডিয়াধর) বিদ্যমান। এদের বৃদ্ধিও সীমিত। এগুলো অন্তঃবাসী মাইসেলিয়াম হতে উৎপন্ন হয়ে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বাইরে বের হয়ে, যদি আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেশি থাকে, বৈশিষ্ট্যগতভাবে শাখান্বিত হয়। রেণুস্থলীধরের প্রকারভেদে গণগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রতিটি শাখায় কয়েকটি হতে অনেকগুলো খাটো, কোমল প্রশাখা থাকে। স্টেরিগমার শীর্ষভাগে ডিম্বাকার বা পাইরিফর্ম রেণুস্থলী তৈরি হয়।

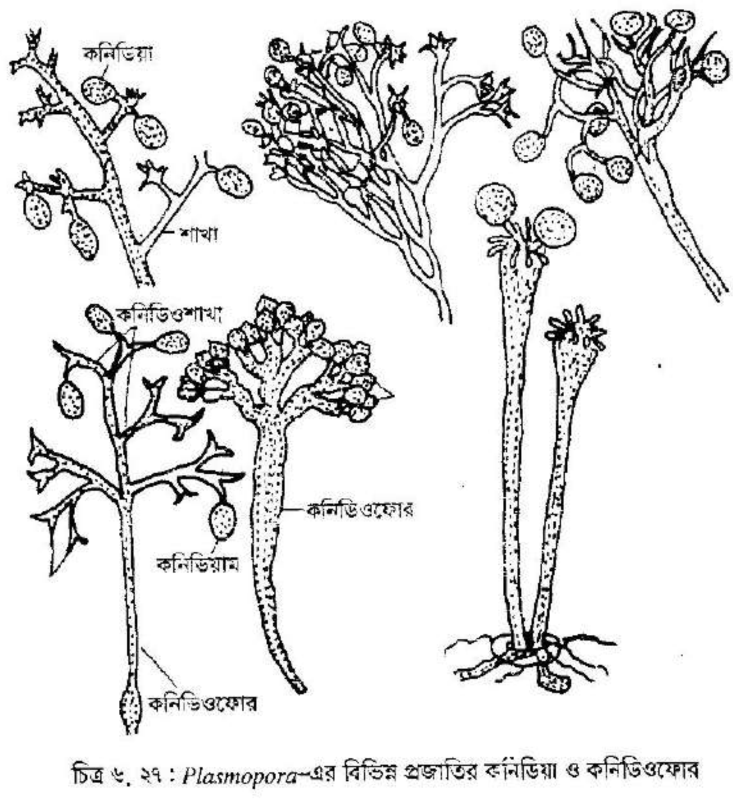

চিত্র ৬. ২৭ : *Plasmopora*–এর বিভিন্ন প্রজাতির কনিডিয়া ও কনিডিওফোর

রেণুস্থলীগুলো পর্ণমোচী প্রকৃতির তাই এগুলো পরিণত হলে ঝরে পড়ে এবং বায়ুতাড়িত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো উপযুক্ত পোষকের উপর পতিত হলে *Peronospora* ছাড়া অন্যান্য গণ দু'ভাবে কাজ করে। রেণুস্থলীগুলো অঙ্কুরিত হয়ে ক্ষুদ্র, দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত বৃক্কাকার চলরেণু দেয় বা শুষ্ক পরিবেশে সরাসরি খাটো অঙ্কুর-নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় এবং রেণুস্থলী কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে। এ অঙ্কুর-নল মাধ্যমেই পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে পোষকদেহে প্রবেশ করে ও মাইসেলিয়াম গঠন করে।

জননাঙ্গগুলো পোষক দেহের মধ্যে একই মাইসেলিয়ামে বা পাশাপাশি ও ভিন্ন ভিন্ন হাইফিতে উৎপন্ন হয়। পুংধানী প্যারাগাইনাস। ডিম্বাণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্ট পেরিপ্লাজম ও উপপ্লাজম নামক দুটি অংশে বিভেদিত। উস্পোর পুরোপ্রাচীরযুক্ত ও দ্বিস্তরীয়, বহিঃপ্রাচীরটি বা এপিস্পোরটি কারুকাজযুক্ত। নিয়মমাফিক, উস্পোরটি অঙ্কুরণ মাধ্যমে অঙ্কুর-নল দেবে। কিন্তু *Peronospora tabacina* ও *Plasmopara* ব্যতিক্রমধর্মী এবং উস্পোর হতে রেণুস্থলী ভেসিকল মাধ্যমে চলরেণুর নির্গমন হয়। এখানে এ গোত্রের *Plasmopara* ও *Peronospora* সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

গণ : *Plasmopara*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota

উপবিভাগ—Eumycotina

শ্রেণি—Oomycetes

বর্গ—Peronosporales

গোত্র—Peronosporaceae

গণ—*Plasmopara*

প্রজাতি—*P. viticola*

প্রকৃতি ও বসতি

Plasmopara পরজীবী ছত্রাকটি ডাউনি মিলডিউ নামে অধিক পরিচিত। এ গণটির প্রায় ২০টি প্রজাতি রয়েছে। এদের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী এবং এরা বাধ্যতামূলক পরজীবী। আর্থিক দৃষ্টিকোণ হতে *P. viticola* সর্বাধিক পরিচিত। এগুলো আঙুরের বাগানের গাছপালাকে আক্রমণ করে আঙুরে ডাউনি মিলডিউ রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগটি কখনও মহামারি আকারে দেখা দেয় না, তবে ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে।

দৈহিক গঠন

মাইসেলিয়াম শাখান্বিত ও সিনোসাইটিক। হাইফি অসংখ্য ও বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। হাইফি আন্তঃকোষীয় (চিত্র ৬.২৮ ক)। কিছু কিছু হাইফি হতে পার্শ্বীয় উপবৃদ্ধি বের হয়ে কোষমধ্যে প্রবেশ করে ও স্ফীত হয়ে থলেসদৃশ চোষকমূল গঠন করে। এ মূলগুলো উৎসেচক নিঃসরণ মাধ্যমে পোষক কোষ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে।

রোগ লক্ষণ : প্রথম পর্যায়ে আঙুর পাতার উপর পৃষ্ঠে ছোট, সবুজাভ হলুদ বর্ণের দাগ সৃষ্টি হয়। এগুলোর আকার বৃদ্ধি পেলে ছোট দাগগুলো একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে ও বাদামি বর্ণযুক্ত হয়। আর্দ্র আবহাওয়ায় পাতার নিম্নপৃষ্ঠে ধোয়াশাসদৃশ ডাউনিছোপ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। পাতা ঝরে পড়ার ফলে বিটপ খাটো ও বিকৃত হয়। বৃন্ত, আকর্ষ ও বিটপের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হয়। এ রোগের আক্রমণের ফলে আক্রান্ত স্থান স্পঞ্জের মতো হয়ে যায়। তরুণ বেরীগুলো ডাউনি রোগে ছেয়ে যায়। প্রবীণগুলোতে পচন ধরে ও ভেঙে যায়।

অযৌন জনন

পোষক দেহের উপ-পত্ররন্ধ্রীয় গহ্বরে প্রবেশের পর অঙ্কুরিত চলরেণুর মাইসেলিয়াম হাইফির প্যাড তৈরি করে (ক)। এ হাইফি প্যাড হতে একগুচ্ছ হাইফি খাড়াভাবে বর্ধিত হয়ে পত্ররন্ধ্রপথে বাইরে বের হয়ে আসে এবং রেণুস্থলীধর (ক) হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি রেণুস্থলীধর দীর্ঘ ও এক অক্ষীয়ভাবে শাখান্বিত। পার্শ্বীয় শাখার সংখ্যা ৩ থেকে ৬টি হতে পারে। প্রতিটি শাখার প্রশাখা থাকে এবং এগুলো মাতৃ অক্ষের সাথে সমকৌণিকভাবে অবস্থান করে। রেণুস্থলীধরের বৃদ্ধি সীমিত এবং পূর্ণ বিকশিত হলে রেণুস্থলী বহন করে। প্রতিটি রেণুস্থলীধরের যে শাখাটি একটি করে রেণুস্থলী বহন করে তাকে স্টেরিগমা বলে। সবগুলো রেণুস্থলী প্রায় একই সময়ে বিকাশিত ও

পরিণতি হয়। এগুলো আকার-আকৃতিতে ডিম্বাকৃতি ও বর্ণ স্বচ্ছ ধরনের। ক্ষুদ্রপ্রান্ত দ্বারা এগুলো স্ব স্ব শাখায় আটকে থাকে ; অগ্রপ্রান্তটি প্যাপিলাযুক্ত (১)।

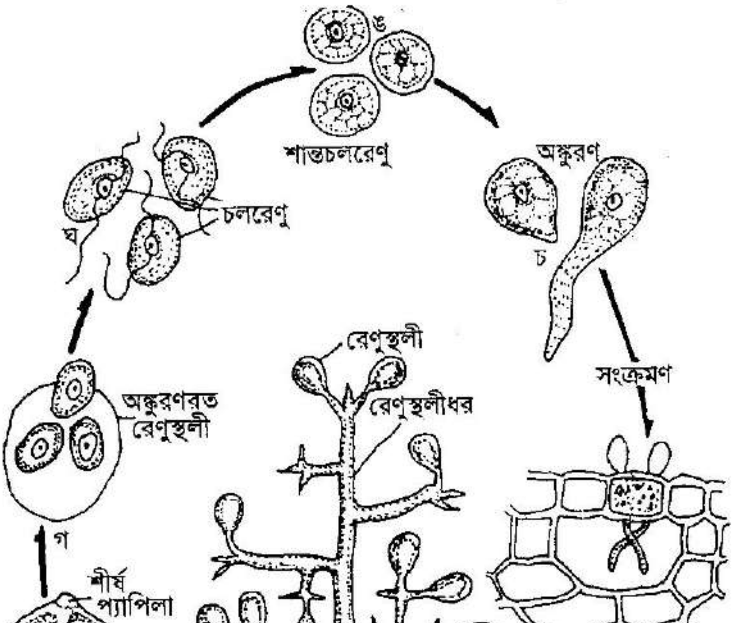

চিত্র ৬.২৮ : *Plasmopara viticola*–এর অযৌন জননচক্র। ক. রেণুস্থলীতে চলরেণুস্থলী ; খ. চলরেণুর বিভেদন ; গ. চলরেণুস্থলীর অঙ্কুরণ ; ঘ. চলরেণু ; ঙ. আবৃত চলরেণু ; চ. আবৃত চলরেণুর অঙ্কুরণ ; ছ. অঙ্কুরনল দ্বারা পত্ররন্ধ্রীয় অনুপ্রবেশ ; জ. আন্তঃকোষীয় মাইসেলিয়াম ও চোষক মূল

নবীন রেণুস্থলীটি আকারে ক্ষুদ্রাকৃতি, ডিম্বাকার ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত। এটি আকারে বড় হলে কেন্দ্রিকাটি বার বার বিভক্ত হয়ে বহুসংখ্যক অপত্যকেন্দ্রিকা দেয় ; অতঃপর বহুকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট দানাদার প্রোটোপ্লাস্ট এক একটি কেন্দ্রিকা নিয়ে অপত্য-প্রোটোপ্লাস্টে পরিণত হয় (খ)। এ সময়েই রেণুস্থলীগুলো ঝরে যায় ও বায়ুবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুবাহিত হয়ে এগুলো যদি পোষক উদ্ভিদের পাতায় পতিত হয়, তবে সেখানেই অঙ্কুরণ শুরু হয়। প্রথমে প্যাপিলার পাতলা পর্দা গলে দ্রবীভূত হয়ে গোলাকার রন্ধ্র তৈরি হয় ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত অপত্য- প্রোটোপ্লাস্ট এ ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে (গ)। এটি দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণুতে পরিণতি হয় (ঘ)। মুক্ত চলরেণুটি প্ল্যানোকনভেক্স আকৃতির হয়ে থাকে। এটির চ্যাপ্টা অংশের খাঁজে কেন্দ্রিকা থাকে। কেন্দ্রিকার উভয়প্রান্ত হতে ১টি করে মোট দুটি অসমাকৃতির ফ্লাজেলা উৎপন্ন হয়। ছোট ফ্লাজেলাটি টিনসেল ধরনের ও সামনের দিকে প্রসারিত এবং দীর্ঘ ফ্লাজেলাটি হুইপল্যাশ ধরনের ও পিছনের দিকে থাকে। এটিই চলনে সাহায্য করে। প্রায় আধা ঘন্টা চলরেণুটি সাঁতার কাটে এবং পত্ররন্ধ্রে এসে বিশ্রাম নেয়। এ সময় ফ্লাজেলা দুটি বিলুপ্ত হয়, চলরেণুটি গোলাকার হয় ও পাতলা প্রাচীরাবৃত হয় (ঙ)।

কিছু সময় বিশ্রাম যাপনের পর এটি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর-নল দেয় (চ)। এটি পোষক দেহের মধ্যে পত্ররন্ধ্রপথে ঢুকে পড়ে (ছ) (Gregory, ১৯১২)। খুব কমক্ষেত্রে রেণুস্থলীটি কনিডিয়ামের মতো অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর-নল দেয়।

যৌন জনন

যৌন জনন উগ্যামীয় প্রকৃতির। *Albugo* প্রজাতির মতো এখানেও পোষক কোষের মধ্যে জননাঙ্গের বিকাশ ঘটে। এ জননাঙ্গগুলো পাশাপাশি হাইফি হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। স্ত্রীজননাঙ্গকে উগোনিয়াম বা স্ত্রীধানী এবং পুংজননাঙ্গকে পুংধানী বলে।

স্ত্রীধানীর উৎপত্তি ও বিকাশ

স্ত্রী-হাইফির শীর্ষাঞ্চল স্ফীত ও জলাকার হয়ে স্ত্রীধানী গঠিত হয় (খ)। অতঃপর পাদদেশে প্রস্থপ্রাচীর গঠিত হলে তা বাকি অংশ হতে পৃথক হয়। তরুণ স্ত্রীধানীটি বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত ও নিয়মিতভাবে সমসত্ত্বীয়। বয়োপ্রাপ্তির প্রাক্কালে এটি দুটি অংশে ভাগ হয়ে যায়।

১. **উপ্লাজম :** এটি কেন্দ্রীয়, গোলাকার, ঘন, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত অঞ্চল।

২. **পেরিপ্লাজম :** এটি পরিধিস্থ, গহ্বরযুক্ত ও বহু কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট অঞ্চল। এ দুটি অংশকে সুস্পষ্টভাবে চেনা যায়। পরিণত উপ্লাজমে একটি কেন্দ্রিকা সজীব ও সতেজ যা উস্ফেয়ার বা ডিম্বাণু হিসেবে কাজ করে।

পুংধানীর উৎপত্তি ও বিকাশ

স্ত্রীধানীর নিকটবর্তী পুং-হাইফি হতে পুংধানীর উৎপত্তি ও বিকাশ হয়ে থাকে। পুংধানী হাইফির শীর্ষটি স্ফীত হয়ে গদাকৃতি হয় এবং সহায়ক হাইফিতে (নিম্নাংশে) প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হলে শীর্ষাগ্রে প্রোটোপ্লাস্ট প্রবাহ বন্ধ হয়। শীর্ষের এ গদাকৃতি স্ফীতাংশই পুংধানী হিসেবে কাজ করে। এ অংশে ডজনখানেকেরও বেশি পুংকেন্দ্রিকা থাকে। পুংধানীটি স্ত্রীধানীর গায়ে লেগে চাপ দেয়।

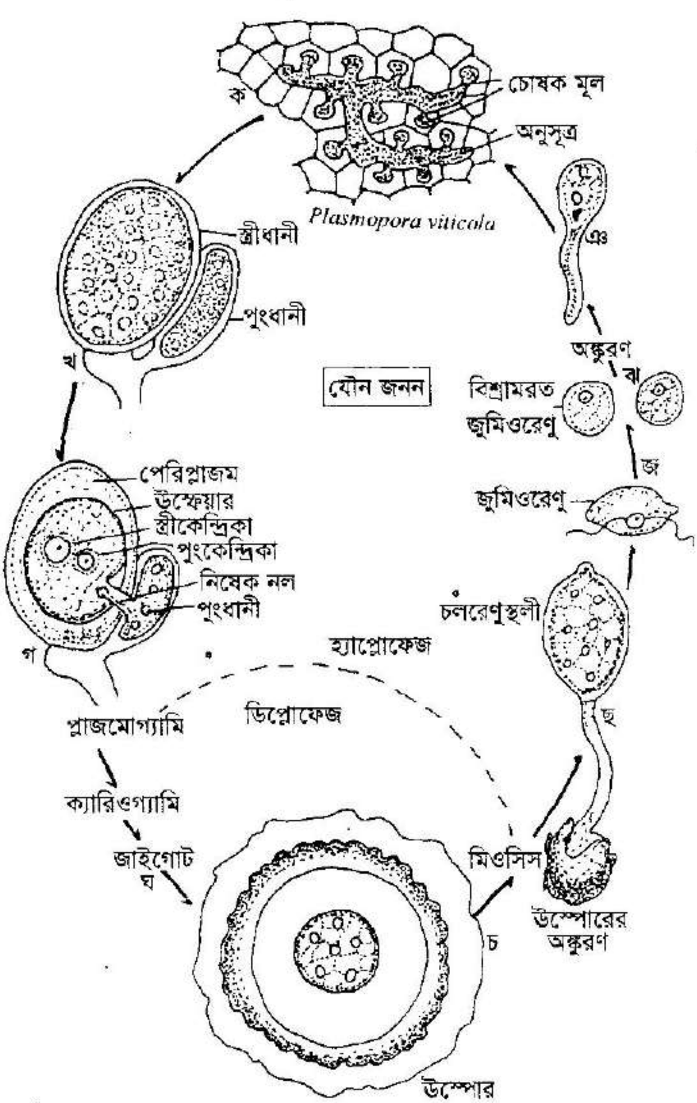

চিত্র ৬.২৯ : *Plasmopera viticola*-এর যৌন জননচক্র

নিষেক প্রক্রিয়া

স্ত্রীধানীর যে স্থানে পুংধানীটি স্পর্শ করে সে স্থানে ক্রমাগত চাপ পড়ে এবং পুংধানীটি এ অংশেই নরম-কোমল নিষেক নল উৎপন্ন করে এ চাপ ক্রমাগতভাবে দিতে থাকে (গ)। অবশেষে এটি স্ত্রীধানী ভেদ করে পেরিপ্লাজম অতিক্রম করে ডিম্বকের মধ্যে প্রবেশ করে (ঘ)। এ সময় নিষেকনলের শীর্ষটি দ্রবীভূত হয় এবং একটি পুংকেন্দ্রিকা ডিম্বাণু-কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়। এ

পুং-ও ডিম্বাণু-কেন্দ্রিকার মিলনে জাইগোট তৈরি হয়। অতঃপর জাইগোটটি পুরু, অমসৃণ প্রাচীর নিঃসরণ করে নিজেকে আবৃত করে উস্পোরে পরিণত হয় (ঙ)। এটি কিছুসময় বিশ্রামে কাটায়। উস্পোর প্রাচীর দ্বিস্তরীয়, ভিতরের প্রাচীরটি পুরু ও মসৃণ—একে এন্ডোস্পোর বলে। বহিঃস্তরটি পাতলা ও অসমৃণ। একে এক্সোস্পোর বলে।

উস্পোরের অঙ্কুরণ

সমাগত বসন্তে, বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে উস্পোর অঙ্কুরিত হয়। অবশ্য, অঙ্কুরণের পূর্বেই পুং ও স্ত্রী কেন্দ্রিকার মিলন হয়ে যায়। অঙ্কুরণ প্রাক্কালে ডিপ্লয়ড জাইগোট কেন্দ্রিকাটি বার বার বিভক্ত হয়ে ৫০টিরও অধিক কেন্দ্রিকা সৃষ্টি করে। প্রথম দুটি বিভাজন মিওটিক ধরনের হয়ে থাকে। Bose (১৯৪৬) অবশ্য উল্লেখ করেন যে, ৩য় ও ৪র্থ বিভাজনটি মিওটিক ধরনের হয় বলে হ্যাপ্লোফেজ সংঘটিত হয়। এ দশায়, উস্পোর প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে এবং অঙ্কুরনল উদগত হয়। অঙ্কুরনলের শীর্ষভাগটি স্ফীত হয়ে রেণুস্থলী গঠন করে (ছ)। উস্পোরের বহুকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট প্রোটোপ্লাস্ট রেণুস্থলীতে প্রবেশ করতে থাকে। রেণুস্থলীতে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হলে প্রোটোপ্লাস্টের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। রেণুস্থলীতে ৫০টি বা তারও বেশি এককেন্দ্রিকাযুক্ত, দ্বি-ফ্লাজেলাবিশিষ্ট বৃক্কাকার চলরেণু তৈরি হয়। রেণুস্থলীর শীর্ষরন্ধ্রপথে এগুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এ মুক্ত চলরেণুগুলো একই পোষকে বা অন্য পোষকে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কুরিত হয়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

১. ছত্রাকনাশক ওষুধ ছিটানো খুবই ফলপ্রসূ।

২. 'বোঁর্দো মিশ্রণ', ফার্বাস ও ক্যাপ্টান খুবই কার্যকর ছত্রাকনাশক।

৩. আক্রান্ত পাতা বা গাছপালা পুড়িয়ে ফেলা।

৪. রোগমুক্ত ও রোগসহনশীল বীজ ব্যবহার করা।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

Berkehy ও Curtis ডাউনি মিলডিউকে *Botrytis viticola* নাম দিয়ে Deuteromycetes এ স্থান দেন। পরে De Bary এটির জাতিতত্ত্ব নির্ধারণ করে Perenosporaceae গোত্রে স্থান দেন ও নাম দেন *Perenospora viticote.* Schrocter (১৮৮৬) এটিকে *Plasmopora* গণে স্থাপন করেন। Berlese ও be Toni এটিকে *Plasmopora viticola* নামকরণ করেন। শ্রেণিগত অবস্থানটি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

Perenospora

Ainsworth ও Bisby (১৯৫৪) এ গণে ৭৫টি প্রজাতি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এ প্রজাতিগুলোর সবগুলোই ক্ষতিকর, বাধ্যতামূলক পরজীবী এবং এগুলো রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগের নাম ডাউনি মিলডিউ। এদের অধিকাংশ প্রজাতিই নির্দিষ্ট পোষককে আক্রমণ করে থাকে। ফলে এরা নির্বাচনমূলক পরজীবিতা দেখায়। অনেকেই ফসলী উদ্ভিদকে আক্রমণ করে। তাছাড়া এরা অর্থকরী ফসল যেমন, মটর, পিঁয়াজ, শালগম, বিট, ভুট্টা, তামাক, পালং প্রভৃতিকে আক্রমণ করে থাকে। অতি পরিচিত প্রজাতিগুলো হচ্ছে—

১. *Perenospora parositica*—এটি শালগম, মূলা, কপি (বাঁধাকপি ও ফুলকপি) এবং সব কপিজাতীয় শস্যকে আক্রমণ করে থাকে।

২. *P. destructer*—এটি পিঁয়াজে 'ডাউনি মিলডিউ রোগ' সৃষ্টি করে থাকে।

৩. *P. pisi*—এটি মটরশুঁটিতে 'ডাউনি মিলডিউ' রোগ সৃষ্টি করে।

৪. *P. parasitica*—এ প্রজাতিটিকে Gaumann পোষকভিত্তিক নামকরণ করে ভাগ করে ফেলেছেন, যেমন সরিষা আক্রমণকারীটি *P. brassicae*, দেয়ালফুল (*Cheiranthas cherry*) আক্রমণকারীকে *P. cheiranthi* প্রভৃতি। এদের জীবনেতিহাসে খুব সামান্যই পার্থক্য রয়েছে।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Oomycetes
বর্গ—Peronosporales
গোত্র—peronosporaceae
গণ—*Peronospora*
প্রজাতি—*P. parasitica*

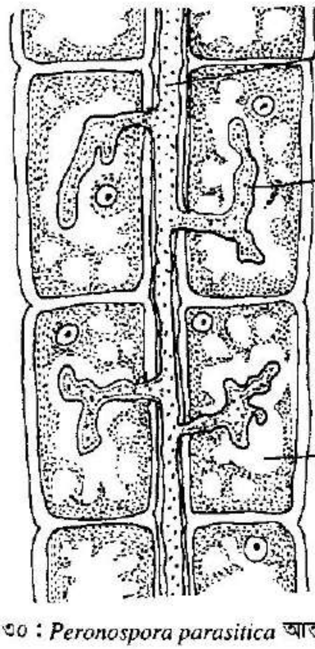

চিত্র ৬.৩০ : *Peronospora parasitica* আন্তঃকোষীয় হাইফি ও চোষক মূল

বসতি ও প্রকৃতি

Peronospora একটি পরজীবী ছত্রাক। এটি 'ডাউনি মিলডিউ' রোগের কারণ। এটিতে ৭৫টি প্রজাতি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেকেই নির্বাচিত পরজীবিতা দেখায়। এগুলো সাধারণত *Brassica* গোত্রীয় গাছপালাকে আক্রমণ করে থাকে। *P. parasitica* ছত্রাকটি কপিজাতীয় গাছপালাকে আক্রমণ করে ফলন কমিয়ে দেয়। এটি 'ডাউনি মিলডিউ' বা 'পালকসদৃশ ছাতা রোগ' সৃষ্টি করে।

দৈহিক গঠন

Peronospora-এর দেহকাণ্ড শাখান্বিত মাইসেলিয়ামযুক্ত ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন সিনোসাইটিক হাইফি দিয়ে গঠিত। হাইফিগুলো পোষক দেহের কোষমধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করে। এ স্থলে শাখান্বিত চোষক মূল সৃষ্টি করে পোষক দেহ হতে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। প্রজাতিভেদে চোষক মূলগুলো ক্ষুদ্র ও গোলাকার বা আঙুলের ন্যায় শাখা-প্রশাখাযুক্ত হতে পারে। আবার কখনও শাখাযুক্ত হয়ে গোটা পোষক কোষকে দখল করে নেয়। চোষকমূলের নিঃসৃত উৎসেচকের ক্রিয়ায় পোষক কোষের প্রোটোপ্লাস্ট ছত্রাক কোষে চলে আসে।

জনন

Peronospora পরজীবী ছত্রাকে দু'ধরনের জননক্রিয়া দেখা যায় ; যথা—অযৌন ও যৌন জনন। নিচে এসব জনন সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো—

অযৌন জনন

Peronospora–তে এ ধরনের জনন সাধারণত কনিডিয়া দিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। পোষক দেহে অনুপ্রবেশের পর *Peronospora*–এর হাইফিগুলো উপ-পত্ররন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখান হতে হাইফিগুলো এককভাবে বা গুচ্ছাকারে পত্ররন্ধ্রপথে উল্লম্বভাবে বর্ধিত হয়ে বের হয়ে আসে। এ উন্মুক্ত বায়ব বেলনাকার হাইফিগুলোকে কনিডিওফোর বলে। এগুলো নিচদিকে অশাখ হলেও উপরের দিকে দ্ব্যগ্রভাবে শাখান্বিত হয়ে থাকে। শাখাগুলোর শীর্ষভাগে স্টেরিগমাটা নামক সরু, ক্ষুদ্র বৃন্তের সাথে স্ফীত গোলাকার ও বর্ণহীন কনিডিয়া যুক্ত থাকে। একটি শাখায় একটি কনিডিয়া উৎপন্ন হয়। কনিডিয়াগুলো এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও স্টেরিগমাটা পানিতে দ্রবণীয়।

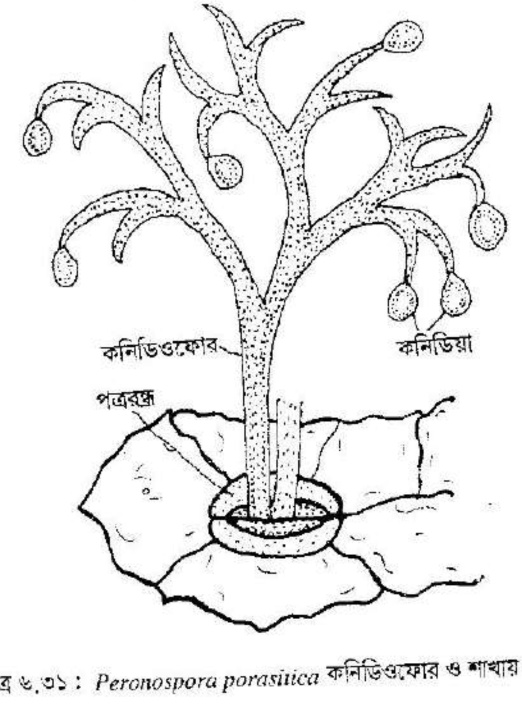

চিত্র ৬.৩১ : *Peronospora porasitica* কনিডিওফোর ও শাখায় কনিডিয়া

কনিডিয়ামের অঙ্কুরণ

Peronospora–এর কনিডিয়াম খুবই স্বল্পজীবী। অন্য কথায় এরা বেশিক্ষণ সজীবও সতেজ থাকে না। কনিডিয়ামের অঙ্কুরণ পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থান ও অনুকূল আবহাওয়াজনিত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। খুবই কম সংখ্যক কনিডিয়াম যথাসময়ে যথার্থ স্থানে পতিত হয়ে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায়। এ প্রতিকূলতা এড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে কনিডিয়া উৎপন্ন হয়।

অনুকূল পরিবেশে নির্দিষ্ট পোষক দেহের উপর কনিডিয়াম নীত হলে তা অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরণের সময় কনিডিয়াম-প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুরনল বের হয় (চিত্র ৬.৩২)। এ অঙ্কুরনলটি পত্ররন্ধ্রের নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং পত্ররন্ধ্র পেলে তার মাধ্যমে পোষক দেহে প্রবেশ করে। অতঃপর অঙ্কুরনলটি পোষকের আন্তঃকোষীয় অবকাশে শাখা–প্রশাখা বিস্তার করে মাইসেলিয়াম গঠন করে। সাধারণত আর্দ্র, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও নিম্ন তাপমাত্রা ছত্রাকটির বিস্তারলাভের সহায়ক। অন্যদিকে শুষ্ক, উচ্চ তাপমাত্রা রোগবিস্তারের প্রতিকূল। Felton ও Walker (১৯৪০) উল্লেখ করেন যে, বাঁধাকপির উপর *P. parasitica*–এর কনিডিয়ার অঙ্কুরণের সুবিধাজনক তাপমাত্রা ১৫° এবং মাইসেলিয়াম বৃদ্ধির তাপমাত্রা হলো ২৪° সে.। এ তাপমাত্রায় স্পোরুলেশন ও পুনসংক্রমণ (reiufection) কদাচ দেখা যায়।

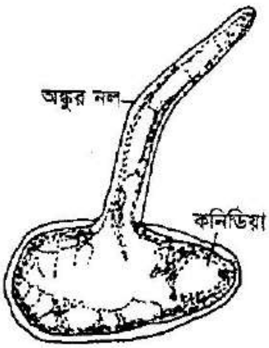

চিত্র ৬.৩২ : *P. parasitica* কনিডিয়ার অঙ্কুরণ

যৌন জনন

যৌন জনন উগ্যামীয় এবং বৃদ্ধি মৌসুমের শেষ দিকে যখন আবহাওয়া শুষ্ক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হয় তখন এ জনন কাজ হয়ে থাকে। সেসব মাইসেলিয়াম বার বার কনিডিয়াম উৎপাদন করে সেগুলো পোষক কলার গভীরে চলে যায় এবং জননাঙ্গ তৈরি করে। এগুলো সাধারণত কাণ্ডের মজ্জা অঞ্চলের আন্তঃকোষীয় অবকাশের ভিতর দেখা যায়।

পুং–ও–স্ত্রী জননাঙ্গকে যথাক্রমে অ্যান্থেরিডিয়া ও উগোনিয়াম বলে। প্রথমদিকে এ জননাঙ্গদ্বয় বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হয় এবং হাইফির শীর্ষে প্রান্তীয় স্ফীতিরূপে উৎপন্ন হয় (চিত্র ৬.৩৩ ক)। তরুণাবস্থায় এগুলো বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত ঘন প্রোটোপ্লাস্টপূর্ণ থাকে। আকারে আরও বড় হলে উগোনিয়ামে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে—

১. ঘন দানাদার, প্রাণসত্তা ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত কেন্দ্রীয় উপ্লাজম।

২. অপেক্ষাকৃত পাতলা ও গহ্বরযুক্ত প্রাণসত্তা ও স্বল্পসংখ্যক কেন্দ্রিকাযুক্ত পরিধিস্থ পেরিপ্লাজম।

উপর্যুক্ত পরিবর্তনসহ উগোনিয়ামের কেন্দ্রিকাগুলো পুনর্বিন্যস্তও হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত উপ্লাজমে একটি থাকে এবং অন্যগুলো পেরিপ্লাজমে চলে যায়। সেখানে এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। এককেন্দ্রিকাযুক্ত উপ্লাজম উস্পোর বা ডিম্বাণু হিসেবে কাজ করে।

পুংধানী বা শুক্রাণুস্থলী

পুংধানী প্যারাগাইনাস। আকারে এটি নলাকার এবং প্রথমে বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত থাকে। এটি প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে পৃথক থাকে। ডিম্বাণুস্থলী বহনকারী হাইফির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসবাসকারী হাইফির সরু বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত স্ফীত শীর্ষটি শুক্রাণুস্থলী। পরিণতি লাভের পূর্বে শুক্রাণুস্থলীতে ১টি কেন্দ্রিকা থাকে এবং অন্যগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়।

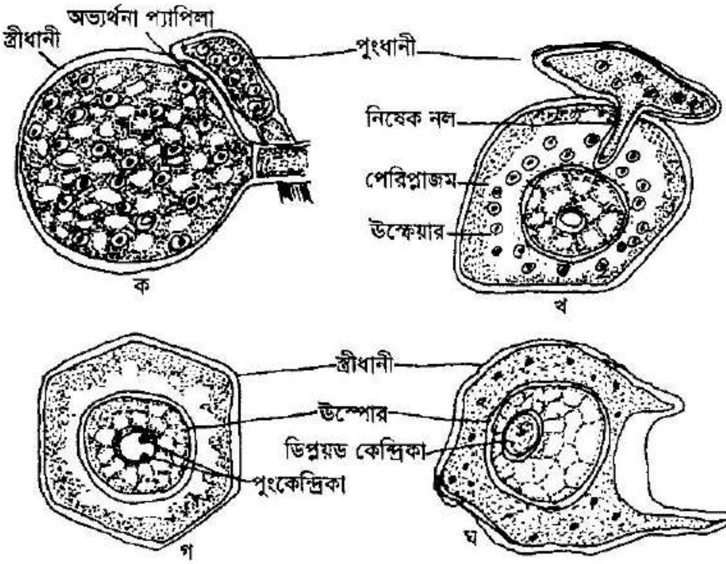

চিত্র ৬.৩৩ : *P. parasitica* যৌন জননের বিভিন্ন দশা ও নিষেক। ক. তরুণ উগোনিয়াম ; খ. নিষেক নলসহ উগোনিয়াম ; গ. উস্পোর পুং-ও স্ত্রী-কেন্দ্রিকা পাশাপাশি ; ঘ. মূল প্রাচীরযুক্ত উস্পোরে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা

নিষেকক্রিয়া

পুংধানীটি ডিম্বাণুস্থলীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে এবং স্পর্শস্থানে শুক্রাণুস্থলী হতে একটি সরু, নলাকার নিষেকনল তৈরি হয়। এ নিষেকনলটি ডিম্বাণুস্থলী প্রাচীর ও পেরিপ্লাজম ভেদ করে ডিম্বাণুর কাছাকাছি পৌঁছে। শেষে নিষেকনলের অগ্রভাগ দ্রবীভূত হয় ও পুংকেন্দ্রিকাটি সামান্য পরিমাণ প্রাণসত্তাসহ উস্পোরে প্রবেশ করে। পুং-ও স্ত্রী-কেন্দ্রিকার মিলন হয়, এ মিলনই নিষেক (গ)। এভাবে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জাইগোট বলে। এটি স্থূলপ্রাচীর নিঃসৃত করে নিজেকে আবৃত করে বিশ্রাম-রেণুতে পরিণত হয়।

এ বিশ্রামরেণুটি কয়েক মাস সুপ্তাবস্থায় থাকে। সাধারণত এবং সম্ভবত প্রতিকূল পরিবেশ এড়ানোর জন্যই উস্পোরের এ–দীর্ঘকালীন সুপ্তি। এটি একটি উন্নত বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য। Mc Meckin (১৯৬০) উল্লেখ করেন যে, এ পরজীবী ছত্রাকটি যৌনভাবে বিশ্রামরেণু গঠন করে দীর্ঘকাল সুপ্তাবস্থায় থেকে প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে থাকে। ইত্যবসরে পোষকদেহের পচন শুরু হয় এবং উস্পোরটি মুক্ত হয়। এগুলো অঙ্কুরণের পূর্বে এ দূষিত মাটিতেই পড়ে থাকে।

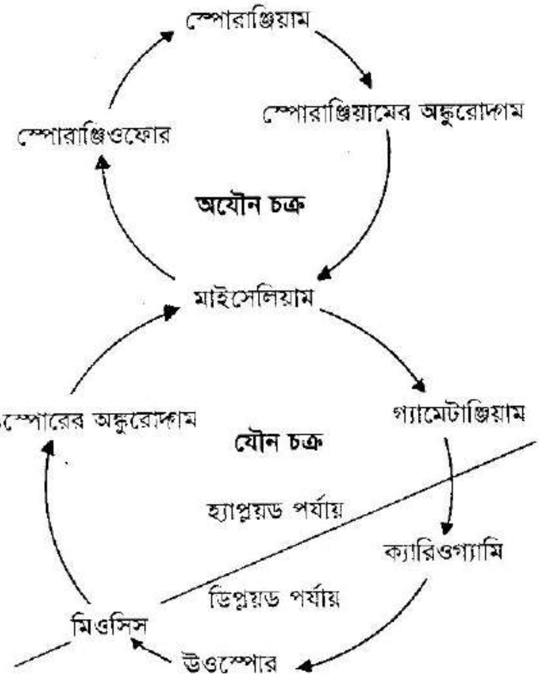

চিত্র ৬.৩৪ : *Peronospora parasitica* –এর জীবনচক্র

উস্পোরের অঙ্কুরণ

সুপ্তাবস্থার শেষে এবং অনুকূল পরিবেশের আগমনে উস্পোর অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরণের পূর্বে উস্পোরের ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকা উৎপন্ন করে। উস্পোরের স্থূলপ্রাচীর ভেঙে যায় এবং সমগ্র প্রোটোপ্লাস্ট একটি ক্ষুদ্র অঙ্কুর-নল হিসেবে বের হয়ে আসে। এটিই উপযুক্ত পোষককে আক্রমণ করে।

রোগলক্ষণ

১. আক্রান্ত পাতাগুলোর নিম্নপৃষ্ঠে সাদাটে ধূসর বর্ণের চিতি বা ছাতা দেখা যায়।

২. কনিডিওফোর উৎপন্ন হলে পাতার নিম্নপৃষ্ঠ খুবই ছোট ছোট সাদাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা দেয়।

রোগ বিস্তার

আর্দ্র আবহাওয়া ও ১৬° সে. থেকে ২৪° সে. তাপমাত্রায় রোগের বিস্তার ভালো হয়।

রোগের প্রতিকার

১. রাসায়নিক ওষুধ বা ছত্রাকনাশক প্রয়োগ।
২. শস্যের আবর্তন।
৩. আক্রান্ত উদ্ভিদাংশের ধ্বংস সাধন।
৪. পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা।
৫. স্বাস্থ্যবিধান নিশ্চিত করে।

Peronospora–এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. অধিকাংশ প্রজাতিই বাধ্যতামূলক পরজীবী ও নির্বাচিত পরজীবিতা দেখায়।
২. পোষকের মৃত্যুর সাথে সাথে পরজীবীও মারা যায়। সেহেতু পুষ্টি সংগ্রহের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পরজীবী তার উস্পোর ও কনিডিয়া তৈরি চলতে থাকে।
৩. বংশবিস্তারের ধারা যেন কোনোক্রমেই বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য বহুল পরিমাণে কনিডিয়া উৎপাদন করে থাকে।
৪. কনিডিয়াগুলোর বিচ্যুতি কৌশল সহজতর করার জন্য স্টেরিগমাটা পানিতে দ্রবণীয় হয় এবং বিস্তারের জন্য আকারে ছোট ও হালকা হয়।
৫. জননাঙ্গগুলো পোষকদেহের গভীরে উৎপন্ন হয় বলে সুরক্ষিত।
৬. প্রতিকূলতা এড়ানোর জন্য বিশ্রাম-রেণুর প্রাচীর বেশ পুরু হয়ে থাকে।

Pythiaceae হতে Peronosporaceae কি উন্নত বা অধিক প্রগতিশীল সে বিষয় নিরূপণে কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো,

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যে Peronosporaceae গোত্রটি Pythiaceae হতে উন্নত বা প্রগতিশীল :

১. এ গোত্রের সবগুলো প্রজাতিই বাধ্যতামূলক পরজীবী।
২. আক্রান্ত উদ্ভিদদেহ সাথে সাথেই মারা যায় না। সেহেতু ছত্রাকটি যতক্ষণ পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত রেণুস্থলী এমনকি উস্পোরও গঠন করে থাকে।
৩. হাইফিগুলো আন্তঃকোষীয় এবং শুধু চোষকমূলই কোষমধ্যে প্রবেশ করে।
৪. প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে ঝরে যাওয়া রেণুস্থলী উৎপাদন করে ; কেননা, এগুলো স্বল্পায়ুবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সেহেতু, ঝরনার ও বিস্তারের সুব্যবস্থার পদক্ষেপ হিসেবে স্টেরিগমাটা পানিতে দ্রবণীয় ও হালকা বলে বায়ুবাহিত হয়।
৫. *Peronospora*–তে অঙ্কুর–নল মাধ্যমে রেণুস্থলীর অঙ্কুরণ হতে এ ধারণাই প্রমানিত হয়েছে যে, এখানে প্রগতিশীল অবলুপ্তি ও চলরেণুতে রদবদল মাধ্যমে পুনর্বিন্যাস সংঘটিত হয়েছে।
৬. যৌনাঙ্গগুলো পোষকদেহের গভীরে উৎপন্ন হয় বলে সুরক্ষিত।
৭. উস্পোরটি পুরু, সহনশীল প্রাচীর নিঃসৃত করে নিজেকে আবৃত করে বলে দীর্ঘ প্রতিকূলতা এড়াতে পারে।

গোত্র : Abnginaceae

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

এ গোত্রের ছত্রাকগুলো সপুষ্পক উদ্ভিদে 'সাদা মরিচা রোগ' সৃষ্টি করে থাকে। এদের সবাই বাধ্যতামূলক পরজীবী। এ দেহকাণ্ড সিনোসাইটিক, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও মুক্ত শাখা-প্রশাখাযুক্ত মাইসেলিয়াম নিয়ে গঠিত। এরা পোষকদেহ হতে গোলাকার বা গদাকার কিংবা নব-আকৃতির চোষকমূল দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে। কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের উপর সাদা সাদা গুঁড়া পদার্থের ছোপ বা দাগ বা বর্ণের আবরণ দেখে এদের চেনা যায়। রেণুস্থলীধর গদাকৃতি ও সোরাস গঠন করে পাতার নিম্নত্বকে অবস্থান করে—রেণুস্থলীধরে রেণুস্থলীগুলো শিকলাকারে উৎপন্ন হয়।

রেণুস্থলীধর নামক বিশেষ ধরনের খাটো, সোজা ও অশাখ যৌন শাখায় রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়। এ রেণুস্থলীর মাধ্যমেই অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। অবশ্য, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন লেখক, গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ এ রেণুস্থলীকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ কেউ একে পতনশীল বা পর্ণমোচী, রেণুস্থলী বলে উল্লেখ করেছেন ; কেননা, এগুলো অঙ্কুরণের সময় পরিবেশগত কারণে চলরেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে চলরেণু উৎপন্ন করে। কখনও আবার কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল দেয়। আবার অনেকেই এদেরকে কনিডিয়ারূপেই চিহ্নিত করে থাকেন। কেননা এগুলো পালাক্রমে শিকলাকারে উৎপন্ন হয় এবং একে একে ঝরেও পড়ে। সেহেতু এদেরকে যে বিশেষ শাখার উপর জন্মাতে দেখা যায় সেটিকে কনিডিওফোর বলে।

রেণুস্থলীগুলো হতে চলরেণু উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলীধরগুলো (কনিডিওফোর) পাশাপাশি ঘন সন্নিবিষ্টভাবে প্যালিসেড স্তরের ন্যায় পোষকদেহের ত্বকের নিচে অবস্থান করে। যৌনাঙ্গ সুবিকশিত। নিষেকনল মাধ্যমে নিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। উস্পোর তার চারদিকে একটি স্থূলপ্রাচীর নিঃসরণ করে। এ প্রাচীরটি তিন স্তরযুক্ত—

১. এপিস্পোর : এটি উস্পোরের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এটি বিভিন্নভাবে অলংকৃত হয়ে থাকে। এটি রোগ লক্ষণ নির্ণয়ের সহায়ক।

২. এন্ডোস্পোর-১ ও ২।

৩. অবকাশ যাপনের পর বসন্তের আগমনে উস্পোরটি অঙ্কুরিত হয়ে দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু দেয়। এ গোত্রে ১টি গণ *Albugo* বা *Cystopus* রয়েছে।

Albugo candida

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
  উপবিভাগ—Eumycotina .
    শ্রেণি—Oomycetea
      বর্গ—Peronosporales
        গোত্র—Albuginaceae
          গণ—*Albugo*
            প্রজাতি—*A. candida*

প্রকৃতি ও বসতি

Albugo নামকরণটি ১৮২১ সালে এবং *Cystopus* নামকরণটি ১৮৭৪ সালে হলেও ICBN *Albugo* নামটিই গ্রহণ করে ও অন্যটি বাতিল হয়।

Albugo (Cystopus) একটি সাদা মরিচা রোগ সৃষ্টিকারী বাধ্যতামূলক পরজীবী ছত্রাক। এতে প্রায় ২৫টি প্রজাতি রয়েছে এবং সবগুলোয় স্থলজ উদ্ভিদের পরজীবী। *A. candida* প্রজাতিটি Crucifereae গোত্রের উদ্ভিদ যেমন মুলা, শালগম, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদের পরজীবী হিসেবে জীবনধারণ করে। এ রোগের আক্রমণে উদ্ভিদের মঞ্জরী ও ফল তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করে, কাণ্ড ও পাতার চকচকে সাদা দাগ পড়ে ফলে ফলন হ্রাস পায়।

চিত্র ৬.৩৫ : *Albugo* আক্রান্ত মূলা পাতা

চিত্র ৬.৩৬ : *Albugo* আক্রান্ত *Capsella* পাতা

দৈহিক গঠন

Albugo candida ছত্রাকের দেহ মাইসেলিয়ামযুক্ত। মাইসেলিয়াম নলাকার প্রস্থপ্রাচীরবিহীন, সিনোসাইটিক, শাখান্বিত হাইফি নিয়ে গঠিত। পোষকদেহের আন্তঃকোষীয় অবকাশে হাইফিগুলো বাস করে ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। এগুলো ছোট ছোট বোতামসদৃশ চোষক মূলের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে। হাইফির প্রাচীর সেলুলোজনির্মিত। এখানে কাইটিন দ্রব্য থাকে না। অনুসূত্র বা

[illegible] প্রোটোপ্লাজম ঘন দানাদার, অসংখ্য কেন্দ্রিকাযুক্ত, গহ্বরযুক্ত ও সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে [illegible] ও তেলবিন্দু থাকে।

[illegible] অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে, প্রাণসত্তায় মাইটোকন্ড্রিয়া, অন্তঃপ্লাজমীয় [illegible] ও রাইবোজম বিদ্যমান। কোষপর্দাটি কোষপ্রাচীরের সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে লেগে থেকে [illegible] গঠন করে। তরুণ হাইফিতে কোনো প্রস্থপ্রাচীর থাকে না। কিন্তু জননাঙ্গ গঠনকালে [illegible] নিরাময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়।

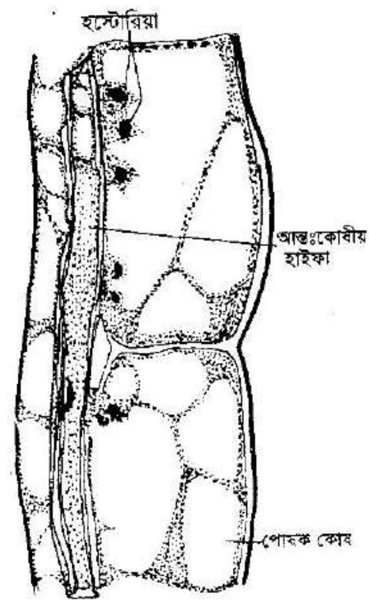

চিত্র ৬.৩৭ : *Albugo candida* পোষকের আন্তঃকোষীয় হাইফি ও চোষকমূল

পুষ্টি : পরজীবী ছত্রাকটি পোষককলা হতেই খাদ্য সংগ্রহ করে। আন্তঃকোষীয় অবকাশে যেসব হাইফি থাকে, সেগুলোর এক ধরনের ছোট ছোট পার্শ্বীয় উপবৃদ্ধি থাকে ; এদেরকে চোষক মূল বলে। এরা পোষক কোষের প্রাচীর ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং স্ফীত হয়ে গোলাকার বা বোতামসদৃশ চোষকমূলে রূপান্তরিত হয়। ফলে চোষকমূলে অনুপ্রবেশ নল ও স্ফীত শোষক অঞ্চল নামে দুটি অংশ থাকে। অনুপ্রবেশ নলটি পোষকপ্রাচীরে "কলার" হিসেবে এবং স্ফীত চোষক অঞ্চলটি পোষকপ্রাচীরে চাপ দেয়। এখানে আরেকটি অ্যাপোজিশন জোনও থাকে। চোষক মূল পোষক কলা হতে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে।

জনন পদ্ধতি

Albugo অযৌন ও যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে থাকে ; যথা—

১. অযৌন—কনিডিয়াও চলরেণু দ্বারা এবং

২. যৌন গ্যামেট তৈরির মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

চিত্র ৬.৩৮ : *A. candida* আণুবীক্ষণিক দৃশ্য চোষক মূলের প্রস্থচ্ছেদের

অযৌন জনন

মাইসেলিয়ামের পূর্ণতাপ্রাপ্তির এক পর্যায়ে পোষক ত্বকের নিচে ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হাইফিগুলো হতে কিছু সংখ্যক খাড়া খাট, স্থূল প্রাচীরযুক্ত অশাখ ও গদাকৃতি হাইফি বের হয়ে আসে। এ হাইফিগুলোই রেণুস্থলীধর (কনিডিওফোর) নামে পরিচিত। এগুলো খুবই ঘনভাবে ও খাড়াভাবে পোষকের ত্বকের নিচে প্যালিসেড প্যারেনকাইমার ন্যায় সন্নিবিষ্ট থাকে। পুরুপ্রাচীর যুক্ত রেণুস্থলীধরের শীর্ষকোষটি স্ফীত হয়ে পাতলা প্রাচীরযুক্ত হয় এবং এতে ৫ থেকে ৬টি কেন্দ্রিকা থাকে। রেণুস্থলীধরের স্ফীত শীর্ষের সামান্য নিচে একটি খাঁজ তৈরি হলে প্রথম রেণুস্থলীটির উদ্ভব হয়। এভাবে, একের পর এক রেণুস্থলী বিকাশ লাভ করে পুঁতির মালার ন্যায় রেণুস্থলী শিকল তৈরি করে। পাশাপাশি রেণুস্থলীগুলোর মাঝখানে জেলাটিনের প্যাড তৈরি হয় বলে এগুলো পরস্পর যুক্ত হতে পারে। রেণুস্থলী ছোট, মসৃণ বর্ণহীন, প্রায় গোলাকার ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত এবং প্রতিটির আকার ১৪–১৬×১৬–২০ মাইক্রোমিটার। এগুলো শিকলে বিকাশের ধারানুপাতে নিম্নমুখীভাবে সাজানো থাকে। সেহেতু, বয়োজ্যেষ্ঠ্য রেণুস্থলীটি শিকলের অগ্রভাগে এবং বয়োকনিষ্ঠটি একেবারে নিচে থাকে। এ জাতীয় বিকাশ ও বিন্যাসের জন্য জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী রেণুস্থলীর বিসরণ এবং কনিষ্ঠগুলোর পুষ্টি নিশ্চিত হয়।

এক্ষেত্রে কিছু কিছু লেখকের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। তাঁরা রেণুস্থলীগুলোকে কনিডিয়া এবং রেণুস্থলীধরকে কনিডিওফোর বলে মনে করেন। আবার অনেকেই এদের কনিডিও রেণুস্থলী বা পর্ণমোচী রেণুস্থলী বলে অভিহিত করেন। রেণুস্থলীগুলোর চাপে পোষকত্বক বিদীর্ণ হয় এবং অতিক্ষুদ্র সাদা রঙের ফুস্কুড়িসদৃশ রেণুস্থলীর সোরাস দৃশ্যমান হয়। ফলে পোষকদেহের আক্রান্ত স্থানগুলোতে সাদা মরিচা দেখা যায়।

বিসরণ : রেণুস্থলী পরিণত ও পরিপক্ব হলে রেণুস্থলীগুলোর মধ্যবর্তী জেলাটিনের প্যাডগুলো শুকিয়ে সংকুচিত হয় এবং পরে আর্দ্র–বাতাসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে শিকল হতে রেণুস্থলী পৃথক হয়ে পড়ে। অতঃপর বায়ুপ্রবাহ বা বৃষ্টিধারায় রেণুস্থলীগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্ত রেণুস্থলীগুলো বা কনিডিয়াগুলো আকারে ক্ষুদ্র, বর্ণহীন, স্বচ্ছ, পাতলা প্রাচীরযুক্ত, গোলাকার ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়ে থাকে।

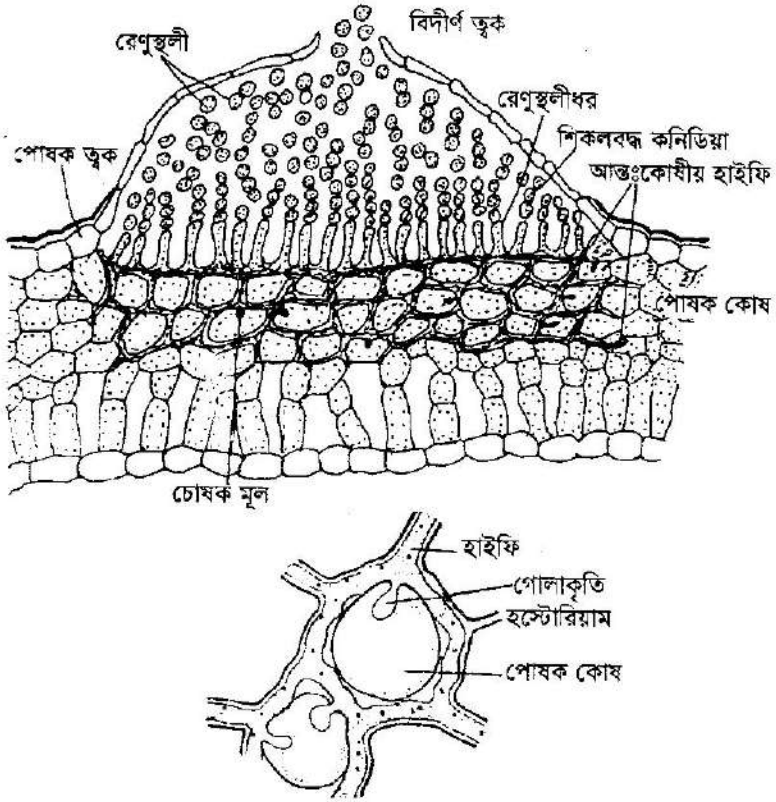

চিত্র ৬.৩৯ : *Albugo candida* ক. আক্রান্ত পাতার প্রস্থচ্ছেদে রেণুস্থলী ও খ. পোষক কোষে চোষক মূল

রেণুস্থলীর অঙ্কুরণ

উপযুক্ত পোষকে পৌঁছানোর ২/৩ ঘণ্টার মধ্যেই (যদি পরিবেশ অনুকূল হয়) রেণুস্থলীর অঙ্কুরণ শুরু হয়। পরিবেশের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে রেণুস্থলীগুলোর অঙ্কুরণ দু'ধরনের হয়ে থাকে ; যথা—ক. পরোক্ষ অঙ্কুরণ ও খ. প্রত্যক্ষ অঙ্কুরণ।

ক. পরোক্ষ অঙ্কুরণ

নিম্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রেণুস্থলীগুলো চলরেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে (খ)। এ ধরনের অঙ্কুরণের জন্য সবচেয়ে উত্তম তাপমাত্রা হলো ১০° সে.। রেণুস্থলীগুলো পানি শোষণ করে স্ফীত হয় এবং দানাদার প্রাণসত্তায় কতিপয় গহ্বর উৎপন্ন হয়। অতঃপর গহ্বর বিলীন হয়ে গেলে প্রোটোপ্লাস্ট বিভক্ত হয়ে ৫ থেকে ৮টি হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকাযুক্ত অপত্যপ্রোটোপ্লাস্ট উৎপন্ন করে। ইতোমধ্যে রেণুস্থলীর একপ্রান্তে একটি প্যাপিলা তৈরি হয়। প্রতিটি অপত্য-প্রোটোপ্লাস্ট এক একটি চলরেণুতে পরিণত হয় (ঙ)। এগুলো আকারে উত্তল-অবতলপৃষ্ঠযুক্ত চলরেণু। এগুলোর একপাশে থাকে ডিস্কসদৃশ সংকোচনশীল গহ্বর এবং পার্শ্বীয়ভাবে গহ্বরের নিকটবর্তী অংশে সন্নিবিষ্ট থাকে দুটি ফ্লাজেলা—এদের একটি টিনসেল ও অন্যটি হুইপল্যাস ধরনের। চলরেণু বিকশিত ও পূর্ণতা পেলে প্যাপিলা স্ফীত ও উন্মুক্ত হয়। প্যাপিলার ছিদ্রপথে চলরেণুগুলো নিশ্চল

হলেও একে একে বের হয়ে আসে (গ)। মুক্তিলাভের পর চলরেণুগুলো পোষকদেহের ভেজা গায়ের পানিতে সাঁতার কাটে। Vantspool-এর মতে প্যাপিলা স্ফীত হবার কারণে সৃষ্ট বৃন্তহীন ভেসিকলের মধ্যে প্রথমত চলরেণুগুলো চলে আসে এবং ভেসিকলটি বিলুপ্ত হলে চলরেণুগুলো মুক্ত হয়। সাঁতার শেষে চলরেণুগুলো পত্ররন্ধ্রের (জ) মাধ্যমে পোষক দেহে প্রবেশ করে ও ফ্লাজেলা দুটি বিলুপ্ত হয়। চলরেণু প্রাচীরাবৃত হয়ে গোলাকার হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুরনল (ছ) মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। এ অঙ্কুর নলগুলো শাখাপ্রশাখা যুক্ত হয়ে শাখান্বিত মাইসেলিয়াম গঠন করে।

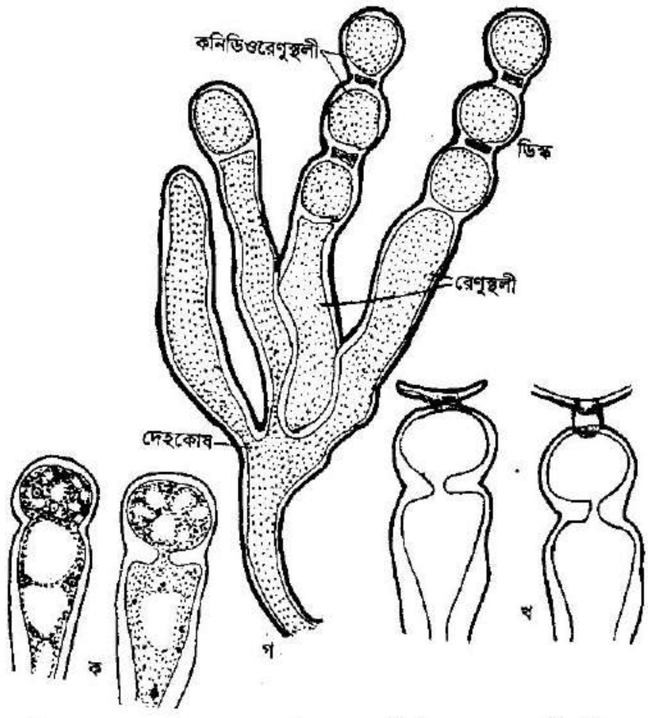

চিত্র ৬.৪০ : *Albugo candida* ক-খ. রেণুস্থলী খাঁজ ; গ. রেণুস্থলীর শিকল

খ. সরাসরি অঙ্কুরণ

অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় রেণুস্থলীগুলো কনিডিয়ার মতো আচরণ দেখায় (ঞ)। প্রতিটি কনিডিয়াম একটি অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় এবং পত্ররন্ধ্র বা বহিঃত্বকের কোনো ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে পোষকদেহে প্রবেশ করে। অঙ্কুরনলটি বহুধাবিভক্ত হয়ে শাখাবহুল মাইসেলিয়াম গঠন করে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, রেণুস্থলীগুলোর কনিডয়াল পদ্ধতিতে অঙ্কুরণ সচরাচর ঘটে না।

যৌন জনন

A. candida ছত্রাকের যৌন জনন উগ্যামীয় প্রকৃতির। বৃদ্ধি মৌসুমের শেষদিকে যৌন জনন পদ্ধতিতে *A. candida* জনন কাজ সম্পন্ন করে। পুং-জননাঙ্গকে পুংধানী এবং স্ত্রী-জননাঙ্গকে

[illegible] বলে (ক)। পোষক কলার আন্তঃকোষীয় অবকাশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের দুটি হাইফাতে পুংধানী ও স্ত্রীধানী উৎপন্ন হয় এজন্য যে, প্রজাতিটি সহবাসী। পুংধানী বহনকারী হাইফিটিকে পুং–হাইফি এবং শ্ত্রীধানী বহনকারী হাইফিটিকে শ্ত্রী হাইফি নামে অভিহিত করা হয়। খুব শীঘ্রই এদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পুংধানীটি স্ত্রীধানীর একপাশে মিলিত হয়। পোষকদেহে যৌনাঙ্গের বিকাশের কারণে সাধারণত পোষকে হাইপারট্রফি দেখা দেয় ও বা ঐ অঞ্চলের বা অঙ্গের বিকৃতি দেখা দেয়।

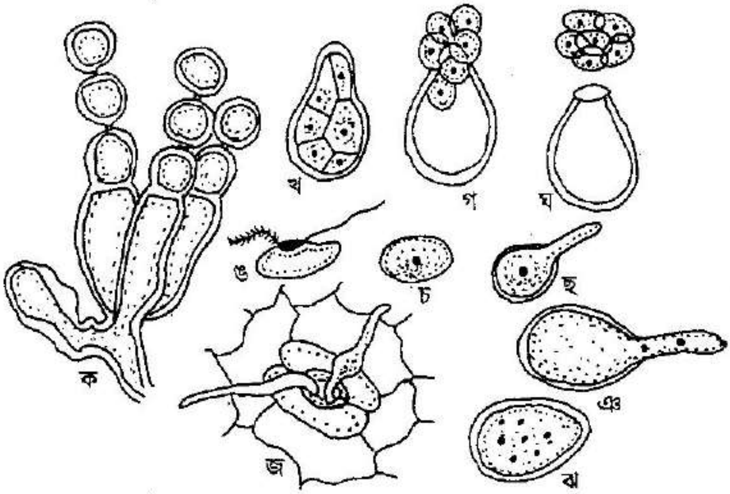

চিত্র ৬.৪১ : *A. candida* ক. এক গুচ্ছ রেণুস্থলীধর ও শিকলাকারে রেণুস্থলী ; খ–ঘ. চলরেণুর বিকাশ ও মুক্তি ; ঙ. মুক্ত চলরেণু, চ. আবৃত চলরেণু ; ছ. চলরেণুর অঙ্কুরণ, জ. পত্ররন্ধ্র মাধ্যমে আক্রমণ, ঝ–ঞ. সরাসরি অঙ্কুরণ

স্ত্রীধানী বা ডিম্বাণুস্থলী

স্ত্রী–হাইফির শীর্ষদেশ স্ফীত ও গোলাকার হয়ে ডিম্বাণুস্থলীতে পরিণত হয়। এটি অনেক সময় নিবেশিতও হয়ে থাকে। স্ফীত শীর্ষাগ্রটি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত (প্রায় ১০০টি) ও প্রচুর সঞ্চিত খাদ্যবস্তুজড়িত হয়ে থাকে। অতঃপর স্ফীতাংশের নিচে বহনকারী হাইফিতে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। ফলে স্ফীতাংশ ডিম্বাণুস্থলী হিসেবে পৃথক হয় (খ)। এ সময়ে ডিম্বাণুস্থলী প্রাণসত্তায় অসংখ্য কেন্দ্রিকা ও গহ্বর একাকার হয়ে ছড়ানো থাকে। কেন্দ্রিকাগুলো মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকা উৎপন্ন করে। যেহেতু ডিম্বাণুস্থলীটি পরিণতি লাভের দিকে এগিয়ে যায়, সেহেতু প্রথম মাইটোটিক বিভাজনের পর পরই দুটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায় (ক)। ঘন দানাদার প্রাণসত্তা ও বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকাসহ কেন্দ্রীয় উপ্লাজম ও (খ) অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা প্রাণসত্তা, বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকাও গহ্বরযুক্ত পরিধিস্থ পেরিপ্লাজম। এ অঞ্চল দুটি অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা প্লাজমাপর্দা দ্বারা পৃথক থাকে। অনেক সময়, উপ্লাজমের সবগুলো কেন্দ্রিকা পেরিপ্লাজমে চলে যায় (ঘ) এবং বলয়াকারে বিন্যস্ত হয়। এখানে কেন্দ্রিকাগুলো মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়। এক্ষেত্রে যে মাকুতন্তু উদ্ভূত হয়ে থাকে, সেটির একপ্রান্ত উপ্লাজমে ও অন্যপ্রান্ত পেরিপ্লাজমে থাকে (ঙ)। মাইটোসিসের অন্তিমলগ্নে মাকুতন্তুর প্রতিটি হতে ১টি করে কেন্দ্রিকা উপ্লাজমে চলে আসে এবং অন্যগুলো পেরিপ্লাজমে চলে যায় (চ)। ডিম্বাণুস্থলীর পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্বে উপ্লাজমের বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকার মধ্যে ১টি কেন্দ্রিকা কার্যকর থাকে এবং অন্যগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় (ছ)। পরিণত

উপ্লাজমে ১টি কেন্দ্রিকা থাকার ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে। একটি অভিমত হলো : একটি ছাড়া অন্য কেন্দ্রিকাগুলো পেরিপ্লাজমে চলে যায়। অন্য অভিমতটি হচ্ছে—উপ্লাজমের ১টি কেন্দ্রিকা ছাড়া অন্য সবগুলো কেন্দ্রিকা বিলুপ্ত ও বিলীন হয়ে যায়। মতভেদ যতই থাকুক না কেন, এ প্রত্যয় প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিণত ডিম্বাণুস্থলীতে ১টি কেন্দ্রিকা সতেজ ও সজীব থাকে এবং এককেন্দ্রিকাযুক্ত উপ্লাজম স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণু হিসেবে কাজ করে। পেরিপ্লাজমটি ডিম্বাণুর চারপাশে রক্ষাকারী প্রাচীরের কাজ করে থাকে।

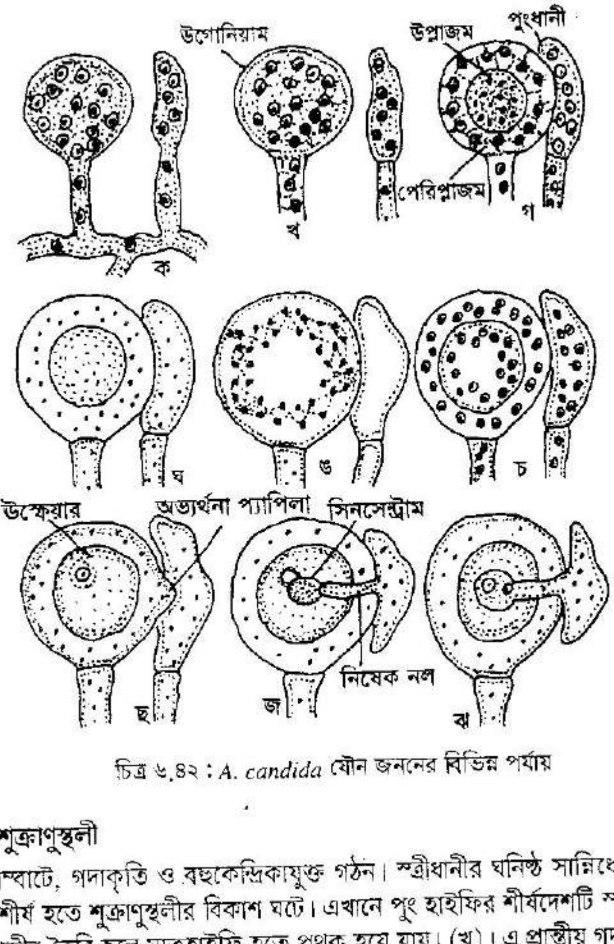

চিত্র ৬.৪২ : *A. candida* যৌন জননের বিভিন্ন পর্যায়

পুংধানী বা শুক্রাণুস্থলী

পুংধানীটি লম্বাটে, গদাকৃতি ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত গঠন। স্ত্রীধানীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী পুংহাইফির শীর্ষ হতে শুক্রাণুস্থলীর বিকাশ ঘটে। এখানে পুং হাইফির শীর্ষদেশটি স্ফীত হয়, নিচে একটি প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হলে মাতৃহাইফি হতে পৃথক হয়ে যায়। (খ)। এ প্রান্তীয় গদাকার কোষটিই পুংধানী নামে পরিচিত। পুংধানীতে বহুসংখ্যক কেন্দ্রিকা থাকলেও (৬–১২) মাত্র একটি কার্যকর থাকে। প্যারাগাইনাস পুংধানীটি সরাসরি ডিম্বাণুস্থলীর একপাশে সংস্পর্শে আসে (গ)।

নিষেক

ডিম্বাণুস্থলী ও শুক্রাণুস্থলী বয়োঃপ্রাপ্ত হবার পর উভয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যহেতু পরস্পরকে স্পর্শ করে। এ স্পর্শ স্থানের প্রাচীরটি খুবই পাতলা হয়ে যায়। এ স্থানেই শুক্রাণুস্থলী হতে ক্ষুদ্র ও

[illegible] নিষেকনল (ঝ) তৈরি হয়। পক্ষান্তরে ডিম্বাণুস্থলীতেও স্পর্শস্থানের প্রাচীর স্ফীত হয়ে প্যাপিলাসদৃশ উপবৃদ্ধি দেয় (জ) ; একে স্বাগতিক প্যাপিলা (জ) বলে। নিষেকনলটি স্বাগতিক প্যাপিলা ভেদ করে পেরিপ্লাজম হয়ে উপ্লাজমে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে গোলাকার ও দানাদার [illegible] ঘন ডিম্বাণুর কেন্দ্রে গঠিত হয় একে কোনোসেন্ট্রাম (Conocentrum) বলে। এটি ডিম্বাণু-কেন্দ্রিকাকে আকর্ষণ করে এবং এর একপাশে কোনো এক বিন্দুতে যুক্ত হয়। অবশেষে নিষেক নালিকা এটির নিকটবর্তী হয় এবং শীর্ষভাগ বিদীর্ণ হয়ে কোনোসেন্ট্রাম (Conocentrum)-এর সাথে যুক্ত হয় যাতে পুং-কেন্দ্রিকাটি ডিম্বাণু কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হতে পারে। অতঃপর নিষেকনলটি অকেজো হয়ে পড়লেও টিকে থাকে এবং কোনসেন্ট্রাম বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে উস্পোর (zn) তৈরি হয়।

উস্পোর : নিষিক্ত ডিম্বাণুটি (ঞ) তার চারদিকে একটি পুরু প্রাচীর নিঃসৃত করে নিজেকে আবৃত করে উস্পোরে পরিণত হয় (চিত্র ৬.৪২)। উস্পোর প্রাচীরটি ২/৩ স্তরযুক্ত। প্রাচীরের বহিঃস্তরটি পুরু ও অমসৃণ। কোনো কোনো প্রজাতিতে এ স্তরটি খাঁজকাটা কিংবা অন্যভাবে অলংকৃত হতে পারে। অন্তঃস্তরটি মসৃণ প্রকৃতির।

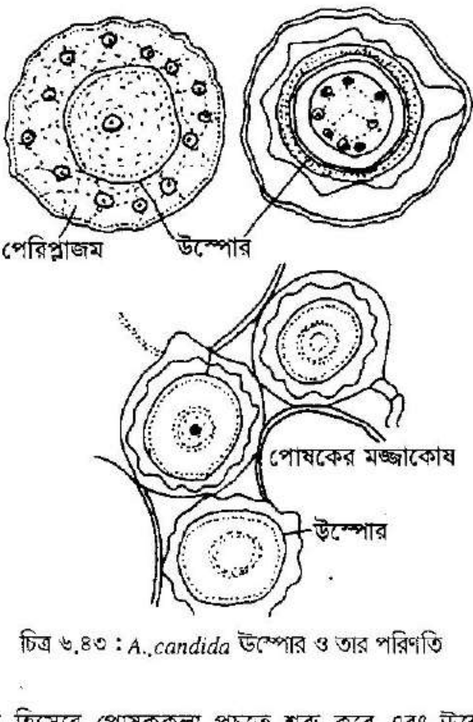

চিত্র ৬.৪৩ : *A. candida* উস্পোর ও তার পরিণতি

অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পোষককলা পচতে শুরু করে এবং উস্পোরটিও মুক্ত হয়। নিষেকের পর ও নিষিক্ত ডিম্বাণুটি প্রাচীরাবৃত হয়ে উস্পোরে পরিণত হবার অব্যবহিত পরে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি বার বার বিভাজন দ্বারা প্রায় ৩২টি হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা তৈরি করে (Walkerm 1969)। ৩২ কেন্দ্রিকাযুক্ত অবস্থায় উস্পোরটি মুক্ত হয়ে অবসর বিনোদনের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থা উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস পায়।

উস্পোরের অঙ্কুরণ

অনুকূল পরিবেশের আগমনে উস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে মিওরেণু তৈরি করে। ৩২টি কেন্দ্রিকা বিভক্ত হয়ে শতাধিক অপত্যকেন্দ্রিকা তৈরি করে। প্রতিটি কেন্দ্রিকার চারপাশে সামান্য পরিমাণ করে প্রাণসত্তাও জমা হয়। ফলে, এক–কেন্দ্রিকাযুক্ত বহুসংখ্যক অপত্য-প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি হয়। এগুলোর প্রতিটি ক্রমরূপান্তর মাধ্যমে এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও দ্বি–ফ্লাজেলাবিশিষ্ট বৃক্কাকার মিওচলরেণু উৎপন্ন হয়। পার্শ্বীয়ভাবে যুক্ত ফ্লাজেলাদ্বয়ের ছোটটি টিনসেল ও বড়টি হুইপল্যাস ধরনের হয়ে থাকে। বয়োঃপ্রাপ্তির পর মিওচলরেণু নিম্নোক্ত যে কোনো একটি উপায়ে উস্পোর হতে মুক্ত হয় :

১. Debary মত প্রকাশ করেন যে, উস্পোরের বহিঃপ্রাচীরটি ভেঙে গিয়ে উন্মুক্ত হয় (ক)। এ উন্মুক্ত পথে একটি পাতলা বৃন্তহীন ভেসিকল বের হয়ে আসে (খ)। চলরেণুগুলো এ ভেসিকলের মধ্য থেকে উস্পোর হতে নির্গত হয় (খ)। এটি অল্প সময়ের ব্যবধানে বিলুপ্ত ও বিলীন হলে মিওচলরেণুগুলো মুক্ত হয়।

২. Vanterpool (১৯৫৯) উল্লেখ করেন যে, উস্পোরটি একটি খাটো অঙ্কুরনল তৈরি করে যার অগ্রপ্রান্ত পাতলা ভেসিকলযুক্ত। চলরেণু এ ভেসিকলে জমা হলে আকারে বড় হয়। একসময় ভেসিকলটি বিদীর্ণ হয়ে চলরেণুগুলো মুক্ত হয় (গ) ও পানিতে সাঁতার কাটে (গ)।

চিত্র ৬.৪৪ : *A candida* ক–খ. উস্পোরের অঙ্কুরণ ; গ. মুক্ত মিওচলরেণু ; ঘ–ঙ. মিওচলরেণুর অঙ্কুরণ

চলরেণুর অঙ্কুরণ

সন্তরণ প্রাক্কালে মিওচলরেণুগুলো সুবিধাজনক পোষক দেহের সংস্পর্শে এলে ফ্লাজেলা গুটিয়ে গোলাকার হয়ে একটি প্রাচীরাবৃত হয়। প্রাচীরাবৃত মিওচলরেণু (ঘ) একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অঙ্কুরনল মাধ্যমে (ঙ) পত্ররন্ধ্র দিয়ে পোষকদেহে প্রবেশ করে এবং বহুভাবে অতি দ্রুত শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন করে মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে।

আলোচনা হতে এ প্রত্যয় সমর্থিত হয়েছে যে, *Albugo* অধিক বিশেষিত বাধ্যতামূলক পরজীবী এবং *Peronospora*–এর মতো বহু উন্নত বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। জননক্ষেত্রেই দেখা যায়, *Peronodpora* চেয়ে এটি মুক্ত পানির উপর অধিক নির্ভরশীল। কেননা রেণুস্থলী ও উস্পোর উভয়ই চলরেণু মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Albugo পরজীবী ছত্রাকটি *Crucifevae* গোত্রীয় উদ্ভিদে "সাদা মরিচা রোগ" সৃষ্টি করে ফলন কমিয়ে দেয়। *A. ipomeae panduranae* ছত্রাকটি মিষ্টি আলুকে আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে আবার *A bliti amarantaceae* গোত্রীয় উদ্ভিদকে রোগাক্রান্ত করে।

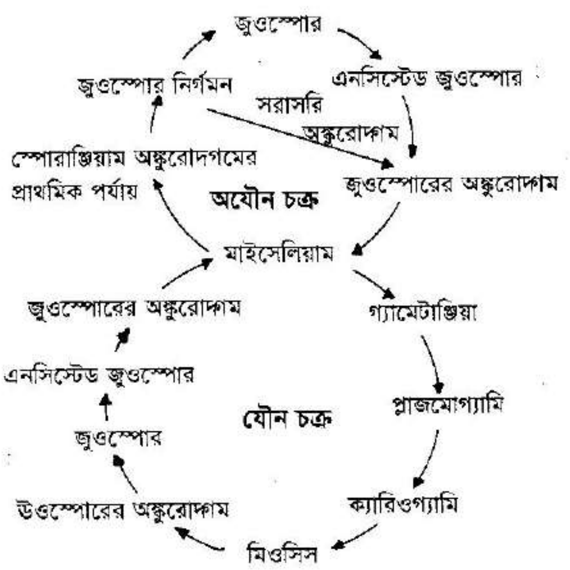

চিত্র ৬.৪৫ : *Albugo*–এর জীবনচক্র

রোগের প্রতিকার

১. ফসলের আবর্তন
২. আক্রান্ত উদ্ভিদকে পুড়িয়ে ফেলা
৩. বোর্দো মিশ্রণ ০.৮% ব্যবহার করা।

Albugo ছত্রাকের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. মাইসেলিয়াম সিনোসাইটিক ও শাখান্বিত।
২. ছত্রাকটি বাধ্যতামূলক পরজীবী ও 'সাদা–মরিচা রোগ' সৃষ্টিকারী।
৩. খাটো গদাকার রেণুস্থলীধর ও রেণুস্থলীগুলো সোরাসে শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। এগুলো অযৌন জনন একক।
৪. যৌন জনন উগ্যামীয় ও ছত্রাক সহবাসী।
৫. অযৌন জননে দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু তৈরি এবং যৌনভাবেও উস্পোর হতে মিওচলরেণু উৎপন্ন হয়।
৬. উস্পোরটি বিশ্রাম–রেণু ও প্রতিকূলতা এড়ানোর কৌশলও বটে।

Oomycetes-এ অভিব্যক্তির ধারা

Oomycetes এ নিম্নোক্ত অভিব্যক্তির ধারাগুলো দেখা যায় :

১. জলজ অবস্থা হতে স্থলজ প্রকৃতিতে উত্তরণের একটি প্রগতিশীল অভিব্যক্তির ধারা দেখা যায়। Lagendiales, Soprolegiales ও Leptomitales বর্গের প্রজাতিগুলো জলজ স্বভাবের। উন্নত Peronosporales বর্গে জলজ, উভচর ও স্থলজ প্রজাতি বিদ্যমান।

২. এ শ্রেণির প্রতিনিধিগুলো যেমন মৃতজীবী (*Saproleynia*) তেমনি সুবিধাবাদী পরজীবী (*Pythium*) ও বাধ্যতামূলক পরজীবী (*Peronospora* ও *Albugo*) হয়ে থাকে। উন্নত স্থলজ প্রকৃতির সব ছত্রাকই বাধ্যতামূলক পরজীবী।

৩. অনুন্নত পরজীবী ছত্রাকগুলোর মাইসেলিয়াম সাধারণত অন্তঃকোষীয় হয়ে থাকে ; কিন্তু অধিক উন্নতগুলোতে আন্তঃকোষীয় মাইসেলিয়াম দেখা যায় এবং এগুলো চোষকমূল মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে। লম্বাটে বা ভেসিকলার চেয়ে শাখান্বিত চোষকমূলকে অধিক উন্নত বলে ধরা হয়।

৪. কনিডিয়ার অভিব্যক্তি—রেণুস্থলীর অবস্থান্তর এ শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে বিভিন্ন প্রজাতিতে চলরেণুস্থলী হতে রেণুসদৃশ কনিডিয়ামে উত্তরণ লক্ষ্য করার মতো। *Soprolegnia* ও *Achlya*-এর মতো জলজ ও আদিম গণগুলো সম্পূর্ণরূপে চলরেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন কাজ চালায়। এ চলরেণুগুলো চলরেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। *Phytophthora pythium* ও *Peronospora*তে রেণুস্থলী দু'ধরনের আচরণ দেখায়—নিম্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রেণুস্থলীগুলো চলরেণুস্থলী হিসেবে কাজ করে ও চলরেণু তৈরি করে। কিন্তু আবহাওয়া শুষ্ক ও তাপমাত্রা বেশি হলে রেণুস্থলীগুলো রেণুর ন্যায় কনিডিয়া উৎপন্ন করে। এগুলো সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল দেয়। *Peronospora* রেণুস্থলী উৎপন্ন করে এবং সাধারণত কনিডিয়া হিসেবে কাজ করে।

৫. নিয়মানুযায়ী Oomycetes ছত্রাকের যৌন জনন উগ্যামীয় ও নিশ্চল ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন করে। Saporplegnistes এ আদিম ধরনের উগ্যামীয় জনন দেখা যায়। স্ত্রীধানীতে উস্ফেয়ারের সংখ্যা 2-α এবং এদের মধ্যে কোনো সীমা বা পার্থক্য থাকে না। *Pythium, Phytophthora* ও অন্যান্যগুলো স্ত্রীধানীতে ১টি উস্পোর উৎপন্ন হয়। এখানে স্ত্রীধানীয় প্রোটোপ্লাস্টে অঞ্চলায়ন সুপ্রতিষ্ঠিত।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণি—জাইগোমাইসেটিস
Class—Zygomycetes

এ শ্রেণিতে প্রায় ৩৫০ প্রজাতি ও ৩৭০টি গণ রয়েছে। এদের সবাই স্থলজ মোল্ড। এদের অধিকাংশই মৃতজীবী। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক মৃত্তিকা-মৃতজীবী ও কিছু সংখ্যক মলবাসী। এদের পরজীবী ছত্রাকগুলোতে পিন-মোল্ডও রয়েছে। এরা প্রধানত ছত্রাক, কীট-পতঙ্গ ও প্রোটোজোয়ানদের আক্রমণ করে থাকে। তাছাড়া, বিশেষ ধরনের কিছু সংখ্যক ছত্রাক জীব-জন্তু ও মানুষকে আক্রমণ করে বুক্তেকোমাইকোসিস রোগ সৃষ্টি করে। এদের খুব কম-সংখ্যক প্রজাতিই বাধ্যতামূলক পরজীবী।

এদের মাইসেলিয়াম সুগঠিত। তরুণাবস্থায় এরা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন এবং পরিণত অবস্থায় প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হতে পারে। অবশ্য এ প্রস্থপ্রাচীরের উপস্থিতি যৌনাঙ্গ বিকাশ বা ক্ষত নিবারণের সাথে সম্পর্কিত।

মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. ছত্রাকীয় কাইটিননির্মিত কোষপ্রাচীর।
২. জীবনেতিহাসের কোথাও সচল কোষ থাকে না।
৩. অযৌন জনন সাধারণত নিশ্চল স্পোরাঞ্জিওরেণু বা সমগ্র স্পোরাঞ্জিয়ামটি একক রেণু হিসেবে কাজ করে।
৪. অনেক ক্ষেত্রে ক্ল্যামাইডোরেণুও তৈরি হয়।
৫. যৌন জনন সাধারণত জননকোষাধার সংশ্লেষের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
৬. অনেক ক্ষেত্রে দুটো জনন কোষাধারের প্রোটোপ্লাস্টের পূর্ণ মিলনের ফলে উৎপন্ন জাইগোরেণু (বিশ্রাম-রেণুও বটে) একটি যৌথভাবে উৎপন্ন রেণুবিশেষ।
৭. জাইগোরেণুর অঙ্কুরণে উৎপন্ন হাইফার শীর্ষভাগে রেণুস্থলী থাকে।

এ শ্রেণিতে দুটি বর্গ রয়েছে—Mucorales ও Entolophthorales বিজ্ঞানী Bessey (১৯৫০) এ দুটোর সাথে Zoopagales নামে আরেকটি বর্গ যোগ করেন। এদের মধ্যে Mucorales সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

বর্গ—Mucorales

এ বর্গে প্রায় ২৫০টি প্রজাতি ও ৪৫টি গণ রয়েছে। প্রধানত বর্গের প্রজাতিগুলো স্থলজ-মৃতজীবী। অবশ্য, কিছু সংখ্যক প্রজাতি উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পরজীবীরূপেও জীবনযাপন করে। মৃতজীবী প্রজাতিগুলোকে সাধারণত ভেজা, পচনশীল জৈব দ্রব্যের উপর (গোবর, মল, পচাকাঠ) জন্মাতে দেখা যায়। এ বর্গের ছত্রাকগুলো 'কালো মোল্ড' নামে অধিক পরিচিত।

থ্যালাস সুগঠিত শাখাযুক্ত সূত্রাকৃতি বায়ব মাইসেলিয়াম। হাইফিগুলো সিনোসাইটিক ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন। মাইসেলিয়াম তরুণাবস্থায় সাদা এবং ধীরে ধীরে ধূসর বা বাদামি হয়ে যায়। মাইসেলিয়ামগুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে : বায়ব হাইফি ও শায়িত হাইফি। শায়িত হাইফিগুলো খাদ্য শোষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো আশ্রয়ে প্রোথিত থাকে, আবার কোথাও আশ্রয়ের উপর থাকে এবং রাইজয়ড উৎপন্ন করে খাদ্য সংগ্রহ করে।

দুটি গোষ্ঠীর রাইজয়ডের মধ্যে সংযোগকারী হাইফিকে স্টোলন (stolon) বলে। এটি সাধারণত আশ্রয়ের উপর দিয়ে বর্ধিত হয়।

অযৌন জনন : কলুমেলাযুক্ত গোলাকার রেণুস্থলী হতে উৎপন্ন নিশ্চল রেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ রেণুস্থলীগুলো বায়বীয় হাইফি হতে উৎপন্ন কনিডিওফোরের অগ্রভাগে থাকে। এ রেণুস্থলীগুলোতে অসংখ্য রেণু উৎপন্ন হয়। কতিপয় প্রজাতিতে ছোট, কম সংখ্যক রেণুযুক্ত কিংবা একরেণুযুক্ত রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় ; এগুলোকে স্পোরাঞ্জিওলা (Sporangiolla) বলে। স্পোরাঞ্জিওলা কলুমেলাযুক্ত বা কলুমেলাবিহীন হতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতিতে (*Choanephora*) স্পোরাঞ্জিওলা ও স্পোরাঞ্জিয়া উভয়ই একই রেণুস্থলীবহে উৎপন্ন হয়। এ রেণুস্থলীবহটি *Mueor protiferus* শাখান্বিত হয়ে থাকে। একক রেণুযুক্ত পতনশীল রেণুস্থলী বা স্পোরাঞ্জিওলাকে কনিডিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। Mucorales বর্গের *Cunninghamella* গণে প্রকৃত কনিডিয়াম উৎপন্ন হয়; এ কারণে অনেক ছত্রাকবিদই মনে করেন যে, Ascomycetes ও Zygomyectes একটা সাধারণ উৎস হতে উদ্ভূত হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে (খরা বা অতিরিক্ত পানি) হাইফিগুলো প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হয় এবং প্রতিটি খণ্ডের প্রোটোপ্লাজম গোলাকার হয়ে পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে প্রতিকূলতা সহনশীল রেণুতে পরিণত হয়। এ ধরনের রেণুকে ক্ল্যামাইডোরেণু বলে। এগুলো অনুকূল পরিবেশের আগমণে সরাসরি নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। অযৌন রেণু উৎপাদন পরিবেশনির্ভরশীল তথা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলোর উপর নির্ভর করে।

ক. **তাপমাত্রার প্রভাব :** Barnett ও Lilly (১৯৫০, ১৯৫৫) বহুরেণুযুক্ত ও একক-রেণুযুক্ত রেণুস্থলী উৎপাদনকারী *Choanophora cucurbitum* নিয়ে গবেষণা চালিয়ে উল্লেখ করেন যে, ৩০° থেকে ৩১° সে তাপমাত্রা ও ১০০% আর্দ্রতা রেণুস্থলী বিকাশের অনুকূল। এ পরিবেশে কনিডিয়া উৎপাদন ব্যাহত হয় বা একেবারেই হয় না। কনিডিয়া উৎপাদনের জন্য ২৫° সে. তাপমাত্রা ও নিম্ন আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়।

খ. **আলোর প্রভাব :** নিরন্তর অন্ধকার, নিরন্তর উজ্জ্বল আলো (৬০ ফুট, ক্যান্ডলস্) বা অন্ধকারের পর উজ্জ্বল আলোর পরিবেশে কনিডিয়া উৎপন্ন হয় না। অন্ধকার পিরিয়ড যখন উজ্জ্বল আলোর দ্বারা অপসারিত হয় তখন প্রচুর কনিডিয়া উৎপন্ন হয়। কাজেই, কনিডিয়া উৎপাদনের জন্য যে দ্রব্যটির প্রয়োজন হয় সেটি দুটি ধাপে তৈরি হয় : প্রথম ধাপে আলোর প্রয়োজন হয় এবং দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে আলো দিয়ে দমন করা।

যৌন জনন : Mucorales বর্গের যৌন জনন আইসোগ্যামেটাঞ্জিয়াল। দুটি খাট পার্শ্বশাখা বা প্রোগ্যামেটাঞ্জিয়া পাশাপাশি দুটি অনুসূত্র হতে উৎপন্ন হয়। প্রোগ্যামেটাঞ্জিয়া বহনকারী হাইফিকে Zygophores বলে। প্রোগ্যামেটাঞ্জিয়াদ্বয় একে অন্যের দিকে বর্ধিত হয়ে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, প্রান্তে-প্রান্তে সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রতিটি প্রোগ্যামেটাঞ্জিয়াম শীর্ষভাগে প্রস্থপ্রাচীর গঠন করে একটি ছোট, প্রান্তীয়, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত কোষ দেয়। একে গ্যামেটোঞ্জিয়াম বলে।

অবশিষ্টাংশকে সাসপেনসর বলে। অধিকাংশ প্রজাতিতেই গ্যামেটাঞ্জিয়ামদ্বয় বাহ্যিকভাবে একই রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষম ধরনের (একটি বড়, অন্যটি ছোট) হয়ে থাকে। সংস্পর্শস্থানের কোষপ্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে এবং তাদের বস্তুনিচয় ফিশন কোষে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায়। ফলে ক্যারিওগ্যামিও হয়ে যায়। এ ফিউশন কোষেই জাইগোরেণু গঠিত হয়। জাইগোরেণুর প্রাচীর পুরু, রঞ্জক দ্রব্যযুক্ত ও অলংকৃত। এটি খরা ও অন্যান্য প্রতিকূলতা সহনশীল অঙ্কুরণকালে হাইফি বের হয় এবং শীর্ষাগ্রে স্পোরাঞ্জিয়াম থাকে।

Phycomycesblakesleanus-এর জাইগোরেণু বন্ধ্যা, ফর্কট পত্র কন্টকসদৃশ গঠন দ্বারা আবৃত থাকে। এগুলো সাসপেনসর থেকে উৎপন্ন হয়। *Mortierella* গণের জাইগোরেণু বন্ধ্যা হাইফির তুলাসদৃশ শীথ দিয়ে রক্ষা হয়। Endogone-তে এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও একটু উন্নত। পাশাপাশি কিছু সংখ্যক জাইগোরেণু একটি অনুসূত্রীয় শীথের মধ্যে আবদ্ধ হয় কিংবা পেরিডিয়াম যুক্ত হয়ে ফলদেহে পরিণত হয়। এ ধরনের ফলদেহ অ্যাসকোমাইসেটিসের সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে জাইগোরেণুর এ ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল প্রবণতা Ascomycetes –এর পূর্বসূরিদের বিকাশধারার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

Mucorales–এ যৌনতার বিকাশ

Mucorales বর্গের অধিকাংশ প্রজাতিই হোমোথ্যালিক। অন্যভাবে বলা যায় একই মাইসেলিয়াম হতে ফিউজিং গ্যামেটাঞ্জিয়াম বহনকারী জাইগোফোর উৎপন্ন হয়। বহু প্রজাতিতে দু'ধরনের হাইফি থাকে। এগুলো বাহ্যিকভাবে দেখতে একই রকম হলেও জনন কাজের সময় ভিন্ন রকম কাজ করে। এগুলো দু'ধরনের যৌনতাযুক্ত—১টি (+) ও অন্যটি (−) স্টেইন। (+) জাইগোফোর ও (−) জাইগোফোর পরস্পর মিলিত হলেই জাইগোরেণু তৈরি হয়। একেই হেটোরোথ্যালিক বলে। বিজ্ঞানী **Blakesles (১৯০৪) সর্বপ্রথম Mucorales–এ হেটোরোথ্যালিজম আবিষ্কার করেন।**

হেটোরোথ্যালিজম বা ভিন্নধর্মিতা

Sporodinia grandis জাইগোরেণু গঠন প্রক্রিয়াটি প্রথম লক্ষ্য করেন Ehrenberg (১৮২০), ও DeBary (১৮৬৪)। এর দীর্ঘদিন পর Blakeslee (১৯০৪) জাইগোরেণু গঠনের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। তিনি একটি *Sporodina grandis* –এর রেণুকে আবাদ মাধ্যমে চাষ করে জাইগোরেণু উৎপাদনে সক্ষম হন। কিন্তু *Rhizopus nigricans*-কে ঐ এক ধরনের আবাদ মাধ্যমে চাষ জাইগোরেণু পেতে ব্যর্থ হন। তাই তিনি জাইগোরেণু গঠনের ভিত্তিতে এটির প্রজাতিসমূহকে দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন—একই থ্যালাস বা মাইসেলিয়াম হতে জাইগোরেণু তৈরি হয় এদেরকে হোমোথ্যালিক বলে এবং প্রপঞ্চকে হোমোথ্যালিক বলে। তাছাড়া একই প্রজাতির দুটি বিষমপ্রকৃতির অনুসূত্রীয় হতে জাইগোরেণু-এ উৎপন্ন হয় এদেরকে হেটোরোথ্যালিক এবং এই প্রপঞ্চকে বলে হেটোরোথ্যালিজম (heterothallism)। হোমোথ্যালিক গোষ্ঠীভুক্ত প্রজাতির মধ্যে *Sporodinia grandis, Dicranophora fulva, Rhigopus sexualis* উল্লেখ্য এবং হেটোরোথ্যালিক গোষ্ঠীর মধ্যে *Absida caerulea, Blakeslea trispos, Mucor mucedo, Phycomyces nitens, Rhizopus nigricans* উল্লেখযোগ্য।

Blakeslee আরও ব্যাখ্যা দেন যে, হেটোরোথ্যালিক প্রজাতিতে জাইগোরেণুর উৎপাদন সাধারণত বাহ্যিকভাবে না হলেও শারীরবৃত্তীয়ভাবে ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী দুটি মাইসেলিয়ামের মিথস্ক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। তিনি এদেরকে + স্ট্রেইন ও − স্ট্রেইন নামে চিহ্নিত করেন। Blakeslee-এর মতে, হেটোরোথ্যালিজম এমন একটি অবস্থা যেখানে জাইগোরেণুর উৎপাদন দুটি ভিন্ন যৌন বিভবযুক্ত মাইসেলিয়া বা থ্যালাসের মিথস্ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে,

হোমোথ্যালিক অবস্থায় জাইগোরেণুর বিকাশ একই থ্যালাস দ্বারা সম্পন্ন হয়। এখানে বিপরীতধর্মী দুটি থ্যালাসের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয় না। Blackman (১৯০৬) মনে করেন যে, যেখানে ফিউজিং কোষদ্বয় বাহ্যিকভাবে বিসদৃশ নয় সেখানে 'সেক্স' শব্দটির ব্যবহার যথার্থ নয়। এক্ষেত্রে তিনি সিনাগ্যামি (syngamy) ব্যবহার করা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে উল্লেখ করেন।

জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ

বেশ কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর জাইগোরেণুটি অঙ্কুর-রেণুস্থলী মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। এ অঙ্কুর রেণুস্থলীকে জাইগোরেণুস্থলী বা অঙ্কুর স্পোরাঞ্জিওস্পোর কিংবা অঙ্কুর-রেণুস্থলীবহ বলে। এটি আবার অঙ্কুরিত হয়ে মাইসেলিয়াম দেয়। *Mucor hiemalis* এ অঙ্কুর রেণুস্থলীবহ শাখাযুক্ত হয় এবং দুটি রেণুস্থলী গঠন করে। জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ বিশুদ্ধ হোমোথ্যালিক, বিশুদ্ধ হেটারোথ্যালিক ও মাইসেয়াল অঙ্কুরণ হতে পারে।

Blakeslee (১৯০৬) যে Mucor −১ হোমোথ্যালিক স্ট্রেইনের অঙ্কুর স্পোরাঞ্জিওরেণু যখন এককভাবে পৃথক করা হয় সেটি অঙ্কুরিত হয়ে জাইগোরেণু-উৎপাদনকারী মাইসেলিয়াম দেয়। এ ধরনের অঙ্কুরণকে তিনি বিশুদ্ধ হোমোথ্যালিক বলে।

Kohler (১৯৩০) Mucor mucedo-এর একটি অঙ্কুর রেণুস্থলী হতে সবগুলো স্পোরাঞ্জিওরেণু সংগ্রহ করে অঙ্কুরণ হতে দেন এবং একই ধরনের ম্যাটিংটাইপ মাইসেলিয়া পান। এ ধরনের জাইগোরেণুর অঙ্কুরণকে বিশুদ্ধ হেটারোথ্যালিক বলে।

Coffer (১৯৪২) Sjowall (১৯৪৫) ও Gouzs (১৯৬৫) Mucorhiemalis-এ জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ লক্ষ্য করে উল্লেখ করেন যে, এতে বিশুদ্ধ হেটারোথ্যালিক অঙ্কুরণ ঘটলেও *Mucor mucedo* হতে কিছুটা আলাদা। এখানে জাইগোরেণু অঙ্কুরিত হয়ে স্পোরাঞ্জিফোর দেওয়ার পূর্বে অন্তগর্জ মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে। এ ধরনের অঙ্কুরণকে মাইসেলিয়াল অঙ্কুরণ বলে।

Blakeslee (১৯০৬) *Sporodinia grandis, Mucor mucedophycomyces nitens* ও *Rhizopus*-এর উপর অনুশীলন করে উল্লেখ করেন যে, + ও − বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রেণুর ৪-ধরনের অঙ্কুরণ দেখা যায় :

ক. হোমোথ্যালিক *Sporodinia grandia*-এর অঙ্কুর রেণুস্থলীর সব রেণু অঙ্কুরিত হয়ে হোমোথ্যালিক মাইসেলিয়া দেয় ; অন্য কথায়, সবগুলোই (±)।

খ. হেটারোথ্যালিক Mucormuce -এর অঙ্কুর-রেণুস্থলীতে বিকশিত সবগুলো রেণুই এক ধরনের ; এগুলো হয় + না হয় −। এক্ষেত্রে জাইগোরেণু অঙ্কুরিত হবার পূর্বে এদের যৌনতা পৃথক হয়ে যায়।

গ. অন্য একটি হেটারোথ্যালিক *Phycomyces nitens*-এ অঙ্কুর রেণুস্থলী তিন ধরনের রেণু বহন করে ; এগুলো হচ্ছে : +, −, ও ±। এ ক্ষেত্রে যৌনতার আংশিক পৃথকীকরণ হয়েছে। এগুলো ± অঙ্কুরিত হয়ে হোমোথ্যালিক মাইসেলিয়া দেয়। এখান থেকে মনে হয়, খুব সম্ভবত কতিপয় ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা রেণু তৈরিতে অংশ নেয় এবং এরা মিওটিক বিভাজনে অংশ নেয় না।

ঘ. Blakelee যেটিকে *Rhizopus nigrican* বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটিকে শ্রেণিবিন্যাসিত করতে সক্ষম হন নি। কেননা তিনি জাইগোরেণুর অঙ্কুরণে বেশ কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবে তিনি ধারণা করেন যে, অঙ্কুরণ-রেণুস্থলীতে মিশ্রিত + ও − স্পোরাঞ্জিওস্পোর থাকতে পারে। এটিকেই তিনি ৪র্থ ধরনের বলে বর্ণনা করেন।

Gauges (১৯৬১) *Rhizopns stolonifer, R. nigricans*–এর জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ ঘটাতে সক্ষম হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, একটি জাইগোরেণু আবাদ মাধ্যমে "স্পোরাঞ্জিওস্পোর" উৎপাদন করে ; এগুলোর সবই হয় +, না হয় সবই – কিংবা + ও – এর মিশ্রণ।

জাইগোরেণু উৎপাদন ও অঙ্কুরণকালে কেন্দ্রিকার আচরণ

জাইগোরেণু উৎপাদন ও অঙ্কুরণের সাথে যেসব কোষতাত্ত্বিক ঘটনা জড়িত তা সুস্পষ্টভাবে জানার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে : এগুলো হচ্ছে—শক্ত জাইগোরেণু প্রাচীর, জাইগোরেণুর প্রোটোপ্লাস্টের ঘনত্ব, প্রচুর পরিমাণে তেলবিন্দুর উপস্থিতি ; তাছাড়া, প্রোটোপ্লাস্টের দানাদার গঠন প্রকৃতি এবং কেন্দ্রিকার আকার–আয়তনে খুবই ছোট। তবে জাইগোরেণুর গঠন হতে রেণুবিকাশের সময় কেন্দ্রিকার আচরণ নিম্নোক্ত যে কোনো একটি পথ অনুসরণ করে।

১. বিপরীত গুণযুক্ত একজোড়া কেন্দ্রিকা টিকে থাকে এবং এরা মিলিত হয়ে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা দেয়।
২. সবগুলো কেন্দ্রিকা যুগলবন্দী হয় এবং একজোড়া কেন্দ্রিকা টিকে থাকে ; পরে এটি মিলিত হয়ে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা দেয়।
৩. সবগুলো কেন্দ্রিকা যুগলিত হয় এবং যুগল বিভাজনও ঘটে কিন্তু একজোড়া কেদ্রিকা টিকে থাকে ; পরে এরা মিলিত হয়ে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা দেয়।
৪. সব কেন্দ্রিকা যুগলবন্দী হয় মিলিত হয়ে বহুসংখ্যক ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা ও দেয়। এখানে সবগুলো ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটিকে থাকে বা একটি ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা টিকে থাকে ও অন্যগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়।

Dangeard (১৯০৬), Moreau (১৯১১–১৩) ও Keehe (১৯১৪) উল্লেখ করেন যে, জাইগোরেণু কেন্দ্রিকা যুগল অবস্থায় থাকে এবং তাদের মধ্যে একসময় মিলন ঘটে। Lendnes (১৯০৪) *Sporodinia grandis*–তে এবং McCormick (১৯১২) উল্লেখ করেন যে, মাত্র এক জোড়া কেন্দ্রিকা সতেজ ও সবল থাকে এবং তাদের মধ্যে মিলন হয়। অন্যগুলো নষ্ট হয়ে যায়। Cutter (১৯৪২) Mucorales বর্গের উপর প্রচুর গবেষণা করার পর ব্যাপক বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করেন। *Mucor hiemalis, Blakeslea trispora* ও *Absidia spinosa*-তে সংশ্লেষ হবার পর কয়েকদিন যুগলবন্দী কেন্দ্রিকা থাকে। অতঃপর যুগল কেন্দ্রিকার মধ্যে মিলন হয় ও কেন্দ্রিকাদ্বয় একত্রিত হয়ে ডিপ্লয়ড হয়। এ ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয় ; ফলে বিশ্রামরত জাইগোটটি হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা বহন করে। *Rhizopus nigricans, Absidia glauca* ও *Absidia coerulea* প্রভৃতিতে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রিকা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং অন্যগুলো যুগলবন্দী হয়ে মিলিত হয়, ডিপ্লয়ড হয় ও বিশ্রাম দশায় চলে যায়। এটি অঙ্কুরিত হবার ঠিক পূর্বে কেন্দ্রিকাটি মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়।

Mucorales বর্গে অনেকগুলো গোত্র রয়েছে। এর মধ্যে Mucoraceae সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

গোত্র Mucoraceae

Mucorales বর্গের এটি বৃহত্তম গোত্র। এ গোত্রের প্রজাতিগুলো স্পোরাঞ্জিওলা ও কনিডিয়াবিহীন। রেণুস্থলী কলুমেলাযুক্ত, পাতলা ও বৃন্তিকাবিহীন প্রাচীরযুক্ত। তবে কতিপয় প্রজাতির রেণুস্থলী কলুমেলাবিহীন ও গুটিকয়েক রেণুযুক্ত। জাইগোরেণু বিভিন্ন রকমের, মসৃণ বা কণ্টকযুক্ত হয়ে থাকে। এ গোত্রের উল্লেখযোগ্য গণ হলো *Rhizopus* ও *Mucor* । অন্য কয়েকটি হলো *Pirella, Cirinella, Absidia, Mycocladns Spinellus, Sporodinia, Phycomyces, Zygorhynchns* প্রভৃতি।

Rhizopus গণে ৩৫টি প্রজাতি রয়েছে। এরা সবাই মৃতজীবী। এদের মধ্যে *R. stolonifer* সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রতীক প্রজাতি *R. stolonifer* (Syn. *R. nigricans*)

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Zygomycetis
বর্গ—Mucorales
গোত্র—Mucoraceae
গণ—*Rhizopus*
প্রজাতি—*R. stolonifer*

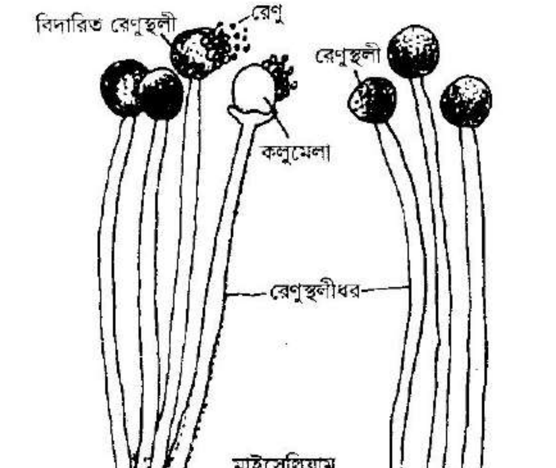

চিত্র ৭.১ : *Rhizopns stolonifer* ক. মাইসেলিয়াম ; খ. রেণুস্থলীবহ ; গ. রেণুস্থলী স্টোলন ; ঘ. রাইজয়ডাল হাইফি প্রভৃতি দেখানো হয়েছে

প্রকৃতি ও বসতি

Rhizopus-এ প্রায় ৩০টি প্রজাতি রয়েছে ও তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। অধিকাংশ প্রজাতিই মৃতজীবী। *R. stolonifer* ছত্রাকটি 'ব্রেড-মোল্ড' নামে সর্বাধিক পরিচিত। তবে এটি রাঙা আলুর নরম পচন রোগের জন্যও দায়ী। পনির, আচার, পচা ও বাসী রুটি, পচা ফল, শাক-সবজি জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের উপর প্রচুর পরিমাণে এগুলো জন্মে থাকে। অবশ্য ছত্রাকটির সুন্দর জীবনযাপনের জন্য উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ ও আর্দ্রতা প্রয়োজন। তাই এদের বর্ষাকালেই জন্মাতে দেখা যায়। *R. stolonifer* প্রতিকূল পরিবেশে দুর্বল পরজীবীরূপে স্ট্রবেরি ফলের 'লিক' রোগের ও গোল আলুর 'সফট রট' রোগের জীবাণুরূপে জন্মায়। কিছু কিছু প্রজাতি মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর 'মিউকর-মাইকোসিস' রোগের জন্য দায়ী।

উদ্ভিদের দেহ

Rhizopus একটি সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। এটির দেহ একটি মাইসেলিয়াম। এ মাইসেলিয়াম আবার তুলার আঁশের মতো উজ্জ্বল সাদা রঙের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাযুক্ত সূক্ষ্ম অনুসূত্র নিয়ে গঠিত। অনুসূত্রগুলো প্রস্থপ্রাচীরবিহীন। সেহেতু এরা অবিচ্ছিন্ন প্রোটোপ্লাজম, বহু সংখ্যক ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কেন্দ্রিকা, গহ্বর ও যথেষ্ট পরিমাণ প্রাণসত্তার সমষ্টি। এ ধরনের গঠনকে সিনোসাইট বলে। প্রথমাবস্থায় মাইসেলিয়ামের অনুসূত্রগুলো একই রকম হলেও বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মধ্যে শ্রমবিভাগ দেখা দেয়। কাজের ধরন অনুযায়ী এদের কিছু দৈহিক পরিবর্তনও হয়। পরিণত মাইসেলিয়ামে তিন ধরনের অনুসূত্র দেখা যায়। অনুসূত্রগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. **রাইজয়ডীয় অনুসূত্র :** যেসব স্থানে অনুসূত্রগুলো আশ্রয়স্থল বা মাধ্যমকে স্পর্শ করে সেসব স্থান হতে বহু সংখ্যক বাদামি, সরু ও শাখান্বিত অনুসূত্র বের হয়ে আশ্রয়ের বা মাধ্যমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বৃদ্ধি পায়। এগুলো যে শুধু স্টোলনকে ধরে রাখে তা নয়, বরং সমগ্র ছত্রাককে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে এবং আশ্রয় হতে জৈবখাদ্যও সংগ্রহ করে।

২. **স্টোলন বা বক্রধাবক অনুসূত্র :** এগুলো অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বায়বীয় অনুসূত্র এবং আশ্রয়স্থান বা মাধ্যম হতে সামান্য উত্থিত হয়ে মাধ্যমের উপরিভাগে আনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় এর অগ্রভাগ বক্রাকারে মাধ্যমকে স্পর্শ করে। এভাবে এরা অতি শীঘ্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো মাইসেলিয়াম ও মাধ্যমের স্পর্শস্থান হতে উৎপন্ন হয় এবং উভয় প্রান্তে রাইজয়ডীয় অনুসূত্র থাকে। এগুলো অধিক সতেজ হয়ে থাকে।

   সোমাটিক পর্যায়ে ছত্রাকের দেহে এ দুটি অনুসূত্র একই থাকে এবং তুলার ন্যায় সাদা হয় এবং জনন দশায় প্রবেশের সাথে সাথে মোল্ডসদৃশ হয় ও তৃতীয় অনুসূত্রটি দেখা দেয়।

৩. **বায়ব অনুসূত্র বা রেণুস্থলীধর :** জননকালে ধারকের উভয় প্রান্তে ও রাইজয়ডীয় অনুসূত্র-ঝাড় হতে গুচ্ছাকারে আলোকাভিমুখীভাবে উপর দিকে খাড়াভাবে যেসব অনুসূত্র বৃদ্ধি পায়, তাদের বায়ব অনুসূত্র বা রেণুস্থলীধর বলে। এদের শীর্ষভাগে রেণুস্থলী থাকে।

থ্যালাসের গঠন

মাইসেলিয়াম গঠনকারী অনুসূত্রগুলো স্বচ্ছ, নলাকার ও প্রাচীর কাইটিননির্মিত। এতে হাইড্রোজেন ও কার্বন ছাড়াও নাইট্রোজেন থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফে দেখা যায় যে, এগুলো ম্যাক্রোফ্রাইব্রিলার

গঠনযুক্ত এবং তলের সাথে সমান্তরালভাবে ম্যাক্রোফ্রাইব্রিলগুলো বিন্যাসিত। সূত্রগুলো কাইটিনের মাইক্রোফাইব্রিল ছাড়া কাইটোসান ও প্রাচীরে থাকে। তাছাড়া নানা ধরনের পলিস্যাকারাইড যেমন গ্লুকোসোমাইল, গ্যালাকটোজ প্রোটিন, লিপিড প্রভৃতিও থাকে।

কাইটিনাস প্রাচীর অর্ধভেদ্য। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে প্রাচীরের ভিতর দিকে অতি সূক্ষ্ম প্লাজমাপর্দা দেখা যায়, যা প্রোটোপ্লাস্টকে আবৃত করে রাখে। প্রোটোপ্লাস্ট দানাদার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রিকাযুক্ত ও তেলবিন্দুবিশিষ্ট। এছাড়াও প্রাণসত্তায় অসংখ্য ছোট ছাট রাইবোজম, আন্তঃপ্লাজমা জালিকা ও মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। বর্ধনশীল অনুসূত্রের অগ্রভাগের প্রোটোপ্লাস্ট অধিক ঘন ও দানাদার। অনুসূত্রের বয়স্ক অংশে গহ্বর থাকে। কেন্দ্রিকাগুলো দ্বিস্তরীয় কেন্দ্রিকা পর্দাবৃত। এ পর্দায় রন্ধ্রও থাকে।

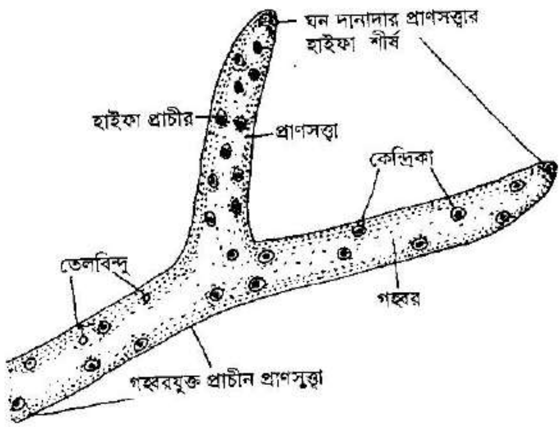

চিত্র ৭.২ : *R. stolonifer* –এর অনুসূত্রের গঠনপ্রকৃতি দেখানো হয়েছে

Rhizopus –এর অনুসূত্রে কোনো প্রস্থপ্রাচীর থাকে না। সেহেতু অনুসূত্রগুলো সিনোসাইটিক। অবশ্য জননাঙ্গ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। তাছাড়া আঘাত ও ক্ষত নিরাময়কল্পেও প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হতে পারে। অনুসূত্রের বৃদ্ধি সবসময় শীর্ষ অঞ্চলীয়।

পুষ্টি : *Rhizopus* ক্লোরোফিলবিহীন। সেহেতু এটি পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি (CO_2O, H_2O) হতে জৈব দ্রব্য সংশ্লেষ করতে পারে না। তাহলো এরা পুষ্টি গ্রহণ করে কিভাবে? এ ছত্রাকগুলো মৃতজীবী। সেহেতু এরা এদের রাইজয়ডীয় অনুসূত্র হতে নিঃসৃত উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলে আশ্রয়স্থলের অদ্রবণীয় জৈব দ্রব্যকে দ্রবণীয় করে এবং ব্যাপনক্রিয়ায় তা গ্রহণ করে। কাজেই, এদের পুষ্টি কৌশল হেটারোমরফিক ও স্যাপ্রোফাইটিক।

জনন প্রক্রিয়া

Rhizopus অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

১. **অঙ্গজ জনন :** অনুকূল পরিবেশে *Rhizopus*–এর যে কোনো অংশ একটি নতুন মাইসেলিয়াম হিসেবে কাজ করতে পারে।

অযৌন জনন

অনুকূল পরিবেশে তথা মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলে প্রতিটি রেণুস্থলীধরের অগ্রভাগে ছোট গোলাকার ও কালো বর্ণের রেণুস্থলী থাকে। এ রেণুস্থলীতে অজস্র বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত নিশ্চল রেণু তৈরি হয়। প্রতিটি রেণু হতে একটি করে নতুন মাইসেলিয়াম তৈরি হতে পারে। রেণুস্থলীতে রেণু তৈরির পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো :

ক. **রেণুস্থলীর বিকাশ :** মাইসেলিয়ামের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর ধাবকের উভয় প্রান্ত হতে একগুচ্ছ অনুসূত্র খাড়াভাবে উপরদিকে উঠতে থাকে ; এদের রেণুস্থলীধর বলে। এ খাড়া অনুসূত্রটি কিছুটা বৃদ্ধি পেলে তার অগ্রভাগটি স্ফীত হয়ে রেণুস্থলী তৈরি করে। মাইসেলিয়ামের শায়িত অংশ হতে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রিকা, পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাণসত্তা ও সঞ্চিত খাদ্যবস্তু রেণুস্থলীর মধ্যে এসে জমা হয়। ফলে শীর্ষদেশের রেণুস্থলীটি ক্রমান্বয়ে বর্ধিত ও স্ফীত হয়। এটি প্রথমে সাদা বলের মতো থাকে এবং পরে তা কালো হয়ে যায়।

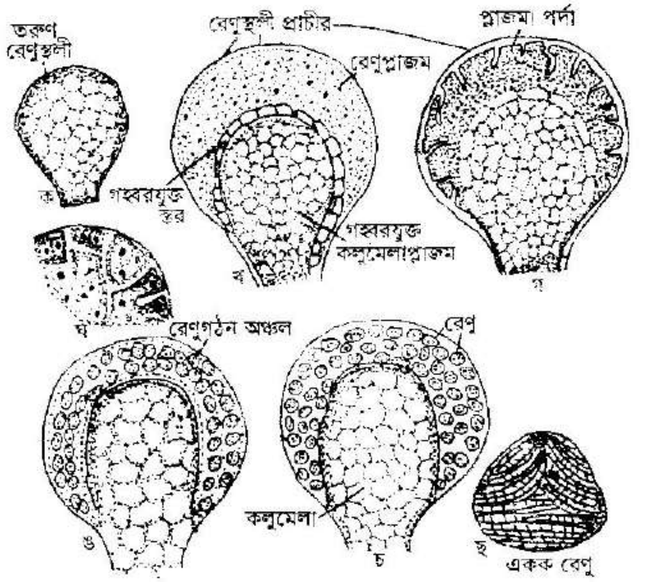

চিত্র ৭.৩ : *R. stolonifer* ক–চ. রেণুস্থলী ও রেণু বিকাশের বিভিন্ন দশা ; ছ একক রেণু

খ. **রেণুর বিকাশ :** তরুণ রেণুস্থলীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাণসত্তা ও কেন্দ্রিকা থাকে (ক)। তাছাড়া এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত খাদ্যও থাকে। কিছুকালের জন্য কেন্দ্রিকাগুলোর বিভাজন ঘটে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই যথেষ্ট পরিমাণ প্রাণসত্তাসহ রেণুস্থলীর পরিধির দিকে বিন্যস্ত হয় (খ)। এ অংশটি তখন রেণুপ্লাজম নামে পরিচিত হয়। অপরদিকে মাত্র গুটিকয়েক অবশিষ্ট কেন্দ্রিকাসমন্বিত রেণুস্থলীর কেন্দ্রীয় অংশ প্রায় গোলাকার হয় ; একে বলে কলুমেলাপ্লাজম। পরবর্তীকালে এ দু'অংশের মধ্যবর্তী স্থানের প্রোটোপ্লাজম ফেনার মতো হয়ে যায় এবং তার মধ্যে পাশাপাশি বহু সংখ্যক ছোট ছোট চ্যাপ্টা আকৃতির গহ্বর দেখা দেয় (গ)। অবশেষে গহ্বরগুলো একত্রিত হয়ে একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজাকৃতি পর্দার সৃষ্টি করে। পরে পর্দার সাহায্যেই রেণুপ্লাজম ও কলুমেলাপ্লাজম অংশ দুটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয় (খ)।

কলুমেলাপ্লাজম হতেই শেষ পর্যন্ত কলুমেলা নামক একটি রেণুবিহীন বন্ধ্যা অংশের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, ক্লিভেজ নিয়মে বিদারণ-খাঁজ তৈরি করে প্রজাতিভেদে রেণুপ্লাজম বিভেদিত হয়ে বহু সংখ্যক এক বা একাধিক কেন্দ্রিকাযুক্ত প্রাণসত্তার খণ্ড উৎপন্ন করে (ঙ)। এরূপ প্রতিটি খণ্ডের চারপাশে একটি প্রাচীর গঠিত হয়ে সেটিকে রেণুতে (ঙ) পরিণত করে।

রেণুস্থলীর বিদারণ ও রেণু বিসরণ (চিত্র ৭.৪) : রেণুগুলো পূর্ণতা পেলে আয়তনে বড় হয়। অপরদিকে রেণুস্থলীধরের উপরাঞ্চলে প্রোটোপ্লাস্টের চাপের জন্য কলুমেলা আরও বেশি স্ফীত হয়। ফলে রেণুস্থলীর প্রাচীর বিদীর্ণ হয় ও রেণুগুলো বায়ুবাহিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

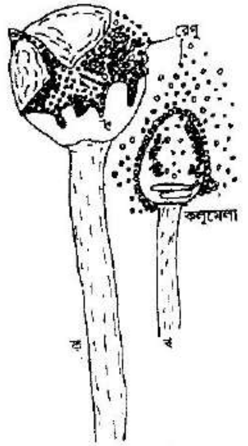

চিত্র ৭.৪ : *Rhizopus stolonifer* ক. রেণুস্থলীর বিদারণ ; খ. বিদারিত রেণুস্থলী ও দৃশ্যমান কলুমেলা

R. stolonifer–এ বিজ্ঞানী Ingold ও Zoberi (১৯৬৩), দেখিয়েছেন যে, পূর্ণ-পরিণত হলে রেণুস্থলীটি শুকিয়ে যায় এবং সাথে সাথে কলুমেলাটিও হঠাৎ করে রেণুস্থলীধরের ডগায় মুষড়ে পড়ে ভাঁজ হয়ে যায়। এসব পরিবর্তনের সাথে সাথে রেণুস্থলী-প্রাচীর অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং শুকনো রেণুগুলি বায়ুবাহিত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

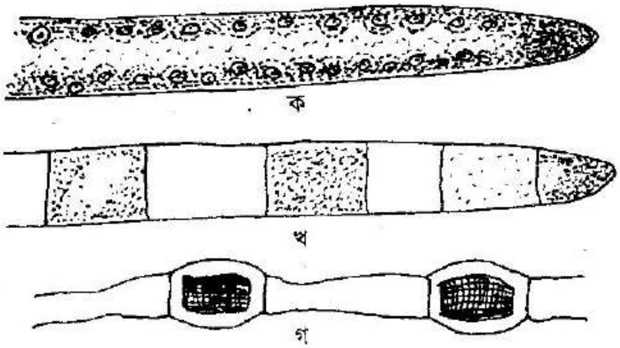

চিত্র ৭.৫ : *R. stolonifer* অঙ্কুরণের বিভিন্ন দশা

রেণুর অঙ্কুরণ

উপযুক্ত পরিবেশ ও অনুকূল আশ্রয়ে পতিত হলে প্রতিটি রেণু প্রথমত পানি শোষণ করে স্ফীত হয়, দ্বিতীয়ত প্রাচীর নরম হলে অঙ্কুরণ শুরু হয়। এ অঙ্কুরণ এক বা একাধিক অঙ্কুর নল মাধ্যমে হয়ে থাকে। অঙ্কুর নলগুলো বৃদ্ধি পেয়ে নতুন মাইসেলিয়াম সৃষ্টি করে।

রেণুগুলো প্রতিকূল পরিবেশে পড়লে দীর্ঘদিন সুপ্তাবস্থায় বিশ্রাম নিতে পারে। *R. sotolonifer*–এর রেণু দীর্ঘ ১২ বছর পরেও অনুকূল পরিবেশ পেলে অঙ্কুরিত হয়ে থাকে।

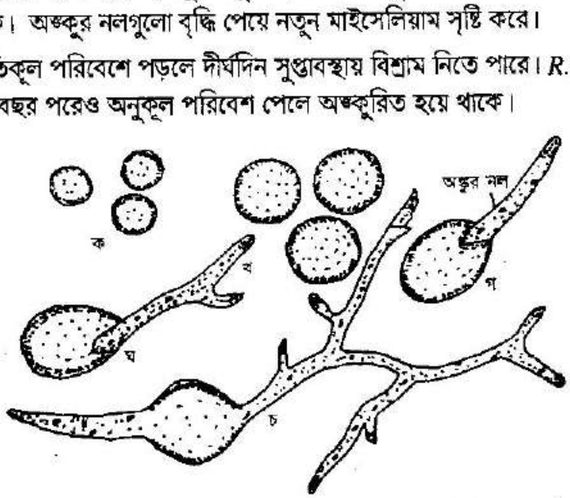

চিত্র ৭.৬ : *Rhizopus stolonifer* ক. স্বাভাবিক অনুসূত্র ; খ–গ. ক্ল্যামাইডোরেণু গঠনের বিভিন্ন দশা

ক্ল্যামাইডোরেণু

Rhizopus–এর কোনো কোনো প্রজাতি প্রতিকূল পরিবেশে ক্ল্যামাইডোরেণু তৈরি করে অযৌনভাবে জনন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অনাবৃষ্টির কারণে পানির ঘাটতি হলে অনুসূত্রের কোনো কোনো স্থানে প্রোটোপ্লাজমিক বস্তুসমূহ ঘনীভূত হয়ে একটি পুরু প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত হয়ে ক্ল্যামাইডোরেণুতে পরিণত হয়। কাজেই, *Rhizopus*–এর ক্ল্যামাইডোরেণু নিবেশিত ধরনের। এ ধরনের রেণুতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চিত খাদ্য থাকে এবং চরম খরাজনিত প্রতিকূলতা এড়াতে পারে। যে আশ্রয়ে ছত্রাকটি জন্মে, সেটি খরাজনিত কারণে নষ্ট হয়ে গেলে মাইসেলিয়ামও মারা যায় কিন্তু ক্ল্যামাইডোরেণুটি সতেজ ও সজীব থাকে এবং অনুকূল পরিবেশের আগমনে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

যৌন জনন

জীবনধারণের জন্য আশ্রয়স্থলে বা মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটলে অথবা পরিবেশ প্রতিকূল হলে *Rhizopus* সাধারণত সংশ্লেষ পদ্ধতিতে যৌন জনন সম্পন্ন করে থাকে। দুটি যোগ্য ও উপযুক্ত অথচ ভিন্ন প্রকৃতির বা বিপরীতধর্মী স্ট্রেনের (+) ও (–) মাইসেলিয়ামের সংযোগ ঘটলে তবেই এ ধরনের যৌনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেহেতু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে এগুলোকে স্ত্রী বা পুং বলে চেনা যায় না অথচ এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকৃতিগত বা কার্যগত পার্থক্য থাকে, সেহেতু এদের (+) ও (–) স্ট্রেইন বলে অভিহিত করা হয়। Blakeslee (১৯০৪) এ ধরনের মাইসেলিয়ামকে হেটারোথ্যালিক বা ভিন্নবাসী বলে উল্লেখ করেন। *Rhizopus* –এর কোনো কোনো প্রজাতি (*R. sexualis*) হোমোথ্যালিক বা সহবাসীও হয়ে থাকে।

R. stolonifer একটি ভিন্নবাসী প্রজাতি। এক্ষেত্রে মাইসেলিয়াম দুটি বিপরীতধর্মী + ও – স্টেইন, একটি + স্ট্রেইন ও অন্যটিতে – স্টেইন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলে উভয় মাইসেলিয়াম হতে মুগুরাকৃতির বায়বীয় শাখা উৎপন্ন হয়ে একে অন্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ পার্শ্বশাখাকে প্রোজননকোষাধার বা জাইগোফোরস বলে। কিন্তু Burgeff (১৯২৪) প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি স্ট্রেইনে জাইগোফোরের বিকাশ তখনই হয়, যখন মাইসেলিয়ামদ্বয় খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি ও পাশাপাশি উৎপন্ন হয়। কেননা, এদের বিপাকীয় ও ব্যাপনীয় নিঃসরণ দ্রব্য একে অন্যকে আকর্ষণ করে। আবার, বিজ্ঞানী Plenpel (১৯৬৩) পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করেন যে, ভিন্নবাসী প্রজাতির জাইগোফোরের মধ্যে + ও – দু'ধরনের হরমোন থাকে ; এগুলোকে তিনি + ও – গ্যামোনস বলে অভিহিত করেন।

দুটি জাইগোফোর এক জায়গায় এসে মিলিত হলে তাদের শীর্ষভাগ দুটি গদার আকার ধারণ করে। একেই প্রজননকোষাধার বলে। পরে প্রতিটি প্রজননকোষাধার একটি প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। অগ্রভাগেরটি বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত এবং একে জনন কোষাধার বলে। এটির পশ্চাদবর্তী অংশকে ভ্রূণধর বলে। কালক্রমে দুটি সংশ্লিষ্ট জননকোষাধারের মধ্যবর্তী প্রাচীরটি দ্রবীভূত হলে দুটির প্রোটোপ্লাজমীয় অংশ পরস্পর মিলিত হয় ; বিপরীত যৌনের কেন্দ্রিকাগুলো ও উভয়ের প্রাণসত্তা যুগ্মভাবে মিলিত হয়। যে কেন্দ্রিকাগুলো যুগলবন্দী হতে ব্যর্থ হয় সেগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। মিলনের ফলে উৎপন্ন কোষকে জাইগোরেণু বলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঘন দানাদার ও বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত জননকোষাধারের প্রোটোপ্লাস্ট একটি সিনোগ্যামেট বা অ্যাপ্লানোগ্যমেট জননকোষাধারীয় সংশ্লেষের ফলে যে গঠনটির উদ্ভব হয় তাকে জাইগোট না বলে জাইগোরেণু বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

জাইগোরেণুটি ক্রমে বড় হয় এবং একটি পুরু, কালো ও প্রায় কণ্টকিত দ্বিস্তরীয় প্রাচীর গঠন করে। বহিঃপ্রাচীরকে এক্সাইন বা এক্সোরেণু এবং ভিতরেরটিকে ইন্টাইন বা অন্তঃরেণু বলে। যথেষ্ট বিশ্রামের পর জাইগোরেণু পুনরায় আকারে বড় হয়। ইত্যবসরে ভ্রূণধর শুকিয়ে বিলুপ্ত হয় ও জাইগোরেণু মুক্ত হয় এবং বিশ্রাম পর্যায়ে (৫ থেকে ৯ মাস) চলে যায়।

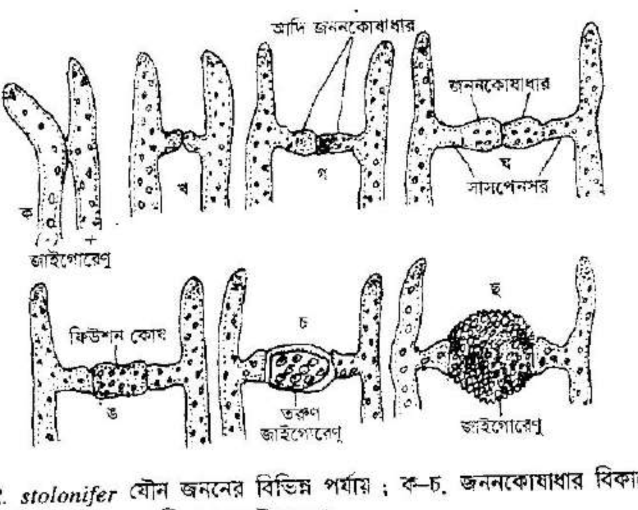

চিত্র ৭.৭ : *R. stolonifer* যৌন জননের বিভিন্ন পর্যায় ; ক–চ. জননকোষাধার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় ও প্লাজমোগ্যামি ; ছ. জাইগোরেণু

বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত সিনোগ্যামেটদ্বয়ের মিলনের ফলে বিপরীত যৌনের কেন্দ্রিকাগুলোর মধ্যে যুগলবন্দী হওয়ার ক্ষেত্রে ছত্রাকবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। একদল ছত্রাকবিদ মনে করেন যে, বিপরীত যৌনের কেন্দ্রিকাগুলো জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয় (+ ও –)। আবার অন্য একদল ছত্রাকবিদ মনে করেন যে, এ ধরনের যুগলায়ন আদৌ ঘটে না (Baired, ১৯২৪)। আবার Cutter (১৯৪২) উল্লেখ করেন যে, উভয় সিনোগ্যামেটের মাত্র ১টি করে কেন্দ্রিকার মিলন হয় এবং অবশিষ্টগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। Gaugs (১৯৬২) মনে করেন যে, উভয় প্রকার (+ বা –) কিংবা যে কোনো একপ্রকার (+ বা –) রেণুস্থলীয় রেণু তৈরি হয়।

জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ

জাইগোরেণু দীর্ঘকাল (৫ থেকে ৯ মাস) বিশ্রাম নেওয়ার পর অঙ্কুরিত হয়। তবে অঙ্কুরণের পূর্বে জাইগোরেণুর ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা মিওটিক ও মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা তৈরি করে। এদের ৫০% কেন্দ্রিকা + স্ট্রেইন ও ৫০% – স্ট্রেইনের হয়ে থাকে (Cutter, ১৯৪২)। অঙ্কুরণের পূর্বে জাইগোরেণু পানি শোষণ করে স্ফীত হয় (ক)। ফলে বহিঃরেণু বা বহিঃত্বক ফেটে যায় এবং অন্তঃরেণু বা অন্তঃত্বকটি এক ক্ষুদ্র সোজা ও খাড়া অঙ্কুর নল বা প্রোমাইসেলিয়াম গঠন করে (খ)। প্রোমাইসেলিয়ামটি অশাখ বা সশাখ হতে পারে। এটি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়। অতঃপর খুব শীঘ্রই প্রোমাইসেলিয়ামের শীর্ষে একটি গোলাকার জাইগোরেণুস্থলী বা অঙ্কুর-রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় (গ)। অতঃপর জাইগোরেণুস্থলীর

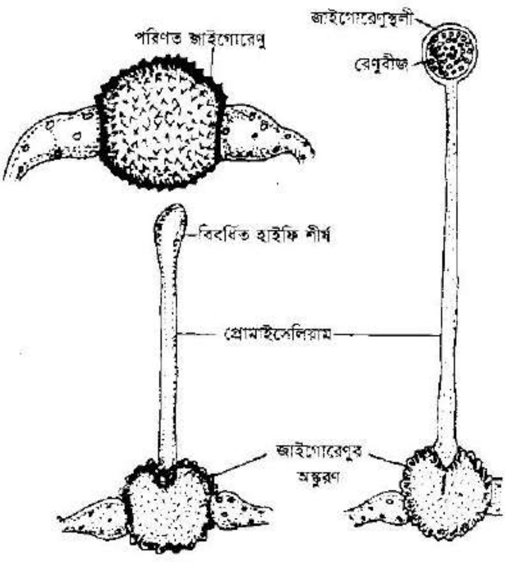

চিত্র ৭.৮ : *R. stolonifer* জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ

প্রোটোপ্লাস্ট ক্লিভেজ পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক নিশ্চল মিওরেণু বা অঙ্কুররেণু তৈরি করে। *Gaugar*–এর মতে *R. Stolorifer*–এর মিওরেণুগুলোর সবগুলো হয় +, না হয় সবগুলো –, কিংবা + ও – উভয় প্রকৃতির। পরবর্তীটির ক্ষেত্রে ৫০% + কেন্দ্রিকা এবং ৫০% – কেন্দ্রিকাযুক্ত মিওরেণু থাকে। Cutter (১৯৪৪) উল্লেখ করেন যে, জাইগোরেণু তৈরির প্রাক্কালে যদি উভয়

স্ট্রেইনের + ও – কেন্দ্রিকা এসে থাকে, তবে + ও – ধরনের মিওরেণু তৈরি হবে। আর যদি শুধু এক ধরনের কেন্দ্রিকা জাইগোরেণু গঠনে অংশ নেয় তবে শুধু + বা শুধু – প্রকৃতির মিওরেণু তৈরি হবে। তাই মিওসিস বিভাজনে ৫০% + কেন্দ্রিকা ও ৫০% – উৎপন্ন হয়। জাইগোরেণুস্থলীতে + ও – উভয় ধরনের কেন্দ্রিকা থাকে।

মিওরেণুগুলো জাইগোরেণুস্থলী হতে মুক্ত হবার পর প্রোমাসেলিয়ামের বিলুপ্তি ঘটে। মিওরেণুগুলো অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে।

কোনো কোনো Mucorales–এর (*Mucor mucedo*) জাইগোরেণুস্থলীতে শুধু এক ধরনের (+ বা –) রেণু থাকে ; কিন্তু *Phycomyces nitens*–এর জাইগোরেণুস্থলীতে +, –, ও ± এ তিন ধরনের মিওরেণু থাকে।

অ্যাজাইগোরেণু : জননকোষাধার অনেক সময় প্রতিকূলতার জন্য মিলিত হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি জননকোষাধারের প্রোটোপ্লাস্ট ঘনীভূত হয়ে একটি পুরু প্রাচীর দিয়ে আবৃত হয়ে পার্থেনোরেণু হিসেবে কার্যকরী হয়। যেহেতু এটি জাইগোরেণুসদৃশ আকৃতিযুক্ত হয় সেহেতু একে অ্যাজাইগোরেণু বলে। এগুলো অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

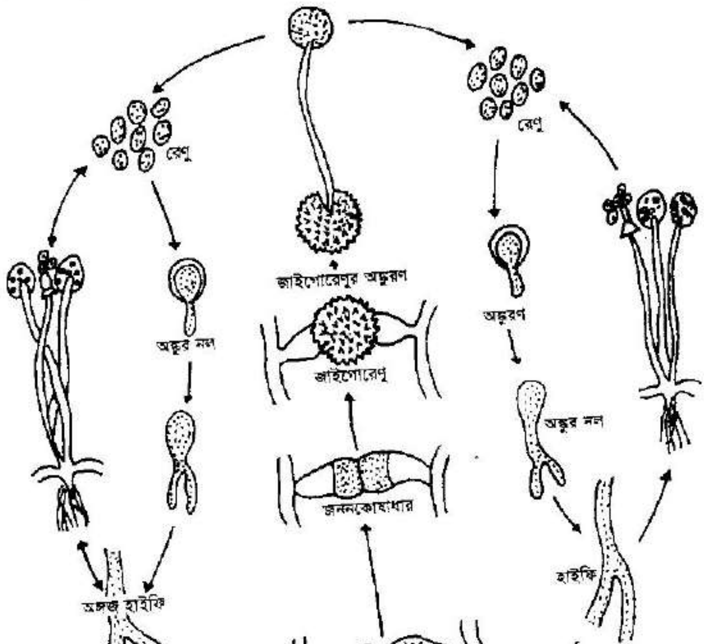

চিত্র ৭.৯ : *Rhizopus* sp. হ্যাপ্লোনটিক জীবনচক্র

জাইগোরেণুস্থলীর কোষতত্ত্ব

Mucorales –এর জীবনচক্রে মিওটিক বিভাজন সম্পর্কে দুটি ধারণা বিদ্যমান। একটি ধারণা মতে জাইগোরেণু অঙ্কুরণের পূর্বে মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়। প্রতিটি ডিপ্লয়ড জাইগোরেণু কেন্দ্রিকা

মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়। ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা হতে ৪টি হ্যাপ্লয়ড অপত্য কেন্দ্রিকা তৈরি হয়। এটি *Spirogyra* শৈবালের অনুরূপ। এ ৪টি কেন্দ্রিকার মধ্যে ২টি + ও ২টি – প্রকৃতির। মিওটিক বিভাজনকালে এদের পৃথকীকরণ হয়ে থাকে। এ ধারণা মতে জাইগোরেণুটিই এর জীবনচক্রের মধ্যে একমাত্র ডিপ্লয়ড গঠন। প্রোমাইসেলিয়াম, জাইগোরেণুস্থলী, অঙ্কুররেণু, মাইসেলিয়াম, জননকোষাধার, রেণুস্থলীধর, রেণুস্থলী স্পোরাঞ্জিওরেণু–এগুলো হ্যাপ্লোফেজ বা গ্যামেটোফাইটিক জনুর আওতাভুক্ত (চিত্র ৭.৯)। অধিকাংশ ছত্রাকবিদই এ ধারণার সমর্থক।

অন্য একটি ধারণা মতে, অঙ্কুর রেণুস্থলীর মধ্যে রেণু তৈরির সময় মিওটিক কোষ বিভাজন হয়। এ ধারণা সঠিক বলে ধরে নিলে জাইগোরেণু প্রোমাইসেলিয়াম, অঙ্কুর রেণুস্থলী হতে রেণু মাতৃকোষ অবধি ডিপ্লোফেল বা স্পোরোফাইটিক জনু। অঙ্কুর রেণুস্থলীর রেণুগুলোতে প্রথম হ্যাপ্লয়ড গঠন। তারা মিলিতভাবে মাইসেলিয়াম, জননকোষাধার, রেণুস্থলীধর, রেণস্থলী ও স্পোরাঞ্জিওরেণু নিয়ে হ্যাপ্লোফেজ বা গ্যামেটোফাইটিক জনু গঠন করে। জীবনচক্রে এ দুটি জনু পালাক্রমে আবর্তিত হয়। আধুনিক ছত্রাকবিদগণ এ ধারণাটিকে অযৌক্তিক বলে বাতিল করেছেন।

Rhizopus–এর জীবনচক্র

Rhizopus–এর জীবনেতিহাসে দুটি পর্যায় বিদ্যমান ; একটি অযৌন ও অন্যটি যৌন পর্যায়। মাইসেলিয়াম, রেণুস্থলীধর, রেণুস্থলী ও স্পোরাঞ্জিওরেণু নিয়ে অযৌন পর্যায় গঠিত। *Rhizopus*–এর এ পর্যায়টি হ্যাপ্লয়ড ও অনুকূল পরিবেশে ঘটে থাকে।

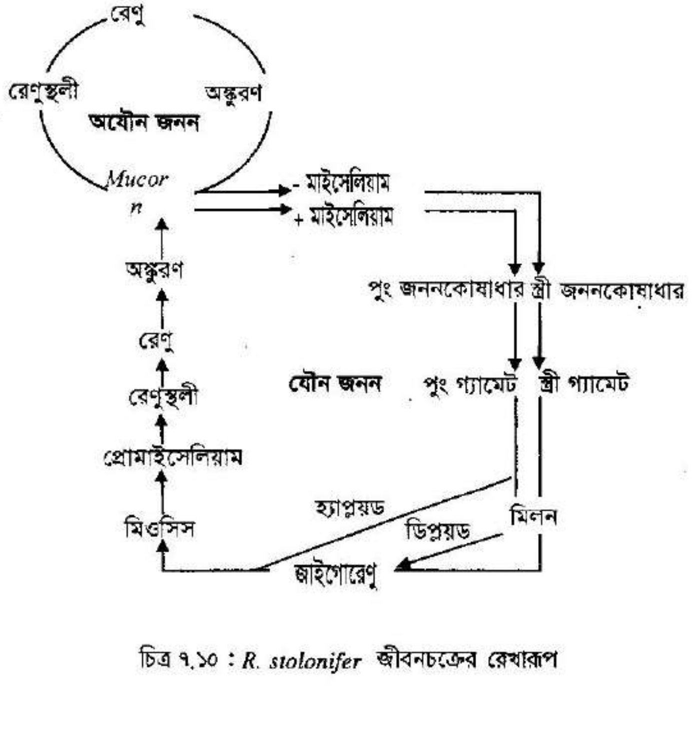

চিত্র ৭.১০ : *R. stolonifer* জীবনচক্রের রেখারূপ

যৌন দশাটি (+) মাইসেলিয়া ও (–) মাইসেলিয়া, (+) ও (–) জননকোষাধার ও অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেট, জাইগোরেণু, প্রোমাইসেলিয়াম, অঙ্কুর রেণুস্থলী ও অঙ্কুর রেণু নিয়ে গঠিত। এ দশাটি সাধারণত প্রতিকূল পরিবেশে হয়ে থাকে। এখানে জাইগোরেণুটি শুধু ডিপ্লয়ড গঠন এবং অন্যগুলো সবই হ্যাপ্লয়ড। এ ধরনের যৌনচক্রকে হ্যাপ্লোনটিক জীবনচক্র বলে। জাইগোটিক মিওসিস ও হ্যাপ্লয়ড মাইসেলিয়াম এ চক্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Rhizopus–এর বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন ফলের ক্ষতি করে, যেমন *R. orrhizos* কাচা ও পাকা আপেলের ক্ষতি করে, *R. nigricans* মিষ্টি আলুর পচন ঘটায় ; তেমনি এমন কিছু প্রজাতি রয়েছে যেগুলো উপকারও করে থাকে ; যেমন *R. nigricans, R. sinensis, R. oryzae* ও *R. nodoaus* প্রভৃতি হতে ল্যাকটিক ও ফিউমারিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। *R. oryzae*-কে গাঁজান প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে চাল হতে অ্যালকোহল তৈরি করা হয়।

***Rhizopus* –এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য**

১. মাইসেলিয়াম অত্যধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত বর্ণহীন, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও সিনোসাইটিক।
২. দেহ মাইসেলিয়ামযুক্ত এবং মাইসেলিয়াম স্টোলন হাইফি ও রাইজয়ডীয় হাইফি নিয়ে গঠিত। তাছাড়া রাইজয়ডীয় হাইফির উপরে এবং স্টোলনের উভয় প্রান্তে গুচ্ছাকারে রেণুস্থলীধর উৎপন্ন হয়।
৩. রেণুস্থলী গোলাকার দৃঢ়, শক্ত ও কলুমেলাবিশিষ্ট। এখানে অন্তর্জনেষ্ণুভাবে রেণু তৈরি হয়। এগুলো অযৌনভাবে বংশবৃদ্ধি করে।
৪. অধিকাংশ প্রজাতিই ভিন্নবাসী ও যৌনজনন আইসোগ্যামীয়। অবশ্য দুটি বিপরীতধর্মী, (+ ও –) হাইফির বা কেন্দ্রিকার মিলন ছাড়া যৌন কাজ সম্পন্ন হয় না।
৫. জাইগোরেণুর অঙ্কুরের পূর্ব মুহূর্তে মিওসিস হয় এবং প্রোমাইসেলিয়াম মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়।
৬. প্রোমাসেলিয়ামে রেণুস্থলীতে ('+ ' বা '–' কিংবা ('+' ; –' ও ±) রেণু উৎপন্ন হয়।

প্রতীক প্রজাতি : *Muscor mucedo*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Zygomycetes
উপবর্গ—Mucorales
গোত্র—Mucoraceae
গণ—*Mucor*
প্রজাতি—*M. mucedo*

প্রকৃতি ও বসতি

Mucoraceae গোত্রের বৃহত্তম গণ হলো *Mucor*–এর বিভিন্ন প্রজাতিগুলো বাসী রুটি, ভেজা চামড়া, পাকা ফল-মূল, হিউমাস মাটি বা পশুর মল প্রভৃতির উপর ভাল জন্মে। *M. mucedo*

প্রজাতিটি ঘোড়ার মলে দ্রুত জন্মাতে পারে। মোট কথা, *Mucor* একটি মৃতজীবী ছত্রাক এবং শ্বেতসারসমৃদ্ধ মাধ্যমে বা মৃত প্রাণীর দেহাবশেষের উপর জন্মে থাকে।

মাইসেলিয়াম

Mucor-এর দেহ মাইসেলিয়াম দিয়ে তৈরি। মাইসেলিয়াম স্বচ্ছ, বিবর্ণ বা পেঁজা তুলার মতো উজ্জ্বল সাদা ও সশাখ। শাখাগুলোকে হাইফি বলে। এগুলো প্রস্থপ্রাচীরবিহীন (চিত্র ৭.১১)। অনুসূত্রের ছেদনে (চিত্র ৭.১২) দেখা যায় যে, এতে ঘন দানাদার প্রাণসত্তা, বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকা, রাইবোজম, আন্তঃপ্লাজমা জালিকা, মাইটোকন্ড্রিয়া গহ্বর ও প্লাজমাপর্দা ও কোষপ্রাচীর বিদ্যমান। অনুসূত্রে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে গ্লাইকোজেন, চর্বি ও তেলবিন্দু থাকে। অনুসূত্রের প্রাচীর ছত্রাকীয় কাইটিননির্মিত।

মাইসেলিয়ামে তিন ধরনের অনুসূত্র দেখা যায়—

১. শায়িত অনুসূত্র
২. রাইজয়ডীয় অনুসূত্র ও
৩. অযৌন মৌসুমে খাড়া বায়ব রেণুস্থলীধর অনুসূত্র। এখানে স্টোলন অনুসূত্র অনুপস্থিত।

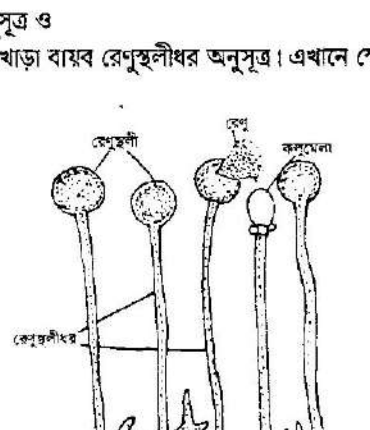

চিত্র ৭.১১ : *Mucor* sp. ইউকার্পিক মাইসেলিয়ামে রেণুস্থলীধর ও রেণুস্থলী

পুষ্টি : আশ্রয়স্থলের বা মাধ্যমের অভ্যন্তরে যেসব হাইফি প্রবেশ করে তাদের রাইজয়ড বা পুষ্টিজড়িত হাইফি বলে। এ হাইফিগুলো খাদ্য সংগ্রহের জন্য দায়ী। এ হাইফি নিঃসৃত উৎসেচক

ক্রিয়ার ফলে আশ্রয়স্থলের মাধ্যমের অদ্রবণীয় শ্বেতসার দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত হয়। অতঃপর ব্যাপন ক্রিয়ার ফলে উক্ত শর্করা প্রথমে রাইজয়ড হাইফিতে এবং পরে মুখ্য হাইফিগুলোতে প্রবেশ করে।

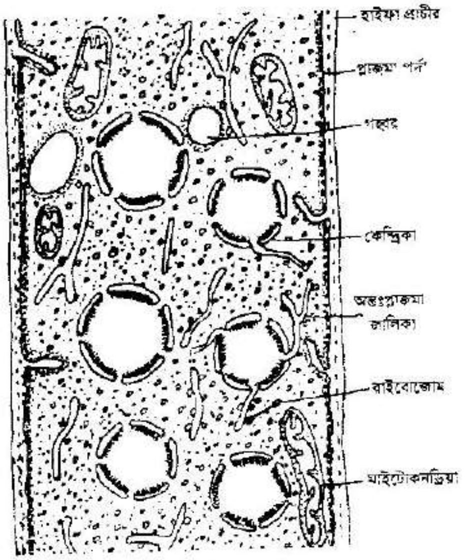

চিত্র ৭.১২ : *Mucor* sp. মাইসেলিয়ামের প্রস্থচ্ছেদের সূক্ষ্ম গঠন

জনন প্রক্রিয়া

এখানে তিন ধরনের জনন দেখা যায় ; যথা অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন ও যৌন জনন।

১. **অঙ্গজ জনন :** খণ্ডায়ন পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে। কোনো কারণে মাইসেলিয়ামটির হাইফি ভেঙে এক বা একাধিক টুকরো হয়ে যায় তবে প্রতিটি টুকরো এক একটি মাইসেলিয়াম গঠন করে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করতে পারে।

২. **অযৌন জনন :** মাইসেলিয়াম পরিণত হলে কতিপয় অনুসূত্র খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠে আসে। এদের শীর্ষভাগটি ক্রমশ স্ফীত হয়ে গোলাকার, থলিসদৃশ রেণুস্থলীতে পরিণত হয় এবং উল্লম্ব বায়ব হাইফিকে রেণুস্থলীধর বলে। রেণুস্থলীধরের মধ্য দিয়ে প্রতিটি রেণুস্থলীতে কিছু পরিমাণ প্রাণসত্তা, অসংখ্য কেন্দ্রিকা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চিত খাদ্য এসে জমা হয়। কেন্দ্রীয় অঞ্চল অপেক্ষা পরিধি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ঘন প্রোটোপ্লাজম থাকে। এ সময় রেণুস্থলীর মূলীয় অংশে অসংখ্য ছোট ছোট গহ্বরযুক্ত একটি গম্বুজাকৃতির ফেনিল ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এটিকে কলুমেলাপ্লাজম বলে। অসংখ্য কেন্দ্রিকাযুক্ত অপেক্ষাকৃত ঘন প্রোটোপ্লাজমীয় অঞ্চলকে স্পোরোপ্লাজম বলে। ক্রমে ক্রমে একটি পাতলা পর্দার সাহায্যে স্পোরোপ্লাজম ও কলুমেলাপ্লাজম পৃথক হয়ে যায়। কলুমেলাপ্লাজমের কেন্দ্রিকাগুলো অজ্ঞাত কারণে নষ্ট হয়ে যায় ও একটি কেন্দ্রীয় গহ্বরের সৃষ্টি করে। ফলে কলুমেলাপ্লাজম গম্বুজাকৃতির হয়। ক্লিভেজ পদ্ধতিতে স্পোরোপ্লাজম খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রজাতিভেদে প্রতিটি খণ্ডে এক বা একাধিক কেন্দ্রিকা থাকে। প্রতিটি খণ্ড প্রাচীরাবৃত হয়ে রেণুতে পরিণত হয়।

পরিণতি প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রতিটি রেণুস্থলী প্রথমে হলুদবর্ণ হতে হলদে–পিঙ্গল এবং পরে কালো বর্ণযুক্ত হয়। রেণুস্থলী আকারে বেশ বড় ও গোলাকার। এতে অসংখ্য রেণু থাকে। রেণুগুলো পরিণত হলে কলুমেলা অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করার ফলে স্ফীত হয় ও উপরের দিকে চাপ দেয়। ফলে রেণুস্থলী-প্রাচীর ফেটে যায় এবং রেণুগুলো স্তূপাকারে বের হয়ে আসে।

অনুকূল ও উপযুক্ত মাধ্যম পেলে এসব রেণু এক বা একাধিক অঙ্কুর নল উৎপন্ন করে অঙ্কুরিত হয়। এবং নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

প্রতিকূল পরিবেশে *Mucor* যখন স্বাভাবিকভাবে রেণু তৈরি করতে পারে না, তখন ক্ল্যামাইডোরেণু, গিমি ও অয়ডিয়া তৈরি করেও অযৌনভাবে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

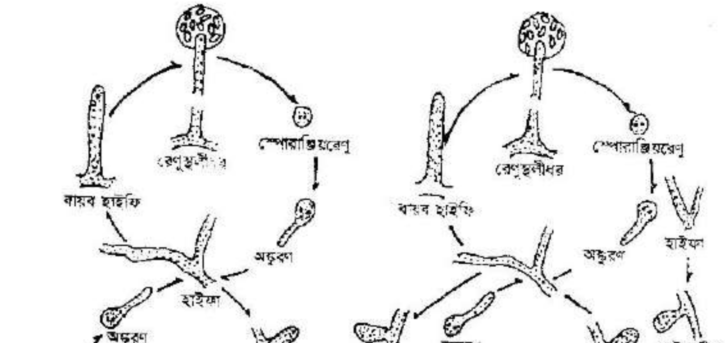

চিত্র ৭.১৩ক : ভিন্নবাসী *Mucor* sp. প্রজাতির জীবনচক্র

যৌন জনন : *Mucor*–এর কতিপয় প্রজাতি হোমোথ্যালিক বা সহবাসী এবং কতক প্রজাতি হেটারোথ্যালিক বা ভিন্নবাসী হয়ে থাকে। তবে উভয়ক্ষেত্রেই জননকোষাধার সংশ্লেষের মাধ্যমে যৌন জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জনন পদ্ধতি ও জাইগোরেণুর অঙ্কুরণ *Rhizopus* –এর অনুরূপ। অঙ্কুর-রেণুস্থলীতে শুধু একরকমের রেণু থাকে ; অর্থাৎ হয় (+), না হয় (–)। এটি কিভাবে সম্ভব তা Cutter ও Sjoeall (১৯৪২) সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁদের মতে, জাইগোরেণু অবসর যাপনে যাওয়ার পূর্বে (মতান্তরে অবকাশ যাপনের সময় ও অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বে) মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়। ফলে + ও – কেন্দ্রিকাগুলো পৃথক হয়ে যায়। এগুলোর সবগুলো বিলুপ্ত হলে ও মাত্র একটি + বা – সতেজ ও সজীব থাকে। পরে এটি মাইটোটিক নিয়মে বার বার বিভক্ত হয়ে অসংখ্য হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা হয় + না হয় – উৎপন্ন হয়। এগুলো ঘটনাক্রমে অঙ্কুররেণুস্থলীতে প্রবেশ করে মিওরেণুতে পরিণত হয়। আর এগুলো + স্ট্রেইন কিংবা – স্ট্রেইন হবে।

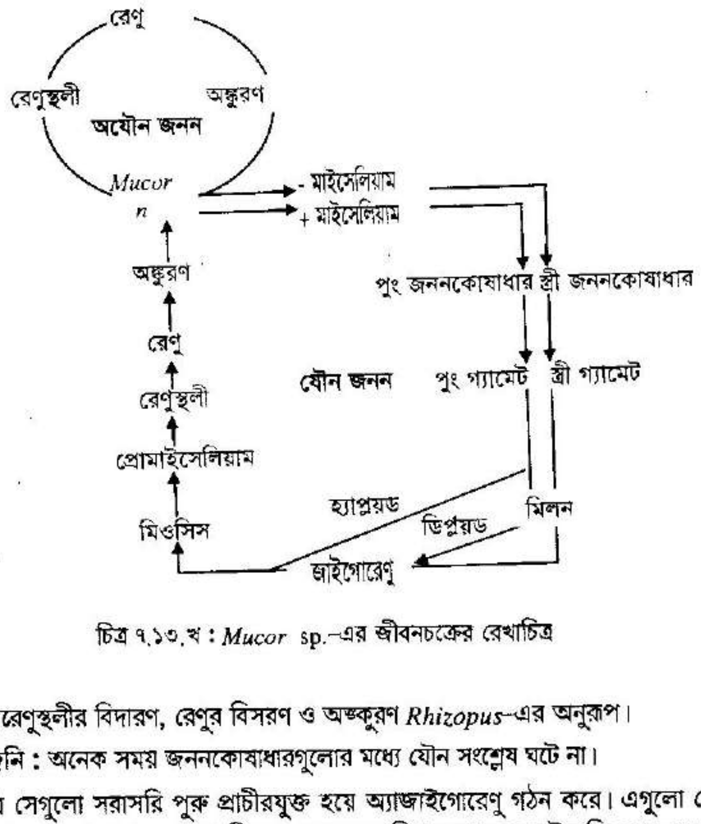

চিত্র ৭.১৩.খ : *Mucor* sp.–এর জীবনচক্রের রেখাচিত্র

জাইগোরেণুস্থলীর বিদারণ, রেণুর বিসরণ ও অঙ্কুরণ *Rhizopus*–এর অনুরূপ।

অপুংজনি : অনেক সময় জননকোষাধারগুলোর মধ্যে যৌন সংশ্লেষ ঘটে না।

এক্ষেত্রে সেগুলো সরাসরি পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে অ্যাজাইগোরেণু গঠন করে। এগুলো দেখতে হুবহু জাইগোরেণুর মতো। অনুকূল পরিবেশে এরা অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম জন্ম দেয়।

জীবনচক্র : *Mucor* –এ সুস্পষ্ট জনুঃক্রম বিদ্যমান। এক্ষেত্রে গ্যামেটোফাইট পর্যায়ের প্রতিনিধি হলো মাইসেলিয়া ও হাইফি। এখানে অযৌন চক্র দেখা যায়। হাইফি হতে রেণুস্থলীধর ও রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় ও রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়া দেয়।

যৌনচক্রে হ্যাপ্লয়ড জননকোষাধারের সংশ্লেষ মাধ্যমে ডিপ্লয়ড জাইগোরেণু উৎপন্ন হয়। এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে প্রোমাইসেলিয়াম ও জাইগোরেণুস্থলী সৃষ্টি হয়। জাইগোরেণুস্থলী ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা মিওটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়ড রেণু তৈরি করে। প্রতিটি রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম জন্ম দেয়।

গোত্র Pilobolaceae

রেণুস্থলীয়-রেণুগুলো রেণুস্থলীর মধ্যে বিকাশ লাভ করে। রেণুস্থলীগুলো দ্বি-উত্তল থালাকৃতি বা মসুরাকৃতি ও বহুরেণুযুক্ত হয়ে থাকে। রেণুস্থলী প্রাচীরের রং কালো ও স্থূল কৃত্তিকাযুক্ত। অধিকাংশ প্রজাতির রেণুস্থলীই উপরেণুস্থলী ভেসিকলযুক্ত হয় এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময় আলোর প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। প্রতিটি রেণুস্থলীতে একটি মাঝারি আকারের কলুমেলা থাকে। জাইগোরেণুর বিকাশকালে সাধারণত জিহ্বাসদৃশ হাইফির বৃদ্ধির কারণে আশ্রয়স্থল হতে উপরে উঠে আসে। Pilobolaceae গোত্রে দুটি গণ রয়েছে ; যথা—*Pilolus* ও *Pillaira* .

প্রতীক গণ : *Pilobolus*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Mycota
উপবিভাগ—Eumycotina
শ্রেণি—Zygomycetes
বর্গ—Mucorales
গোত্র— Pilobolaceae
গণ—*Pilobolus*
প্রজাতি—*P. prystallina*

প্রকৃতি ও বসতি

Pilobolus –এর প্রায় সবগুলো প্রজাতিই (প্রায় ১২টি) তৃণভোজী প্রাণীর টাটকা মলে, বিশেষ করে ঘোড়ার মলে জন্মে থাকে। কাজেই এগুলো মলবাসী মৃতজীবী। *P. crystallina* একটি সাধারণ প্রজাতি।

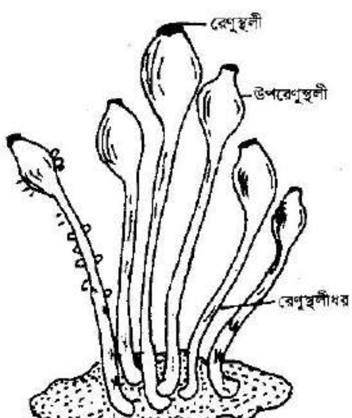

চিত্র ৭.১৪ : *Pilobolus* sp. মলের উপর *Pilobolus* ছত্রাক

দৈহিক গঠন

Pilobolus–এর দেহ মাইসেলিয়াম নিয়ে গঠিত। এগুলো শাখা-প্রশাখাবহুল সিনোসাইটিক হাইফি নিয়ে গঠিত। এ হাইফিগুলো আশ্রয়স্থলের উপর-তলে বিস্তৃত হয়ে থাকে। এগুলোর প্রাণসত্তায় বহু

সংখ্যক ছোট ছোটকেন্দ্রিকা, তেলবিন্দু ও গ্লাইকোজেন কণা দেখা যায়। এ ছত্রাকটির যেসব হাইফি আশ্রয়স্থলের উপরে বায়বভাবে উপরে উঠে আসে সেগুলো বৃন্তযুক্ত ও রেণুস্থলীবিশিষ্ট। বৃন্তের সাথে জলবিন্দুও লেগে থাকে এবং ভোরের আলোতে ঝিকমিক করে। মাইসেলিয়ামের যেসব অনুসূত্র আশ্রয়স্থলের মধ্যে প্রবেশ করে ছত্রাকটিকে দৃঢ়তা প্রদান ও পুষ্টি গ্রহণে সহায়তা করে সেগুলোকে রাইজয়ড বলে। এগুলো সাধারণত রেণুস্থলীধরের গোড়া হতে উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে *Pilobolus* ছত্রাকটি *Rhizopus*–এর সাথে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। রেণুস্থলীর বৃন্তটি প্রায় ০.৬৪ সেমি. দীর্ঘ ও শীর্ষভাগে সামান্য স্ফীত হয়ে ছোট গ্লোবিউল গঠন করে এবং এটি কালো টুপি দিয়ে আবৃত থাকে। এ গ্লোবিউলটিই রেণুস্থলী হিসেবে পরিচিত।

জনন প্রক্রিয়া

Pilobolus সাধারণত অযৌন ও যৌন উপায়ে বংশরক্ষা করে থাকে।

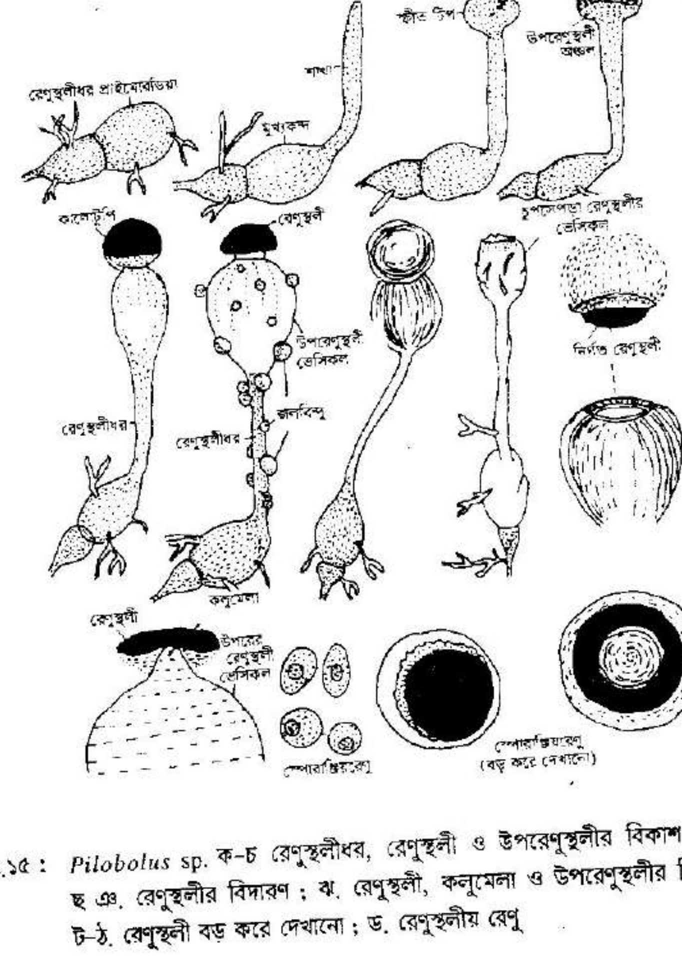

চিত্র ৭.১৫ : *Pilobolus* sp. ক–চ রেণুস্থলীধর, রেণুস্থলী ও উপরেণুস্থলীর বিকাশ পর্যায়সমূহ ; ছ এঃ. রেণুস্থলীর বিদারণ ; ঝ. রেণুস্থলী, কলুমেলা ও উপরেণুস্থলীর বিশদ বিবরণ ; ট–ঠ. রেণুস্থলী বড় করে দেখানো ; ড. রেণুস্থলীয় রেণু

অযৌন জনন

Pilobolus ছত্রাকটি রেণুস্থলী ও রেণুস্থলীয় রেণু গঠন করে অযৌন জননের কাজ করে থাকে। প্রথমে আশ্রয়স্থলের সামান্য উপরে ছোট ছোট কমলা রঙের বাল্বাস ধরনের স্ফীতি দেখা যায়। এগুলো গোলাকার রেণুস্থলীধর প্রাইমরডিয়া নামে পরিচিত। এটি মাইসেলিয়াম হতে বায়ব শাখারূপে উৎপন্ন হয়। হাইফির বৃদ্ধির সাথে সাথে শীর্ষাঞ্চলেটি একটি প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে পৃথক হয়ে প্রাথমিক বাল্ব বা প্রাইমরডিয়া গঠন করে। এখান হতেই রেণুস্থলীধর ও রেণুস্থলী বিকাশলাভ করে। গোলাকৃতি প্রাইমরডিয়ামটি হলদে রঙের অসংখ্য তেলবিন্দুতে পূর্ণ থাকে। অতঃপর গাঢ় সোনালি রঙের শাখার বাল্বাস অঞ্চল হতে সোজা খাড়াভাবে উপরে উঠে আসে। এটি তরুণ রেণুস্থলীধর। এটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত—গোড়ায় স্ফীত ট্রফোসিস্ট বা 'খাদ্যথলি' ও রেণুস্থলীধর প্রোপার, স্ফীত উপরেণুস্থলী ভেসিকল ও প্রান্তীয় রেণুস্থলী।

তরুণ রেণুস্থলীধরটির শীর্ষভাগ খুবই আলোক-সংবেদনশীল। বর্ধনশীল শীর্ষটি আরও কিছুটা স্ফীত হয়ে বাল্বের ন্যায় গোলাকার হয় ; একে প্রান্তীয় রেণুস্থলী বলে (গ)। এ প্রান্তীয় রেণুস্থলী ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং একসময় গোলাকার থলিসদৃশ হয়। এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটোপ্লাজম ও হলুদ তেলবিন্দু থাকে ; তাই একে হলুদ বর্ণ দেখায়। আর রেণুস্থলীধরটি বর্ণহীন হয়ে যায়। এ থলিসদৃশ গঠনটি কালক্রমে রেণুস্থলীতে পরিণত হয়। তবে প্রাথমিক দশায় এটির বস্তুনিচয় বিভক্ত হয়ে অসংখ্য প্রোটোপ্লাজমিক খণ্ডের সৃষ্টি করে এবং এ খণ্ডগুলো প্রাচীরাবৃত হয়ে রেণুতে পরিণত হয় (ট)। একই সময়ে রেণুস্থলী-প্রাচীরের উপরাংশ কালো হতে থাকে এবং উপরেণুস্থলীধর অঞ্চল স্ফীত হয়ে থলিসদৃশ ভেসিকলে পরিণত হয় (ঘ–চ)। এটি রেণুস্থলী অপেক্ষা বহুগুণ বড় হয় ; একে উপরেণুস্থলী ভেসিকল বলে। কলুমেলাটি প্রায় গাজরাকৃতি এবং রেণু পরিবেষ্টিত। রেণুস্থলীর শীর্ষপ্রাচীরটি ভাঙে না কিংবা দ্রবীভূত হয় না। কখনও কখনও রেণুস্থলীধরের নিম্নাংশে দ্বিতীয় থলিসদৃশ গঠন তৈরি হয় এবং এখান হতে উদ্গত রাইজয়ড ছত্রাকটিকে আশ্রয়ের সাথে দৃঢ় করে ধরে রাখে (ঙ–ছ)। এ থলিসদৃশ অঙ্গটিকে ট্রফোসিস্ট বলে। আর দুটি প্রস্থপ্রাচীরের মধ্যবর্তী সমগ্র রেণুস্থলীধরটি একটি পানি সঞ্চয়াগারে পরিণত হয়। এদের পার্শ্বপ্রাচীর দিয়ে পানি নির্গমন হয়ে বিন্দু বিন্দু আকারে রেণুস্থলীধরের গায়ে লেগে থাকে (চ)। রেণুস্থলীর গোড়ায় প্রস্থপ্রাচীরটি সর্বত্র সমভাবে পুরু নয় ; উপরাংশ পুরু, কালো, স্থূলীকৃত ও কাঁটাযুক্ত। এ কাঁটাগুলো ক্যালশিয়াম অক্সালেটের তৈরি ক্রিস্টাল। অপরদিকে, নিম্নাংশে (কলুমেলার নিকটবর্তী) পাতলা ও হালকা রঙের কোষপ্রাচীর থাকে (ঝ)।

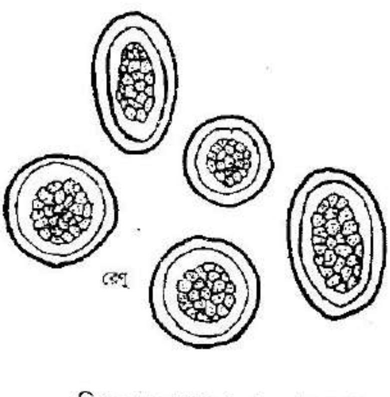

চিত্র ৭.১৬ : *Pilobolus*-এর রেণু

পরিণত রেণুস্থলীর নিম্নাংশের ভিতরভাগে যে মিউসিলেজ-স্তর থাকে সেটি শোষিত পানির সংস্পর্শে এসে নরম হয় ও একসময় ভেঙে যায় বলে রেণুস্থলীটি কলুমেলা হতে পৃথক হতে পারে। এটি ঝাঁকুনি খেয়ে উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। কলুমেলার ভারসাম্যপূর্ণ হাইগ্রোস্ট্যাটিক চাপও আর থাকে না, রেণুস্থলীটিও থাকে না। অবশ্য এসময় কলুমেলাটিও বিদীর্ণ হয়। ফলে রেণুস্থলীধর হতে জলজেট উৎক্ষিপ্ত হলে রেণুস্থলীকে দূরে নিক্ষেপ করে (ছ. জফ)। সেহেতু একে মিসাইল বা টুপি নিক্ষেপকারীরূপে বর্ণনা করা হয়। সেহেতু এ গণের রেণুর বিসরণ কৌশলকে কোনো ভাবেই এড়ানো যায় না।

রেণু বিসরণের কলাকৌশল

Pilobolus—এর রেণুস্থলী আলোর প্রেক্ষাপটে উৎক্ষিপ্ত হয় এ ঘটনা বহু ছত্রাকবিদ, Alleu ও Jovlivelte (১৯১৪), Parr (১৯১৮), Priugsheium ও Czurda (১৯২৭) Vauder Wey (১৯২৯) ও Buller (১৯৩৪) প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। Pin-hole দিয়ে আলোর প্রবেশের ক্ষেত্রে রেণুস্থলী পর্যাপ্ত পরিমাণে মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আলোর প্রবেশের সর্বোচ্চ ও সুনির্দিষ্ট মাত্রা সাদা ও নীল আলোতে ভালো হয়। কিন্তু অন্য আলোতে তেমন হয় না। এ কৌশল সম্পর্কে Busller (১৯৩৪) খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন আলোর তীব্রতা অনুযায়ী উপরেণুস্থলী ভেসিকলের বৃদ্ধি, পদার্থের চলাচল ও দীর্ঘায়ন নির্ভরশীল। তাছাড়া প্রোটোপ্লাজমিক বস্তুর ও অভিস্রবণীয় (Cosmotic) চাপ তীব্রতর হয়। ফলে এটি বৃত্তাকারভাবে ফেটে যায়। বিদীর্ণ ভেসিকলের সংকোচন হয় জলজেট নির্গমনের কারণে। এ জলজেটটি ঝাঁকুনি সহকারে রেণুস্থলীকে পাশে বা উপরে নিক্ষেপ করে। একইসাথে কলুমেলাও বিদীর্ণ হয়। Buller (১৯৩৪)—এর মতে *Pilobolus* এর রেণুস্থলীটি খাড়া উপরে ২ মিটার এবং আড়াআড়িভাবে ৩ মিটার পর্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার *P. kleinii* ও *P. longipes*- এ রেণুস্থলীটি উচ্চে ২ মিটার ও পাশের দিকে হলে ২.৫ মিটার পর্যন্ত দূরে যেতে পারে। Ingold লক্ষ্য করেন যে, *P. kleinii* –তে রেণুস্থলীটি উচ্চতায় ১১৮ সেমি. পর্যন্ত যায়।

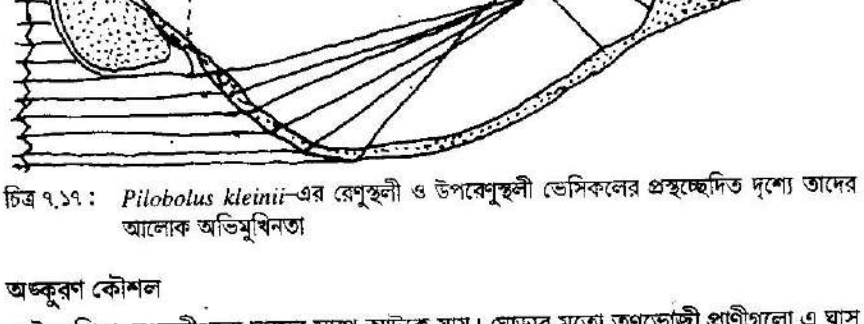

চিত্র ৭.১৭ : *Pilobolus kleinii*—এর রেণুস্থলী ও উপরেণুস্থলী ভেসিকলের প্রস্থচ্ছেদিত দৃশ্যে তাদের আলোক অভিমুখিনতা

অঙ্কুরণ কৌশল

এ উৎপক্ষিপ্ত রেণুস্থলীগুলো ঘাসের সাথে আটকে যায়। ঘোড়ার মতো তৃণভোজী প্রাণীগুলো এ ঘাস খেলে খাদ্যের সাথে এগুলোও পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে। এখানে উপরেণুস্থলী প্রাচীর দ্রবীভূত হয়।

ফলে রেণুগুলো মুক্ত হয়ে যায়। এ রেণুগুলো মলের সাথে বাইরে নিঃসরিত হলে অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

যৌন জনন

দুটি একই ধরনের জননকোষাধারের প্রকৃতিতে বিপরীতধর্মী সংশ্লেষ মাধ্যমে যৌন জনন কাজ হয়ে থাকে। অবশ্য এ জনন কাজ রেণুস্থলী বিকাশের প্রতিকূল অবস্থা চলাকালে সময়ে সংঘটিত হয়।

যৌন জননের সময় মাইসেলিয়ামের দুটি পাশাপাশি হাইফির শীর্ষভাগ স্ফীত হয়ে ক্লাব–আকৃতিযুক্ত হয়। এগুলো পাশাপাশি উপরদিকে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ইত্যবসরে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটোপ্লাজমিক বস্তু এ স্ফীতাংশে এসে জমা হয়। সংশ্লেষজড়িত হাইফিদ্বয় পাশাপাশি এমনভাবে অবস্থান নেয় যে, এদেরকে একজোড়া ঠোঁটের মতো দেখায় (ক)। জননকোষাধার বহনকারী হাইফিকে ভ্রূণধর বলে।

জননকোষাধার ঘন, বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্রোটোপ্লাজম। এদের স্পর্শস্থানের প্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে প্লাজমোগ্যামী, প্রোটোপ্লাজমের পিণ্ড গঠন ও কেন্দ্রিকার যুগলমিলন ধাপে ধাপে হয়ে থাকে। জননকোষাধার দুটি পূর্ণরূপে মিলিত হয়ে একটি জাইগোরেণুতে পরিণত হয়ে দুটি ধ্রুবধরের উপর অবস্থান করে (গ)। এটি আকারে আয়তনে বড় হয় ও একটি পুরু ও অমসৃণ প্রাচীরবেষ্টিত হয়।

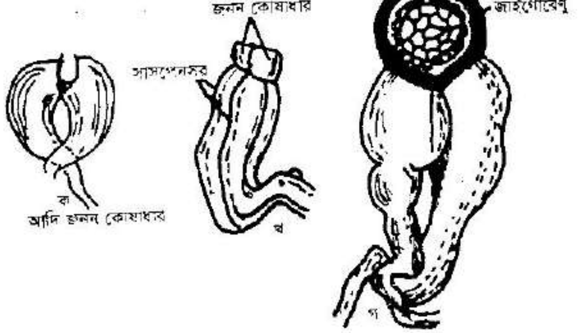

চিত্র ৭. ১৮ : আদি জননকোষাধার হতে জাইগোরেণুর সৃষ্টি

দীর্ঘদিন অবসর যাপনের পর এক অনুকূল পরিবেশে জাইগোরেণু অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্কুর নলের অগ্রভাগে অঙ্কুর–রেণুস্থলী থাকে। এটির রেণু পরিণতি প্রাপ্তির পর ছড়িয়ে পড়ে এবং অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম গঠন করে।

Zygomycetes –এর আত্মীয়তা সম্পর্ক ও উৎপত্তি

Zygomycetes–এর উৎপত্তি ও আত্মীয়–সম্পর্ক আজও সুস্পষ্ট নয়। জীবনচক্রে অ্যাপ্ল্যানোরেণুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বড়ই রহস্যময়। যৌন জননে সংশ্লেষ পদ্ধতিটি সবুজ শৈবালের Conjugales বর্গের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও প্রচুর ভিন্নতা বিদ্যমান।

Zygomyectes ও Oomycetes উভয়েরই সুগঠিত ও শাখাবহুল সিনোসাইটিক, মাইসেসলিয়াম রয়েছে। আসলে সরল প্রকৃতির Oomycetes, যেমন Saporlegniales বর্গভুক্ত

মৃত্তিকাবাসী ছত্রাক ; এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, এরা হয়তো বা Mucorales-এর পূর্বসূরি হতে পারে। ধারণা করা হয় যে, Mucorales-এর উত্তরসূরি হচ্ছে Entomophthorales.

অন্তগজ মাইসেলিয়ামের প্রকৃতি, ক্রমান্বয়ে প্রস্থপ্রাচীরের গঠন, প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত সদস্যদের প্রস্থপ্রাচীরে ছিদ্রের উপস্থিতি অনুপস্থিতি, প্রায়শই ক্ল্যামাইডোরেণুর উপস্থিতি, ক্রমরূপান্তরের পথ বেয়ে রেণুস্থলীটির প্রকৃত কনিডিয়ামে উত্তরণ এবং Ascomycetes-এর প্রকৃত রেণু, আইসোগ্যামীয় যৌন জনন হতে হেটারোগ্যামীয় জননে ক্রমোত্তরণ প্রবণতা Zygomycetes ও Ascomycetes-এর মধ্যে সম্পর্ক থাকার কথাই বলে। ধারণা করা হয় যে, এরা উভয়েই একটি সাধারণ স্টক হতে এসেছে।

অন্য একটি ধারণা হচ্ছে Mucorales ও Chytrids-এর মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, তাতে মনে হয় ফ্লাজেলাযুক্ত কোনো একটি সাধারণ স্টক হতে এদের উৎপত্তি হয়েছে।

Zygomycetes-এর অভিব্যক্তীয় প্রবণতা

Zygomycetes-এর মধ্যে অভিব্যক্তীয় প্রবণতাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. অধিক উন্নত ছত্রাকের সোমাটিক দশায় ক্রমাগত প্রস্থপ্রাচীর গঠনের বৃদ্ধি-হার লক্ষণীয়। আদি Zygomycetes, যেমন *Mucor* ও *Rhizopus*, এর মাইসেলিয়াম সিনোসাইটিক ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন। এখানে শুধু জনন মৌসুমে জননাঙ্গের নিচে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয়। এ প্রাচীরটিও আবার নিরেট প্রকৃতির। এ প্রজাতিগুলোর চেয়ে অধিক উন্নত Zygomycetes ছত্রাকে শুরু হতেই প্রস্থপ্রাচীর থাকে (Entomophthoales)। Ascomycetes-এর মতোই এগুলোর প্রস্থপ্রাচীর সছিদ্র।

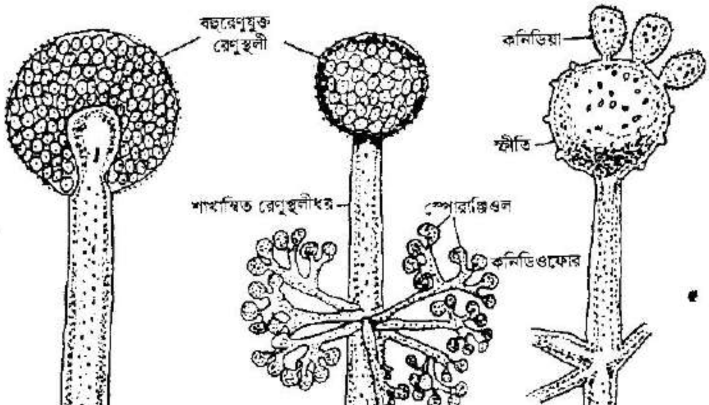

চিত্র ৭.১৯ : Mucorales-এ বহুরেণুযুক্ত রেণুস্থলী হতে কনিডিয়ামের উদ্ভব

২. বহুক্ষেত্রে রেণুস্থলী হতে ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে কনিডিয়ামে রূপান্তর ঘটেছে এটি আরেকটি অভিব্যক্তির ধারা সূচিত করে (চিত্র ৭.১৮)। এখানে প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে প্রগতিশীলভাবে রেণুস্থলীর আকারে ছোট হওয়া ও রেণুস্থলীতে রেণুর সংখ্যা হ্রাস। এক্ষেত্রে রেণুস্থলীধরটি শাখাযুক্ত হয়। সম্পর্কজড়িত আদি দুটি গণ *Mucor* ও *Rhizopus*, অসংখ্য রেণুযুক্ত ও কলুমেলাবিশিষ্ট রেণুস্থলী এককভাবে অশাখ রেনুস্থলীধরের শীর্ষাগ্রে উৎপন্ন হয়

(ক)। *Thamnidium*–এর কিছু কিছু প্রজাতিতে লম্বা, খাড়া, সশাখ রেণুস্থলীধরের প্রতিটি শাখা অসংখ্য, প্রান্তীয়, বহু রেণুযুক্ত রেণুস্থলী দ্বারা সীমিত হয়। কিছু কিছু পার্শ্বীয় শাখার গোড়ার গুচ্ছ ছোট ছোট রেণুস্থলী বা স্পোরাঞ্জিওল বহন করে। এদের প্রতিটি যখন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে থাকে তখন ছোট ছোট স্পোরাঞ্জিওল উৎপন্ন হয়। Chaetomyces–এ শুধু স্পোরাঞ্জিওল উৎপন্ন হয়, কোনো রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় না। *Chaetocladium* এ ঝরে পড়া একরেণুযুক্ত স্পোরাঞ্জিওল উৎপন্ন হয়। *Cunninghamella* (C) প্রকৃত কনিডিয়াম বহন করে। এ গণগুলোতে কনিডিয়ামের বিকাশধারা সুস্পষ্টভাবে Ascomycetes–এর প্রবণতা দেখায়।

৩. Zygomycetes–এ আইসোগ্যামীয় জনন হতে হেটারোগ্যামীয় জননে উত্তরণের প্রবণতা আরেকটি অভিব্যক্তির ধারা নির্দেশ করে (চিত্র ৭.১৯)। *Mucor* ও *Rhizopus*–এর জননকোষাধারগুলো অভিন্ন আকৃতির। পক্ষান্তরে *Zygorhynchus*–এ জননকোষাধার দুটি বিষম আকৃতির (খ–গ)। *Endogone lactiflua*–তে হেটারোগ্যামি সুস্পষ্ট। বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত প্রো–জননকোষাধারদ্বয় আকারে ভিন্ন (ঘ) ; একটি বড় আকারের ও অন্যটি ছোট আকারের। বড় ও ছোট হাইফি দুটি একে অন্যের দিকে অগ্রসর হয় ও পরস্পর সংস্পর্শে আসে। এককেন্দ্রিকার প্রান্তকোষটি বা জননকোষাধার অগ্রপ্রান্ত হতে পৃথক হয়। অবশিষ্ট কেন্দ্রিকাগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। এদের স্পর্শস্থানের প্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে একটি ছিদ্রপথ তৈরি হয় (ঙ)। ছোট জননকোষাধারের কেন্দ্রিকাটি এ ছিদ্রপথে বড় জননকোষাধারের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর কেন্দ্রিকা দুটি বড় জননকোষাধারের স্ফীত উপবৃদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে ও পরস্পর মিলিত হয় (চ)।

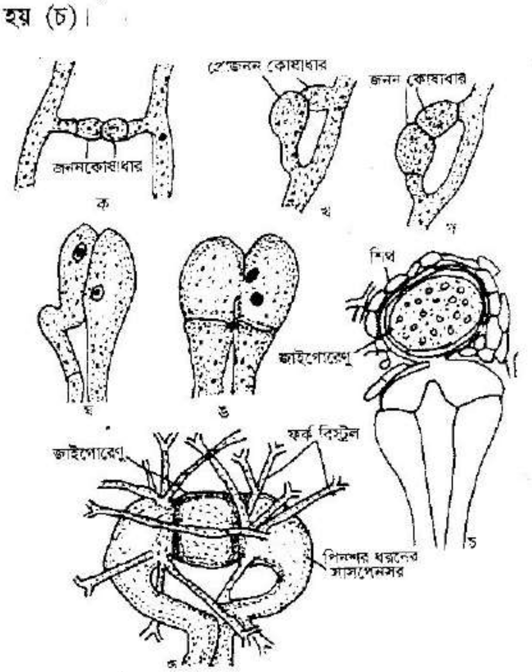

চিত্র ৭.২০ : Mucorales আইসোগ্যামীয় হতে হেটারোগ্যামীয় যৌন জনন ও জাইগোরেণুতে অধিকতর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

৪. Zygomycetes–এ আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যবহ অভিব্যক্তির ধারা দেখা যায়। এখানে দেখা যায় যে, জাইগোরেণুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত হয় এবং উন্নত শ্রেণির মতো এখানেও ফলদেহ গঠনের প্রবণতা দেখা যায় (চিত্র ৭.১৯ চ–ছ)। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপটি হচ্ছে Mortierella–এর জাইগোরেণুর চারপাশে বন্ধ্যা হাইফির উৎপত্তি ও শিথ গঠনের সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (চ)। সমগ্র গঠনটিকে ফলদেহের মতোই মনে হয়। *Endogone* –তে এ ধারার প্রাগ্রসরতা দেখা যায়। এখানে সুনির্দিষ্ট ফলদেহ বা স্পোরোকার্প গঠিত হয়। এটি কিছুসংখ্যক জাইগোরেণু নিয়ে গঠিত ও একটি সাধারণ শিথ দ্বারা পরিবেষ্টিত (পেরিডিয়ামের সাথে তুলনীয়)। এই শিথটি অঙ্গজ হাইফি দ্বারা গঠিত।

আলোচনা ও উপসংহার

১. নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের (Phycomycetes) উৎপত্তি

এদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে এবং ছত্রাকবিদগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল শৈবাল হতে নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের উদ্ভবে বিশ্বাসী; আবার অন্য দলটি বর্ণহীন ফ্লাজেলাযুক্ত জীব হতে উদ্ভবে বিশ্বাসী।

ক. Phycomycetes–এর উদ্ভবে শৈবাল–মতবাদ

এ মতবাদটি শৈবাল ও ছত্রাকের গঠনগত সাদৃশ্য ও জননগত সাদৃশ্য নির্ভরশীল। এখানে দাবি করা হয় যে, নিম্নশ্রেণীর ছত্রাক, *Saprolegnia* ও শৈবাল *Vaucheria* –তে উগ্যামীয় জনন বিদ্যমান এবং উভয়েরই অঙ্গজ হাইফি প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও সিনোসাইটিক। এদের জীবনচক্রেও মিল রয়েছে। তাছাড়া, কোষের প্রাচীরের রাসায়নিক গঠনেও সাদৃশ্য বিদ্যমান। রেণুস্থলীতে রেণু গঠনের কৌশলও অভিন্ন প্রকৃতির।

Debary (১৮৮১) এ মতবাদের প্রবক্তা সবুজ–কণা হারিয়ে ও জীবনযাপন প্রণালি পরিবর্তন করে vaucherial ancertor হতে *Saprolegnia* ছত্রাকের উৎপত্তি হয়েছে। বহু দ্বি–ফ্লাজেলাযুক্ত জুস্পোর হতে ancestral stock–এ সিনজুস্পোর বিকাশের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে থাকে। পুনরায় তিনি উল্লেখ করেন যে, *Saprolegnia* সদৃশ উওমাইসেটিস–Vuchria সদৃশ Ancestor হতে উদ্ভূত হয়েছে। এখান হতে Chytrids ও Zygomycetes–পশ্চাদমুখী বা ক্রমহ্রাসমান নিয়মে উদ্ভূত হয়েছে।

Debay-এর মতবাদের বিরোধীপক্ষ উল্লেখ করেন যে, এ মতবাদটি শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। সেহেতু *Vaucheria* –সদৃশ শৈবাল হতে ছত্রাকের উৎপত্তি নয় বরং বিভিন্ন ধারার সমান্তরাল বিকাশের বা অভিব্যক্তির কথা বলা যায়। এ মতবাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য ও ফ্লাজেলার ধরন যা জাতিজনির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাকে বিবেচনায় আনা হয় নি। এজন্য Debary সাম্প্রতিককালের ছত্রাকবিদদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

পক্ষান্তরে অন্য দলভুক্ত ছত্রাকবিদগণের অন্যতম Bessey (১৯৪২) উল্লেখ করেন যে, জান্থিসিয়ান উদ্বংশীয় কক্কয়েড নামক এককোষী শৈবাল হতে নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের বিকাশ ঘটেছে। এ মতবাদটি নিম্নোক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত :

১. গঠনে অভিন্নতা ও উভয়ের সোয়ার্মার (Swarmer)–এর সামনের দিকে ফ্লাজেলার উপস্থিতি।

২. উভয়ের কোষপ্রাচীরে সেলুলোজের উপস্থিতি।

৩. উভয়ক্ষেত্রে সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন।

এ মতবাদের ভিত্তিতে নিম্নশ্রেণির ছত্রাকগুলো এককোষী Coccoid Xanthophycean ancestor হতে দুটি অভিসারী ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। এখানে একটিতে swarmer সামনে একটি ফ্লাজেলাযুক্ত ও অন্যটির swarmer দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত। পিছনে একক ফ্লাজেলার উপস্থিতি ও সেলুলোজের অনুপস্থিতি এ মতবাদের বিরোধিতা করে। এক-ফ্লাজেলা ও দ্বি-ফাজেলাযুক্ত Phycomycetes একই স্টক হতে উদ্ভূত হয় নি। কাজেই নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের বিকাশ Polyphylectic বলা যায়।

খ. Phycomycetes-এর উদ্ভবে ফ্লাজেলেট মতবাদ

Fisher ও Dangeard (১৯০৯) বর্ণহীন ফ্লাজেলেট হতে নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের উদ্ভব হয়েছে। অভিন্ন বিপাকক্রিয়া ও ফ্লাজেলার ধরন (Phycomycetes ও Protozoem) এ ধারণাকেই সমর্থন দেয়। এ মতবাদে জোর দাবি করা হয় যে, Phycomycetes বহু জাতিজনিক ধারায় উৎপত্তি লাভ করেছে। একক ফ্লাজেলার Phycomycetes দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত প্রোটোজোয়া হতে উদ্ভূত হয়েছে। সর্বপ্রথম মাইসেলিয়ামবিহীন ছত্রাকের উদ্ভব হয়। এগুলো হতে প্রাগ্রসর অভিব্যক্তির পথ ধরে উন্নত ধরনের মাইসেলিয়ামের উদ্ভব হয়েছে।

আধুনিক ছত্রাকবিদগণ এ মতবাদের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। কেননা, নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছত্রাকগুলো Chytrids হয়ে ফ্লাজেলেট প্রোটোজোয়া হতে উদ্ভূত হয়েছে। এ ধারণার ক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে Chytrids-এর চলরেণু ও গ্যামেটগুলো শৈবালের জননকোষগুলোর চেয়ে প্রোটোজোয়ার সাথে অধিক সাদৃশ্য দেখায়। Hawker (১৯৬৭) ও ছত্রাকের বহু জাতিজনিক সমান্তরাল অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, Chytridismycetes, Hyphoehy-tridiomycetes ও Plasmodiophoromycetes প্রকৃত ফ্লাজেলার ফ্লাজেলেট প্রোটোজোয়া হতে উদ্ভূত হয়েছে। Oomycetes কিছু কিছু সূত্রাকৃতি শৈবালের সাথে কোষপ্রাচীরের গঠন উপাদান, যৌনাঙ্গের ধরন, জীবনচক্র এবং এন্ডোপ্লাজমের ধরন ও মাইটোকনড্রিয়ার আকারে সাদৃশ্য দেখায় বলে শৈবাল ancestor হতে ক্লোরোফিল হারিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, Zygomycetes ও Chytrids-এর উদ্ভব ফ্লাজেলেট স্তর (level) হতেই উদ্ভূত হয়েছে।

২. Phycomycetes-এর অভিব্যক্তীয় সম্পর্ক

Phycomycetes কোনো প্রাকৃতিক বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ছত্রাকের শ্রেণি নয়। এটি কতগুলো ছত্রাকগোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র। এ গোষ্ঠীগুলোতে রয়েছে সবচেয়ে সরল ধরনের থ্যালাস। এদের বৈশিষ্ট্যেও রয়েছে সর্বাধিক সাদৃশ্য। সর্বাপেক্ষা সরল ও আদি ধরনের ছত্রাকে একক ফ্লাজেলার সচল কোষ থাকে। যেসব সচল কোষের ফ্লাজেলাটি হুইপল্যাস ধরনের এবং পিছন দিকে থাকে সেগুলোকে Chytridionycetes শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। আর যাদের ফ্লাজেলামটি টিনসেল ধরনের এবং সামনের দিকে থাকে তাদেরকে Hyphochytridiomycetes শ্রেণির আওতায় রাখা হয়েছে। আবার যেগুলোতে খুব ছোট ধরনের একটি ফ্লাজেলাম থাকে এবং এ সাথে দীর্ঘ ফ্লাজেলার ছত্রাক থাকে সেগুলোকে Plasmodiophoromycetes শ্রেণির আওতায় দেওয়া হয়েছে। এ তিনটি শ্রেণিভুক্ত নিম্নশ্রেণির ছত্রাকগুলো সম্ভবত সমান্তরাল অভিব্যক্তির পথে বর্ণহীন জলজ ফ্লাজেলেট হতে উদ্ভূত হয়েছে।

Chytridiomycetes -এ তিনটি বর্গ রয়েছে। এদের মধ্যে Chytridiales-এ এককোষী, অধিকাংশই হলোকার্পিক প্রজাতি রয়েছে। Blastocladiales-এ সামান্য উন্নত ও জটিল ধরনের

থ্যালাস বিদ্যমান। এতে রয়েছে বিশেষ ধরনের যৌনাঙ্গ। Monoblepharidales–এ সূত্রাকৃতি মাইসেলিয়াম, উগ্যামাস জনন (আদি গোষ্ঠীর ছত্রাকে অস্বাভাবিক) দেখা যায়। ধারণা করা হয় যে, সম্ভবত ফ্লাজেলেট Ancestor হতে Chytridales–এর Chytridiales হতে Blastocladiales ও Monoblephoridales–এর উৎপত্তি হয়েছে। বিকাশের এ অভিব্যক্তির ধারাটি যুক্তিহীনভাবে Monoblepharidaes–এ শেষ হয়েছে।

অবশ্য, কিছু কিছু ছত্রাকবিদদের ধারণা এই যে, থ্যালাসের অনুসূত্রীয় প্রকৃতি, লম্বাটে হাইফাসদৃশ রেণুস্থলী ও উগ্যামীয় জনন, প্রভৃতি Monoblepharidales–এর সাথে আদি Oomycetes–এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যেরই প্রমাণ দেয়। এ মতের প্রতিপক্ষের যুক্তি হলো, পিছনদিকে একফ্লাজেলাযুক্ত সচলকোষের (চলরেণু ও স্পার্ম) উপস্থিতি এবং Monoblepharidales–এর কোষপ্রাচীরে সেলুলোজের পরিবর্তে কাইটিনের উপস্থিতি এ প্রত্যয়েরই সত্যতা বহন করে যে, Oomycetes–এর সাথে সাদৃশ্য শুধু বাহ্যিক। সেহেতু উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, Chytridiales ও Blastocladiales–এর সাথে Monoblepharidales–এর ঘনিষ্ঠতা Oomycetes থেকে অধিক।

Hyphochytriales–এর সাথে Chytridiales সাদৃশ্য তাদের জীবনচক্রে, জলজ স্বভাবে, আকৃতিতে, দেহগঠনে ও কোষপ্রাচীরের গঠনে বিদ্যমান। এ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, এদের Chytridiales বিদ্যমান। এ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, এদের Chytridiales ভুক্ত করা যেতে পারে। যাহোক, এদের মধ্যে মুখ্য বৈসাদৃশ্য চলরেণু আকারে গঠনে এবং চলরেণুতে ফ্লাজেলার অবস্থানে বিদ্যমান। এ বৈসাদৃশ্যই সাম্প্রতিককালের ছত্রাকবিদগণকে Chytridiales হতে পৃথক Hyphochytriales গোষ্ঠীতে বিবেচনা করতে হচ্ছে। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের ধারায় এদেরকে পৃথক শ্রেণি Hyphochytridiomycetes ও একক বর্গ Hyphochytriales–এর আওতাভুক্ত করেছে।

Plasmodiophoromycetes শ্রেণির Plasmodiophorales বর্গের আন্তঃপরজীবী স্লাইম মোল্ডের সাথে জাতিত্ব সম্পর্ক নিশ্চিত নয়। আধুনিক ছত্রাকবিদগণ আন্তঃপরজীবী স্লাইম মোল্ডকে প্রকৃত ছত্রাক বলে বিবেচনা করেন। এর কারণ হচ্ছে—

১. জীবনচক্রে ফলদেহ গঠিত হয় না।
২ হ্যাপ্লয়ড প্লাজমোডিয়ামের উপস্থিতি।
৩. গ্যামেটের মিলন কৌশল।
৪. রেণুপ্রাচীরে সেলুলোজের অনুপস্থিতি।
৫. আন্তঃপরজীবী প্রকৃতি।
৬. চলরেণুস্থলীয় পর্যায়ের উপস্থিতি।

এতদবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য স্লাইম মোল্ডকে Myxomycetes–এর আওতাভুক্ত আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। Gauman ও Dodge (১৯২৮) এজন্যই এদেরকে মাইসেলিয়ামবিহীন Archimycetes শ্রেণিভুক্ত করেন। Sparrow (১৯৬০) সাময়িকভাবে Biflagellatae (Oomycetes) ভুক্ত করেন।

Hawker (১৯৬৭) মতপ্রকাশ করেন যে, আন্তঃপরজীবী স্লাইম মোল্ডগুলো Myxomycetes বা Oomycetes–এর সাথে সাদৃশ্য দেখায় না। এগুলো Chytridiomycetes–এর সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত ; কেননা, *Synchytrium* প্রথমদিকে কোষপ্রাচীরবিহীন থাকে ; চলরেণুর এক ধরনের

আকৃতি থাকে ও ছোট ফ্লাজেলামও থাকে। তাই তিনি এদেরকে Plasmodiophoromycetes-ভুক্ত করেন।

Alexopoulos (১৯৬২) আন্তঃপরজীবী স্লাইম মোল্ডের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিকাশধারায় বিশ্বাসী। তিনি এদেরকে Oomycetes ও Chytridiomycetes সাথে আত্মীয়তাবিহীনভাবে পৃথক Plasmodiophoromycetes ভুক্ত করেন।

দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত চলরেণু, ঊগ্যামীয় যৌন জনন, নিষেকনলের মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া, অঙ্কুর নলের মাধ্যমে জাইগোটের অঙ্কুরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য Saprolegniales, Leptomitales, Lagenidiales ও Perenospoales-এর সাথে সম্বন্ধপরতার দেয়। সেহেতু এদেরকে একটি শ্রেণি Oomycetes ভুক্ত করা যায়। এদের মধ্যে Saprolegniales সবচেয়ে আদিম প্রকৃতির। আর এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে *Vaucheria* শৈবালের সাথে সাদৃশ্য দেখায়।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চাদমুখী অভিব্যক্তির ফলে Saprolegniales-এর পূর্বসূরী, আদিম স্থলজ ছিল এবং এখান হতেই Mucorales-এর উদ্ভব হয়েছে। Entomophthorales কে Mucorales-এর উত্তরসূরি বলে বিবেচনা করা হয়। Zygomycetes-এর সাথে Ascomycetes সম্পর্ক পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নশ্রেণির (Phycomycetes) ছত্রাকে অভিব্যক্তির প্রবণতা

ক. **বসতি :** জলজ প্রকৃতি হতে উভচর স্বভাবের মাধ্যমে পূর্ণ স্থলজ স্বভাবে উত্তরণ ঘটেছে ধারাবাহিক ও প্রাগ্রসর পরিবর্তনের মাধ্যমে। জলজ Chytridiomycetes সবচেয়ে সরল ও আদিম প্রকৃতির ছত্রাক। এদের কোনো মাইসেলিয়াম থাকে না । Oomycetes দেহ সূত্রাকৃতি ও স্বভাবে বিচিত্রধর্মী। উদাহরণ হিসেবে *Saprolegnia*-এর কথা বলা যায় ; এটি একটি স্বাভাবিক ধরনের জলজ মোল্ড। আবার *Pythium* কিছুটা মাটিতে থাকার অভিলাষীও কেননা এটি পানির চেয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মাতে বেশি পছন্দ করে। এটি অযৌনভাবে চলরেণু দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে। এখান হতেই ধারণা হয় যে, মূলত এটি জলজ স্বভাবের ছিল। *Phytophthora infestens* ছত্রাকটি সুস্পষ্টভাবে উভচর দলভুক্ত। সাধারণত এটি রেণুস্থলীতে চলরেণু উৎপাদন করে। শুধু প্রতিকূল পরিবেশে এরা ভেঙে ভেঙে ঝরে পড়ে এবং কনিডিয়ারূপে কাজ করে এবং সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর নল দেয়। অনুরূপভাবে, *Plasmopora viticola* ছত্রাকটিও উভচর প্রকৃতির। এটি *Phytophthora*-এর ন্যায় জলে ও স্থলে অভিযোজিত। *Perenospora* আবার শুধুই স্থলজ প্রকৃতির। এটি রেণুস্থলী উৎপন্ন করলেও কনিডিয়ার মতোই কাজ করে। Zygomycetes (Aplonatae) নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত।

খ. **প্রকৃতি বা স্বভাব :** স্বভাব-প্রকৃতিতে এ ছত্রাকগুলোর বাধ্যতামূলক মৃতজীবী হতে সুবিধাবাদী পরজীবী এবং শেষত খুবই বিশোষিত ধরনের বাধ্যতামূলক পরজীবীতে ক্রমোন্নতি দেখা যায়। Hyphochytriales, Blasocladiales ও Monoblepharidales বর্গীয় ছত্রাকগুলো মূলত মৃতজীবী। অবশ্য, Chytridiales বর্গীয় ছত্রাকগুলো সবচেয়ে সরল ও আদিম হলেও মৃতজীবী ও পরজীবীরূপে দেখা যায়। Oomycetes-এর Saprolegniales ও Leptomitales মৃতজীবী হলেও Pythiaceae সুবিধাবাদী পরজীবী। Plasmodiophorales ও Lagenidialas মূলত বাধ্যতামূলক আন্তঃপরজীবী। Perenosporaceae ও Albuginaceae গোত্রে বাধ্যতামূলক পরজীবিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে

উন্নীত হয়েছে। Zygomycetes এর Mucorales ব্যাপকভাবে মৃতজীবী হলেও Entomophthorales-এর অধিকাংশই কীটপতঙ্গের উপর পরজীবী।

গ. **থ্যালাস :** Chytridiales-এর মতো নিম্নশ্রেণির আদিম ছত্রাকের থ্যালাস আণুবীক্ষণিক, এক-ফ্লাজেলাযুক্ত, সচল হলোকার্পিক ও এককোষী এবং পরজীবী প্রজাতিগুলো এন্ডোবায়োটিক। এ বর্গের আরও একটু উন্নত ও জটিল সদস্যে একস্থান হতে সশাখ রোমসদৃশ শাখা বের হয়ে রাইজোমাইসেলিয়াম গঠন করে। এসব প্রজাতির থ্যালাস এপিবায়োটিক ও ইউকার্পিক হয়ে থাকে। এপিবায়োটিক প্রজাতিগুলো পোষকদেহের বাইরে বিকাশ লাভ করে এবং রাইজোমাইসেলিয়াম পোষকদেহের কলায় অবস্থান করে। এ ধরনের এপিবায়োটিক ইউকার্পিক প্রজাতিগুলোকে প্রাগ্রসর বলে বিবেচনা করা হয়। এদের থ্যালাসটি মনোসেন্ট্রিক বা পলিসেন্ট্রিক হতে পারে। মনোসেন্ট্রিকের চেয়ে পলিসেন্ট্রিক প্রজাতিগুলো অধিক উন্নত।

Monoblepharidales এ মাইসেলিয়াম রয়েছে এবং এতে আদর্শ ধরনের বহু শাখাযুক্ত হাইফিও রয়েছে। Oomycetes-এ মাইসেলিয়াম সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুগঠিত। এগুলো প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও সিনোসাইটিক। আদিম সূত্রাকৃতি আকারের পরজীবী প্রজাতিগুলো আন্তঃকোষীয় কিন্তু প্রাগ্রসর প্রজাতির আন্তঃকোষীয় মাইসেলিয়াম পুষ্টি শোষণের জন্য গোলাকার, খাঁজযুক্ত বা আঙুলাকৃতি, সরল বা সশাখ চোষক তৈরি করে। সশাখ চোষক মূলকে গোলাকার বা লম্বাটে চোষক মূলের চেয়ে অধিক উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, Chytridiomycetes ও Hyphochytridiomycetes-এর জননকোষগুলো সচল হলেও থ্যালাসটি নিশ্চল ধরনের। আবার Zygomycetes শ্রেণির ছত্রাকের জীবনচক্রের কোথাও সচল কোষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হবার প্রবণতা কোনো কোনো প্রজাতিতে দেখা যায়। কিন্তু Entomophthorales-এর থ্যালাস নিয়মিতভাবেই প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত।

ঘ. **হলোকার্পিক হতে ইউকার্পিক :** Chytridiales বর্গের প্রজাতিগুলো প্রকৃত হলোকার্পিক এবং সমগ্র থ্যালাসটিই পরিণতকালে রেণুস্থলীতে পরিবর্তিত হয়। এসব প্রজাতিতে যৌন জনন আইসোগ্যামীয়। এ বর্গেরই উন্নত প্রজাতিতে থ্যালাসের একটি অংশ হতে রেণুস্থলী তৈরি হয় বলে এদেরকে ইউকার্পিক প্রজাতি বলে। এখানে হেটোরোগ্যামি প্রবণতা দেখা যায়। Oomycetes বর্গের ছত্রাকগুলো ইউকার্পিক। ইউকার্পিক প্রজাতিসমূহকে অধিক উন্নত বলে ধরা হয়। Zygomycetes-এর সদস্যগুলো ইউকার্পিক।

ঙ. **অযৌন জনন :** অধিকাংশই নিম্নশ্রেণির ছত্রাক অযৌনরেণু মাধ্যমে অযৌন জনন কাজ করে থাকে। Chytridiales, Blastocladiales, Monoblepharidales ও Hyphochytriales-এর রেণুগুলো এক-ফ্লাজেলাযুক্ত। এগুলো সরল ও অবিকশিত রেণুস্থলীতে উৎপন্ন হয়। *Saprolegnia*-এর রেণুগুলো দ্বি-ফ্লাজেলাযুক্ত। আবার স্থলজ উন্নত ছত্রাকগুলো (Mucorales) নিশ্চল ধরনের অযৌন রেণু বা অ্যাপ্ল্যানোরেণুর মাধ্যমে জনন কাজ সম্পন্ন করে।

Monoblepharidales ও Saprolegniales-এর রেণুস্থলী লম্বাটে এবং হাইফি অপেক্ষা সামান্য প্রশস্ত হয়ে থাকে। অঙ্গজ হাইফি হতে খুব একটি বিষম নয় এমন রেণুস্থলীধরের শীর্ষাগ্রে এগুলো উৎপন্ন হয়। এ বর্গের এবং Leptomitales ও *Pythium*-এর কতিপয় প্রজাতিতে রেণুস্থলীর বিচ্যুতি ঘটে না বলে সেখানে চলরেণুর অঙ্কুরণ হয়।

Leptomitales, Lagenidiales এবং Pythiaceae-এর কিছু কিছু প্রজাতির রেণুস্থলী লেবুকার, বৃত্তাকার বা পাইরিফর্ম আকৃতির হয়ে থাকে। আবার অধিক প্রাগ্রসর Perenosporaceae-তে এদের আকৃতি ডিম্বাকা বা লেবুসদৃশ আকৃতির হয়ে থাকে। তাছাড়া এগুলো ঝরেও পড়ে। এগুলো অবশ্য সুস্পষ্ট রেণুস্থলীধরের উপরে উৎপন্ন হয়।

রেণুস্থলীর বিকাশ ঝরে পড়া রেণুস্থলীর শেষাবধি চলে। এগুলো সরাসরি অঙ্কুর নল মাধ্যমে কিংবা চলরেণু উৎপাদন মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। শেষ পর্যন্ত Perenospora-তে রেণুস্থলী কনিডিয়ারূপে আচরণ করে।

৮. **রেণুস্থলী হতে কনিডিয়ামের বিকাশ** : Chytridiales, Blastocladiales, Monoblepharidales, Hyphochytriales, Plasmodiorales, Saprolegniales, Leptomitales ও Lagenidiales বর্গভুক্ত আদিম ছত্রাকগুলো রেণুস্থলীতে উৎপন্ন চলরেণু মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এ ধরনের অযৌন জননকে আদিম ধরনের বলে গণ্য করা হয়। অধিক প্রাগ্রসর নিম্নশ্রেণির ছত্রাকগুলো ক্রমাগত সচল চলরেণু দশা বিলুপ্ত করে নিশ্চল কনিডিয়ার প্রতিস্থাপন করার ক্রমিক প্রবণতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এগুলো অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। রেণুস্থলী হতে কনিডিয়ায় উত্তরণের অবস্থান্তর অবস্থায় দুটো সিরিজ সমান্তরালভাবে চলে। একটি সিরিজ হচ্ছে Oomycetes শ্রেণির Pythium Perenospora সিরিজ এবং অন্যটি হচ্ছে Mueorales-এর Blakeslea-choanephora ও Cunninghamella সিরিজ। প্রথমোক্তটিতে রেণুস্থলীর আকার-আকৃতি পরিবর্তনে কোনো প্রাগ্রসর হ্রাস বা ক্রমিক রেণু উৎপাদন হ্রাস দেখা যায় না। এ সিরিজে কনিডিয়ামের উদ্ভব হয় চলরেণু উৎপাদন বন্ধের মাধ্যমে। সমগ্র রেণুস্থলীর প্রোটোপ্লাস্ট বিভাজন মাধ্যমে চলরেণু তৈরির পরিবর্তে অঙ্কুর নল তৈরি করে।

১. Pythium-perenospora সিরিজ

জলজ গণ *Saprolegnia* রেণুস্থলীর চলরেণু মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। *Pythium* ভেজা-স্যাতসেঁতে মাটিতে জন্মাতে ভালোবাসে এবং চলরেণু মাধ্যমেই বংশরক্ষার কাজ করে।

Pythium debaryanum, Phytophthora infestans এবং *Plasmopora viticola* উচ্চ তাপমাত্রায় রেণুস্থলীটি কনিডিয়ামের ন্যায় কাজ করে এবং অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু নিম্ন তাপমাত্রায় রেণুস্থলীটি চলরেণু উৎপন্ন করে।

Pythium vexans ও *Bremia*-এর রেণুস্থলী স্বাভাবিকভাবেই কনিডিয়ার মতো কাজ করে ; কিন্তু কখনও কখনও চলরেণু উৎপন্ন করে থাকে।

Pythium vexans ও *Perenospora* ঝরে পড়া ও বায়ুবাহিত ধরনের রেণুস্থলী উৎপন্ন করলেও এরা সবসময় কনিডিয়ার মতো অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়।

Pythium-Perenospora সিরিজটি অ্যাসকোমাইসেটিসের অযৌন রেণু কনিডিয়াম কিভাবে রেণুস্থলী হতে উদ্ভূত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেয়। এ পরিবর্তনটুকু স্থলজ জীবন-যাপন প্রণালির সাথে অভিযোজিত হওয়ার ফলে ঘটে এটি চলরেণু মাধ্যমে বিসরণকে সুযোগ না দিয়ে বায়ুবাহিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

২. Blakeslea, Choanephora ও Cunninghamella সিরিজ

Mucorales বর্গের *Rhizopus* ও *Mucor* গণ দুটির এ সিরিজ আদিম প্রকৃতির। এদের অশাখ রেণুস্থলীধরের উপর একক, বৃহৎ, বহুরেণুযুক্ত ও কলুমেলাবিশিষ্ট রেণুস্থলী উৎপন্ন হয় (ক)।

Blakeslea-তে *Mucor*-এর ন্যায় রেণুস্থলী হলেও পরিবেশ পারিপার্শ্বিক অবস্থা—যেমন পুষ্টির অবস্থা পরিবর্তন, আলো ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে স্পোরাঞ্জিওলও উৎপন্ন করে। *Thamnidium*-এর রেণুস্থলীধর শাখাযুক্ত (খ) এবং *Rhizopus* টাইপ প্রান্তীয় বহুরেণুযুক্ত রেণুস্থলী বহন করে। তাছাড়া স্পোরাঞ্জিওল বহন করে। এতে থাকে কম সংখ্যাক রেণু (মূলীয় অংশের পার্শ্ব শাখায়)। উভয়ক্ষেত্রের রেণুগুলো হুবহু একই ধরনের। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে *Thamnidium elegans* শুধু স্পোরাঞ্জিওল উৎপন্ন করে। *Cokeromyces* সাধারণত স্পোরাঞ্জিওল তৈরি করে। *Chaetocladium*-এ মনোস্পোরাস রেণুস্থলী (=Zsporangioles) তৈরি করে ; এগুলো ঝরে পড়া প্রকৃতির। রেণুপ্রাচীর রেণুস্থলী-প্রাচীর হতে পৃথক। Cunninghamella-তে শুধু কনিডিয়াম উৎপন্ন হয় (গ)। এক্ষেত্রে রেণুপ্রাচীর ও স্পোরাঞ্জিওল-প্রাচীরের মধ্যে ভেদ করা যায় না।

ছ. আইসোগ্যামীয় ⟶ অ্যানাইসোগ্যামীয় ⟶ উগ্যামীয় যৌন জনন : নিম্নশ্রেণির ছত্রাকে শুধু গোষ্ঠীতে নয় এমনকি গোত্র-বর্গের মধ্যে যৌন জননের অভিব্যক্তির ধারা লক্ষ্য করা যায়।

Plasmodiophoromycetes ও Chytridiomycetes-এর হলোকার্পিক সদস্যগুলো আইসোপ্ল্যানোগ্যামেটিক সংশ্লেষ মাধ্যমে যৌন জনন কাজ সম্পন্ন করে। অধিক উন্নত Chytrids গুলো ইউকার্পিক। Blastocladiales-এর অধিকাংশ সদস্যই অ্যানাইসোগ্যামীয় প্ল্যানোগ্যামেটিক সংশ্লেষ দ্বারা যৌন জনন কাজ চালায়। Monoblepharidales-এ উগ্যামীয় জনন দেখা যায়। একটি সচল পুংগ্যামেট অন্য একটি নিশ্চল উস্ফেয়ারকে নিষিক্ত করে।

Oomycetes-এর প্রায় সব সদস্যই উগ্যামীয় পদ্ধতিতে যৌন জননের কাজ চালায়। আবার এ শ্রেণিতে সচল গ্যামেটের অনুপস্থিতিও বিদ্যমান। সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও বিভেদিত পুংজনন অঙ্গকে পুংধানী এবং স্ত্রী জননাঙ্গকে স্ত্রীধানী বলে। Saprolegniales-এর অধিকাংশ জলজ সদস্যই আদিম ধরনের উগ্যামীয় পদ্ধতিতে যৌনজনন কাজ চালায়। এদের প্রতিটি উগোনিয়ামে একাধিক উস্ফেয়ার থাকে। উস্ফেয়ারের স্বাভাবিক সংখ্যা ৪ থেকে ১০টি। তরুণ উগোনিয়াল প্রোটোপ্লাস্টে পেরিপ্লাজম ও উওপ্লাজম নামক কোনো অঞ্চল তৈরি হয় না। *Pythiella vernalis* অবশ্য একটি ব্যতিক্রমী প্রজাতি। এখানে পেরিপ্লাজম ও উপপ্লাজম অঞ্চল তৈরি হয় (Couch, ১৯৩৫)। Leptomitales, Lagenidiales ও Perenosporalres-এ এ ধরনের অঞ্চল বিভেদক সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের উগোনিয়ামে একটি উস্ফেয়ার থাকে।

Mucorales-এর যৌন জনন আইসোগ্যামীয়। দুটি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত জননকোষধার মিলিত হয়ে পুরু প্রাচীরযুক্ত জাইগোরেণু তৈরি করে। অবশ্য, Zygorhynchus এ জননকোষাধারদ্বয় সমাকৃতি নয়। *Endogone lactiflua* তে যৌন সংশ্লেষ হেটারোগ্যামাস। Entomophthorales ও Zoopagales-এ যৌনতা দেখা যায় না—এটি উন্নত ছত্রাকের মধ্যেই দেখা যায়।

আলোচনা হতে এ প্রত্যয়ই প্রমাণিত হয় যে, নিম্নশ্রেণির ছত্রাকের অভিব্যক্তীয় বিকাশে যৌন জননের উদ্ভব বিভিন্ন সময়ে হয়েছে , কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে হয় নি (জ)। Mucorales এ জাইগোরেণুর প্রতিরক্ষা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ছোট্ট ফলদেহ গঠনের প্রবণতা সুস্পষ্ট (চিত্র ৭.১৯ চ–জ)। এটির সূচনা হয়েছে *Absidia* ও *Phycomyces* হতে এবং শেষ হয়েছে *Endogone*-তে। *Absidia*-এর জাইগোরেণুতে অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা বস্তু হলো বাঁকা কাঁটা এবং *Phycomyces* এ শাখাবহুল বাঁকা কাটা দেখা যায় (চিত্র ৭.১৯ জ)। এগুলো সাসপেনসর হতে উৎপন্ন হয়। *Mortiella*-তে আরও একটু প্রাগ্রসরতা দেখা যায়। এখানে প্রতিটি জাইগোরেণু বন্ধ্যা হাইফির শীথ দ্বারা আবৃত হয়। এ আবরণী ঘেরা জাইগোরেণুকে ছোট ফলদেহ বলে মনে হয়

চিত্র ৭.১৯চ)। এ ধরনের প্রবণতার চূড়ান্তরূপ *Endogone*-তে দেখা যায়। এখানে সুনির্দিষ্ট ফলদেহ বা স্পোরোকার্প তৈরি হয়। প্রতিটি স্পোরোকার্পের একাধিক জাইগোরেণু একটি সাধারণ বন্ধ্যা হাইফির ধাত্রে ঘেরা থাকে।

Phycomycetes–এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Rhizopus, *Mucor* প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মৃতজীবী ছত্রাক খাদ্যবস্তুকে দূষিত ও বিনষ্ট করে। শাক–সবজি, ফলমূলের পচনের জন্যও এরা দায়ী। আবার অনেকগুলির শিল্পেও ব্যবহার রয়েছে। *R. stolonifsr*–কে ফিউমারিক অ্যাসিড তৈরিতে, *R. oryzae* কে অ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। *Rhizopus*–এর কিছু কিছু প্রজাতি ও *R. stolonifer*, *R. sinensis* ও *R. nodosus* প্রভৃতি ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। অক্সালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে Mucorales ছত্রাকের ব্যবহার রয়েছে।

Synchytrism endobioticum নামক পরজীবী প্রজাতিটি রাঙা–আলুর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগটির নাম কালোগুটি রোগ। Perenosporales বর্গের পরজীবী প্রজাতিগুলো ফসলী শস্যের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। এদের রোগগুলো হচ্ছে আলুর ধ্বসা রোগ। আঙুরের ডাউনি মিলডিউ, লেবুর বাদামি দাগ, রুট–রট বা ডাম্পিং-অফ রোগ। ক্লাব–রুট বা আঙুল ও পায়ের গোড়ালি রোগের জন্য *Plasmodiophora brassicae* দায়ী। *Mucor*, *Rhizopus* ও *Absidia corymbifera* স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রেণী—অ্যাসকোমাইসেটিস

Class—Ascomycetes

এ শ্রেণিটি সবচেয়ে বড় এবং ছত্রাকগুলো 'থলে ছত্রাক' নামে সুপরিচিত। এগুলো বিভিন্ন পরিবেশে জন্মাতে পারে। তবে, পরজীবীরূপে অধিক দেখা যায়। মৃতজীবী ছত্রাকগুলো মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে। এদের কিছু প্রজাতি বিশেষ বিশেষ প্রাণীর মলের উপর জন্মায়। এগুলোকে মলবাসী বা কপ্রোফাইলাস ছত্রাক বলে। তাছাড়া, এ শ্রেণির কিছু কিছু ছত্রাক মাটির নিচেও বসবাস করে ; এদেরকে মৃদগত ছত্রাক বলে। পরজীবী ছত্রাকের মাইসেলিয়াম অন্তঃকোষীয় এবং তা আশ্রয়দাতার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে চোষকমূলের সাহায্যে খাদ্য শোষণ করে ; কিন্তু মৃতজীবীগুলোর মাইসেলিয়াম খাদ্যবস্তুর উপর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকে।

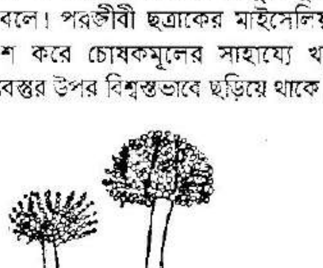

চিত্র ৮.১ : Ascomycetes. ক. ব্যবধায়কযুক্ত ইউকার্পিক মাইসেলিয়াম ; খ. অনুসূত্রের মিলন

চেক ছত্রাকবিদ August Corda (১৮৪২) এ শ্রেণিটির শনাক্তকারী। পাঁচ বছর পর (১৮৪৭) ফরাসি ছত্রাকবিদ Joseph Henri Leveille এদের অ্যাসকাস আবিষ্কার করেন। অতঃপর দুজন ছত্রাকবিদ Louis Rene Tulsane ও Charles Tulsane-এর অক্লান্ত গবেষণার ফলে এ শ্রেণির ছত্রাকের অঙ্গসংস্থান ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

Ainsworth ও Bisby–এর মতে এ শ্রেণিটিতে প্রায় ১২,০০০ প্রজাতি রয়েছে। তাঁরা এ প্রজাতিগুলোকে ১৬৫০টি গণভুক্ত করেন। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ উল্লেখ করেন যে, এ শ্রেণিতে ১৯০০টি গণ ও ১৫০০০টি প্রজাতি রয়েছে। বর্তমানে জানা গেছে যে, এ শ্রেণীতে ১৭০০টি গণ থাকলেও প্রজাতি সংখ্যা কিন্তু ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ এর মতো। এ শ্রেণীর পরিচিত ছত্রাকের মধ্যে ঈস্ট, সবুজ ও নীল মোল্ড, পাউডারি মিলডিউ, মোরেল ও বিভিন্ন আকার-প্রকারের পেয়ালা-ছত্রাকের নাম উল্লেখ করা যায়।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. একমাত্র ঈস্ট ছাড়া অন্যান্য ছত্রাকের মাইসেলিয়াম উন্নত প্রকৃতির, বহুল শাখান্বিত ও পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত। পার্শ্বপ্রাচীর ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় ও সরল রন্ধ্রযুক্ত।

২. পাশাপাশি অনুসূত্রের মধ্যে প্রায় মিলন ঘটে।

৩. জীবনচক্রে দুটি দশা বিদ্যমান—অঙ্গজ দশা ও জনন দশা।

৪. জনন দশার অযৌন দশায় অ্যাসকাস নামক ফলদেহের মধ্যে সাধারণত ৮টি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়। সেহেতু রেণুগুলো অন্তর্জনেষ্ণু। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেণুগুলোর সংখ্যামান ৮–এর কম বা বেশি হতে পারে। অবশ্য এ হ্রাস-বৃদ্ধিও গুণিতক হারে হয়ে থাকে।

৫. অযৌন জনন প্রধানত বহির্জনেষ্ণুভাবে উৎপন্ন নিশ্চল রেণুর (কনিডিয়া) মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ কনিডিয়ামগুলো কনিডিওফোরের শীর্ষভাগে উৎপন্ন হয়।

৬. জীবনচক্রের কোথাও সচল কোষের উপস্থিতি দেখা যায় না।

৭. অ্যাসকাস বিশেষ ধরনের রেণুস্থলী, দেখতে গদাকার বা বেলনাকার, কখনও বা গোলাকার বা নাশপাতির মতো। এর মধ্যেই অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়।

৮. জীবনচক্রের হ্যাপ্লোফেজ দশায় ডাইক্যারিওফেজের উৎপত্তি ও স্বল্পকালীন উপস্থিতি খুবই লক্ষ্যণীয় ; কেননা এটিই ফাইকোমাইসেটিস হতে অ্যাসকোমাইসেটিসের পার্থক্য।

৯. অধিকাংশ প্রজাতিতে বন্ধ্যা হাইফির মোড়কাবৃত্ত বহুকোষীয় জটিল প্রকৃতির অ্যাসকোকার্প নামক ফলদেহ তৈরি হয়।

১০. অ্যাসকোরেণুগুলো আকারে ছোট, পাতলা প্রাচীরে বেষ্টিত থলির ন্যায় অ্যাসকাসের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

থ্যালাস

অ্যাসকোমাইসেটিসের ঈস্ট ছাড়া মাইসেলিয়াম উন্নত প্রকৃতির কোষে এক বা একাধিক কেন্দ্রিকা থাকে। কোষপ্রাচীর কাইটিননির্মিত। মাইসেলিয়াম দীর্ঘ, সরু বা খাড়া, বহু শাখাযুক্ত এবং পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত অনুসূত্রগুলো শীর্ষবৃদ্ধি ক্ষমতাযুক্ত। অনুসূত্রগুলো আলগাভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করে। কোষগুলো প্রশস্ততার চেয়ে অনেকগুণ দীর্ঘ হয়। গহবরযুক্ত প্রাণসত্তায় রাইবোজম, আন্তঃপ্লাজমা জালিকা ও মাইটোকনড্রিয়া থাকে। প্রাণসত্তা-পর্দা সুস্পষ্ট। বলয়াকারে উপবৃদ্ধি কোষদ্বয়ের মধ্যে নলাকার ব্যবধায়কের উপস্থিতি প্রমাণ করে। এটি অন্তর্মুখীভাবে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে বৃদ্ধি পায় ও রন্ধ্রের আকার ছোট করে ; তবে একেবারে বন্ধ করে দেয় না। সেহেতু প্রতিটি ব্যবধায়কে একটি ছোট ছিদ্রপথ থাকে। এ শ্রেণিতে এ ছিদ্রপথটি সরল প্রকৃতির। এর মধ্য দিয়ে কোষ হতে কোষান্তরে প্রাণসত্তার যোগসূত্র রচিত হয়। তাছাড়া, কেন্দ্রিকাও কোষান্তরে যেতে পারে বৈকি। কোনো কোনো অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে কাইটিন ছাড়াও প্রোটিন, শর্করা

ও অ্যামাইনো শর্করাজাতীয় যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময় কোষপ্রাচীরের ভিতর দিকে লোমাজম নামক থলিসদৃশ অভিক্ষেপও দেখা যায়। আবার কোনো কোনো ছত্রাকের অনুসূত্রগুলো সুনিবিড়ভাবে সজ্জিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারায়। এসব ঘন সন্নিবেশিত অনুসূত্রের কোষগুলো সমব্যাসার্ধবিশিষ্ট হয়ে সিউডোপ্যারেনকাইমা গঠন করে। এ ধরনের গঠনকে স্ক্লেরোশিয়াম বলে। স্ক্লেরোশিয়াম হচ্ছে, নিজস্বতা হারানো খুব নিবিড়ভাবে বিন্যস্ত অনুসূত্রগুলোর বিশ্রামরত অঙ্গজ গঠন। এগুলো আয়তনে আলপিনের মাথার সমান বা ১ সেমি. ব্যাসার্ধের হয়ে থাকে। এদের আকার গোলাকার, কুশনাকৃতি, নলাকার বা অনিয়মিত। এদের পশ্চাদ্দেশীয় কোষ খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে। বাইরের কোষগুলোর প্রাচীর স্থূল, প্রায়ই স্ক্লেরেনকাইমীয় ও কালো বর্ণের হয়। এগুলো উদ্ভিদটিকে দুর্দিনে টিকে থাকতে সহায়তা করে। পরাশ্রয়ী মাইসেলিয়ামে বিকাশমাত্র এক/দু'কোষীয় শাখাকে হাইফোপোডিয়াম বলে। এর অগ্রভাগ সূঁচালো হলে মিউক্রোনেট এবং গোলাকার হলে ক্যাপিটেট হাইফোপোডিয়াম বলে। অ্যাসকোমাইসেটিসের ব্যবধায়কযুক্ত মাইসেলিয়াম অত্যন্ত ঘনভাবে সন্নিবেশিত হয়ে অনুসূত্রগুলো সিউডোপ্যারেনকাইমীয় কলা মাদুরাকৃতি হয়ে স্ট্রোমা গঠন করে। এটি দেখতে চ্যাপ্টা থালাকৃতির ন্যায়। এতে অনুসূত্রগুলো পরস্পরকে আঁকড়ে থাকে ও পাশাপাশি যুক্ত থাকে। এখান হতেই জনন এককের উৎপত্তি হয়।

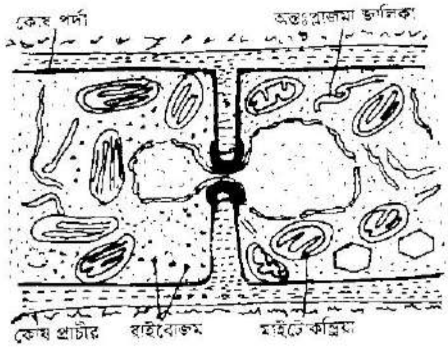

চিত্র ৮.২ : *Neurospora*–অনুসূত্রের পাশাপাশি কোষের কিয়দংশে অঙ্গাণু দেখানো হয়েছে।

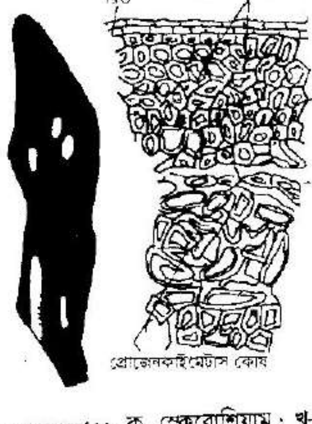

চিত্র ৮.৩ : Ascomycetes. ক. স্ক্লেরোশিয়াম ; খ–ক. এর ছেদনাংশ।

জনন

Ascomycetes ছত্রাকে তিন ধরনের জনন পদ্ধতি দেখা যায় : যথা—

অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন ও যৌন জনন।

অঙ্গজ জনন : এ শ্রেণির ছত্রাকের অঙ্গজ জনন তিন প্রকারের হয়ে থাকে :

১. খণ্ডায়ন—এ জাতীয় জনন শুধু ঈস্ট জাতীয় ছত্রাকেই দেখা যায়।
২. মুকুলায়ন ও ফিশন পদ্ধতিতে জনন শুধু ঈস্ট ছত্রাকে দেখা যায়।

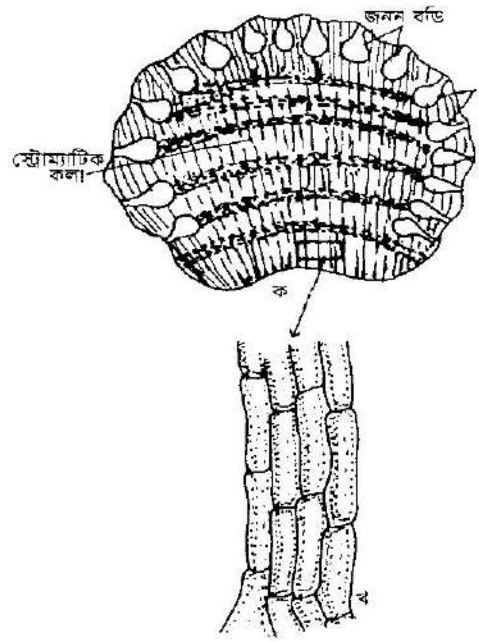

চিত্র ৮.৪ : Ascomycetes, ক. স্ট্রোমা খ. স্ট্রোমাটিক কলা

অযৌন জনন

বিভিন্ন প্রকার রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অযৌন জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ রেণুগুলোর মধ্যে অ্যাসকোরেণুই মুখ্য এবং অন্যগুলো হচ্ছে কনিডিয়া, অয়ডিয়া, ক্ল্যামাইডোরেণু, পিকনোরেণু, ব্লাস্টোরেণু প্রভৃতি।

কনিডিয়া : সাধারণত প্যাথোজেনিক অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকের অঙ্গজ অনুসূত্র হতে কনিডিয়া একক বা শাখান্বিত কনিডিওফোরের শীর্ষভাগে বর্হিজনেযু ও অগ্রমুখ বা নিম্নমুখভাগে নিশ্চল, ঝরে পড়া অযৌন কনিডিয়া বা রেণু উৎপন্ন হয়। কনিডিওফোর হচ্ছে বিশেষ ধরনের উর্বর, খাড়া, মুক্ত, খাটো অনুসূত্র। এটি এককোষী, বহুকোষী অশাখ বা সশাখ হতে পারে। কনিডিয়ামগুলো কখনও নগ্নভাবে কখনও সম্মিলিতভাবে অ্যাসারভুলাস, পিকনিডিয়াম, সাইনেমা নামক জটিল প্রকৃতির ফলদেহ গঠন করে।

প্যাথোজেনিক ছত্রাকের কনিডিওফোর যে মুক্ত, চ্যাপ্টা ও সসার আকৃতির ফলদেহ গঠন করে তাকে অ্যাসারভুলাস বলে। মৃতজীবী ছত্রাকের ফলদেহকে স্পোরোডকিয়াম ও সাইনেমা বলে।

কনিডিওফোরগুলো যদি ফাঁপা, গোলাকার বা ফ্লাস্ক আকৃতির ফলদেহের ভিতরগাত্র হতে উৎপন্ন হয়, তবে তাকে পিকনিডিয়াম বলে। প্রতিটি পিকনিডিয়ামের শীর্ষাঞ্চলে অস্টিওল নামক একটি ছোট রন্ধ্র থাকে। এ রন্ধ্রটি ঢাকনাযুক্ত বা ঢাকনাবিহীন হতে পারে। পিকনিডিয়ামের কনিডিয়ামকে পিকনোরেণু বলে। *Penicillium*-এর কনিডিওফোর দীর্ঘ ও শাখাবহুল। শাখাগুলো গুচ্ছাকারে বোতলাকৃতি স্টেরিগমাটা বহন করে এবং প্রতিটি স্টেরিগমাটাতে দীর্ঘ শিকলাকারে কনিডিয়া উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো অ্যাসকোমাইসেটিসে কনিডিয়া গঠনের পর পরই ঝরে পড়ে (চিত্র ৮.৫ক)। আবার কতকগুলোতে মিউসিলেজ ফোঁটায় আবদ্ধ থাকে বা শিকল সংযুক্ত থাকে (চিত্র ৮.৫খ)। আবার কোথাও একটি কনিডিওফোরে একটি কনিডিয়া শিকল (*Erysiphe*-তে), কোথাও একাধিক শিকল বিদ্যমান (*Aspergillus*-এ)। শিকলাবদ্ধ কনিডিয়ামগুলো সাধারণত নিম্নোন্মুখভাবে উৎপন্ন হয়। কনিডিয়া ছাড়াও আরও দু'ধরনের রেণু দিয়ে অযৌন জননক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এগুলো হলো : অয়ডিয়া ও ক্ল্যামাইডোরেণু।

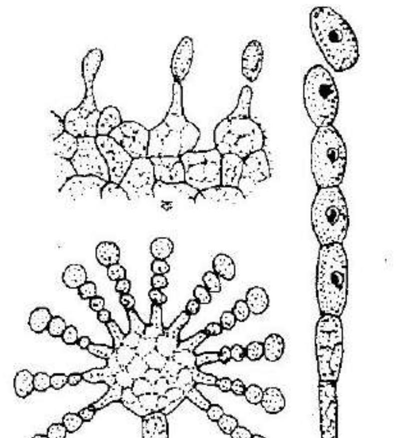

চিত্র ৮.৫ক : অ্যাসকোমাইসেটিসে বিভিন্ন ধরনের কনিডিয়া ও কনিডিওফোর। ক. *Phyllostieta* ; খ. *Erysiphe* ; গ. *Aspergillus*

অয়ডিয়া : কোনো কোনো অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকের অনুসূত্রের অগ্রভাগে ব্যবধায়ক সৃষ্টি করে মাতৃ অনুসূত্র হতে আলাদা হয়ে যায়। এ ধরনের এককোষীয় খণ্ডকেই অয়ডিয়া বলে। এসব খণ্ডে সব গুণাগুণ থাকে। অয়ডিয়াম গ্রীক শব্দ ; অর্থ হলো ডিম বা গোলাকার গঠন। এগুলোই অযৌন রেণু। এগুলো অনুসূত্রেই দৈর্ঘ্যব্যাপী তৈরি হতে পারে।

অবশ্য এগুলোকে কনিডিয়াসদৃশ জনন একক বলা যায় না। যেসব অনুসূত্র হতে এদের উৎপত্তি হয়, সেসব অঙ্গজ কোষের সাথে আকারে, আয়তনে এদের খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে এগুলো প্রতিকূলতা সহনশীল অঙ্গজ বৃদ্ধিতে সক্ষম এবং নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে।

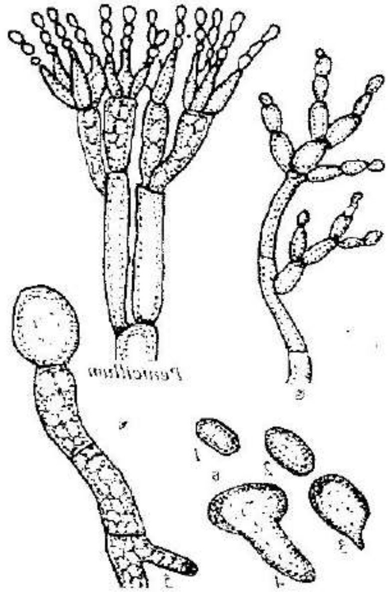

চিত্র ৮.৫খ : Ascomycetes ঘ. *Penicillim*–এ কনিডিওফোর ও কনিডিয়া, ঙ. *Hormodendrum* ও *Penicillim*–এ (F1-F5) কনিডিয়ার অঙ্কুরণ

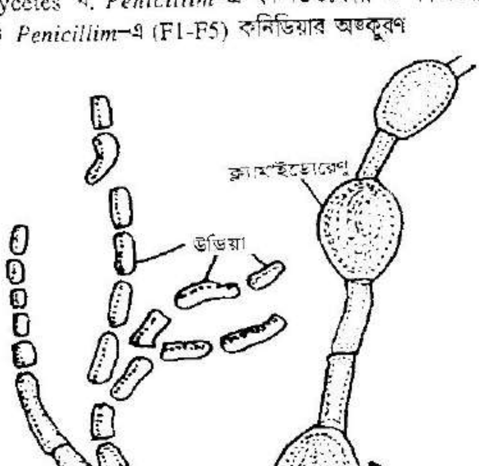

চিত্র ৮.৬ : Ascomycetes. ক. ব্যবধায়কযুক্ত অনুসূত্র হতে অয়ডিয়া উৎপন্ন হচ্ছে ; খ. নিবেশিত ক্ল্যামাইডোরেণু ; গ. আবাদ মাধ্যমে অঙ্কুরণ।

ক্ল্যামাইডোরেণু : মাইসেলিয়ামের যে কোনো কোষ (অগ্রস্থ বা নিবেশিত) প্রতিকূলতার পূর্বাভাসের কারণে পরিমিত খাদ্য সংগ্রহ করে স্ফীত ও গোলাকার হয় এবং স্থূল প্রাচীরযুক্ত হয়। এগুলো অঙ্গজ কোষ হতে আকারে বড় ও পুরু প্রাচীরযুক্ত। তাছাড়া এগুলো বিশ্রাম-রেণুর ন্যায় কাজ করে। এ ধরনের একককেই ক্ল্যামাইডোরেণু বলে। প্রতিকূলতার জন্য ছত্রাকটি মরে গেলে এ রেণুগুলো বহুদিন পর্যন্ত সুপ্তাবস্থায় সজীব থাকে এবং অনুকূল পরিবেশের আগমণে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন ছত্রাক-উদ্ভিদ দেয়।

যৌনজনন

Ascomycetes ছত্রাকে দুটি সদৃশ বা বিসদৃশ গ্যামেটের মিলনের ফলে যৌনজনন সম্পাদিত হয়। তাই এ জনন আইসোগ্যামাস বা হেটারোগ্যামাস হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, মাইসেলিয়াম ও সহবাসী বা ভিন্নবাসী হতে পারে।

যেসব ইউকার্পিক মাইসেলিয়াম কনিডিয়া উৎপন্ন করে, সেগুলোয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট মৌসুমে (বসন্তের প্রারম্ভে) যৌন জনন কাজে জড়িত হয়। এজন্য জননকোষাধার উৎপন্ন হয়। পুংজনন কোষাধারকে পুংধানী এবং স্ত্রী জননকোষাধারকে অ্যাসকোগোনিয়াম বলে। অ্যাসকোগোনিয়াম এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। এর অগ্রভাগ সাধারণত দীর্ঘায়িত হয়ে ট্রাইকোগাইন গঠন করে। এককোষী ছত্রাকে যেমন ঈস্টে (yeast) সম্পূর্ণ দেহকোষটিই জননকোষাধার হিসেবে কাজ করে।

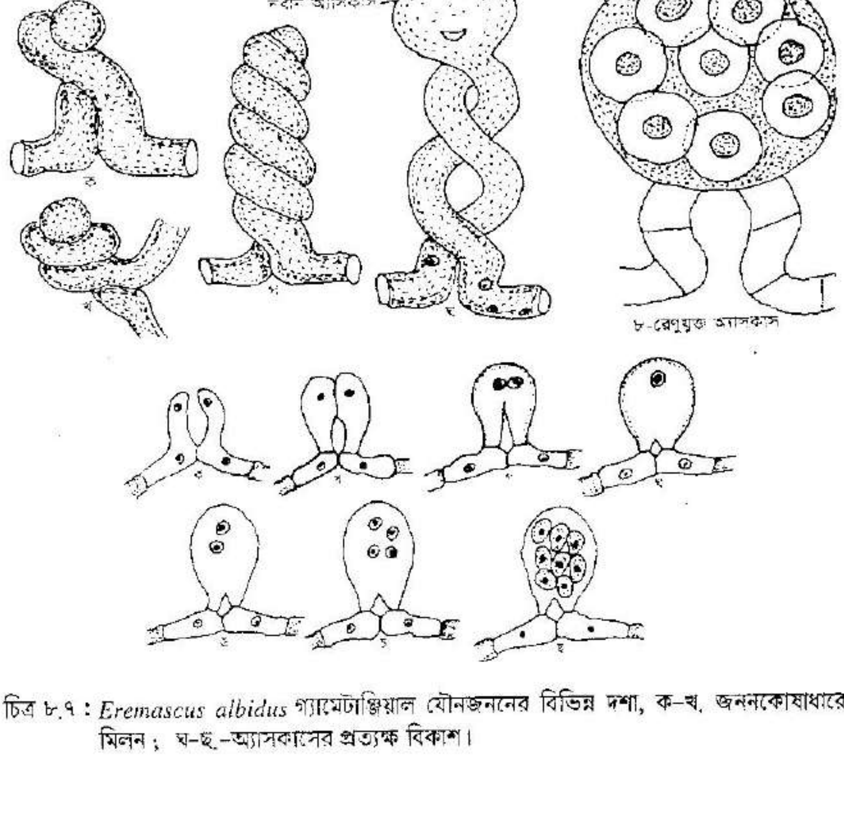

চিত্র ৮.৭ : *Eremascus albidus* গ্যামেটাঞ্জিয়াল যৌনজননের বিভিন্ন দশা, ক–খ, জননকোষাধারের মিলন ; ঘ–ছ.–অ্যাসকাসের প্রত্যক্ষ বিকাশ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসূত্রগুলো জননকোষাধারে বিভেদিত হয় না এবং তখন সাধারণ অনুসূত্রগুলোর বিপরীতধর্মী কেন্দ্রিকাগুলো বিভিন্ন উপায়ে মিলিত হয়ে যৌন জননের কাজ সম্পন্ন করে। এ ধরনের যৌন পদ্ধতিকে প্লাজমোগ্যামি বলে। Ascomycetes–এ ৬টি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্লাজমোগ্যামি সম্পন্ন হতে পারে :

১. **জননকোষাধারের মিলন :** কিছু কিছু নিম্নশ্রেণির অ্যাসকোমাইসেটিস (Hemiascomycetidae) যেমন *Eremascus*, Yeast, *Dipodascus* প্রভৃতির জননকোষাধাররূপে আচরণকারী কোষদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। যেমনটি জাইগোমাইসেটিসের আইসোগ্যামীয় জননে দেখা যায়। জননকোষাধারদ্বয় ছোট, উল্লম্ব স্ফীতিরূপে পাশাপাশি কোষদ্বয়ের ব্যবধায়কের উভয় পার্শ্ব হতে উৎপন্ন হয়। এ স্ফীতিদ্বয় তাদের মাতৃশাখা হতে একটি করে কেন্দ্রিকা পায় এবং প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে আলাদা হয়ে যায়। একসময় পাশাপাশি মাইসেলিয়াম বা কোষের সমাকৃতির শীর্ষদ্বয় জননকোষাধাররূপে কাজ করে এবং পরস্পর আকৃষ্ট হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে এদের প্রোটোপ্লাস্ট একীভূত হয়। এরূপ মিলনকে প্লাজমোগ্যামি বলে। প্রোটোপ্লাজমের মিলনের পরপরই কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন ঘটে ; এ মিলনকে ক্যারিওগ্যামি বলে। এভাবে উৎপন্ন এককোষী গঠনকে জাইগোট বলে। জাইগোট কোষটি আকারে বড় এবং ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি বহুবার বিভক্ত হয়ে অ্যাসকাস গঠন করে। এ বিভাজনগুলোর মধ্যে প্রথম বিভাজনটি মিওটিক। যেহেতু প্লাজমোগ্যামির পরপরই ক্যারিওগ্যামি হয়, সেহেতু এখানে কোনো ডাইক্যারিওটিক দশা থাকে না। *D. albidus*–এ অ্যানাইসোগ্যামীয় ভ্রূণের জননকোষাধারের মিলন দেখা যায়।

চিত্র ৮.৮ : Ascomycetes অ্যানাইসোগ্যামীয় যৌনজননে প্লাজমোগ্যামিতে জননকোষাধারের মিলন ও প্রত্যক্ষ অ্যাসকাসের (*Dipodascus albidus*) বিকাশ

২. **হলোগ্যামি :** এটিও একধরনের জননকোষাধারের মিলন পদ্ধতি। এধরনের যৌনজনন প্রধানত yeast জাতীয় ছত্রাকে (*Schizosaccharomyces octosporas*) দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে দুটি পরিণত অঙ্গজ কোষ জননকোষাধাররূপে কাজ করে এবং একটি খাটো নলের মাধ্যমে পরস্পর মিলিত হয়। এ নলটিই পরবর্তীকালে সংশ্লেষ নলে পরিণত হয়। কোষদ্বয়ের কেন্দ্রিকাদ্বয় সংশ্লেষ নলে চলে আসে ও পরস্পর মিলিত হয়ে একীভূত হয়। এখানে কিন্তু কোনো গ্যামেট তৈরি হয় না। এখানে প্রাণসত্তার সাথে প্রাণসত্তা এবং কেন্দ্রিকার সাথে

কেন্দ্রিকার মিলনে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি হয়। এ জাইগোটই সরাসরি অ্যাসকাস মাতৃকোষরূপে কাজ করে।

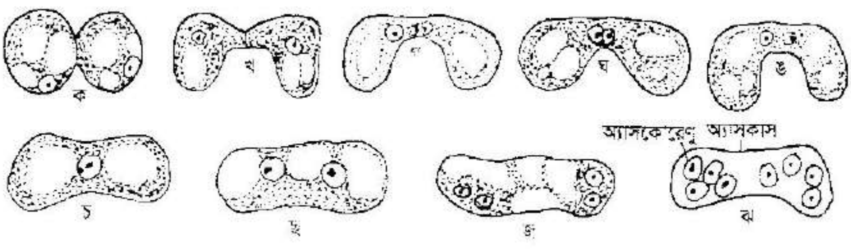

চিত্র ৮.৯ : Ascomysetes. *Schizosaccharomyces octosporas*-এ হলোগ্যামি অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু গঠন

অতঃপর সংশ্লেষ নলটির বেড় (চওড়া) বৃদ্ধি পায় ও পিপাকৃতি আকার ধারণ করে। এখানে ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি দুবার বিভক্ত হয়ে ৮টি কেন্দ্রিকা দেয়। এ বিভাজনদ্বয়ের প্রথমটি মিওটিক হয়ে থাকে।

৩. **জননকোষাধারের সংস্পর্শ :** এ জাতীয় যৌনজনন পদ্ধতিতে বাহ্যিকভাবে শনাক্তযোগ্য ও বিপরীতধর্মী দুটি জননকোষাধার, পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়াম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। এখানে উভয়েরই নিজস্বতা বিদ্যমান। এ ধরনের জননকে হেটারোগ্যামিও বলে। এ জননাঙ্গগুলো সাধারণত পাশাপাশি উৎপন্ন হয়। এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে এসব ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

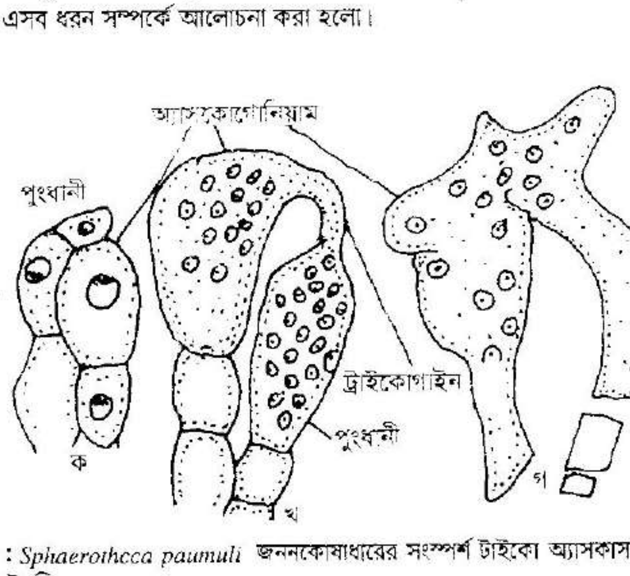

চিত্র ৮.১০ : *Sphaerothcca paumuli* জননকোষাধারের সংস্পর্শ টাইকো অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু তৈরি

ক. *Sphaerotheca humuli*-তে এককেন্দ্রিকাযুক্ত পুংধানী ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত অ্যাসকোগোনিয়াম পরস্পরের নিটকবর্তী হয় এবং তাদের সংযোগপ্রাচীরে প্রশস্ত ছিদ্র সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণসত্তাসহ পুংকেন্দ্রিকাটি অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে। এসময় পুংধানীটি শূন্য হয়ে যায়। অতঃপর অ্যাসকোগোনিয়ামের কেন্দ্রিকাদ্বয় ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি করে। অতঃপর কেন্দ্রিকাদ্বয় মাইটোটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে একস্তর দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত পেনালটিমেট কোষ দেয়। এটিই অ্যাসকোজেনাস কোষ হিসেবে কাজ করে ১টি অ্যাসকাস দেয়। এর মধ্যে অ্যাসকোরেণু তৈরি হয়।

খ. *Pyronema confluens*–এর ক্লাব আকৃতির বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত পুংধানীটি বহু কেন্দ্রিকা ও শাখাবহুল অ্যাসকোগোনিয়ামের নিকটাঞ্চলের উৎপন্ন হয়। অ্যাসকোগোনিয়ামটি নলাকৃতি ট্রাইকোগাইনবিশিষ্ট। এ ট্রাইকোগাইনই অ্যাসকোগোনিয়াম ও পুংধানীর মধ্যে মিলন ঘটায়। জনন প্রাক্কালে ট্রাইকোগাইন প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত বা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হতে পারে। এটি সাধারণত অশাখ হয় ; তবে *Neurospora*-তে সশাখ হয়। অ্যাসকোগোনিয়াম আকৃতি ও প্রজাতিভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটি কোনো প্রজাতিতে এককেন্দ্রিকাযুক্ত, কোথাও সরু হাইফির বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত, খণ্ডবিশেষ হতে পারে। তাছাড়া ১৪০০ কেন্দ্রিকাযুক্ত গোলাকার ও পাইরিফর্ম আকৃতিরও হতে পারে।

ট্রাইকোগাইন বৃদ্ধি পেয়ে পার্শ্ববর্তী পুংধানী সংস্পর্শে আসে এবং জোরে চাপ দিতে থাকে। ফলে সংযোগস্থলের প্রাচীরদ্বয় গলে গিয়ে একটি ছিদ্রপথের সৃষ্টি হয়। এ ছিদ্রপথেই পুংধানী বহু কেন্দ্রিক–প্রোটোপ্লাস্ট অ্যাসকোগোনিয়ামে গমন করে। এখানে কোনো নিষেক নল তৈরি হয় না। প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হয়। অতঃপর অ্যাসকোগোনিয়াম আকারে বৃদ্ধি পায় ও বহু সূত্রাকার স্থূল ও খাট কোষীয় হাইফি বিশিষ্ট হয়। এ হাইফিগুলোকেই অ্যাসকোজেনাস হাইফি বলে। এদের শীর্ষকোষ দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত এবং এদের মিলনের পর মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয় ও শীর্ষাঞ্চল পুনরায় বক্র হয়ে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়।

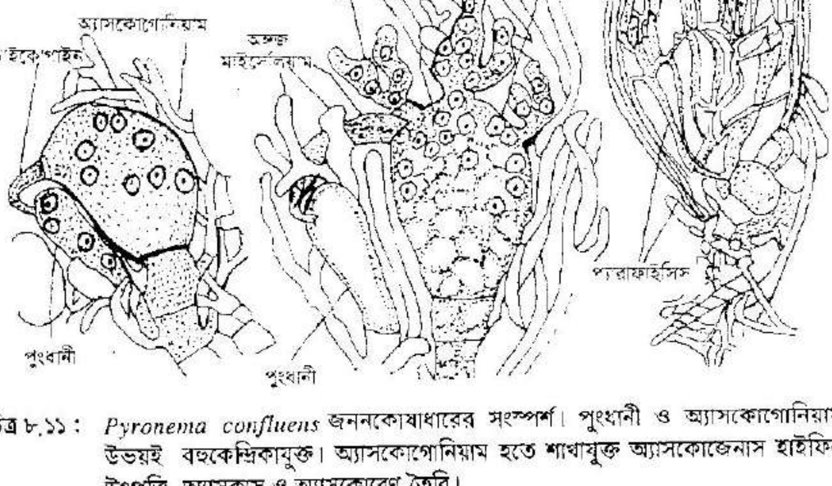

চিত্র ৮.১১ : *Pyronema confluens* জননকোষাধারের সংস্পর্শ। পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়াম উভয়ই বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত। অ্যাসকোগোনিয়াম হতে শাখাযুক্ত অ্যাসকোজেনাস হাইফির উৎপত্তি, অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু তৈরি।

৪. **অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেটের মিলন :** *Spermophthora gossypii*-তে দুটি মূলাকৃতি ও নিশ্চল প্রকৃতির গ্যামেট পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থান করে এবং সংশ্লেষ নল গঠন করে যৌনজননের কাজ সমাধা করে। গ্যামেটদ্বয়ের কেন্দ্রিকাদ্বয় সংশ্লেষ নলেই মিলিত হয়। এ সংশ্লেষ নল হতেই এক-কেন্দ্রিকাযুক্ত খাট প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত শাখার উৎপত্তি হয়। এটিই অ্যাসকোজেনাস হাইফি হিসেবে কাজ করে। এ হাইফির শীর্ষভাগ স্ফীত ও গোলাকার হয়ে অ্যাসকাস এবং কেন্দ্রিকা বিভাজন মাধ্যমে অ্যাসকোরেণু গঠন করে।

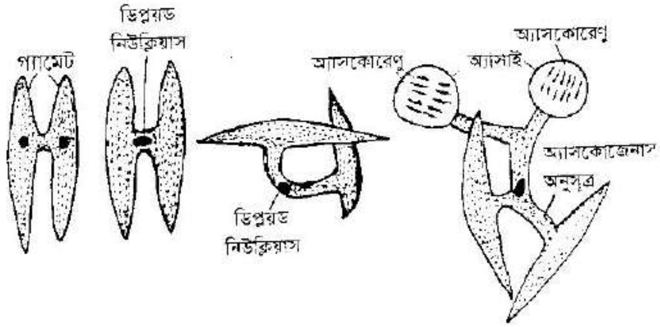

চিত্র ৮.১২ : *Spermophthora gossypii* অ্যাপ্ল্যানোগ্যামেটিক মিলন, অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু গঠন

৫. **অটোগ্যামি :** কিছু কিছু অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকে পুংধানী তৈরি হয় না কিংবা তৈরি হলেও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। উদাহরণ হিসেবে *Talaromyas vermiculatus* Syn. *Penicillium vermiculatum*)-এর পুংধানীর শীর্ষ নলাকৃতি বহুকেন্দ্রিকযুক্ত অ্যাসকোগোনিয়ামকে স্পর্শ করে। এদের সংযোগ স্থলের প্রাচীর গলে যায় ; তৈরি হয় একটি ছিদ্রপথ। এ ছিদ্রপথের মাধ্যমেই জননাঙ্গদ্বয়ের প্রোটোপ্লাস্টের মধ্যে যোগাযোগ হলেও পুংকেন্দ্রিকা বা প্রোটোপ্লাস্ট অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে না। সেহেতু কোনো প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হয় না (Dangeard, ১৯০৭)। এখানে সংযোগের ফলে শুধু অ্যাসকোগোনিয়াম কেন্দ্রিকাটিকে ডাইক্যারিওন হিসেবে কাজ করতে উত্তেজিত করে। এটিই অটোগ্যামির উদাহরণ। তবে ট্রাইকোগাইন হতে অ্যাসকোগোনিয়াম যে কেন্দ্রিকা গ্রহণ করে, তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

৬. **স্পার্মাটাইজেশন :** Ascomycetes শ্রেণির Laboulbeniakles বর্গের ছত্রাকে পুংধানীর পরিবর্তে কনিডিয়াসদৃশ স্পার্মাশিয়াম নামক বিশেষ ধরনের অতি ক্ষুদ্র ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত যৌন কোষ ফ্লাস্ক আকৃতির স্পার্মোগোনিয়াম গহ্বরে উৎপন্ন হয়। কিছু কিছু প্রজাতিতে বিশেষ ধরনের জনন হাইফির শীর্ষাগ্রে (স্পার্মাটোফোর) এককভাবে বা শিকলাকারে উৎপন্ন হয় ; যেমনটি *Neurospora sitophilo*-তে দেখা যায়। স্পার্মাশিয়া হলো বিশেষিত এককেন্দ্রিকাযুক্ত, ছোট, রেণুসদৃশ ও নিশ্চল প্রকৃতির কোষ। স্পার্মাশিয়া পরিণত ও পরিপক্ব হলে মাতৃদেহ হতে ঝরে যায় এবং পতঙ্গ, বাতাস, পানিবাহিত হয়ে অ্যাসকোগোনিয়ামে নীত হয় এবং অভ্যর্থনা অঙ্গে যুক্ত হয়। এদের সংযুক্তিস্থানে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এ ছিদ্রপথেই এটি অ্যাসকোগোনিয়াম কেন্দ্রিকার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে ও ডাইক্যারিওন সৃষ্টি করে।

অতঃপর ক্যারিওগ্যামি সংঘটিত হয় এবং মিওটিক ও মাইটোটিক নিয়মে বিভাজিত অ্যাসকোরেণু গঠন করে।

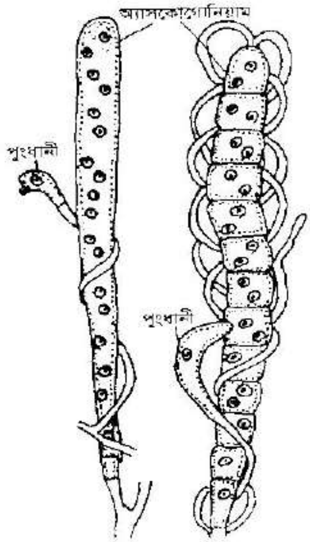

চিত্র ৮.১৩ : Ascomycetes. *Talaromyces vermiculatus*–এ অটোগ্যামি

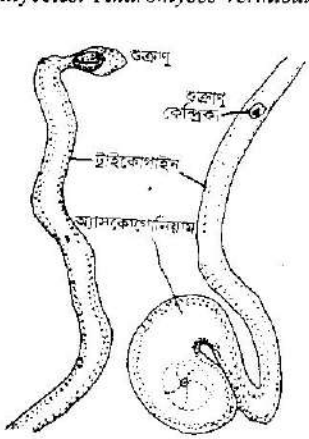

চিত্র ৮.১৪ : Ascomycetes. *Mycospherella fulipiferae* তে স্পার্মাটাইজেশন। ক. ট্রাইকোগাইনের শীর্ষে স্পার্মোগোনিয়াম গহবরে স্পার্মাশিয়াম ; খ. অ্যাসকোগোনিয়ামে স্পার্মাশিয়ার কেন্দ্রিকা ট্রাইকোগাইন দিয়ে নিচে নেমে আসছে

৭. **সোম্যাটোগ্যামি :** অঙ্গজকোষের মিলনে দুটি বিপরীতধর্মী কেন্দ্রিকার মিলন হলে তাকে সোমাটোগ্যামি বলে। Ascomycetes শ্রেণির কিছু কিছু ছত্রাকে কোনো পুংধানী বা স্পারমোনিয়া উৎপন্ন হয় না। এ ক্ষেত্রে, বিপরীতধর্মী স্ট্রেনের (+1) ও (-1) মাইসেলিয়া হতে দুটি হাইফি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে ও বিগলিত হয়। একটির কেন্দ্রিকা অন্যটিতে প্রবেশ করে।

ফলে বিপরীত যৌনতাবিশিষ্ট দুটি বিসদৃশ কেন্দ্রিকা একত্রে অবস্থান নিয়ে অ্যাসকোগোনিয়ামে ডাইক্যারিওটিক দশার সৃষ্টি করে।

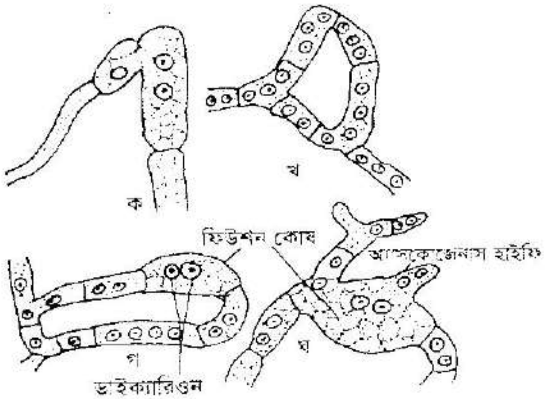

চিত্র ৮.১৫ : Ascomycetes. সোমাটোগ্যামি মাধ্যমে প্লাজমোগ্যামি। ক. *Tuber aestivin*-এ দুটি অঙ্গজ কোষের মধ্যে সংশ্লেষ –*Morchella* sp.-সোমাটোগ্যামি ; খ. অঙ্গজ কোষের মধ্যে সংশ্লেষ ; গ. ডাইক্যারিওনযুক্ত কোষ ; ঘ. মিলনযুক্ত কোষ হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফির উৎপত্তি।

কোনো কোনো প্রজাতিতে কোনো জননকোষাধারেই উৎপন্ন হয় না *(Helvela elastica)*। এখানে দুটি বিপরীতধর্মী মাইসেলিয়ার অঙ্গজ হাইফির মিলন ঘটে। একটির কেন্দ্রিকা অন্যটিতে প্রবেশ করে তাকে হেটারোক্যারিওটিক কোষে পরিণত করে। হেটারোক্যারিওটিক মাইসেলিয়ামের কিছু কিছু কোষ হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফি বিকাশ লাভ করে। *Morchella*-তে সোমাটোগ্যামি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে মাইসেলিয়ামের দুটি অঙ্গজ হাইফি পরস্পর নিকটবর্তী হয় এবং এদের সংযোগস্থলের প্রাচীর গলে গিয়ে কোষদ্বয়ের প্রোটোপ্লাস্ট একীভূত হয়। অতঃপর দুটো কেন্দ্রিকা ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে কোষটিতে ডাইক্যারিওন সৃষ্টি করে ও অন্যগুলো বিলুপ্ত হয়। এ ফিউশন কোষ হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফির বিকাশ ঘটে।

যৌনতা

Ascomycetes ছত্রাককে তাদের মাইসেলিয়ামের যৌন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হোমোথ্যালিক ও হেটারোথ্যালিক ছত্রাক। হোমোথ্যালিক মাইসেলিয়ামকে উভলিঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। এখানে উভলিঙ্গ বলতে স্ব-উর্বরতা বুঝায়। অন্য কথায়, অন্য কারও সহায়তা ব্যতিরেকে একটি মাইসেলিয়া হতে অ্যাসকাস বিকাশ লাভ করতে পারে। আবার হেটারোথ্যালিক মাইসেলিয়ামযুক্ত ছত্রাকগুলো হচ্ছে একলিঙ্গ। জনন দৃষ্টিকোণ হতে এগুলো স্বঅনুর্বর। এক্ষেত্রে সম্পূরকও বিষমলিঙ্গের মাইসেলিয়ামের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ সম্পূরক মাইসেলিয়াকে (+) ও (–) চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করা হয়। হেটারোথ্যালিক প্রজাতিতে যখন দুটি বিপরীতধর্মী মাইসেলিয়ার মিলন ঘটে তখনই শুধু অ্যাসকাস গঠিত হতে পারে। এগুলো উর্বর হলেও পরে নিষেক জড়িত। অন্য কথায়, + পুংধানী স্পার্মাশিয়া—অ্যাসকোগোনিয়ামের মিলন

বাধ্যতামূলক। একেই Blakeselec (১৯০৪) হেটারোথ্যালিজম বলে উল্লেখ করেন। হেটারোথ্যালিজম দুপ্রকার :

১. বাইপোলার হেটারোথ্যালিজম ও

২. টেট্রাপোলার হেটারোথ্যালিজম।

বাইপোলার হেটারোথ্যালিজমের ক্ষেত্রে ডাইক্যারিওকে বংশানুধৃতিক বস্তুর উপস্থিতিকে A+a দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং জাইগোটকে Aa দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কাজেই এ ধরনের ছত্রাকে শুধু বিপরীতধর্মী দুটি মাইসেলিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, টেট্রাপোলার হেটারোথ্যালিজমে ৪ রকমের বিপরীতধর্মী মাইসেলিয়া থাকে। এদের কেন্দ্রিকায় A, a, B, b, জিন থাকে। সেহেতু এদের জাইগোটে Aa ও Bb জিন থাকে।

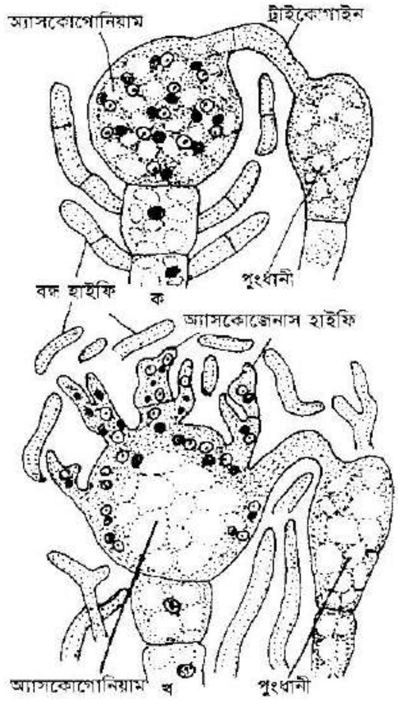

চিত্র ৮.১৬ : Ascomycetes. ক. অ্যাসকোগোনিয়ামে পুংকেন্দ্রিকা প্রবেশের পরবর্তী অবস্থা ; খ. অ্যাসকোগোনিয়ামের পরিধি অঞ্চলে ডাইক্যারিওনের বিন্যাস ও অ্যাসকোজেনাস হাইফি

প্লাজমোগ্যামি পরবর্তী পরিবর্তন

১. **অ্যাসকাসের বিকাশ :** Ascomycetes–এ প্লাজমোগ্যামি পদ্ধতিটি একটি নতুন দশার সূচনা করে। এটিই হচ্ছে বিশেষ ধরনের থলির ন্যায় রেণুস্থলী বা অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণুর বিকাশ পর্যায়। অ্যাসকাসের বিকাশ দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন (ক) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং (খ) পরোক্ষ পদ্ধতি। নিচে এসব পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে।

ক. অ্যাসকাস বিকাশের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

অ্যাসকোমাইসেটিস শ্রেণির নিম্নস্তরের সরল এককোষী ছত্রাকগুলোতে সাধারণত জাইগোট হতে সরাসরি একটিমাত্র অ্যাসকাস গঠিত হয়। কোথাও গ্যামেটগুলোর মিলন ব্যর্থ হলে অপুংজনি প্রক্রিয়ায় অ্যাসকাস গঠিত হয়। জাইগোট কোষটি আকারে বড় হয়ে থলির ন্যায় গোলাকার আকৃতি (*Eremascus*) এবং লম্বাটে আকৃতি গঠন করে (*Dipodascus*)। এটিকেই তরুণ অ্যাসকাস বলে। দ্বি–কেন্দ্রিকাযুক্ত এ স্ফীতাকার ফিউশন কোষটি অ্যাসকাস মাতৃকোষ নামে পরিচিত।

ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকটিও আকারে বড় হয় এবং দু'বার বিভক্ত হয়ে ৮টি অ্যাসকোরেণু তৈরি করে। এখানে প্রথম বিভাজনটি মিওটিক ও দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোটিক হয়ে থাকে। অ্যাসকাসের মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রিকা সামান্য পরিমাণ প্রাণসত্তায় আবরিত হয়ে ৮টি একক কেন্দ্রিকার অপত্য–প্রোটোপ্লাস্ট গঠন করে। অতঃপর এগুলো প্রাচীর নিঃসৃত করে আবৃত হয় ও অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। অ্যাসকাসে এ ধরনের বিভাজনকে মুক্ত বিভাজন বা অবাধ বিভাজনরূপে গণ্য করা হয়। তবে, রেণু উৎপাদনে অ্যাসকাসের সব প্রাণসত্তাই ব্যবহৃত হয় না, বরং কিছুটা প্রাণসত্তা থেকে যায় এবং ধাত্রী প্রাণসত্তারূপে কাজ করে। প্রজাতিভেদে অ্যাসকাসে অ্যাসকোরেণুর সংখ্যায় ভিন্নতা বিদ্যমান। এ ভিন্নতা *Dipodascus*–এ ১–১০০। তবে অ্যাসকাসে প্রধানত ৮টি অ্যাসকোরেণু থাকে। নিম্নশ্রেণির অ্যাসকোমাইসেটিসের অ্যাসকাস বন্ধ্যাকোষের শীষবিহীন। সেহেতু এখানে কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ফলদেহ গঠিত হয় না। অ্যাসকাসগুলো অঙ্গজ মাইসেলিয়ামে সরাসরি এলোমেলো বিন্যাসে উৎপন্ন হয়।

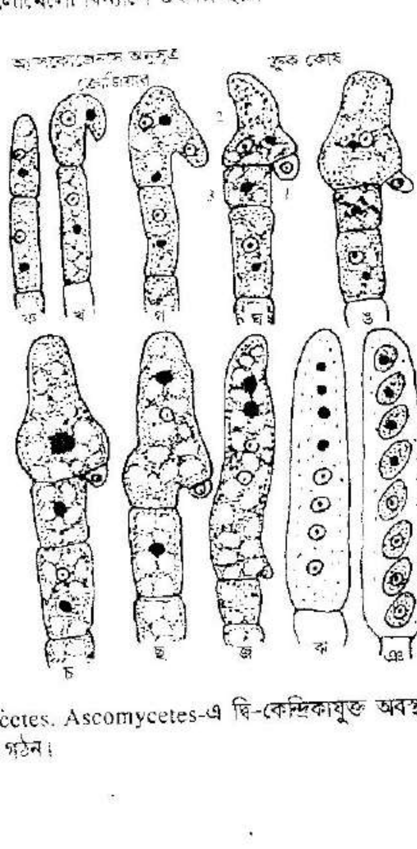

চিত্র ৮.১২ : Ascomycetes. Ascomycetes-এ দ্বি-কেন্দ্রিকাযুক্ত অবস্থা হতে ক্রোজিয়ারের সৃষ্টি ও অ্যাসকাস গঠন।

খ. অ্যাসকাস বিকাশের পরোক্ষ পদ্ধতি

উচ্চশ্রেণির অ্যাসকোমাইসেটিসে অ্যাসকাস গঠন ও অ্যাসকোরেণু উৎপাদন ভিন্ন ধরনের কথা বলে। এখানে পুংধানী হতে পুংকেন্দ্রিকা অ্যাসকোগোনিয়ামে স্থানান্তরিত হলে অ্যাসকোগোনিয়ামের স্ত্রী কেন্দ্রিকার সাথে সজোড় অবস্থায় অবস্থান করে। এ অবস্থাকে ডাইক্যারিওন অবস্থা বলে। এ ডাইক্যারিওনগুলো প্রথমে অ্যাসকোগোনিয়ামের পরিধি অঞ্চলে সজ্জিত হয়।

১. **অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্রের বিকাশ :** বহু সংখ্যক উচ্চশ্রেণির অ্যাসকোমাইসেটিসে অ্যাসকোগোনিয়াম কখনই অ্যাসকাস গঠন করে না ; বরং এখান থেকে প্যাপিলাসদৃশ উপবৃদ্ধি ডাইক্যারিওনের ঠিক বিপরীতে উৎপন্ন হয়। এগুলো এক বা একাধিক শাখাবিহীন বা শাখাবহুল, এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। এদেরকেই অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্র বলে। এ অনুসূত্রের শীর্ষ বা উপশীর্ষ কোষটি হতেই পরবর্তীকালে অ্যাসকাস উৎপন্ন হয়। এ জন্যই এ ধরনের অ্যাসকাস তৈরির পদ্ধতিকে পরোক্ষ পদ্ধতি বলে। প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হবার পর অ্যাসকোগোনিয়ামটি এককোষী বা পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত হয়। পরে এখান থেকে এক বা একাধিক এককোষী বা বহুকোষী অশাখ বা সশাখ উপবৃদ্ধিরূপে অ্যাসকোজেনাস হাইফি উৎপন্ন হয়। ইত্যবসরে ডাইক্যারিওন কেন্দ্রিকা বা কেন্দ্রিকাগুলো বহুবার বিভক্ত হয়ে বহু সংখ্যক কেন্দ্রিকা গঠন করে। অতঃপর ডাইক্যারিওনগুলো অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্রে প্রবেশ করে। প্রথমে অ্যাসকোজেনাস হাইফি প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হলেও পরবর্তীকালে প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হয় এবং প্রতিটি কোষে একটি করে ডাইক্যারিওন কেন্দ্রিকা থাকে। শীর্ষভাগের দ্বি কেন্দ্রিকাযুক্ত কোষটি (Wilson, ১৯৫২) অ্যাসকাস গঠনে অংশ নেয়। এ কেন্দ্রিকাদ্বয় কিন্তু বিপরীত যৌন বৈশিষ্ট সম্পন্ন।

২. **অ্যাসকাসের বিকাশ :** অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্রের শীর্ষকোষটি দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত এবং অ্যাসকাস গঠনে অংশ নেয়। এ সময় কোষটি বাঁকা হয়ে ক্রুক কোষ (Crook cell) নামক একটি ক্রোজিয়ার বা হুকের ন্যায় গঠন তৈরি করে এবং কেন্দ্রিকাযুগল বিভক্ত হয়ে ৪টি কেন্দ্রিকা গঠন করে। এদের বিপরীত যৌনের দুটি কেন্দ্রিকা খিলানের মতো বাঁকা ক্রোজিয়ারের মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট কেন্দ্রিকা দুটি বাঁকের দুপ্রান্তে চলে যায়। অতঃপর দুটি কোষপ্রাচীর গঠিত হয়ে ৩টি কোষের সৃষ্টি করে। মধ্যস্থলের দ্বি–কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট কোষটি ক্রমে অ্যাসকাস গঠন করে ; অগ্রভাগের কোষটিতে ও ভিত্তিকোষে ১টি করে কেন্দ্রিকা থাকে। এ কোষত্রয়ের সমষ্টিকে ক্রোজিয়ার বলে। অনেকক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাৎভাগের কোষদ্বয় মিলিত হয়ে পুনরায় একটি অ্যাসকাস গঠন করে থাকে।

মধ্যস্থলের কোষটি বিপরীতধর্মী দ্বি–কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট। অন্যকথায়, এ কোষটিতে ১টি (+) ও অন্য (–) ধর্মী কেন্দ্রিকা থাকে। এ কোষটিই আকারে বড় ও লম্বা হয়ে অ্যাসকাস গঠন করে। কোষটিকে তাই অ্যাসকাস মাতৃকোষও বলা যেতে পারে। এ কোষটি আকারে বড় হবার সাথে সাথে ক্যারিওগ্যামি সংঘটিত হয় ও ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। এটি নিষেকের সমপর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। জীবনচক্রে এটিই ডিপ্লোফেজ নামে পরিচিত।

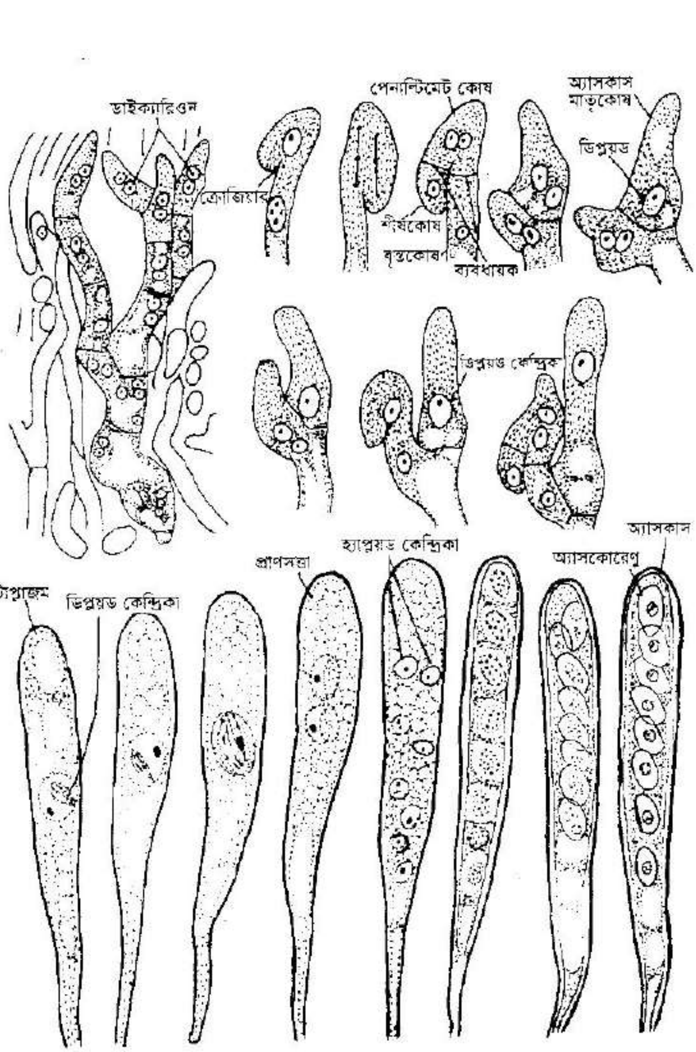

চিত্র ৮.১৮ : *Pyronema confluens*–এ অ্যাসকোজেনাস হাইফি হতে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু বিকাশ

৩. **অ্যাসকোরেণু উৎপত্তি :** অ্যাসকাসটি আরও বড় হলে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি তিন বার বা তারও অধিক বার বিভক্ত হয়ে ৮, ১৬, ৩২, ১২৮ বা আরও বেশি সংখ্যক হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা দেয়। প্রথম দুটি বিভাজন মিওসিস জড়িত ও পরবর্তীগুলো মাইটোটিক জড়িত। সেহেতু উৎপন্ন কেন্দ্রিকাগুলো হ্যাপ্লয়ড। কিছু পরিমাণ প্রাণসত্তা এসব কেন্দ্রিকাকে ঘিরে থাকে। প্রতিটি একক কেন্দ্রিকাযুক্ত অপত্য–প্রোটোপ্লাস্ট তাদের চারদিকে কোষপ্রাচীর

নিঃসৃত করে মিওরেণু গঠন করে। এটিই অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকে অ্যাসকোরেণু নামে পরিচিত। অবশিষ্ট প্রাণসত্তা রেণু গঠনে ব্যবহৃত হয় না। এ প্রাণসত্তাকে এপিপ্লাজম (epiplasm) বলে। এতে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোজেন থাকে ; অন্যান্য খাদ্যবস্তুও থাকে। এগুলো বিকাশমান অ্যাসকোরেণুকে খাদ্যের যোগান দেয়। অ্যাসকাসগুলো পরস্পর পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে হাইমেনিয়াম নামক একটি স্তর গঠন করে। এদের সাথে বহু সংখ্যক বন্ধ্যা হ্যাপ্লয়ড প্যারাফাইসিসও থাকে। এগুলো প্রধানত দুটি অ্যাসকাসের মধ্যবর্তী স্থানে বিকাশলাভ করে।

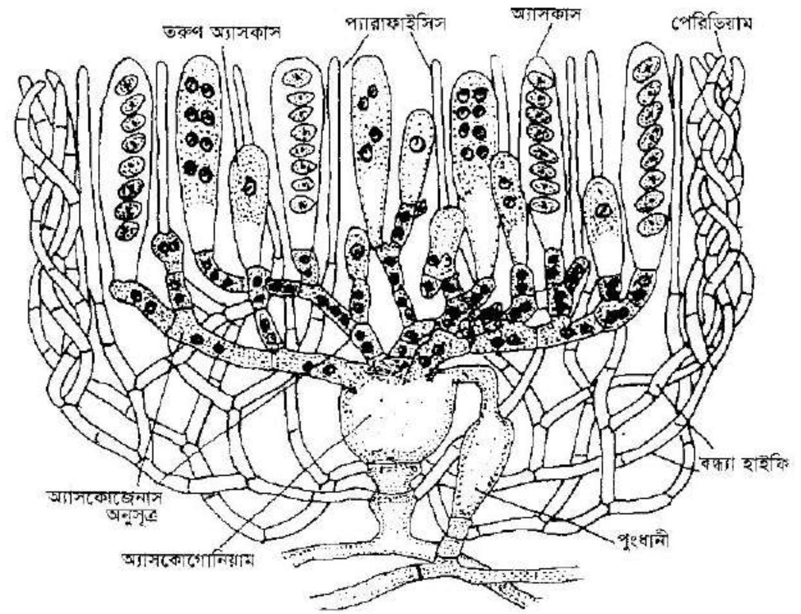

চিত্র ৮.১৯ : Ascomycetes অ্যাসকোকার্পের গঠনে জননাঙ্গ বন্ধ্যা হাইফি ও অ্যাসকোজেনাস হাইফি দেখানো হয়েছে।

অ্যাসকোকার্পের উৎপত্তি ও গঠন

কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণির অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাক ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকগুলো অ্যাসকাস, অনুর্বর প্যারাফাইসিস একটি সাধারণ সিউডোপ্যারেনকাইমীয় অনুসূত্রের আবরণ দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়। একে পেরিডিয়াম বলে। পেরিডিয়াম যখন কোনো নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে তখন তাকে অ্যাসকোকার্প বা ফলদেহ বলে। কাজেই এটি অ্যাসকোগোনিয়াম ও ডাইক্যারিওন, অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্র, অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু এবং পরিবেষ্টনকারী আবরণী নিয়ে গঠিত। এ ধরনের ফলদেহ শুধু উন্নত ধরনের Ascomycetes-এ দেখা যায়। একটি কিয়দংশ মনোক্যারিওটিক ও কিয়দংশ ডাইক্যারিওটিক অনুসূত্র বিজড়িত। পরিবেষ্টনকারী শিথ বা পেরিডিয়াম হ্যাপ্লয়ড প্রকৃতির। পেরিডিয়ামসহ জননাঙ্গের মাতৃ অনুসূত্র হ্যাপ্লোফেজ বা

গ্যামেটোফাইট তৈরি করে। পক্ষান্তরে ডাইক্যারিওন অ্যাসকোগোনিয়াম, অ্যাসকোজেনাস অনুসূত্র ও রেণু তৈরির পূর্বে অ্যাসকাস ডিপ্লয়ড প্রকৃতির। এগুলো একত্রে ডাইক্যারিওটিক দশা গঠন করে।

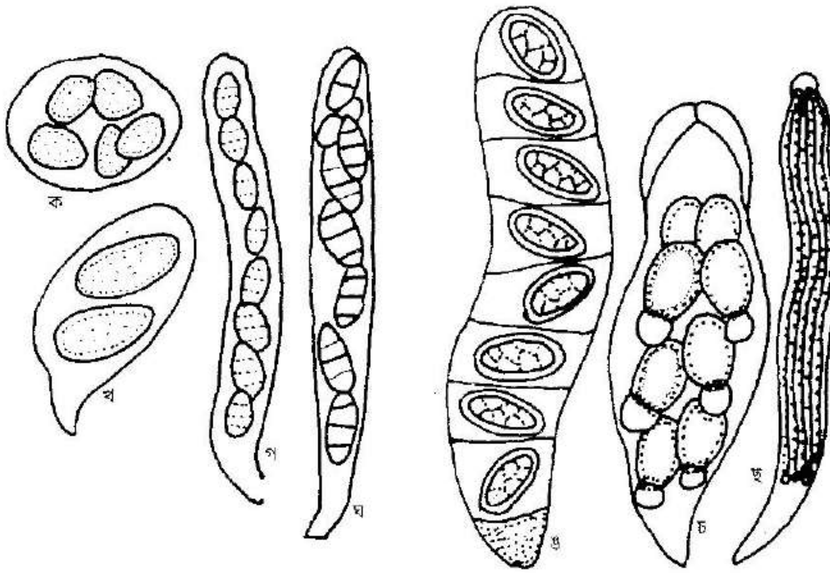

চিত্র ৮.২০ক : অ্যাসকোমাইসেটিস বিভিন্ন ধরনের অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু

অ্যাসকাসের আকার-প্রকার

Ascomycetes–এর অ্যাসকাস বিভিন্ন আকার-প্রকারের হয়ে থাকে। এগুলো আকারে গোলাকার, ডিম্বাকার, ক্লাব–আকৃতি ও লম্বাটে ধরনের হতে পারে। অ্যাসকাসের মধ্যে অ্যাসকোরেণুগুলো এক সারিতে, দু'সারিতে, গুচ্ছাকারে বা সজ্ঞাহীন (inordinate) রীতিতে সাজানো থাকতে পারে। লম্বাটে অ্যাসকাসে সূত্রাকৃতি অ্যাসকোরেণুগুলো (Claviceps) পরস্পর সমান্তরালভাবে একটি গুচ্ছে সজ্জিত থাকে। অ্যাসকাস এককোষস্তরীয় হলে তাকে ইউনিটিউনিকেট (eunitunicate) এবং দ্বি–কোষস্তরীয় হলে তাকে বাইটিউনিকেট (bitunicate) বলে।

অ্যাসকাস গঠনের প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ হতে পারে। অ্যাসকাসটি অগ্র ও বৃন্ত কোষের মিলনের ফলে উদ্ভূত হয়, তবে তাকে corvascous টাইপ বলে। উদাহরণ *Pyronema confluens*। আবার লুপ কোষটি লম্বাটে হয়ে ক্রোজিয়ার সৃষ্টি করে। এ নিয়মটি বহুবার আবর্তিত হলেও শুধু শেষবারের প্রান্তীয় লুপ কোষটি অ্যাসকাসে পরিবর্তিত হয়। উপরে বর্ণিত অ্যাসক্যাস গঠন পদ্ধতিটি হলো : হুকটাইপ বা পাইরোনেমা টাইপ। লুপ কোষ ছাড়াও অন্য পদ্ধতিতে অ্যাসকোজেনাস হাইফি বা অন্য কোনোরকম গঠন হতে অ্যাসক্যাস গঠনের তথ্য পাওয়া গেছে :

১. Geopyxis type : এক্ষেত্রে হুক গঠিত হয় না। এখানে শীর্ষ কোষটি এককেন্দ্রিকাযুক্ত হলে উপশীর্ষ কোষটি কিন্তু দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। এ দ্বিকেন্দ্রিকা কোষটি পাশের দিকে বর্ধিত হয়ে অ্যাসকাস মাতৃকোষ গঠন করে সরাসরি অ্যাসকাসে পরিণত হয়। একেই Geopyxis type ধরনের বিকাশ বলে।

২. Plicaria type : এখানে অ্যাসকোজেনাস হাইফির অগ্রবর্তী কোষটি দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত এবং অ্যাসকাস বিকাশে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ; যেমনটি Plicaria *suceosa*-তে দেখা যায়।

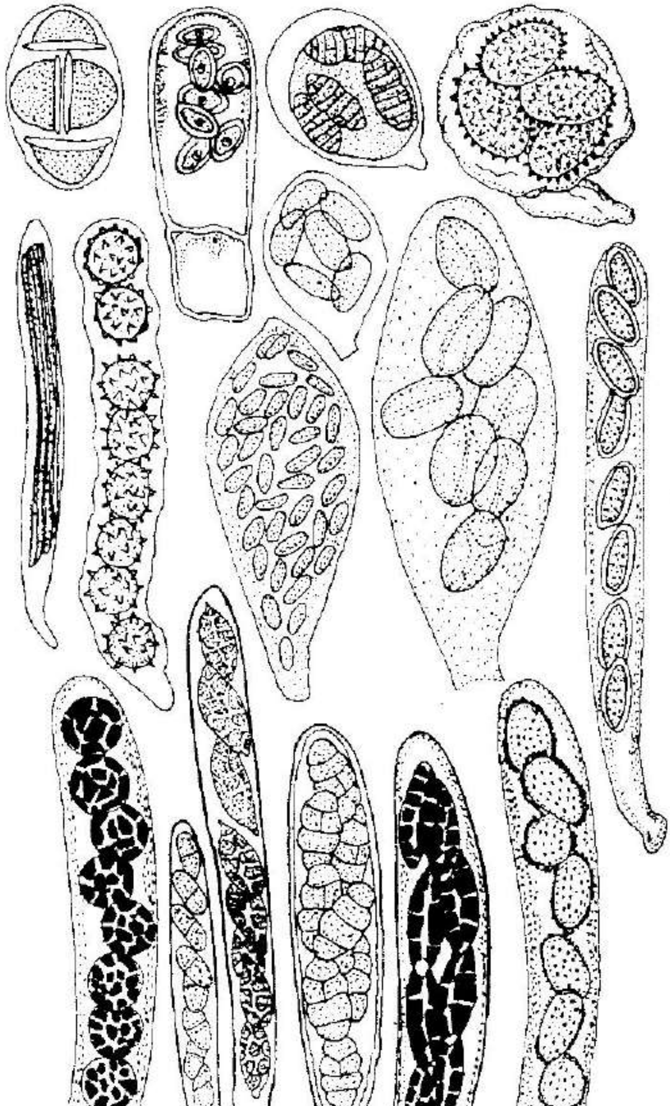

চিত্র ৮.২০খ : বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাই

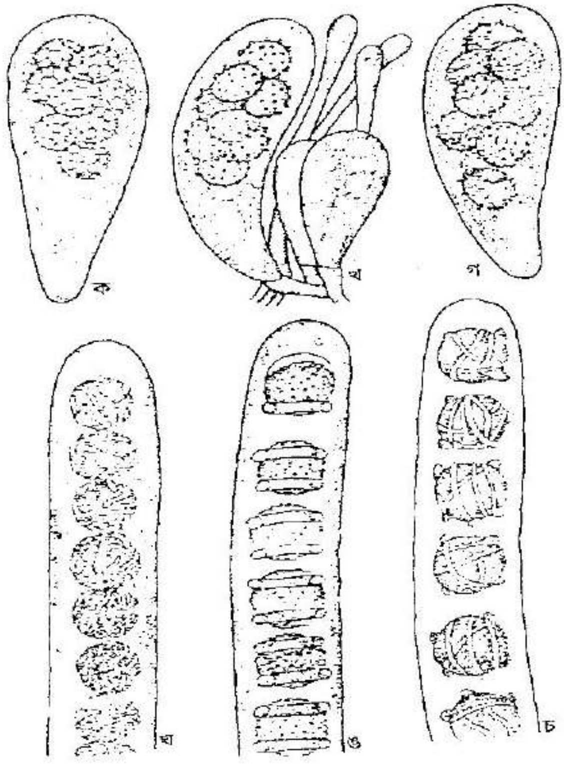

চিত্র ৮.২১ : *Lamprospora*–এর বিভিন্ন প্রজাতির অ্যাসকোরেণুসহ অ্যাসকাস

৩. *Pyronema* ও *Plicaria*–এর মধ্যবর্তী ধরনের অ্যাসকাসের বিকাশধারা *Pustularia vesiculosa*-তে দেখা যায়। এখানে ক্রোজিয়ার গঠিত হয় ; কিন্তু ক্রোজিয়ারের লুপ কোষটি অ্যাসকাস গঠনের পরিবর্তে হাইফা তৈরি করে এবং এ হাইফার শীর্ষকোষটি হতে অ্যাসকাস তৈরি হয়।

৪. Rectascous type : এক্ষেত্রে, অনেক অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকের অ্যাসকোগোনীয় হাইফির দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত কোষগুলো অ্যাসকাসে পরিণত হয়ে অ্যাসাই শিকল সৃষ্টি করে থাকে।

৫. Laboulbenia type : স্পার্মাটাইজেশন পদ্ধতিতে Loboulbenia বর্গভুক্ত ছত্রাকগুলো দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত অবস্থায় উন্নীত হয়। এখানে স্ত্রী জননাঙ্গটি অ্যাসকোজেনাস কোষে পরিণত হয়। এখানে কোনো অ্যাসকোজেনাস অনুসূত্র থাকে না। অ্যাসকোজেনাস কোষটি সরাসরি অ্যাসকাস তৈরি করে।

অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণুর প্রকৃতি

অ্যাসকোমাইসেটিস শ্রেণির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু উৎপাদন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যাসকাসগুলো অ্যাসকোকার্পের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সাধারণত অ্যাসাই ও প্যারাফাইসিসের একটি সুনির্দিষ্ট সজ্জারীতি থাকে বলে হাইমেনিয়ামও তৈরি হয়। তবে সবক্ষেত্রেই তা হয় না। কোথাও কোথাও অ্যাসকাসগুলো অনাবৃত, কোথাও অ্যাসকোকার্পমুক্ত, কোথাও অ্যাসকোকার্পের মধ্যে এলোমেলোভাবে ছড়ানো বা আলগাভাবে গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। আকার-আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে অ্যাসকাসগুলো বিভিন্ন রকমের। এগুলো লম্বাটে বা গদাকার, বর্গাকার, গোলাকার বা ডিম্বাকার হতে পারে (চিত্র ৮.২০)। অ্যাসকাসগুলো সবৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে। সাধারণত অ্যাসকাসগুলো এক-কক্ষযুক্ত হয় ; তবে ব্যতিক্রমীভাবে প্রস্থপ্রাচীর গঠন করে একাধিক কক্ষবিশিষ্টও হয়ে থাকে। অ্যাসকাস প্রাচীরের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে পরিণত অ্যাসকাসগুলো মাতৃঅক্ষে স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির হয়। যেসব পরিণত অ্যাসকাসের স্থায়ী প্রাচীর থাকে সেগুলোকে স্থায়ী অ্যাসকাস বলে। আর যেসব অ্যাসকাসের প্রাচীর অ্যাসকোরেণুর গঠনের পরপরই তাদেরকে মিউসিলজে অবস্থায় অ্যাসকোকার্পে মুক্ত করে দেয়, সেগুলোকে ক্ষণস্থায়ী অ্যাসকাসরূপে চিহ্নিত করা হয়।

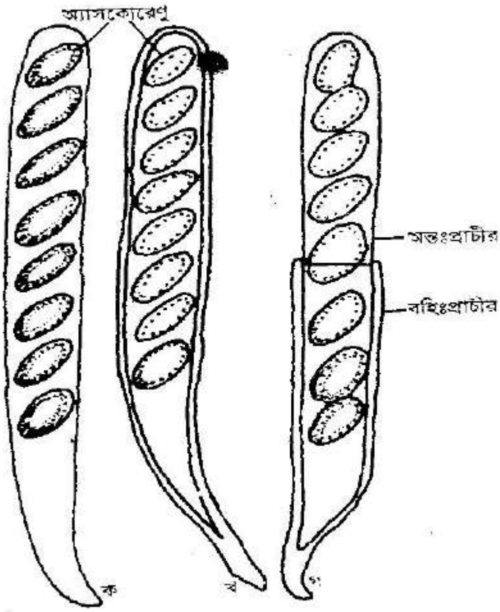

চিত্র ৮.২২ : বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাই। ক. ইউনিটিউনিকেট অ্যাসাই ; খ. বাইটিউনিকেট অ্যাসাই; গ. স্থূল বহিঃপ্রাচীরযুক্ত বাইটিউনিকেট অ্যাসাই

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Nannfeldt (১৯৩২) উল্লেখ করেন যে, অ্যাসকাসগুলো এক বা দু'স্তর কোষপ্রাচীরযুক্ত হয়। কিন্তু Chadefaud (১৯৪২) মনে করেন যে, অ্যাসকাসগুলো সব

RAMSDOO

দ্বিপ্রাচীরযুক্ত হয় ; একটি স্থূল প্রাচীর ও অন্যটি পাতলা প্রাচীর। কিন্তু এ প্রাচীরদ্বয় বুনটে খুবই ভিন্নধর্মী। যেসব অ্যাসকাসের অন্তঃও বহিঃ প্রাচীর দুটি মোটামুটি শক্ত ও নির্গমনকালে আলাদা হয়ে যায় না, সেগুলোকে ইউনিটিউনিকেট অ্যাসকাস বলে। পক্ষান্তরে বাইটিউনিকেট অ্যাসকাসের অন্তঃপ্রাচীরটি স্থিতিস্থাপক এবং নির্গমনকালে স্থূল বহিঃপ্রাচীরকেও ছাড়িয়ে বর্ধিত হতে পারে।

ইউনিটিউনিকেট অ্যাসকাস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে অ্যাসকোমাইসেটিসের অধিকাংশ সদস্যই শীর্ষাগ্রে ঢাকনা বহন করে এবং রেণুমুক্তিকালে ঢাকনাটি খুলে যায়। আবার কোনো ক্ষেত্রে ঢাকনা থাকে না, বরং শীর্ষরন্ধ্রপথে মুক্তি ঘটে কিংবা মোটেই মুক্ত হয় না। হাইমেনিয়াম পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হলে সরল শীর্ষরন্ধ্রের সৃষ্টি হয় এবং এ পথেই অ্যাসকাসের মুক্তি ঘটে। অ্যাসকাসের শীর্ষভাগে বলয়াকৃতি পুরুত্ব থাকে বলে অ্যাসকাস মুক্তির সময় তা ফেটে বা ছিঁড়ে যায় না। বাইটিউনিকেট অ্যাসকাসগুলো সাধারণত অনুপ্রস্থীয় ফাটল মাধ্যমে উন্মুক্ত হয় (sphaerotheca)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকনাও থাকে।

অ্যাসকাসকে ঢাকনাযুক্ত, ঢাকনাবিহীন (যদি ফাটল মাধ্যমে রেণুমুক্তি ঘটে) ও উপ-ঢাকনাযুক্ত (যদি শীর্ষরন্ধ্র থাকে) নামে অভিহিত করা যায়।

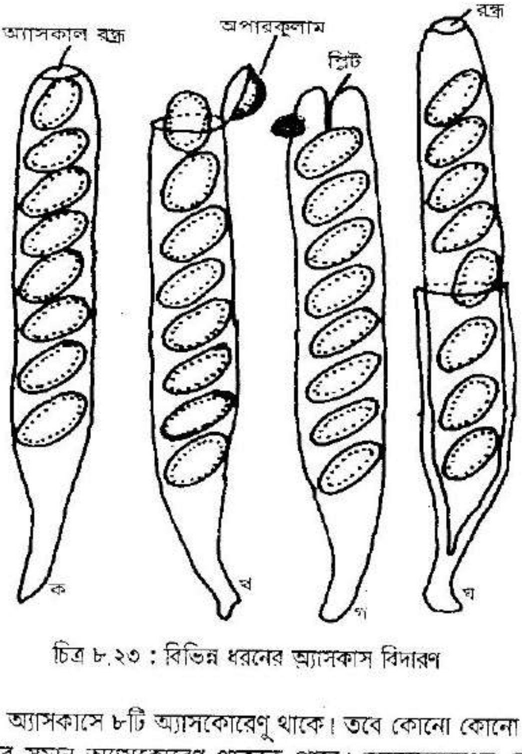

চিত্র ৮.২৩ : বিভিন্ন ধরনের অ্যাসকাস বিদারণ

সাধারণত একটি অ্যাসকাসে ৮টি অ্যাসকোরেণু থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮টির কম বা ৮ এর গুণিতকের সমান অ্যাসকোরেণু থাকতে পারে। অ্যাসকোরেণুর রেণুগুলো আকার, আয়তন, বর্ণ, প্রাচীরপৃষ্ঠের প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে এগুলো গোলাকার বা সূত্রাকার, স্বচ্ছ ও বর্ণহীন বা কালো বর্ণযুক্ত ও অতি ক্ষুদ্র প্রায় ১০০ সিমি. দৈর্ঘ্যযুক্ত। এগুলো এককোষী, এককেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। তবে এককোষী ও দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত অ্যাসকোরেণুও পাওয়া

যায়। অ্যাসকোরেণুতে ঘন দানাদার প্রাণসত্তা ও তেলবিন্দু থাকে। রেণুপ্রাচীর মূলত পাতলা ও মসৃণ হয়। তবে স্থূল ও কারুকার্যময় রেণুপ্রাচীরও পাওয়া যায়।

অ্যাসকোরেণুর অঙ্কুরণ

অধিকাংশ প্রজাতির অ্যাসকোরেণু অনুকূল পরিবেশে (আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা প্রায় ২০°সে.) অঙ্কুরিত হয়। অবশ্য কিছু কিছু প্রজাতির অ্যাসকোরেণুর অঙ্কুরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয় ; যেমন ফ্রিজিং, হিটিং বা অ্যাসিডে ডুবানো। মল্ট নির্যাসে ৪ ঘণ্টা রাখলে অ্যাসকোরেণুগুলো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যায়। রেণু-দ্রব্যগুলো বুদবুদের ন্যায় ফুলে ওঠে। এ বুদবুদ হতে এক বা একাধিক অঙ্কুরনল বের হয় (গ)। অতঃপর পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত মাইসেলিয়াম গঠিত হয়। সাধারণত অ্যাসকোরেণুগুলো সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুরনল দেয়। বহুকোষী অ্যাসকোরেণুগুলোর প্রতিটি কোষ হতে অঙ্কুরনল বের হয়।

চিত্র ৮.২৪ : Ascomycetes অ্যাসকোরেণুর অঙ্কুরণ

অ্যাসকাস বিকাশের কোষতত্ত্ব

অ্যাসকাস বিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা, মতামত ও পর্যালোচনার মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। অ্যাসকাস বিকাশের কোষতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া খুবই কঠিন। তবু বিভিন্ন গবেষকের ধ্যান-ধারণা ও পর্যবেক্ষণ হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অ্যাসকাসের বিকাশ সম্পর্কীয় কোষতত্ত্ব সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা এখানে করা হলো।

Dangard (১৮৯৪) সর্বপ্রথম অ্যাসকোমাইসেটিসে কেন্দ্রিকার মিলন লক্ষ্য করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, *Peziza vesiculosa* প্রজাতির অ্যাসকোজেনাস হাইফির শীর্ষাঞ্চলে ক্রোজিয়ার গঠিত হয়। এ ক্রোজিয়ারের লুপকোষের কেন্দ্রিকা দুটি মিলিত হয় এবং উপশীর্ষ কোষটি লম্বা হয়ে অ্যাসকাস গঠন করে।

Dangard-এর এ তথ্য বহু গবেষকের স্বীকৃতি লাভ করেছে। Herper (১৮৯৫) *Sphaerotheca humuli*-তে জননকোষাধারের সংস্পর্শ মাধ্যমে যৌন জননের সূচনা লক্ষ্য

করেন। এখানে জননকোষাধারের সংযোগবিন্দুর উভয় প্রাচীর গলে গিয়ে নালিপথের উদ্ভব হয় এবং এ পথেই পুংকেন্দ্রিকাটি অ্যাসকোগোনিয়ামে নীত হয়ে স্ত্রীকেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়। এ মিলনের সাথে পার্শ্বপ্রাচীর উদ্ভূত হয়। ফলে কয়েক সারি কোষেরও বিকাশ ঘটে। দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত পেনালটিমেট কোষটি অ্যাসকাসে পরিণত হয়। Harper উল্লেখ করেন যে, দু'বার কেন্দ্রিকার মিলন ঘটে (ক) অ্যাসকোগোনিয়ামে পুং ও স্ত্রীকেন্দ্রিকার মধ্যে প্রথমবার এবং (খ) অ্যাসকাসের মধ্যে আরেকবার। সেহেতু, অ্যাসকাস কেন্দ্রিকাটি টেট্রাপ্লয়েড। অ্যাসকোরেণু যেহেতু সবসময়ই হ্যাপ্লয়ড, সেহেতু অ্যাসকাসে রেণু গঠনকালে দু'বার কেন্দ্রিকার বিয়োজন বিভাজন হয়ে থাকে।

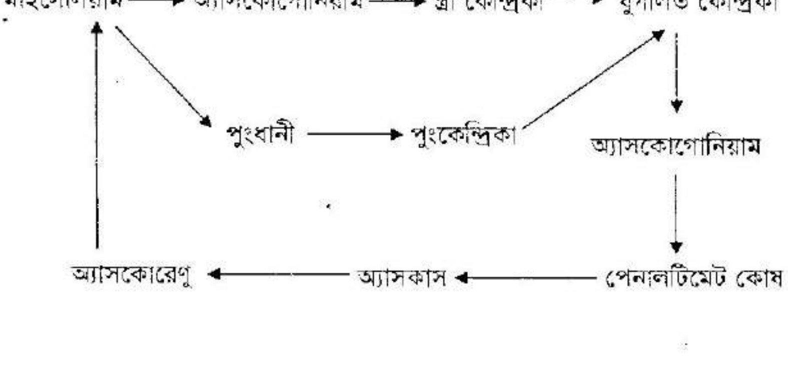

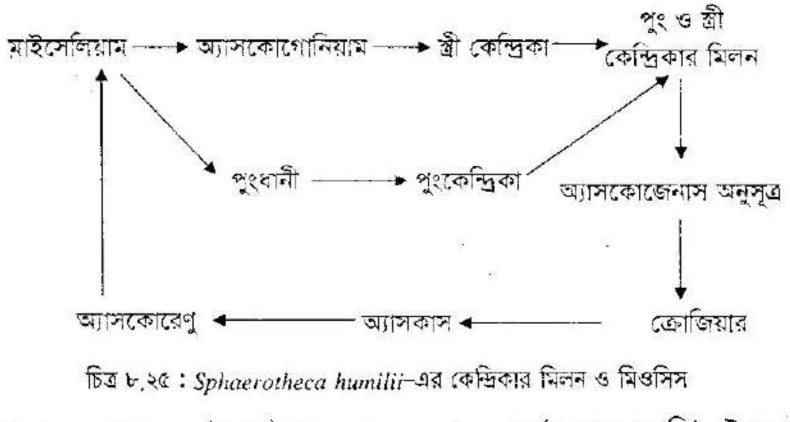

চিত্র ৮.২৫ : *Sphaerotheca humilii*–এর কেন্দ্রিকার মিলন ও মিওসিস

Blackman ও Fraser (১৯০৬) *Humaria granulata*–তে (স্ব-বন্ধ্যা প্রজাতি) যৌন জননে বিয়োজন বিভাজন লক্ষ্য করেন। এখানে পুংধানীর বিকাশ হয় না। একটি বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত অ্যাসকোগোনিয়াম কোনো ট্রাইগাইন উপাঙ্গ বা উপবৃদ্ধি ছাড়াই স্ত্রীকেন্দ্রিকাগুলো যুগলিত হয়ে ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকা তৈরি করে। পক্ষান্তরে অ্যাসকাসে আরেকটি মিওটিক বিভাজন দেখানো হয়।

Dangard ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ লক্ষ্য করেন যে, *Pyronema confluens*-এ পুংধানী ও ট্রাইকোগাইনসহ অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপন্ন হয়। কিন্তু পুংকেন্দ্রিকা ও ট্রাইকোগাইনের মধ্যে মিলন হয় না এবং ট্রাইকোগাইনের বেস-এর ব্যবধায়ক অক্ষুন্ন থাকার কারণে পুং কেন্দ্রিকা অ্যাসকোগোনিয়াম-কেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হতে পারে না। ফলে ট্রাইকোগাইন ও পুংধানী বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর অ্যাসকোগোনিয়াম-কেন্দ্রিকা অ্যাসকোগোনিয়ামে জোড় বাঁধার ব্যবস্থা নেয়। সজোড় কেন্দ্রিকাদ্বয় অ্যাসকোগোনিয়াল অনুসূত্রে প্রবেশ করে এবং ক্রোজিয়ার গঠন করে অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু তৈরি করে। Dangard অ্যাসকোগোনিয়ামে কেন্দ্রিকার মিলনকেও অস্বীকার করেন ; কিন্তু অ্যাসকাসে একবার কেন্দ্রিকার মিলন ও একবার বিয়োজন বিভাজনকে স্বীকার করেন।

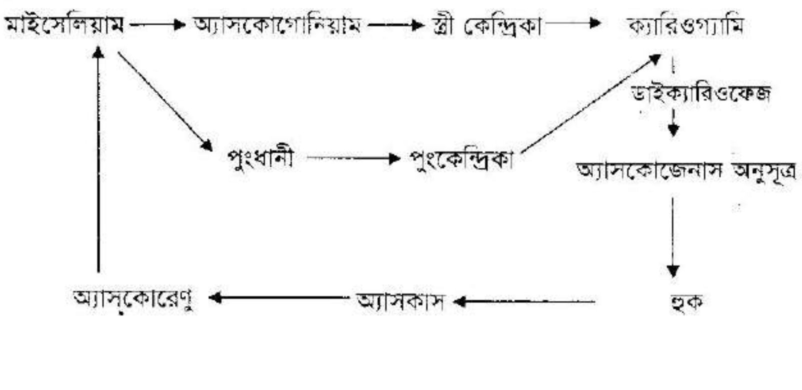

চিত্র ৮.২৬ : *Pyronema confuluens*-এ অ্যাসকাস বিকাশে Dangard-এর পর্যবেক্ষণ।

Gwynne-Vayghan (১৯০৮) উল্লেখ করেন যে, *Hymaria rutilans* ছত্রাকের অ্যাসকাসে দুবার কেন্দ্রিকার মিলন ও দুবার বিয়োজন বিভাজন ঘটে। অ্যাসকাসে এ ধরনের দুবার বিয়োজন উপস্থিতিকে ব্রাকিওমিওসিস (brachacomeiosis) বলে। Gwynne-Vaughan Williamson (১৯৩১) ও Foster (১৯৪১) *Pyronema confluens*–অনুশীলন করে উল্লেখ করেন যে, যৌন জননের ক্ষেত্রে অ্যাসকোগোনিয়ামের ট্রাইকোগাইন ও পুংধানীর মধ্যে সংস্পর্শ স্থাপিত হলে ট্রাইকোগাইনের কেন্দ্রিকা বিলুপ্ত হয় এবং নিচের ব্যবধায়ক গলে যায়। ফলে পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়ামের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার ফলে পুংধানীর কেন্দ্রিকা ট্রাইকোগাইনের ভিতর দিয়ে অ্যাসকোগোনিয়ামে নীত হয় ও স্ত্রীকেন্দ্রিকার সাথে মিলিত হয়। এভাবে অ্যাসকোগোনিয়ামে পুং ও স্ত্রীকেন্দ্রিকার মিলনে ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকার উদ্ভব হয়। অতঃপর ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি অ্যাসকোজেনাস হাইফিতে প্রবেশ করে। ক্রোজিয়ার গঠনের মাধ্যমে অ্যাসকাস তৈরি হয় এবং দ্বিতীয়বার কেন্দ্রিকার মিলন ঘটে। ফলে অ্যাসকাসে টেট্রাপ্লয়েড কেন্দ্রিকা থাকে। এখন অ্যাসকোরেণু উৎপন্নকালে টেট্রাপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি পরপর তিনবার বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন করে। এ তিনটি বিভাজনের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় বিভাজনদ্বয় মিওটিক ধরনের ও দ্বিতীয়টি মাইটোটিক ধরনের। দ্বিতীয় বিয়োজন বিভাজনটি অ্যাসকাসে হয় বলে একে ব্রাকিওমিওসিস বলে। তাঁদের এ মতামতের সত্যতা কেন্দ্রিকা বিভাজনের প্রতিটি দশায় ক্রোমোজম সংখ্যা গণনার মধ্য দিয়ে *Ascobolus magnificus*–এ এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। Gwynne-Vaughan (১৯৩৭) *Patella (Lachnea) melaloma*-তে দু'বার কেন্দ্রিকার মিলন ও দু'বার বিয়োজন বিভাজন হয়ে থাকে বলে উল্লেখ করেন।

অন্য এক শ্রেণির গবেষক ও ছত্রাকবিদ ব্র্যাকিওমিওসিস ধ্যান–ধারণার ঘোর বিরোধিতা করেন। Olive (১৯৪৯–৫০) *Patella melaloma*–তে Propino-Carmine–রঙ ব্যবহার করে ব্রাকিওমিওসিসের কোনো নজির খুঁজে পান নি। তিনি উল্লেখ করেন যে, এখানে একবার কেন্দ্রিকার মিলনে তরুণ অ্যাসকাস গঠিত হয় এবং একে অনুসরণ করে আরেকবার মিওটিক বিভাজন হয়।

Hirch (১৯৫০) *Pyronema confluenyns*–এ বিশেষ ধরনের রঙ–পদ্ধতি ব্যবহার করেও ব্রাকিওমিওসিসের প্রমাণ খুঁজে পাননি। তিনি উল্লেখ করেন যে, তরুণ অ্যাসকাস কেন্দ্রিকাটি ডিপ্লয়েড (টেট্রাপ্লয়েড নয়)। এখানে তরুণ অ্যাসকাসে একবার মাত্র বিয়োজন বিভাজনের ফলে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যামানের অ্যাসকোরেণুর উৎপত্তি হয়।

Wood (১৯৫৩) *Ascobolus magnificus*-এর অ্যাসকাস বিকাশের কোষতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ক্রোজিয়ামের দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত পেনালটিমেট কোষ হতে অ্যাসকাসের উদ্ভব হয়। অ্যাসকোজেনাস হাইফিতে সংশ্লেষ বিভাজন বিদ্যমান। এখানে ব্রাকিওমিওসিসের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

Claussen (১৯১২) *Pyronema confluens*-এর গবেষণা করে একটি মতবাদ রচনা করেন। একেই Claussen's Theory বলে। মতবাদে উল্লেখ করা হয় যে, অ্যাসকোগোনিয়ামে কোনো কেন্দ্রিকার মিলন ঘটে না, বরং পুং ও স্ত্রীকেন্দ্রিকাদ্বয় পাশাপাশি অবস্থান করে ডাইক্যারিওন গঠন করে। কেন্দ্রিকাদ্বয়ে মিলন মূলত অ্যাসকাস মাতৃকোষে হয়ে থাকে। কাজেই, অ্যাসকোমাইসেটিসের জীবনচক্রের তরুণ অ্যাসকাসে সিনক্যারিওনের ফলে ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকার উৎপত্তি ঘটে। ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকার প্রথম দুটি বিভাজন মিলে মিওটিক বিভাজন এবং তৃতীয় মাইটোটিক। এজন্যই অ্যাসকাসে ৮ হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকার রেণু পাওয়া যায়।

Dodge, Bagechee, Schiueizer, প্রমুখ ছত্রাকবিদের মতে ব্রাকিওমিওসিস বিভাজন কোনো ছত্রাকে আদৌ দেখা যায় না ; পরবর্তী অবস্থাগুলো এরই রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র। অনেকেই Claussen's Theory কে সমর্থন করেন। কেননা, কোনো অ্যাসকাসেই ৮ রকমের (ম্যাটিং টাইপ) অ্যাসকোরেণু পাওয়া যায় না, বরং ৪ রকমের অ্যাসকোরেণু পাওয়া যায়। এ রেণুগুলো বংশানুধৃতিকভাবে বিপরীতধর্মী।

অ্যাসকাসের জাতিজনি

থলিসদৃশ, যৌনজনন একক জড়িত অঙ্গকে অ্যাসকাস বলে। এতে প্রধানত ৮টি অ্যাসকোরেণু থাকে। একে অনেক ছত্রাকবিদ বিশেষ ধরনের রেণুস্থলী বলে মনে করেন। কেননা ক্যারিওগ্যামির ফলে এদের উদ্ভব। কাজেই, সিনক্যারিওন কেন্দ্রিকা ডিপ্লয়ড হবার অব্যবহিত পরেই মিওটিক নিয়মে বিভাজিত হয় এবং মুক্ত কোষ গঠন মাধ্যমে ৮টি অ্যাসকোরেণু অ্যাসকাসে সজ্জিত থাকে। জাতিজনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে ফাইকোমাইসেটিসের জার্ম-রেণুস্থলীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেননা, এখানে নিম্নরূপ পরিবর্তন দেখা যায় :

১. মিওরেণুর সংখ্যামান হ্রাস পেয়ে ৮টিতে উপনীত হয়।

২. রেণু গঠনের ক্লিভেজ পদ্ধতিটি অবাধ-কোষগঠন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

এ ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ফাইকোমাইসেটিসের জার্ম-রেণুস্থলীর রেণু অ্যাসকোরেণুর সাথে তুলনীয়।

অ্যাসকোকার্পের বিকাশ ও পরিসর

অ্যাসকোমাইসেটিসের উন্নত ছত্রাকগুলোতে বহু সংখ্যক অ্যাসাই, প্যারাফাইসিস নামক বন্ধ্যা অনুসূত্র ও রক্ষাকারী আবরণী অনুসূত্রের সমন্বয়ে অ্যাসকোকার্প নামক ফলদেহ তৈরি হয়। এদের সাধারণ গঠন, বিকাশ-পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং আকার খুবই ভিন্ন। এদের হাইমেনিয়ামের উৎপত্তি ও বিস্তার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা বিদ্যমান। হাইমেনিয়ামে শুধু অ্যাসাই থাকতে পারে, কিংবা অ্যাসকাসের মাঝে বন্ধ্যা অনুসূত্রের প্যারাফাইসিস থাকতে পারে। ফলদেহগুলো চ্যাপ্টা, গোলাকার, পেয়ালাকৃতি ফ্লাস্কের মতো জালিকাবৎ, খাড়া ক্লাবসদৃশ প্রভৃতি আকারের হতে পারে। এ গঠন বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে অ্যাসকোকার্পকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে :

১. **ক্লিস্টোথেসিয়াম :** সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও প্রায় গোলাকার অ্যাসকোর্পকে ক্লিস্টোথেসিয়াম বলে। এখানে হাইমেনিয়ামটি প্রাচীর দিয়ে আবৃত থাকে।

২. **অ্যাপোথেসিয়াম :** সসারসদৃশ বা পেয়ালাকৃতি অ্যাসকোকার্পের হাইমেনিয়ামটি কোনো আবরণী দিয়ে আবৃত থাকে না, মুখ খোলা থাকে, তাকেই অ্যাপোথেসিয়াম বলে। এটি সবৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে।

৩. **পেরিথেসিয়াম/অ্যাসকোস্ট্রোমা :** ফ্লাস্ক বা কলম আকৃতির অ্যাসকোকার্পকে পেরিথেসিয়াম বলে। এটির শীর্ষদেশে অস্টিওল নামক রন্ধ্র থাকে। এ রন্ধ্রে রোমসদৃশ যে অনুসূত্র থাকে তাদেরকে পেরিথেসিয়াম বলে। পেরিফাইসিস স্ট্রোমাটিক বা নন-স্টোম্যাটিক হতে পারে।

৪. **হিস্টারোথেসিয়াম :** অ্যাপোথেসিয়াম ও পেরিথেসিয়াম-এর মধ্যবর্তী এক বিশেষ ধরনের কালো বা কার্বনসদৃশ চর্মবৎ, নৌকাসদৃশ ও শাখা অ্যাসকোকার্পকে হিস্টারোথেসিয়াম বলে। এগুলো তরুণ অবস্থায় বন্ধ থাকে এবং পরিণত হলে অক্ষ বরাবর লম্বালম্বি ফেটে যায়।

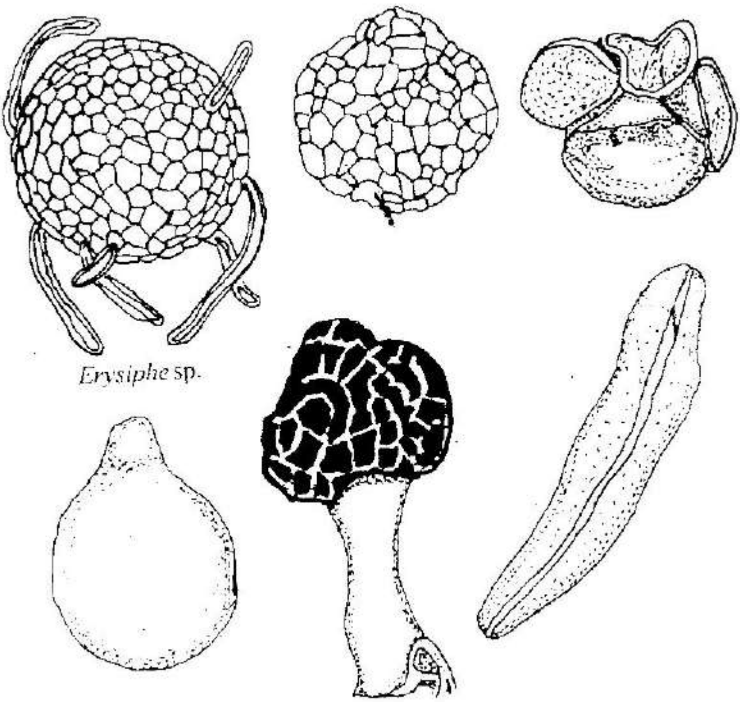

চিত্র ৮.২৭ : বিভিন্ন ধরনের অ্যাসকোকার্প

৫. **থাইরিওথেসিয়াম বা ক্যাটোথেসিয়াম :** এগুলো উল্টানো সসার–আকৃতির অ্যাসকোকার্প; প্রাচীর প্রায় অরীয় ধরনের।

আবার এমনও অ্যাসকোকার্প দেখা যায়, যেগুলো সরাসরি স্ট্রোমায় উৎপন্ন হয় ও লোকিউল হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এ লোকিউলকে অ্যাসাইজেরাস গহ্বর বলে। এ লোকিউলকে সিউডোথেসিয়া বা সিউডোপেরিথেসিয়া কিংবা অ্যাসকোস্ট্রোমাটাও বলে। সিউডোথেসিয়াম এক বা বহু লোকিউলযুক্ত হতে পারে। এ লোকিউলগুলো মেঝেতে অ্যাসকাসগুলো বিকাশ লাভ করে। অ্যাসকাসগুলো ছাদের বা মেঝের অনুসূত্রীয় উপাঙ্গের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। এ অনুসূত্রীয় উপাঙ্গগুলোর মুক্ত প্রান্ত থাকে না বলে এদেরকে সিউডোপ্যারাফাইসিস বা প্যারাফাইসয়েড বলে। সিউডোথেসিয়ামের গহ্বরটি অ্যাসাই ও প্যারাফাইসিস তৈরির পূর্বেই বিকাশ লাভ করতে পারে কিংবা নাও পারে। পেরিথেসিয়ামে যে ধরনের প্রাচীর থাকে সিউডোথেসিয়ামে সেরকমটি থাকে না। এখানে শুধু স্ট্রোমার মধ্যে গহ্বরটি থাকে এবং গহ্বরের মধ্যে অ্যাসাই থাকে। এতে নিয়মমাফিক অস্টিওল থাকে না, বরং অ্যাসাই–এর ঠিক শীর্ষভাগের স্ট্রোমাটিক কলা দ্রবীভূত হয়ে রন্ধ্র বা ফাটলের সৃষ্টি করে এবং এ পথে রেণুমুক্তি ঘটে। এছাড়াও মৃৎগত ধরনের ফলদেহ Tuber ছত্রাকে দেখা। এটি বন্ধ প্রকৃতির এবং ভাঙন ও পচন মাধ্যমে অ্যাসকোরেণুর মুক্তি ঘটে।

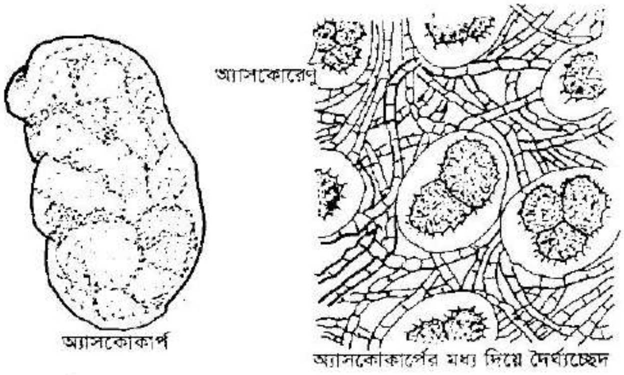

চিত্র ৮.২৮ : *Tuber* sp এ অ্যাসকোর্কাপ ও রেণু

অধিকাংশ Ascomycetes–এর ফলদেহে তিন ধরনের অনুসূত্রীয় পদ্ধতি দেখা যায়,

১. অ্যাসকোগোনিয়াম হতে অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্র ও অ্যাসাই–এর বিকাশ,
২. চারপাশের মাইসেলিয়াম হতে অঙ্গজ প্রতিরক্ষা কলার উৎপত্তি, এবং
৩. অ্যাসকোগোনিয়ামের প্রেরণার ফলে গৌণ প্রতিরক্ষাকলার উদ্ভব হয়।

Ascomycetes-এর ফলদেহ দ্বিস্তরযুক্ত — নিম্নভাগ খাদ্যবস্তু বা আশ্রয়দাতার অঙ্গের সাথে অর্ধেক মাইসেলিয়াম নিয়ে গঠিত অংশ এবং অ্যাসকাস ও প্যারাফাইসিস নিয়ে গঠিত অংশ। ফলদেহ ও অ্যাসকাসের সজ্জারীতি অনুযায়ী যে চার ধরনের অ্যাসকোকার্প পাওয়া যায়, তাদের গঠন ও বিকাশ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. অ্যাপোসিয়াম : উচ্চশ্রেণির Ascomycetes ছত্রাকে এ ধরনের ফলদেহ দেখা যায়। এটি ডিস্কের মতো বা সসার আকৃতিবিশিষ্ট বা পেয়ালাকৃতি হতে পারে। আকার–আয়তনে বিভিন্নতা দেখা যায়—কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধযুক্ত হয়ে থাকে। এদের রঙের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা—ধূসর বাদামি হতে কালো, কখনও লাল, কমলা, স্বর্ণাভ, এমনকি বর্ণহীনও হতে পারে।

চিত্র ৮.২৯ : Ascomycetes. ক. *Peziza*–এর অবৃন্তক অ্যাপোথেসিয়াম ; খ. *Urnula*–র সবৃন্তক অ্যাপোথেসিয়াম

অ্যাপোথেসিয়ামের গঠন

অ্যাপোথেসিয়াম অ্যাসকোকার্পটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত—

১. হাইমেনিয়াম,

২. হাইপোথেসিয়াম ও

৩. এক্সিপুলাস। নিচে এসব অ্যাসকোকার্প সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হচ্ছে—

১. **হাইমেনিয়াম :** এটি ফলদেহের উর্বর স্তর, যা পেয়ালা বা ডিস্কের পৃষ্ঠতল গঠন করে। একে থেসিয়ামও বলে। এটি সুনিবিড়ভাবে সজ্জিত লম্বাটে থলির ন্যায় কোষ বা অ্যাসাই ও প্যারাফাইসিস নিয়ে গঠিত। অ্যাসকাসগুলো ইউনিটিউনিকেট ধরনের এবং উম্বভাবে প্যালিসেডসদৃশ অবস্থান গ্রহণ করে। পরিণত অ্যাসকাস নলাকৃতি, প্রতিটি অ্যাসকাস দ্বিস্তরীয় প্রাচীরযুক্ত। কিন্তু দেখে মনে হবে, একটি স্থিতিস্থাপক প্রাচীরবিশেষ। কোষপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাণসত্তার স্তর বিদ্যমান। কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি বড় গহ্বর। এ গহ্বরের মধ্যেই সাধারণত ৮টি অ্যাসকোরেণু থাকে। অ্যাসাই-এর মাঝে মাঝে থাকে লম্বাটে, ব্যবধায়কযুক্ত বা ব্যবধায়কবিহীন প্যারাফাইসিস হাইফি। এগুলো দৈর্ঘ্যে প্রায় অ্যাসকাসের সমান কিংবা কিছুটা খাটো হতে পারে। ফলদেহে এদের বিকাশ অ্যাসাই-এর পূর্বেই হয়ে থাকে। এগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হয় এবং বন্ধ তরুণ অ্যাকোকার্পের আবরণীকে উন্মুক্ত হবার জন্য চাপ দিতে থাকে। প্যারাফাইসেস মূলত প্রতিরক্ষা, সহায়ক ও রেণু বিস্তারে ভূমিকা রাখে। এগুলো অ্যাসাইকে খাদ্যও সরবরাহ করে থাকে। কতিপয় প্রজাতিতে প্যারাফাইসিসগুলো অ্যাসাই হতেও বড় হয়। এদের শীর্ষদেশ

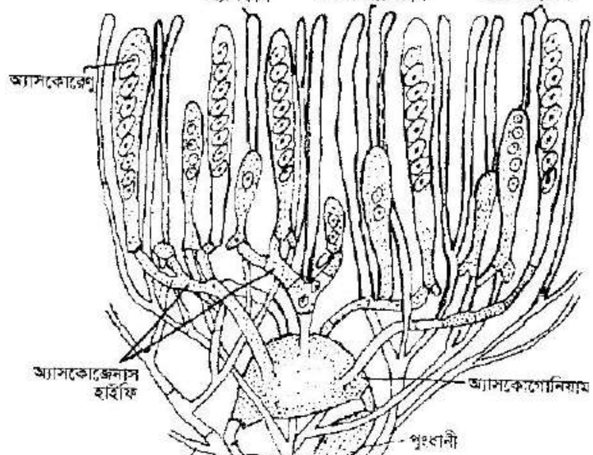

চিত্র ৮.৩০ : Ascomycetes. অ্যাপোথেসিয়ামের লম্বচ্ছেদ বিভিন্ন অংশ (আংশিক)

শাখাযুক্ত হতে পারে এবং অ্যাসাই অতিক্রমী শীর্ষগুলো মিলিত হয়ে একটি স্তর তৈরি করে। এ স্তরটি পাতলা ও উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত হয় ; এ স্তরকে এপিথেসিয়াম বলে। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপোথেসিয়ার বর্ণের জন্য বর্ণকণিকাযুক্ত তেলবিন্দু দায়ী ; আর এ তেলবিন্দু

প্যারাফাইসিসেই থাকে। প্যারাফাইসিসগুলো হ্যাপ্লয়ড প্রকৃতির। অ্যাকোজেনাস হাইফির সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সূঁচালো, কোথাও ক্লাব আকৃতির, কোথাও আবার নলাকার।

২. **হাইপোথেসিয়াম :** হাইমেনিয়ামের অব্যবহিত নিচের জড়াজড়ি অনুসূত্রের পাতলা স্তরটিকে হাইপোথেসিয়াম বলে। এ স্তর হতেই প্যারাফাইসিসগুলো বিকাশলাভ করে।

৩. **এক্সিপুলাম :** এ শব্দটির অর্থ হলো ধারক বা বাহক। এটি অ্যাপোথেসিয়াম হ্যাপ্লয়ড মাংসল অংশ এবং হাইমেনিয়াম ও হাইপোথেসিয়ামকে সহায়তাদান করে।

এটির দুটি অংশ রয়েছে— ক. বহিঃএক্সিপুলাম—অ্যাপোথেসিয়ামে বহিঃস্তর ও খ. মেডুলারি এক্সিপুলাম—এটি ভিতরের স্তর।

Korf (১৯৫৮) এক্সিপুলামের কলাগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বহিঃ বা এক্টাল এক্সিপুলামের কোষগুলো খাটো প্রকৃতির এবং স্বতন্ত্র অনুসূত্র হিসেবে শনাক্তযোগ্য নয়। মেডুলারি এক্সিপুলামের কলাগুলো লম্বাটে ধরনের ও হাইফিগুলো শনাক্তযোগ্য। খাটো কোষের কলাকে তিনি আবার তিন ধরনের বলে উল্লেখ করেছেন :

ক. টেক্সচুরা গ্লোবসা—কোষাবকাশযুক্ত গোলাকৃতি কোষ

খ. টেক্সচুরা অ্যাংগুলারিয়া—কোষাবকাশবিহীন পলিহেড্রাল কোষ এবং

গ. টেক্সচুরা প্রিজম্যাটিকা—আয়তাকার কোষস্তর।

লম্বাটে কোষগুলো ৪ ধরনের বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং অনুসূত্রগুলো সর্বমুখীভাবে বিস্তৃত

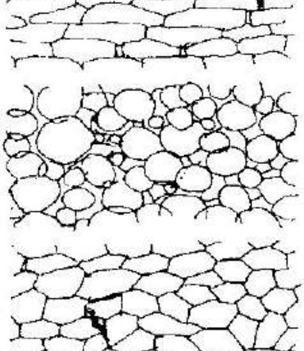

চিত্র ৮.৩২ : Ascomycetes–এর খাটো এক্সিপুলামের কলার ধরন

a. টেক্সচুরা ইট্রিকাটা,
b. টেক্সচুরা এপিডার্মিয়ডিয়া,
c. টেক্সচুরা অবলিটা ও
d. টেক্সচুরা পোরেক্টা।

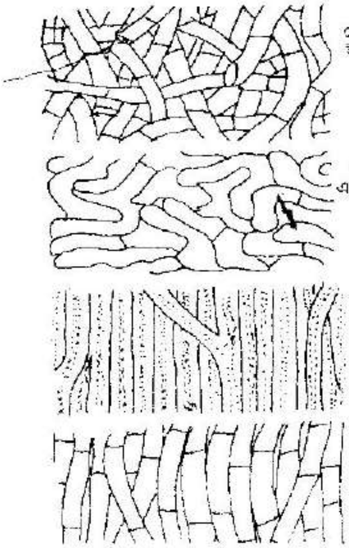

চিত্র ৮.৩২ : Axcomycetes-এর এক্সিপুলামের কলার ধরন

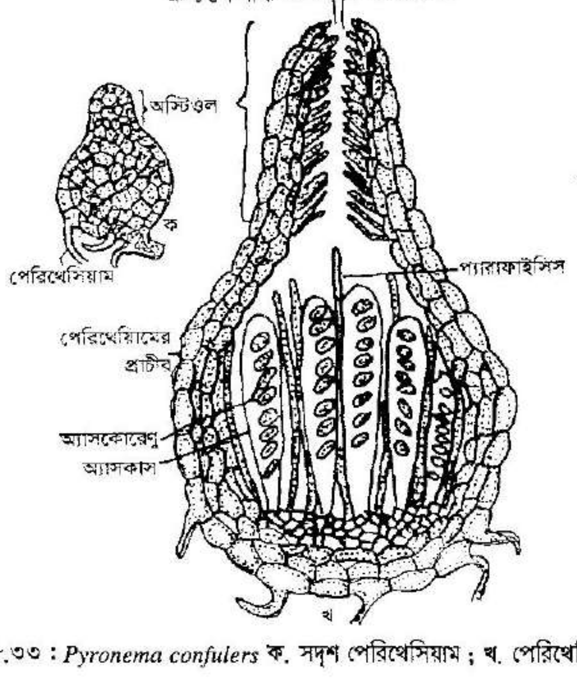

চিত্র ৮.৩৩ : *Pyronema confulers* ক. সদৃশ পেরিথেসিয়াম ; খ. পেরিথেসিয়াম

অ্যাপোথেসিয়াম সবৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে এবং পেয়ালা বা সসার আকৃতি ছাড়াও অন্য আকৃতির হতে পারে। (i) স্থূলবৃন্ত ও কাপ বা পেলিয়াসযুক্ত যার উপর কূপযুক্ত হাইমেনিয়ামকে স্পঞ্জের মতো দেখায়। (ii) লম্বা বা খাটো অতি শিরাযুক্ত বৃন্ত এবং পেলিয়াম ম্যান্ডেলাকৃতি। (iii) লম্বা বৃন্তযুক্ত জিহ্বা, ক্লাব বা পাখাসদৃশ অ্যাপোথেসিয়া। (iv) চ্যাপ্টা, বৃত্তাকার, কালো, টারসদৃশ স্ট্রোমা—যাতে বিচ্ছুরিত কুঞ্চন বিদ্যমান।

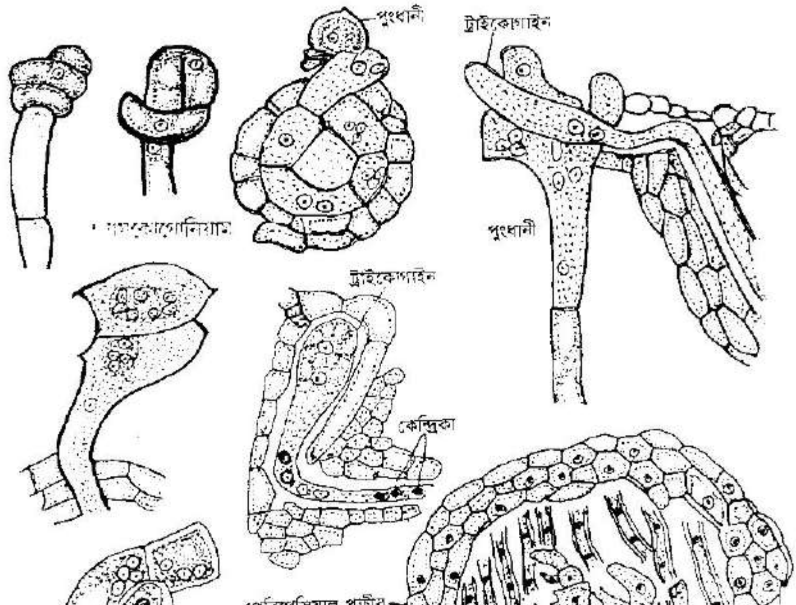

চিত্র ৮.৩৪ : *Venturia inaequalis*—এ পেরিথেসিয়ামের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়

Corner (১৯২৯) অ্যাপোথেসিয়ামের তিন ধরনের বিকাশ ধারার কথা উল্লেখ করেছেন :

(i) অ্যানজিওকার্পিক—এখানে এক্সিপুলামের কলাগুলো প্রাথমিকভাবে বর্ধিত হয় এবং বিকাশমান হাইমেনিয়ামস্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(ii) জিমনোকার্পিক—এখানে হাইমেনিয়ামের বিকাশ সবসময় উন্মুক্ত থাকে।

(iii) হেমিঅ্যানজিওকার্পিক—এক্ষেত্রে হাইমেনিয়ামের বিকাশ আংশিকভাবে আবৃত থাকে। অবশ্য তিনি এ ধরনের বিকাশের কোনো তাৎপর্য উল্লেখ করেন নি।

Pyronema confluens-এ অ্যাপোথেসিয়ামের বিকাশ সম্পর্কে De Bary (১৮৬৩) পূর্ণ বিবরণ দিতে না পারলেও Kihlmann বিশদ বিবরণ দেন। তিনি জননকোষাধার সংস্পর্শ, প্লাজমোগ্যামি, মিওসিস, অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু গঠন অ্যাসকোজেনাস হাইফি ও ডাইক্যারিয়নের বিকাশ, ক্রোজিয়ার গঠন, প্রভৃতি অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু বিকাশের আওতাভুক্ত করেন।

খ. পেরিথেসিয়াম বা অ্যাসকোস্ট্রোমা : এটি আকার-আকৃতিতে বিভিন্নতা, দেখায় তবে তরুণ অবস্থায় গোলাকার বা নাশপাতির মতো এবং পরিণতকালে লম্বাটে বা ফ্লাস্ক আকৃতিসহ খাটো বা লম্বা গ্রীবাযুক্ত হয়। আয়তন ১ মিলিমিটারের চেয়েও কম ব্যাসার্ধযুক্ত। এ অ্যাসকার্পটি স্ট্রোমার সাথে (ঘন সন্নিবেশিত অঙ্গজ হাইফির গঠন) অবস্থান করে তবে তাঁকে স্ট্রোম্যাটিক পেরিথেসিয়া বলে, আর যদি স্ট্রোম্যাটিক কলার সাথে সম্পর্কবিহীন হয়, তবে তাকে নন-স্ট্রোম্যাটিক পেরিথেসিয়া বলে। আবার, স্ট্রোম্যাটিক পেরিথেসিয়ামের স্ট্রোমাতে শুধু ছত্রাকীয় হাইফি কিংবা ছত্রাক হাইফি ও পোষক-কলার মিশ্রণ থাকতে পারে। পেরিথেসিয়াম পরিপক্ব ও পরিণত হলে শীর্ষাগ্রে একটি সরু ছিদ্র নালিপথের সৃষ্টি হয় ; একে অস্টিওল বলে। এটি পেরিথেসিয়ামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ছিদ্রপথটিতে খাটো, সরু, ভঙ্গুর রোমের মতো বৃদ্ধি দেখা যায় ; এগুলোকে পেরিফাইসিস বলে। এগুলো বহির্মুখীভাবে থাকে। প্রতিটি পেরিথেসিয়ামের নিজস্ব প্রাচীর থাকে ; একে পেরিডিয়াম বলে। এটি একটি গহ্বরকে ঘিরে থাকে, যার মধ্যে হাইমেনিয়াম সর্বত্র বা শুধু মেঝেতে থাকে। পেরিডিয়াম প্রাচীর সিউডোপ্যারেনকাইমীয় এবং হাইমেনিয়াম অ্যাসাইও প্যারাফাইসিস নিয়ে গঠিত। প্রজাতিভেদে পেরিথেসিয়ামের অ্যাসাই স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। অ্যাসকোরেণুগুলো এককোষী বা একাধিক কোষবিশিষ্ট হতে পারে এবং আকার-আকৃতিতেও বিভিন্নতা বিদ্যমান।

Venturia inaequalis-এর পেরিথেসিয়ামের বিকাশ সাধারণত স্ট্রোমার উদ্ভূত কুণ্ডলিত অনুসূত্র হতে শুরু হয়। স্ট্রোমার পরিধিস্থ অনুসূত্রীয় কোষগুলো এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও এদের প্রাচীর পুরু ; কিন্তু অভ্যন্তরভাগের কোষগুলো বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত ও পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট। এ পাতলা-প্রাচীরযুক্ত কোনো একটি কোষ হতে একগুচ্ছ কোষ উৎপন্ন হয়ে অ্যাসকোগোনিয়াম গঠন করে। এদের প্রতিটি কোষ কেন্দ্রিকাযুক্ত হয়ে থাকে। অ্যাসকোগোনিয়ামের শীর্ষকোষটি ক্ল্যাভেটাকৃতি হয়ে ট্রাইকোগাইন তৈরি করে। ইত্যবসরে বিকাশমান অ্যাসকোগোনিয়ামের কাছের অন্য একটি অনুসূত্রের শীর্ষাঞ্চল স্ফীত, খাঁজযুক্ত ও বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। এটি পুংধানী। এটি খাঁজ ট্রাইকোগাইনকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত বাড়তে থাকে। সংযোগ নিশ্চিত হলে মিলনস্থানের প্রাচীর গলে রন্ধ্র সৃষ্টি হয় এবং এ পথেই ট্রাইকোগাইনে পুংধানীর বস্তুসমূহ জমা হয়। অতঃপর অ্যাসকোগোনিয়ামে শিকল পার্শ্বপ্রাচীর গলে যায় এবং পুংকেন্দ্রিকা অ্যাসকোগোনিয়ামে চলে আসে। এখানে কেন্দ্রিকা দুটি ডাইক্যারিয়ন অবস্থায় থাকে। অতঃপর অ্যাসকোগোনিয়াম হতে উপবৃদ্ধিরূপে অ্যাসকোগোনীয় অনুসূত্রের বিকাশ ঘটে। দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত পেনাল্টিমেট কোষ গঠিত হয় এবং কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলন ঘটে। তখন ডিপ্লয়ড দশার উদ্ভব হয়। অ্যাসকাস লম্বাটে হয় এবং পর পর কেন্দ্রিকার বিভাজন হয় ; ফলে ৮টি হ্যাপ্লয়ড অ্যাসকোরেণুর উৎপত্তি হয়। প্রথম বিভাজনটি বিয়োজন বিভাজন। ৮টি কেন্দ্রিকা কিছু কিছু প্রাণসত্তাবেষ্টিত হয়ে ৮টি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন

করে। ইত্যবসরে অনুসূত্রের এককেন্দ্রিকাযুক্ত কোষ বিভক্ত হয়ে বিকাশমান পেরিথেসিয়ামের প্রাচীর, অ্যাসাই-এর জন্য ধাত্রীকোষ ও প্যারাফাইসিস গঠন করে। কালক্রমে পেরিথেসিয়ামের প্রাচীর সুগঠিত ও শীর্ষে অস্টিওল ছিদ্রপথের উদ্ভব হয় এবং অ্যাসাই ও প্যারাফাইসিসের বিকাশ ঘটে।

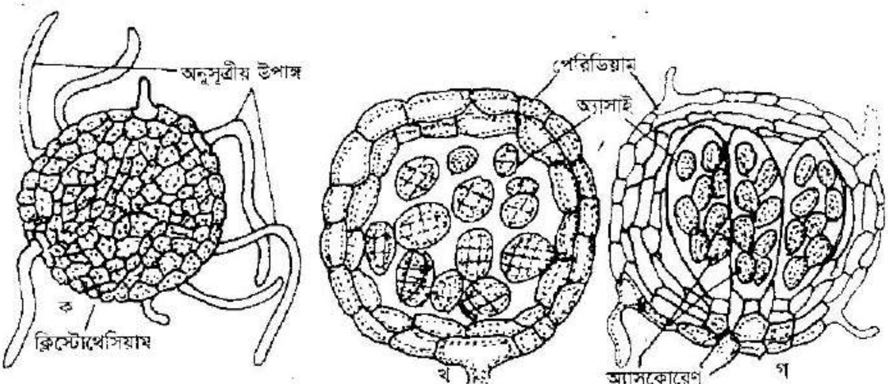

চিত্র ৮.৩৫ : ক. পূর্ণ ক্লিস্টোথেসিয়াম ; খ. *Aspergillus*–এর ক্লিস্টোথেসিয়াম ; গ. *Brysiphe*–এর ক্লিস্টোথেসিয়াম

গ. ক্লিস্টোথেসিয়াম : এটি আকারে ছোট, সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, গোলাকার ও ফাঁপা, অবিদারী অ্যাসকোকার্প। এর আবরণীটি খুবই পুরু ও পেরিডিয়াম নামে পরিচিত। এটি জড়াজড়ি সজ্জারীতি : হাইফি সিউডোপ্যারেনকাইমীয়। এটি মসৃণ হতে পারে ; তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুসূত্রীয় উপবৃদ্ধির উপাঙ্গজড়িত। এ উপাঙ্গগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অ্যাসকাসগুলো পেরিডিয়ামের মধ্যে বিভিন্নভাবে অবস্থান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত হয়ে হাইমেনিয়াম গঠন করতে পারে। অ্যাসকোরেণু মূলত পেরিডিয়াম পচন ও অ্যাসক্যাস প্রাচীর ভাঙনের মধ্য দিয়ে নির্গত হতে পারে। ক্লিস্টোথেসিয়াম সবৃন্তক বা অবৃন্তক, একক অ্যাসকাসযুক্ত বা বহু অ্যাসকাসবিশিষ্ট হতে পারে। চিত্র ৮.৩৬–এ এর বিকাশ দেখানো হলো।

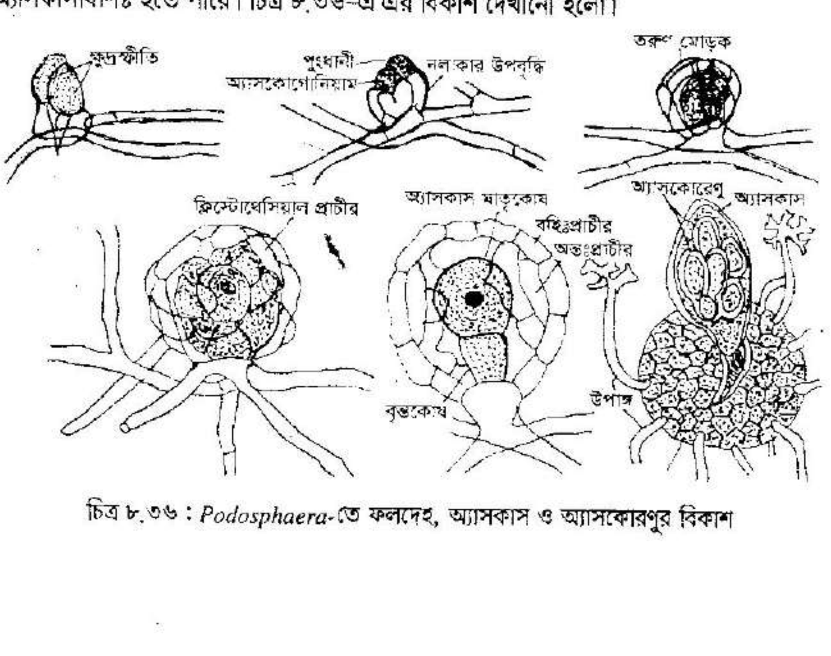

চিত্র ৮.৩৬ : *Podosphaera*-তে ফলদেহ, অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরণুর বিকাশ

Podosphaera-তে ক্লিস্টোথেসিয়ামের বিকাশ খুবই সহজ-সরল প্রকৃতির। এখানে পাশাপাশি দুটি অনুসূত্রীয় শাখার স্ফীতি উদগত হয়ে ব্যবধায়ক যুক্ত হয়। এদের একটি লম্বাটে ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে অ্যাসকোগোনিয়াম গঠন করে। অন্যটি নলাকার অবস্থাতেই থেকে যায় এবং পুংধানী গঠন করে। পুংধানীটি অ্যাসকোগোনিয়ামের উপরে প্যাঁচানোভাবে থাকে এবং প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হয়ে সমব্যাসার্ধ কোষ তৈরি করে। একসময় প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হয় এবং অ্যাসকোগোনিয়াম অনুপ্রস্থে ভাগ হয়ে দুটি কোষ দেয়। উপরের কোষটি কালক্রমে অ্যাসকাসে পরিণত হয় ও ৮টি অ্যাসকোরেণু দেয়। পক্ষান্তরে নিচের কোষটি বৃন্তকোষে পরিণত হয়। অ্যাসকাস বিকাশের সাথে সাথে ক্লিস্টোথেসিয়াম প্রাচীরের বিকাশ শুরু হয়। অ্যাসকোগোনিয়ামের গোড়া হতে নলাকার উপবৃদ্ধি বের হয় এবং অ্যাসকোগোনিয়ামকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর নলাকার উপবৃদ্ধি কয়েকবার অনুপ্রস্থে বিভক্ত হয়ে প্রাচীর গঠন করে। এর পর কোষগুলো আকারে ও আয়তনে বৃদ্ধি পায়, প্রাচীর পুরু হয় ও রং গাঢ় বাদামি হয়।

Ascomycetes-এর জীবনচক্র

সাধারণভাবে Ascomycetes-এর জীবনচক্রে দুটি দশা দেখা যায়—একটি অযৌন জনন দশা ও অন্যটি যৌন জনন দশা। যৌন জনন দশায় তিনটি পর্যায় বিদ্যমান—

(i) হ্যাপ্লোফেজ
(ii) ডাইক্যারিওফেজ ও
(iii) ডিপ্লোফেজ। এ তিনটি দশা পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয় এবং একটি স্থানে যৌন দশাটি অযৌন দশার সাথে যুক্ত থাকে।

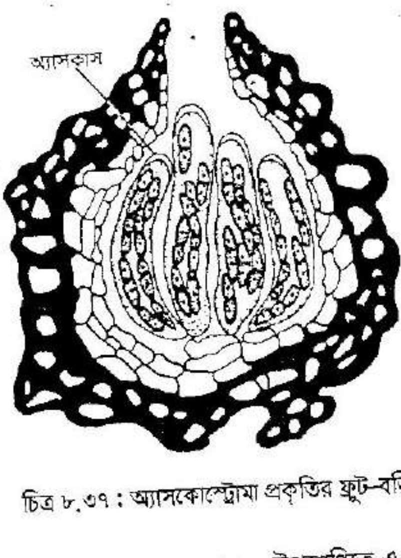

চিত্র ৮.৩৭ : অ্যাসকোস্ট্রোমা প্রকৃতির ফ্রুট-বডি

ঘ. অ্যাসকোস্ট্রোমা : Loculoascomycetidae-উপশ্রেণিতে এ ধরনের বা সিউডোথেসিয়াম (Webstes, ১৯৭০) অ্যাসকোকার্প পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অ্যাসকাসগুলো স্ট্রোমার অভ্যন্তরস্থ একটি গর্তের (locules) মধ্যে সরাসরি উৎপন্ন হয়। অ্যাসকাসগুলো বাইটিউনিকেট প্রকৃতির। অ্যাসকোস্ট্রোমা লম্বাটে, অস্টিওলযুক্ত, কঠিন বা চর্মবৎ ও কালোবর্ণের হয়ে থাকে।

অ্যাসকাসগুলো হাইমেনিয়ামে সুসংগঠিত নয় বা সুস্পষ্ট ফলদেহে পরিণত নয়। স্ট্রোমাগুলো নিজেই ফলদেহ গঠনে অংশ নেয়। প্রতিটি গর্তে ১টি করে অ্যাসকাস (মোনাসকাল) কিংবা একাধিক অ্যাসকাস (পলিঅ্যাসকাল) থাকতে পারে। মনোসকাল লোকিউলগুলো অনিয়মিত বিন্যাসে এবং পলিঅ্যাসকালগুলো একটি নির্দিষ্ট পদতলীয় স্তরে সাজানো থাকে। পেরিথেসিয়ামের সাথে এটির গঠনগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। Wolf and Wolf (১৯৪৭) অ্যাসকোস্ট্রোমাকে পেরিথেসিয়াম ও অ্যাপোথেসিয়ামের মধ্যবর্তী এক বিশেষ প্রকৃতির অ্যাসকার্পরূপে (হিস্টোরোথেসিয়াম) বর্ণনা করেছেন।

ঙ. হিস্টারোথেসিয়াম : এটি ছোট, কালো ও লম্বাটে ফলদেহ। দেহগাত্রের বুনট চামড়াসদৃশ ও শক্ত। এটি পরিণত ও পরিপক্ব হলে একক অনুদৈর্ঘ্যে অক্ষ বরাবর একটি ফাটল মাধ্যমে (শীর্ষভাগ হতে শুরু হয়) উন্মুক্ত হয়। এ ধরনের ফলদেহের বিকাশ শুধু flysteriales বর্গেই হয়ে থাকে।

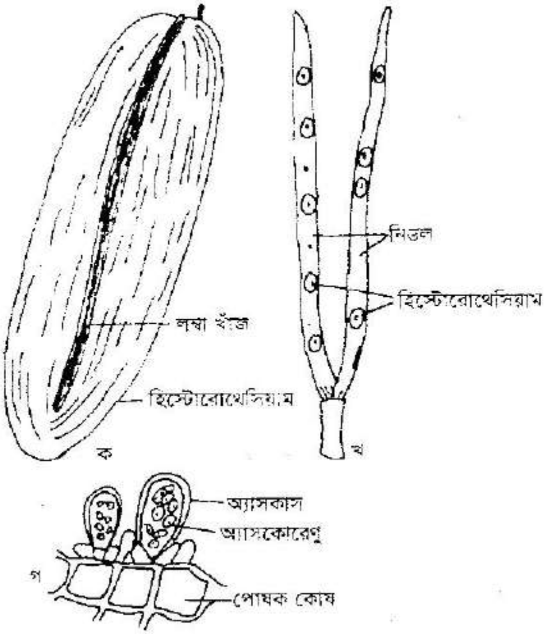

চিত্র ৮.৩৮ : ক. হিস্টারোথেসিয়ামের বিদারণ ; খ. পাইনাস পাতায় হিস্টারোথেসিয়াম ; গ. জাইগোট হতে সরাসরি অ্যাসাই গঠন হলেও কোনো অ্যাসকোকার্প গঠন হয় না।

শ্রেণিবিন্যাস : Ascomycetes ছত্রাকতত্ত্বে অ্যাসকোমাইসেটিসের শ্রেণিবিন্যাস খুবই জটিল সমস্যারূপে চিহ্নিত। কেননা এ শ্রেণির বহু সংখ্যক প্রজাতির বাহ্যিক ও অঙ্গসংস্থানিক জটিলতা ও বিভিন্নতা ছত্রাকতত্ত্ববিদদের দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলে। সে যাই হোক, বহুলভাবে সমর্থিত পুরাতন শ্রেণিবিন্যাসে অ্যাসকোমাইসেটিসকে ৩টি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। Plectomycetes, Pyrenomycetes ও Discomycetes। এ শ্রেণিভাগটি অ্যাসকোকার্পের বাহ্যিক গঠন : ক্লিস্টোথেসিয়াম, পেরিথেসিয়াম ও অ্যাপোথেসিয়াম নির্ভরশীল। অবশ্য এ শ্রেণিবিন্যাসটি বিভিন্ন ছত্রাকবিদ কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হয়েছে। এ ধরনের পরিমার্জিত শ্রেণিবিন্যাস নিচে

আলোচনা করা হলো। এখানে অ্যাসকোমাইসেটিসকে দুটি উপশ্রেণিতে এবং উপশ্রেণিকে বর্গ ও গোত্রে ভাগ করা হয়েছে।

ক. খোলা অ্যাসাই এবং এককভাবে বা হালকা গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়। অ্যাসকোজেনাস হাইফি বা অ্যাসকোকার্প অনুপস্থিত।

১. উপশ্রেণি : Protoascomycetes

খ. দেহ এককেন্দ্রিকা কোষযুক্ত বা মাইসেলিয়ড, অ্যাসকাস সরাসরি জাইগোট হতে গঠিত হয়। জাইগোটটি দুটি কোষের মিলনে বা হাইফির অংশবিশেষের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়।

i. বর্গ : Endomycetales

গ. প্রতিটি অ্যাসকাসে ৮টির অধিক অ্যাসকোরেণু থাকে।

i. গোত্র : Ascoideaceae

গগ. প্রতিটি অ্যাসকাসে ১–৮টি অ্যাসকোরেণু থাকে।

ঘ. মাইসেলিয়াম খুবই কম থাকে বা একেবারেই থাকে না।

ii. গোত্র : Saccharomycesae

গণ : Saccharomyces

ঘঘ. মাইসেলিয়ামের প্রাচুর্য বিদ্যমান

খখ. দেহ মাইসেলিয়ড, পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত মাইসেলিয়ামের দ্বিকেন্দ্রিক কোষ হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফি এবং সেখান হতে অ্যাসাই উৎপন্ন হয়।

ii. বর্গ : Taphrinatles

iii. গোত্র : Taphrinaceae

গণ : *Taphrina*

কক. অ্যাসকোজেনাস হাইফি হতে অ্যাসাই তৈরি হয় এবং সুগঠিত অ্যাসকোকার্পের মধ্যে থাকে।

২. উপশ্রেণি : Euascomycetes

খ. অ্যাসকোকার্প রন্ধ্রবিহীন ক্লিস্টোথেসিয়াম

i. সিরিজ : Plectomycetes

গ. অ্যাসকোকার্পের মধ্যে অ্যাসাই ছড়ানো–ছিটানো অবস্থায় থাকে। অ্যাসকোকার্প উপাঙ্গবিহীন ও সম্মুখভাগে বিলীয়মান অ্যাসাইয়ে পরিপূর্ণ থাকে।

গ. বর্গ : Eurotiales

গোত্র : Eurotiaceae

ফর্মগণ : *Aspergillius*

ফর্মগণ : *Penicillium*

গগ. অ্যাসকোকার্পের মধ্যে অ্যাসাই গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়। অ্যাসাই অনড় ও অ্যাসকোকার্প উপাঙ্গযুক্ত হয়ে থাকে।

বর্গ : Erysiphales

গোত্র : Erysipheaceae

গণ : *Erysiphe*

খখ. অ্যাসকোকার্প প্রশস্ত রন্ধ্রযুক্ত—অ্যাপোথেসিয়াম বা রূপান্তরিত অবস্থা।

2. সিরিজ : Discomycetes

গ. অ্যাসকোকার্প মাটির উপরে থাকে।

ঘ. অ্যাসাই ঢাকনাযুক্ত বা উপ-ঢাকনাযুক্ত

বর্গ : Pezizales

গোত্র : Pezizaceae

গণ : *Ascobolus*

ঘঘ. অ্যাসাই ঢাকনাবিহীন

গগ. অ্যাসকোকার্প মাটিরে নিচে থাকে।

খখখ. অ্যাসকোকার্প নিয়মিতভাবে রন্ধ্র থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে—পেরিথেসিয়াম বা সিউডোথেসিয়াম।

3. সিরিজ : Pyrenomycetes

গ. অ্যাসকোকার্প নিজস্ব প্রাচীরযুক্ত

ঘ. অ্যাসকোরেণু সূত্রাকৃতি

বর্গ : Clavicipitales

গোত্র : Clavicipitaceae

গণ : *Claviceps*

ঘঘ. অ্যাসকোরেণুগুলো সূত্রাকৃতি নয়।

ঙ. অ্যাসকোকার্প এককভাবে জন্মে কিংবা স্ট্রোমার মধ্যে গাঢ় পর্দা বা কার্বনসদৃশ হয়।

বর্গ : Sphaeriales

গোত্র : Sordariaceae

গণ : *Neurospora*

গগ. অ্যাসকোকার্প অবিভেদিত প্রাচীরবিহীন, অ্যাসাইগুলো স্ট্রোমীয় ফাঁকে ফাঁকে বা লোকিউল-এ জন্মায়।

Luttrell (১৯৫৫) অ্যাসাই-এর গঠন প্রকৃতির উপর অধিক গুরুত্ব (একক আবরণী ও দ্বি আবরণী) আরোপ করেন এবং এ বৈশিষ্ট্যকে অ্যাসকোকার্পের সাথে যুক্ত করে দুটি উপশ্রেণি : Euascomycetes ও Loculoascomycetes-এ ভাগ করেন।

সাম্প্রতিককালে Luttrell-এর ধ্যান-ধারণাভিত্তিক Ascomycetes-এর শ্রেণিবিভাগ প্রথমত অ্যাসকাস-এর গঠন প্রকৃতির এবং অতঃপর অ্যাসকোকার্পের উপর নির্ভরশীল।

ক. অ্যাসাই প্রাচীর একস্তরীয়, অ্যাসকোকার্পের মধ্যে বা অন্যভাবে উৎপন্ন হয়ে হাইমেনিয়ামে বিন্যস্ত থাকে।

—উপশ্রেণি : Euascomycetes

খ. অ্যাসাই এককভাবে উৎপন্ন হয়।

গ. স্থূল প্রাচীরবিশিষ্ট ক্ল্যামাইডোরেণু হতে বিকাশ লাভ করে এবং তা পরিবাহী উদ্ভিদকলার মধ্যে উৎপন্ন হয়।

—বর্গ : Protomycetales

গগ. জননকোষাধারের মিলনে সরাসরিভাবে উৎপন্ন হয়।

—বর্গ : Endomycetales

গোত্র : Endomycetaceae (Saccharomycetaceae)

গণ : *Saccharomyces*

ঘঘ. অ্যাসাই নিরবচ্ছিন্ন স্তরে থাকলেও তা কখনও অ্যাসকোকার্পের মধ্যে থাকে না।

—বর্গ : Taphrinales

গোত্র : Taphrinaceae

গণ : *Taphrina*

খখখ. অ্যাসকোকার্পের হাইমেনিয়ামে অ্যাসাই থাকে।

গ. অ্যাসাই ঢাকনাযুক্ত।

—বর্গ : Pezizales

গোত্র : Ascobolaceae

গণ : *Ascobolus*

গগ. অ্যাসাই ঢাকনাবিহীন।

ঘ. সাধারণত অ্যাসাই অবিদারী, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শীর্ষভাগ ছাড়া বিদারণ হয় না।

ঙ. নিরবচ্ছিন্ন হাইমেনিয়াম ভূনিম্নস্থ অ্যাসকোকার্প।

—বর্গ : Tuberales

ঙঙ. সান্তর হাইমেনিয়াম

বর্গ : Plectascales

চ. অ্যাসকোকার্প প্রায় গোলাকার, রন্ধ্রবিহীন, ফাটল মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়।

ছ. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতজীবী।

জ. বৃন্তবিহীন অ্যাসকোকার্প।

অ্যাসকোকার্প গোলাকার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি, ক্ষুদ্রাকৃতি ছত্রাক।

এগুলো মূলত মাটির উপরের পচা খড়ের উপর জন্মায়।

গোত্র : Eurotiaceae

ফর্মগণ : *Aspergillus*

ফর্মগণ : *Penicillium*

জজ. বৃন্তযুক্ত অ্যাসকোকার্প।

ছছ. পরজীবী, বিশেষত সপুষ্পক সবুজ উদ্ভিদের পাতায় জন্মায়।

জ. মাইসেলিয়াম হাইফোপোডিয়াবিহীন ও কনিডিয়াবহুল।

গোত্র : Erysiphaceae

গণ : *Erysiphe*

জজ. মাইসেলিয়াম হাইফোপোডিয়াবিশিষ্ট ও কনিডিয়াবিহীন।

গোত্র : Meliolaceae

গণ : *Meliola*

চচ. লম্বা ঠোঁটযুক্ত অ্যাসকোকার্প, অ্যাসাই ব্যতিক্রমী এবং অ্যাসকোরেণুগুলো সাধারণত ঠোঁটের শীর্ষ দিয়ে মিউসিলেজবিন্দুসহ বের হয়ে আসে।

ঘঘ. শীর্ষরন্ধ্রযুক্ত অ্যাসাই।

ঙ. অ্যাসাই অধিক লম্বা ও সরু নলাকার। অ্যাসকোরেণুগুলো সূত্রাকৃতি।

চ. পেরিথেসিয়ার অ্যাসাই স্ট্রোমাতে জন্মে।

বর্গ : Clavicipitales

গোত্র : Clavicipitaceae

গণ : *Claviceps*

চচ. পেরিথেসিয়ার অ্যাসাই স্ট্রোমাবিহীন।

ঙঙ. অ্যাসাই নলাকার নয়, অ্যাসকোরেণু সূচাকৃতি হলেও সূত্রাকৃতি নয়।

চ. অ্যাপোথেসিয়ামে অ্যাসাই থাকে।

চচ. পেরিথেসিয়ামে অ্যাসাই থাকে।

ছ. সাধারণত প্যারাফাইসেস থাকে। পেরিথেসিয়ামে স্ট্রোমা থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে।

বর্গ : Sphaeriales

গোত্র : Sordariaceae

গণ : *Neurospora / Xylaria*

কক. অ্যাসাই প্রাচীর দ্বিস্তরীয় এবং লোকিউলের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

উপশ্রেণি : Loculoascomycetes

Gwynne-Vaughan ও Barnes (১৯৫১) সমগ্র Ascomycetes কে ফলদেহের ভিন্নতার পরিপেক্ষিতে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছেন :

১. শ্রেণি : Plectomycetes—কোনো নির্দিষ্ট ফলদেহ তৈরি হয় না কিংবা ক্লিস্টোথেসিয়াম তৈরি হলেও এর মধ্যস্থিত অ্যাসকাসগুলো সুবিন্যস্ত হতে পারে অথবা পরস্পর সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকতে পারে। এতে ৩টি বর্গ রয়েছে।

   i. বর্গ : Plectascales উদাহরণ : *Saccharomyces, Penicillium* প্রভৃতি।

   ii. বর্গ : Erysihpales— উদাহরণ : *Erysiphe, Sphaerotheca*

   iii. বর্গ : Exoascales—উদাহরণ : *Taphrina, Exoascus*

২. উপশ্রেণি : Discomycetes—ফলদেহ পেয়ালাকৃতি অ্যাপোথেসিয়াম হাইমেনিয়াম সুস্পষ্ট। এতে দু'টি বর্গ রয়েছে :

   i. বর্গ : Pezizales—উদাহরণ : *Ascobolus, Peziza, Pyronema*

   ii. বর্গ : Helvellales—উদাহরণ : *Helvella*

iii. বর্গ : Tuberales—উদাহরণ : *Tuber*

iv. বর্গ : Phaeidiales—উদাহরণ : *Rhytisma* ও

v. বর্গ : Hysteriales— উদাহরণ : *Lophodermium*

৩. উপশ্রেণি : Pyrenomycetes — ফলদেহ ফ্লাস্কের আকৃতিসদৃশ, নাম পেরিথেসিয়াম অ্যাসকাসের সজ্জারীতি সমান্তরাল। এতে ৪টি বর্গ রয়েছে :

i. বর্গ : Hypocreales—উদাহরণ : Claviceps

ii. বর্গ : Sphacriales—উদাহরণ : *Xylaria*

iii. বর্গ : Laboulbeniales—উদাহরণ : *Laboulbenia*

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য এটি সুবিধাজনক। সম্প্রতি Webster (১৯৭০) ও Ainsworth (১৯৬৬) সমগ্র Ascomycetesকে Ascomycotina বিভাগে ও এই বিভাগকে ৬টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। শ্রেণিগুলো হচ্ছে—

১. Hemiascomycetes (২টি বর্গ)

২. Plectomycetes (২টি বর্গ)

৩. Pyrenomycetes (২টি বর্গ)

৪. Discomycetes ও (৫টি বর্গ)

৫. Laboulbeniomycetes (১টি বর্গ)

৬. Loculoascomycetes. এ গ্রন্থে Ainswoth-এর শ্রেণিভাগটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রেণিগুলোর বর্গে ও গোত্রে বিভাজন নিম্নরূপ :

শ্রেণি : Hemiascomytes

বর্গ ১ : Endomycetes

গোত্র i. Endomycetaceae

ii. Soceharomycetacem

বর্গ : ২ Taphrinales

গোত্র : i. Taphrinaceae

শ্রেণি : Plectomycetes

বর্গ ১ : Erysiphales

গোত্র ১ : Erysiphaceae

বর্গ ২ : Eurotiales

গোত্র ১. Ophiostomataceae

২. Gymnoascaceae

৩. Eurotiaceae

শ্রেণি : Pyrenomycetes

বর্গ ১ : Sphaeriales

গোত্র : Sordariaceae Xylariaceae

বর্গ ২ : Hypocreales

গোত্র : Hypocreaceae Clavipitaceae

শ্রেণি : Discomycetes

বর্গ : Helotiales

ঢাকনাবিহীন	বর্গ : Phacidiales
	বর্গ : Lecanorales
ঢাকনাযুক্ত	বর্গ : Pezizales
মৃদবর্তী	বর্গ : Tuberales

শ্রেণি : Laboulbeniomycetes :

বর্গ : Laboulbemiales

শ্রেণি : Loculoascemycetes

বর্গ : i. Capnodiales
ii. Dothidiales
iii. Hysteriales
iv. Microthyriales
v. Myriangiles
vi. Pleosporales

Ascomycetes-এর জাতিজনি

Ascomycetes-এর জাতিজনি সম্পর্কে দুটি ভিন্নধর্মী মত রয়েছে। Ascomycetes-এর ফ্লোরিডিয়ান পূর্বসূরি ধরে Sachs (১৮৭৫) একটি মতাদর্শ প্রচার করেন। Sachs এখানে Ascomycetes ও লোহিত শৈবালের সাথে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

১. উভয়ক্ষেত্রে স্পার্মাশিয়া উৎপন্ন হয় এবং একই কাজ করে থাকে।
২. উভয়ক্ষেত্রেই স্ত্রীজননাঙ্গ হতে ট্রাইকোগাইন উৎপন্ন হয়।
৩. উভয় গোষ্ঠীতেই যৌনজননের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।
৪. অ্যাসকোকার্প ও সিস্টোকার্প হলো প্রায় সমরূপ অঙ্গবিশেষ।
৫. থ্যালাসের কোষ হতে কোষে প্রাণসত্তার বহমানতা বিদ্যমান।
৬. উভয়ক্ষেত্রেই দেহের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য শীর্ষকোষের বিভাজন ও লম্বাটে হওয়ার লক্ষণ বিদ্যমান।

এ মতাদর্শটি উভয় গোষ্ঠীর শারীরবৃত্তীয় বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি কেননা। এ দুটোর শারীরবৃত্তে যথেষ্ট তফাৎ বিদ্যমান। কাজেই একটি অন্যটি হতে উদ্ভূত হতে পারে না। যে সাদৃশ্যটুকু দেখা যায় তা শুধু সমান্তরাল বিকাশ ধারার জন্যই বিদ্যমান।

DeBary (১৮৮৭) অন্য একটি অভিব্যক্তির ধারার কথা উল্লেখ করেন। তিনি Phycomycetes হতে Ascomycetes–এর উদ্ভবের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এ মতাদর্শের পক্ষে তাঁর যুক্তি হলো নিম্নরূপ :

১. জাইগোট হতে প্রত্যক্ষভাবে অ্যাসাই–এর বিকাশ।
২. রেণুস্থলী হতে কনিডিয়ামে বিকাশ।

এ মতাদর্শদ্বয়ের কোনোটিরই প্রমাণ তেমন জোরালো নয়, সেহেতু গ্রহণযোগ্য বলেও বিবেচিত হয় নি। এ মতবাদ দুটি ফ্লাজেলাযুক্ত পূর্বসূরি হতে Ascomycetes-এর উদ্ভবের সম্ভাবনাকে দূর করতে পারে না।

Phycomycetes ও Ascomycetes মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

	Phycomycetes	Ascomycetes
১. বসতি	১. অধিকাংশ প্রজাতিই জলজ ও অর্ধজলজ।	১. অধিকাংশ প্রজাতিই স্থলজ।
	২. বেশিরভাগ প্রজাতিই মৃতজীবী এবং কমসংখ্যক পরজীবী।	২. মৃতজীবী ও পরজীবী উভয় ধরনের প্রজাতিই রয়েছে।
২. অঙ্গজদেহ	৩. থ্যালাস এককোষী, এক কেন্দ্রিকাযুক্তহীন বিকাশমান হতে উন্নত সিনোসাইটিক মাইসেলিয়ামবিশিষ্ট।	৩. থ্যালাস ব্যবধায়কযুক্ত (ঈস্ট ছাড়া) ও প্লেকটেনকাইমীয় গঠনযুক্ত এবং প্রোজেনকাইমা ও সিউডোপ্যারেনকাইমায় শনাক্তযোগ্য।
৩. অযৌন জনন	৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেণুস্থলীর মধ্যে ফ্লাজেলাযুক্ত রেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন সংঘটিতহয়।	৪. এক্ষেত্রে রেণুস্থলীতে কোনো রেণু তৈরি হয় না ; তবে ফ্লাজেলাবিহীন রেণু তৈরি হয়।
	৫. জননকোষাধারে সুগঠিত গ্যামেট তৈরির মাধ্যমে যৌন জনন হয়।	৫. এক্ষেত্রে কোনো গ্যামেট তৈরি হয় না।
	৬. প্লাজমোগ্যামির সাথে সাথেই ক্যারিওগ্যামি হয়। তাই ডাইক্যারিয়ন ফেজ অনুপস্থিত।	৬. প্লাজমোগ্যামির পরক্ষণেই ক্যারিওগ্যামি হয় না বলে ডাইক্যারিয়ন ফেজ বিদ্যমান।
	৭. যৌনজননের ফলে কোনো ফলদেহ তৈরি হয় না।	৭. যৌনজননের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলদেহ তৈরি হয় ; একে অ্যাসকাস বলে।
	৮. স্ত্রী জননাঙ্গকে উগোনিয়াম বা স্ত্রীধানী বলে। এ কোষে কোনো প্রকার উপবৃদ্ধি বা ডাইক্যারিয়ন দশা দেখা যায় না।	৮. স্ত্রী জননাঙ্গকে অ্যাসকোগোনিয়াম বলে। প্লাজমোগ্যামি ঘটলে ট্রাইকোগাইন নামক উপবৃদ্ধি বিকাশ ও ডাইক্যারিয়ন দশা দেখায়।
	৯. রেণুস্থলীতে অসংখ্য সচল বা নিশ্চল প্রকৃতির রেণু উৎপন্ন হয়।	৯. অ্যাসকাসে সাধারণত ৮টি অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন হয়।

Ascomycetes-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Ascomycetes-ছত্রাকগুলো কিছু সংখ্যক প্রজাতি মানব সমাজের যেমন হিতকারী বান্ধব, তেমনি অপকারী শত্রুও বটে। আমাদের প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জীবনে এদের ভূমিকা সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো।

উপকারী ভূমিকা

১. বিশ শতকের এক বিস্ময়কর মহৌষধ 'পেনিসিলিন' হলো *Penicillin* ছত্রাকের নির্যাস।

২. *P. griseofulvum* হতে গ্রিসিওফুলভিন ওষুধটি যেমন ছত্রাকনাশক তেমনি মানুষের নখ ও চর্মের ছত্রাকঘটিত রোগ নিরাময়েও কার্যকর।

৩. *Clauiceps Purpurea* হতে যে 'আরগোট' পাওয়া যায় তা পৃথিবীর শত–সহস্র মহিলার জীবন রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. 'নীল পনির'–এর সুগন্ধ বৃদ্ধির জন্য *P. roqueforti* ও *P. camemberti* ব্যবহার করা হয়।

৫. *Aspergillus*–এর একটি প্রজাতি হতে Taka-diastase (টাকা–ডায়াস্টেজ) নামক ওষুধ ও *A. niger* হতে সাইট্রিক ও গ্লুটামিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়।

৬. *Penicillium*–এর কিছু প্রজাতি হতে ফিউমারিক, অক্সালিক, গ্লুকোনিক ও গ্যালিক অ্যাসিড তৈরি হয়।

৭. আমিষ ও ভিটামিন–এর উৎস হিসেবে ঈস্টকেক–এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য।

৮. গাঁজানো পদ্ধতিতে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য হতে অ্যালকোহল তৈরিতে ঈস্টের ব্যবহার রয়েছে।

৯. শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য হতে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় তৈরিতে *A. oryzae* ব্যবহৃত হয়।

১০. বেকারি–শিল্পে ব্যবহৃত 'বেকিং পাইডার ঈস্ট হতে প্রস্তুত হয়।

১১. জিবেরেলিন নামক বৃদ্ধি–হরমোনটি *G. fujikuroi* হতে প্রস্তুত হয়।

১২. *Morchella, Tuber* মানুষের উপাদেয় খাদ্যরূপে গণ্য।

১৩. *Saccharomyces, Neurospora, Ascobolus* প্রজাতির ছত্রাক বংশগতিবিষয়ক গবেষণা–উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১৪. ঈস্টে ভিটামিন 'বি'–এর উপাদান বিদ্যমান।

অপকারী ভূমিকা

প্রতিটি জীবেরই ভালো–মন্দ দিক থাকে। ছত্রাকও ব্যতিক্রমী নয়। ছত্রাক যেমন হিতকর তেমনি অহিতকর কাজও করে থাকে। *Chaetonium* গণভুক্ত ছত্রাকগুলো সেলুলোজ ধ্বংসকারীরূপে পরিচিত। *Penicillium*–এর কয়েকটি প্রজাতি লেবুজাতীয় ফল চামড়া ও সুতি কাপড়ের জন্য ক্ষতিকারক। *Neurospora sitophila* রুটির ছাতা রোগের কারণ। *Aspergillus* ছত্রাক— অ্যাসপারজিলোসিস এবং *Claviceps* আরগটিজম রোগের জন্য দায়ী। তাছাড়া বহু ফল ও উদ্ভিদের রোগের জন্যও এ শ্রেণির ছত্রাক দায়ী, যেমন মামড়ি পড়া ক্ষত, বাদামি পচন রোগ, ছাতা রোগ, মরিচা ঝুল রোগ প্রভৃতি। এজন্য এ শ্রেণির ছত্রাকগুলো মানুষের জঘন্যতম শত্রুরূপে বিবেচ্য।

নবম অধ্যায়

উপশ্রেণী—হেমিঅ্যাসকোমাইসেটিডি

Sub-Class : Hemiascomycetidae

সবচেয়ে সরল প্রকৃতির অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাকই এ উপশ্রেণিভুক্ত। অনেক ছত্রাকবিদ তাই এগুলোকে আদিম ও বিলুপ্তিমুখী ছত্রাক বলে বিবেচনা করেন। এসব ছত্রাকের গঠনশৈলী খুবই সরল প্রকৃতির। দুটি জননকোষাধারের সংশ্লেষের মাধ্যমে এদের যৌনজনন হয়ে থাকে। এ জননকোষাধার প্রায়ই একরকমের হয়ে থাকে (*Eremaseus*)। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন (*Dipodaseus*) ভিন্ন রকমের হয়। ফিউশন জননকোষাধারদ্বয় সরাসরি অ্যাসকাসে পরিণত হয় কিংবা বিকাশ মাধ্যমে অ্যাসকাস তৈরি করে থাকে। এ উপশ্রেণিটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. খুবই স্বল্পসংখ্যক মাইসেলিয়াম উৎপন্ন হয় কিংবা একেবারেই উৎপন্ন হয় না।

২. অ্যাসকোজেনাস হাইফি অনুপস্থিত।

৩. অ্যাসকোকার্প সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

৪. অ্যাসকোজেনাস হাইফির আগমন ছাড়াই সরাসরি অ্যাসকাসের বিকাশ হয়।

শ্রেণিবিভাগ

এ উপশ্রেণিটিতে প্রায় ২৫০টি প্রজাতি ও ৫০টি গণ রয়েছে এবং এগুলোকে দুটি বর্গভুক্ত করা হয়েছে :

১. বর্গ –Taphrinaler এ বর্গভুক্ত ছত্রাকগুলো প্রকৃত মাইসেলিয়ামযুক্ত। অ্যাসকোজেনাস কোষগুলো জাইগোট হতে উদগত হয় না, বরং দ্বি-কেন্দ্রিকাযুক্ত মাইসেলিয়াম হতে উৎপত্তিলাভ করে থাকে। ক্ল্যামাইডোরেণুর মতো প্রক্রিয়ায় এদের বিকাশ ঘটে। পেরিডিয়াম বা আবৃতকারী শিথবিহীনভাবে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত প্যালিসেডসদৃশ স্তরে অ্যাসাইগুলো অবস্থান করে। অনেক ছত্রাকবিদ এ বর্গে ১টি গোত্রে Taphrinaceae-তে একটি গণ *Ascomyces (Taphrina)* এর কথা উল্লেখ করেছেন। Kramer প্রমুখ ছত্রাকবিদগণ অন্য একটি গোত্র Protomycelaceae–এর কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে, এ বর্গে ৬টি গণ ও ১২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এ প্রজাতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *Ascomycea (Taphrina) deformans*–এ প্রজাতিটি পীচ গাছের পাতাকে আক্রমণ করে পাতাকে কুঁকড়ে দেয়, স্থূল করে ও ঝাঁঝরা করে দেয়।

২. বর্গ—Endomycetales এ বর্গটিকে Saccharomycetalesও বলা হয়। এখানে জাইগোট হতে সরাসরি অ্যাসাই বিকাশ লাভ করে কিংবা কখনও কখনও অপুংজনিকভাবে অ্যাসাইয়ের বিকাশলাভ ঘটে। দুটি জননকোষাধারের প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে বা দুটি অ্যাসকোরেণুর মিলনে কিংবা দুটি হ্যাপ্লয়ড দেহকোষের মিলনে জাইগোট তৈরি হয়ে থাকে।

এ বর্গের ছত্রাকের জীবনচক্রে কোনো ডাইক্যারিওফেজ নেই। কেননা, প্লাজমোগামির সাথে সাথেই ক্যারিওগ্যামি হয়ে যায়। এ গ্রন্থে শুধু এ বর্গটি সম্পর্কেই বিশদ আলোচনা করা হবে।

চিত্র ৯.১ :Ascomycetes. পোষক পাতার পৃষ্ঠদেশে *T. deformans*–এর হাইমেনিয়াল স্তরে আবরণবিহীন অ্যাসাই

বর্গ—Endomycetales

সাধারণ বৈশিষ্ট্য : Smith–এর বর্ণনা মতে এ বর্গে ১৪০টি প্রজাতি ও ৪৫টি গণ রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মৃতজীবী ও অন্যগুলো পরজীবী। এদের অঙ্গজ গঠন হ্রাসকৃত ; এমনকি এককোষীও হয়ে থাকে। দুটি কোষের মিলনের ফলে জাইগোট তৈরি হয় এবং এ জাইগোটই সরাসরি অ্যাসকাসে পরিণত হয়। অনেকক্ষেত্রে অপুংজনিকভাবে অ্যাসকাস তৈরি হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিপ্লয়ড জাইগোট মুকুলায়ন পদ্ধতিতে বহু সংখ্যক ডিপ্লয়ড কোষ তৈরি করে এবং প্রতিটি কোষ অ্যাসকাসে পরিণত হয়।

এ বর্গটিতে তিনটি গোত্র রয়েছে। Martin (১৯৬১) ৪টি গোত্রের (Ascoideaceae বা Diplodascaceae, Endomycetaceae, Spermophthoraceae ও Saccharomycetaceae) কথা উল্লেখ করেন। এখানে শুধু Saccharomycetaceae গোত্রটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

গোত্র—Saccharomycetaceae

Guiliermond (১৯৪০) উল্লেখ করেন যে, এ গোত্রটিতে একগুচ্ছ হ্রাসকৃত ও পশ্চাৎমুখী অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাক রয়েছে। এগুলো ঈস্ট নামে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে ঈস্ট কি? এগুলো মাইসেলিয়ামবিহীন অ্যাসকোমাইসেটিস নামীয় ছত্রাক ; এদের কোনো ফলদেহ তৈরি হয় না। এদের স্বাভাবিক ও প্রকট বৃদ্ধি হলো গোলাকার, ডিম্বাকার বা ক্ষুদ্র নলাকার হতে বেলনাকার। ঈস্টের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. থ্যালাস মাইসেলিয়ামবিহীন ও আঙ্গিকভাবে এককোষী।
২. অযৌনভাবে মুকুলায়ন বা ফিশন, কখনও বা উভয় পদ্ধতিতে জনন কাজ হতে থাকে।
৩. সমাকৃতি বা বিষমাকৃতি দুটি কোষের মিলনে বা অপুংজনিকভাবে উৎপন্ন জাইগোট সরাসরি অ্যাসকাসে পরিণত হয় ও অ্যাসকোরেণু উৎপন্ন করে।

৪. অ্যাসকাস অনাবৃত থাকে।

৫. অধিকাংশ ঈস্টই কিছু কিছু শর্করাকে গাজাতে পারে। কিছু সংখ্যক ঈস্টে অ্যাসকোরেণু তৈরি হয় না, তবে ঈস্ট গঠনকারী অ্যাসরেণুর সাথে সাদৃশ্য দেখায়। রেণুবিহীন ঈস্টকে asporogenons ঈস্ট এবং রেণু উৎপাদনকারী ঈস্টকে ascosporogenous বা ascosporic ঈস্ট বলে। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ ascosporogenous ঈস্টকে Saccharomycetaceae গোত্র বহির্ভূত বলে মনে করেন।

স্বভাব ও বসতি

অধিকাংশ ঈস্টই মৃতজীবী। এদের বিস্তার ও বিস্তৃতি ব্যাকটেরিয়ার মতোই বিশ্বব্যাপী। জৈব পদার্থসমৃদ্ধ মৃত্তিকা, পচনশীল ও শর্করাযুক্ত শাক-সবজি পাকা ফল, শস্যকণা, ফুলের মধুগ্রন্থি প্রভৃতিতে বহুলভাবে ঈস্ট জন্মে থাকে। মোট কথা, দ্রবণীয় শর্করাসমৃদ্ধ যে কোনো মাধ্যমে মৃতজীবী ছত্রাকরূপে ঈস্ট জন্মে। অবশ্য কিছু কিছু প্রজাতি পরজীবীরূপেও পাওয়া যায়। মানুষসহ প্রাণী ও উদ্ভিদকে আক্রমণ করে পরজীবীরূপে জীবনযাপন করে। এতে জীবের খুব সামান্যই ক্ষতি হয়। ঈস্ট পরজীবীগুলো মানুষকে আক্রমণ করে blastomycosis ও torulosis রোগ সৃষ্টি করে।

Lodder ও Kreger-van Rij (১৯৫৩) এর মতে, অ্যাসকোস্পরিক ঈস্ট বা প্রকৃত ঈস্ট ছত্রাকের প্রজাতি সংখ্যা ৬৮ ও গণ ১৪। এর মধ্যে ৩টি গণ প্রাণী-পরজীবী। প্রকৃত ঈস্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : *Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Debaromyces, Saccharomycodes, Nodosonia, Pichia* ও *Hanschula.*

প্রকারভেদ : অযৌন জনন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ঈস্টকে তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় ; যেমন—

১. **মুকুলায়ন ঈস্ট :** এ জাতীয় ঈস্টগুলো মুকুলায়ন পদ্ধতিতে অযৌনভাবে জনন কাজ সমাধা করে। এক্ষেত্রে পিতৃঈস্ট কোষটি কুঁড়ি দেয়। এ কুঁড়িই অপত্য কোষরূপে কাজ করে। মুকুলায়ন ঈস্টের প্রকৃষ্ট উদাহরণ *Saccharomyces* গণভুক্ত প্রজাতিগুলো। এ গণে ৩০টি প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে দুটি *S. cerrvisiae* ও *S. allipsoideus* আর্থ-সামাজিক দিক হতে খুবই তাৎপর্যবহ। প্রথমটি অ্যালকোহল গাঁজনের প্রভাবক হিসেবেও পাউরুটি প্রস্তুতকরণে এবং দ্বিতীয়টি মদ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়।

২. **ফিশন ঈস্ট :** এ জাতীয় ঈস্টগুলো অযৌনভাবে দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে দুটি সমান অপত্য কোষে বিভক্ত হয়ে জনন কাজ চালায়। এ পদ্ধতিকে বলে ফিশন। এ ধরনের ঈস্টের উত্তম উদাহরণ হলো *Schizosaccharsmyces* গণভুক্ত প্রজাতিগুলো। এ গণে ৩টি প্রজাতি পাওয়া যায়। এ প্রজাতিত্রয়ের মধ্যে *S. octosporus* সুপরিচিত।

৩. **হেলোবিয়াল ঈস্ট :** এ ধরনের ঈস্টগুলোর অযৌন জনন হলো মুকুলায়ন ও ফিশনের মাঝামাঝি ধরনের তথা এ দুটি পদ্ধতির সম্বন্বিত রূপ। মাতৃকোষ হতে কুঁড়ি উদগত হয় এবং ব্যবধায়ক তৈরির মাধ্যমে মাতৃদেহ হতে পৃথক হয়ে যায়। *Saccharomycotes* এ ধরনের একটি গণ। এ গণের পরিচিত প্রজাতিটি হচ্ছে *S. ludwigii.*

সর্বাধিক অনুশীলিত ঈস্টটি হচ্ছে *Saccharomyces cerevisiae* এখানে এটি সম্পর্কেই বিশদ আলোচনা করা হবে।

Saccharomyces cerevisiae

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ—Plantae

শ্রেণি—Ascomycetes

উপশ্রেণি—Hemiascomycetes

বর্গ—Endomycetales

গোত্র—Saccharomycetaceae

গণ—*Saccharomyces*

প্রজাতি—*S. ccerevisiae*

স্বভাব ও বসতি

থ্যালাস : ঈস্ট এককোষী ছত্রাক। কোষগুলো পরস্পর শিকলাকারে যুক্ত হয়ে সিউডোমাইসেলিয়াম গঠন করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো মাইসেলিয়ামবিহীন। এ কোষগুলো আকারে খুবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের । এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার, লম্বাটে বা আয়তাকার হতে পারে। এদের অবস্থান অবস্থিতি ও বয়স অনুসারে কোষগুলোর আকার ও প্রকারে বহুরূপতা দেখা যায়।

ঈস্ট কোষের দৈর্ঘ্য ৩ থেকে ১৫ মাইক্রোমিটার এবং ব্যাস ২ থেকে ৮ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ঈস্টের কোষপ্রাচীর খুবই পাতলা এবং এটির প্রকৃতি সম্পর্কে নানা অভিমত বিদ্যমান।

কোষপ্রাচীর : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈস্টের কোষপ্রাচীর খুবই পাতলা। X-রশ্মির বিচ্ছুরণ, ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, প্রোটিন লিপিড এবং ম্যানান ও গ্লুকোন নামক দু'ধরনের পলিস্যাকারাইডের মিশ্রণে ঈস্টের কোষপ্রাচীরনির্মিত। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ ঈস্টের কোষপ্রাচীরে অন্যান্য যৌগের সাথে কাইটিনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকেই তা অস্বীকারও করেছেন।

প্রোটোপ্লাস্ট : পর্দার একক গুণযুক্ত, আঁকা-বাঁকাভাবে সজ্জিত কোষপর্দাবৃত অংশকে প্রোটোপ্লাস্ট বলে। সাধারণত একটি ছোট কেন্দ্রিকা ও প্রাণসত্তা নিয়ে ঈস্ট-কোষের প্রোটোপ্লাস্ট গঠিত। প্রাণসত্তাটি দুটি স্তরে বিভেদিত—বাইরের স্তরটি খুবই পাতলা এবং এক্টোপ্লাজম (ectoplasm) নামে পরিচিত ; ভিতরের স্তরটি ঘন, দানাদার এবং এন্ডোপ্লাজম (endoplasm) নামে অভিহিত।

কোষের অন্যান্য ক্ষুদ্রাঙ্গ—যেমন রাইবোজম, সঞ্চিত খাদ্যকণা মাইটোকনড্রিয়া, কেন্দ্রিকা প্রভৃতি এন্ডোপ্লাজমের অভ্যন্তরেই থাকে। প্রতিটি কোষের মাঝখানে একটি বড় ধরনের গহ্বর থাকে। গহ্বরের একটি নিজস্ব আরবণী পর্দা থাকে। এর মধ্যে অসংখ্য ভলিউটিন নামক ঘন দানাদার পদার্থ থাকে। RNA, লাইপোপ্রোটিন ও কয়েক ধরনের পলি-ফসফেট নিয়ে ভলিউটিন কণা গঠিত। গহ্বরের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে তন্তুগুলো জালিকার সৃষ্টি করে থাকে, সেগুলোকেই ক্রোমাটিন জালিকা বলে। ইন্ডোপ্লাজমে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে গ্লাইকোজেন, তেলবিন্দু ও প্রোটিনের দানা দেখা যায়। কেন্দ্রিকাটি দ্বিস্তরীয়, রন্ধ্রযুক্ত পর্দা দিয়ে বেষ্টিত থাকে ; একে নিউক্লীয় পর্দা বলে। মনে করা হয় যে, এটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত : বড় অংশটি ক্যালোজেন দিয়ে

রঞ্জিত হয় এবং ছোট অংশটি রঞ্জিত হয় না। Wager উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রিকাটি সমসত্ত্ব ও কেন্দ্রিকাণুবিশিষ্ট। Lindegren এ তথ্য স্বীকার করেন এবং Wager যাকে কেন্দ্রিকাণু বলে ধারণা করেন, সেটি হচ্ছে সেন্ট্রোজম। কিন্তু Guillermond উল্লেখ করেন যে, ঈস্ট কোষে একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর থাকে, যা কেন্দ্রিকার অংশ নয়। পরবর্তীতে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এ প্রত্যয় সত্যায়িত হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় গহ্বরের নিকটবর্তী স্থানে একটি ছোট কেন্দ্রিকা রয়েছে (Moor, Muhlethals, ১৯৬৩)। অবশ্য কোনো ছত্রাকবিদই কেন্দ্রিকাণুর উপস্থিতি স্বীকার করেন নি। তবে একটি ঈস্টকোষে একাধিক কেন্দ্রিকা থাকতে পারে।

চিত্র ৯.২ : *Saccharomyces* কোষ ও এর বিভিন্ন অংশ

পুষ্টি : অন্যান্য ছত্রাকের মতোই ঈস্টে কোনো সবুজ কণিকা থাকে না। সেহেতু, পুষ্টির দিক হতে এদের হেটারোট্রফিক বলা হয়। এগুলো মৃতজীবী হিসেবে পচা বা পচনশীল জৈব দ্রব্য, শর্করাযুক্ত যে কোনো মাধ্যমে জন্মে 'রেডিমেড' খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। মদ-শিল্পে ব্যবহৃত ঈস্টগুলো দ্রবণের সরল-শর্করা গ্রহণ করে থাকে। এদের পুষ্টিজাত দ্রব্যে সি, এইচ,ও, এন, পি, কে, এস, এমজি, এফই, জেডএন, সিইউ, এমবি, ও এমএন থাকে। ধাতব দ্রব্যগুলো উৎসেচককে ক্রিয়াশীল করার জন্য কিংবা উৎসেচকের উপকরণ হিসেবে কাজ করে। শর্করা বা স্টার্চ হতে কার্বন নিশ্চিত হয়। বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য আরও ভিটামিনসদৃশ বৃদ্ধি উপাদানের প্রয়োজন হয়। একেই 'বায়োস' (bios) বলে। এটি সামান্য মাত্রাতেও ক্রিয়াশীল হয়।

সাধারণত ঈস্ট কোষগুলো আশ্রয়ের উপর উৎসেচক নিঃসরণ করে থাকে। এ উৎসেচকগুলোকে সমষ্টিগতভাবে জাইমেজ বলে। এ জাইমেজ উৎসেচক আশ্রয়ের স্টার্চ বা শর্করাজাত দ্রব্যগুলোকে সরল চিনিতে পরিবর্তিত করে। পরে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পাতলা, নরম কোষপর্দার মধ্য দিয়ে এন্ডোপ্লাজমে চলে আসে। এ ব্যাপনকৃত চিনিই ঈস্টের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ও শোষিত হয়। ঈস্টকোষগুলো যখন কোনো পর্যাপ্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ আশ্রয়ের উপর জন্মে তখন অবশিষ্ট চিনিগুলো শ্বসনের ফলেই জারিত হয় :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{শক্তি}$$

এ ধরনের দ্রবণে ঈস্ট কোষগুলো দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু যে মাধ্যমে অক্সিজেন থাকে না বা উপস্থিতি কম সেখানে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির হারও কম এবং বেশিরভাগ চিনিই প্রাণসত্তায় CO_2 ও ইথাইল অ্যালকোহল যুক্ত করে।

$$C_6H_{12}O_6 + \text{ঈস্ট} \longrightarrow 2\, C_2H_5OH + CO_2 + \text{শক্তি}$$

কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালকোহল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষমুক্ত হয়। অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কার্বোহাইড্রেটের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যালকোহলে রূপান্তরকে অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন বলে। এ পদ্ধতিটিই মদ ও রুটিশিল্পে ব্যবহৃত হয়। শ্বসনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তা ঈস্টেরই জৈবনিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

বৃদ্ধি : কোষের আকার-আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমেই তা নিশ্চিত হয়।

জনন : ঈস্ট কোষগুলো ৩টি উপায়ে সংখ্যাবৃদ্ধির কাজ করে থাকে—

১. অঙ্গজভাবে

২. অযৌনভাবে এবং

৩. যৌনভাবে।

অযৌভাবে সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অযৌন জনন এবং যৌনভাবে সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে যৌন জনন বলা হয়।

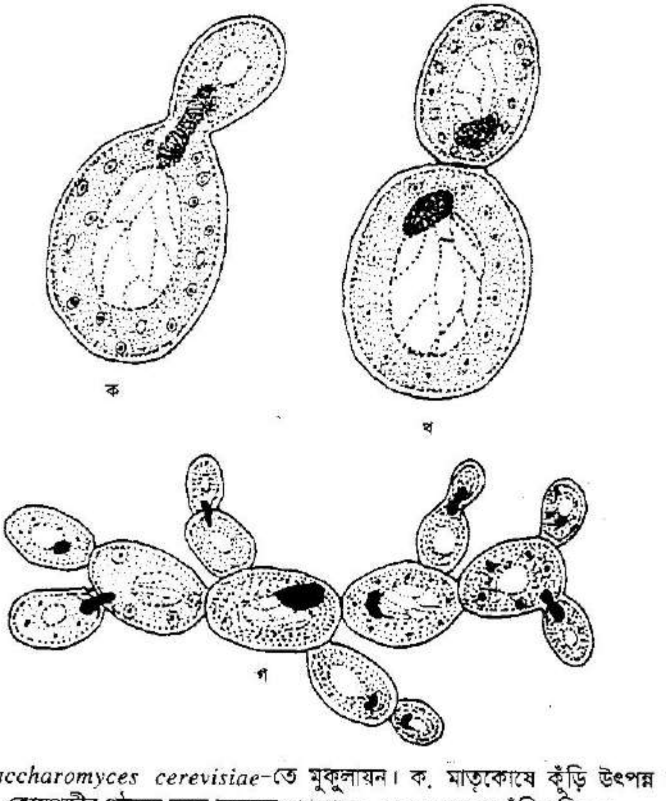

চিত্র ৯.৩ *Saccharomyces cerevisiae*-তে মুকুলায়ন। ক. মাতৃকোষে কুঁড়ি উৎপন্ন হচ্ছে ; খ. কোষপ্রাচীর গঠনের ফলে মুকুলের পৃথকায়ন ; গ. মাতৃকোষে কুঁড়ির শিকল

অঙ্গজ জনন : অঙ্গজ জনন দু'ধরনের হয়ে থাকে—

১. মুকুলায়ন—যা অধিকাংশ ঈস্টেই দেখা যায় এবং

২. কোষ বিভাজন বা ফিশন যা শুধু ফিশন ঈস্টেই দেখায়।

১. মুকুলায়ন পদ্ধতি—অনুকূল পরিবেশে *Saccharomyces cerevisiae* এ পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। ঈস্টের অনুকূল পরিবেশ বলতে পুষ্টিজাত দ্রব্য চিনি বা শর্করা দ্রবণ ও অক্সিজেনের উপস্থিতি বুঝায়। মুকুলায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে, ঈস্ট কোষের একপ্রান্তের কোষপ্রাচীর নরম ও পাতলা হয়ে যায় এবং এ স্থানের প্রোটোপ্লাস্ট কোষপর্দাসহ স্ফীত হয়ে উপবৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। এটি আকারে বড় হয়। একেই মুকুল বা কুঁড়ি বলে। মাতৃকোষটির কেন্দ্রিকা, প্রাণসত্তা ও অন্যান্য অঙ্গাণু মুকুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এ সাথেই কুঁড়ির মধ্যে কেন্দ্রীয় গহ্বরের বিকাশ ঘটে। এখানে কেন্দ্রিকার বিভাজন মাইটোটিক বা অ্যামাইটোটিক হতে পারে। মুকুলটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং কুঁড়ির উৎপত্তিস্থলে কোষপ্রাচীর গঠনকারী পদার্থ নিঃসৃত হয়ে মাতৃকোষ ও মুকুলের মধ্যে প্রাণসত্তার যোগসূত্র বন্ধ হয়ে যায় ; ফলে মাতৃকোষ হতে মুকুলটি পৃথক হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, মুকুলটি মাতৃকোষ হতে পৃথক হয়ে গেলেও মাতৃদেহে একটি চিহ্ন রেখে যায় ; একেই বলে মুকুলক্ষত (bud scar) এবং মুকুলটিতেও একটি চিহ্ন থাকে। একে বলে জন্মক্ষত (birth scar) । কখনও কখনও মুকুলায়ন প্রক্রিয়াটি এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, ধারাবাহিক মুকুলগুলো পরস্পর হতে পৃথক না হয়ে সংযুক্ত থেকে এক বা একাধিক শিকল তৈরি করে ; একেই সিউডোমাইসেলিয়াম বলে। সামান্য কারণে শিকল ভেঙে যেতে পারে এবং প্রতিটি কোষ এক একটি ঈস্টে পরিণত হয়।

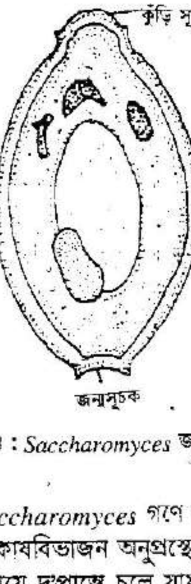

চিত্র ৯.৪ : *Saccharomyces* জন্ম ও কুঁড়ি

কোষবিভাজন বা ফিশন : *Saccharomyces* গণে না হলেও Fisson yeast-এ এ ধরনের অঙ্গজ জনন দেখা যায়। এখানে কোষবিভাজন অনুপ্রস্থে হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে মাতৃকোষটি দীর্ঘ হয় এবং কেন্দ্রিকাটি বিভক্ত হয়ে দু'প্রান্তে চলে যায়। ইতোমধ্যে কোষের মধ্যবর্তী অংশে একটি কোষপ্রাচীর উৎপন্ন হয়ে মাতৃকোষটিকে সমান দুটি অংশে ভাগ করে দেয়। কোষপ্রাচীর সমন্বিত এককেন্দ্রিকাযুক্ত কোষদ্বয় কিছুকাল একত্রিত থাকার পর পৃথক হয়ে যায়। ফলে দুটি অপত্য কোষের উদ্ভব ঘটে। পরে অপত্য কোষদ্বয় পরিণত কোষের ন্যায় আচরণ করে।

অযৌন জনন : স্বাভাবিকভাবে প্রতিকূল অবস্থায় যখন শর্করার পরিমাণ খুবই কমে যায় তখন মৃতজীবী ঈস্ট ছত্রাকগুলো অযৌন পদ্ধতিতে জনন কাজ চালায়। অবশ্য প্রচুর খাদ্যসমৃদ্ধ আবাদ

মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে *S. cerevisiae*-তে অযৌন জনন ঘটানো সম্ভব হয়েছে (Wetten, ১৯১৪)। এ ক্ষেত্রে, ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে প্রাণসত্তার পৃথকীকরণ ও কেন্দ্রিকার মিওটিক বিভাজন সম্পন্ন হয়।

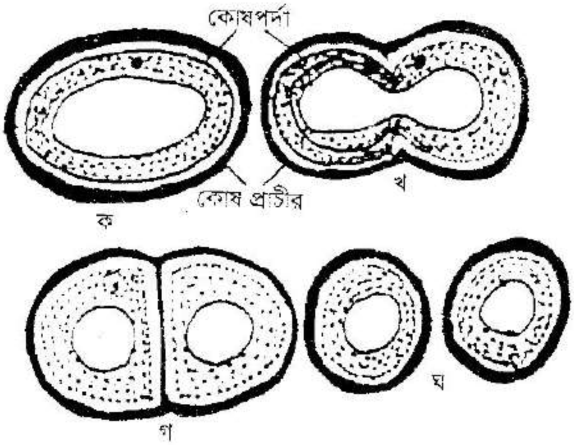

চিত্র ৯.৫ : Schizosaccharomyces. ক-খ. Fission পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা ; ঘ. অপত্যকোষের জন্ম

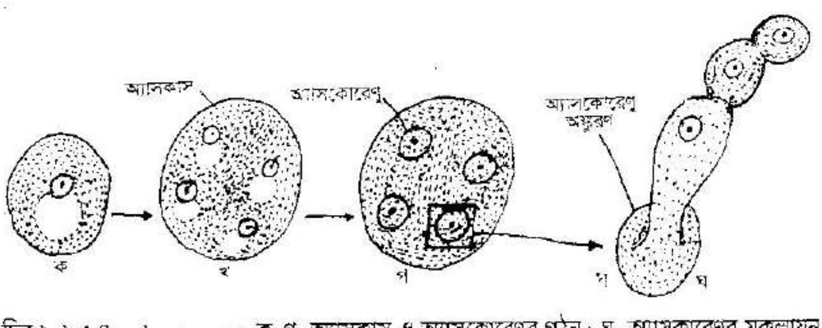

চিত্র ৯.৬ : *Saccharomyces.* ক–গ. অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণুর গঠন ; ঘ. অ্যাসকারেণুর মুকুলায়ন

স্বাভাবিক পরিবেশে এ প্রক্রিয়ায় কোষটি আকারে বড় হয় এবং O_2 পেলে কেন্দ্রিকাটি ৪টি বা ৮টি অপত্য কেন্দ্রিকায় পরিণত হয়। প্রতিটি কেন্দ্রিকার চারদিকে কিছু পরিমাণ প্রাণসত্তা সঞ্চিত হয় ও কোষপ্রাচীরবেষ্টিত হয়ে অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। অ্যাসকোরেণুগুলোকে বিশ্রাম-রেণুও বলে ; কারণ এগুলো প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে সক্ষম। যাহোক, এ ৪টি বা ৮টি অ্যাসকোরেণু গঠিত কোষটিকে অ্যাসকাস বলে। অনুকূল অবস্থার আগমনে অ্যাসকাস প্রাচীর বিদীর্ণ হয় ও অ্যাসকোরেণুগুলো নির্গত হয়। এসব নির্গত রেণু বায়ুবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিবেশের অনুকূলতায় অঙ্কুরিত হয়। এ সময় এরা মুকুলায়নসম পদ্ধতি অনুসরণ করে।

যৌন জনন : পূর্বে ধারণা করা হতো যে, ঈস্টে কোনো প্রকার যৌনজনন নেই। কিন্তু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী উইংগে (১৯৩৫) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এদের দুটি সমাকৃতি বা বিষমাকৃতি

গ্যামেটের মিলনের ফলে যৌনজনন ঘটে থাকে। দুটি অঙ্গজ কোষ বা অ্যাসকোরেণু মিলিত হতে পারে, যাকে প্লাজমোগ্যামি বলে। আবার যখন মাতৃকোষের সাথে অপত্যকোষের মিলন হয়, তাকে পেডোগ্যামি (pedogamy) বলে এবং মিলিত কোষের কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মিলনকে ক্যারিওগ্যামি (karyogamy) বলে। *Zygosaccharomyces chevalieri*–তে পেডোগ্যামি দেখা যায়। ঈস্ট কোষ হোমোথ্যালিক বা হেটারোথ্যালিক হতে পারে। হোমোথ্যালিক ঈস্টে আইসোগ্যামীয় যৌনজনন এবং হেটারোথ্যালিক ঈস্টে অ্যানাইসোগ্যামীয় যৌন জনন দেখা যায়।

Saccharomyces দু'ধরনের দেহকোষ দেখা যায় যেমন—

১. ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন ঈস্ট কোষ : এগুলো আকারে ছোট ও গোলাকৃতির হ্যাপ্লয়ড কোষ। এগুলো সাধারণত মুকুলায়ন মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্যের অভাবে দুটি এককোষী ঈস্টকোষ মিলিত হয়ে যৌন জনন ঘটায়। ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন কোষগুলো দু'ধরনের বা বিষম প্রকৃতিযুক্ত হয়ে থাকে ; যেমন (+) স্ট্রেইন ও (–) স্টেইন। এগুলো জনন কোষাধার রূপে কাজ করে। (+) ও (–) জননকোষাধারদ্বয়ের মিলনের পূর্বে উভয় কোষের সামনের দিকে সংশ্লেষ স্ফীত তৈরি হয়। এ সংশ্লেষ স্ফীতদ্বয় পরস্পর মিলিত হলে উভয়ের মধ্যবর্তী প্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে সংশ্লেষ নালি তৈরি হয়। ফলে কোষদ্বয়ের মিলন পূর্ণ হয় এবং কেন্দ্রিকাদ্বয় পাশাপাশি অবস্থান করে ডাইক্যারিয়ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একেই বলে প্লাজমোগ্যামি। অতঃপর কেন্দ্রিকাদ্বয় মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকায় পরিণত হয় : একেই বলে ক্যারিওগ্যামি। এটিকে নিষেকের সমতুল্য বলা যেতে পারে। ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটিকে সিনক্যারিয়ন ও বহনকারী কোষটিকে জাইগোট বলা যেতে পারে। কাজেই ডোয়ার্ফ স্টেইনটিকে হ্যাপ্লোফেজ দশার প্রতিভূ বলা যায়।

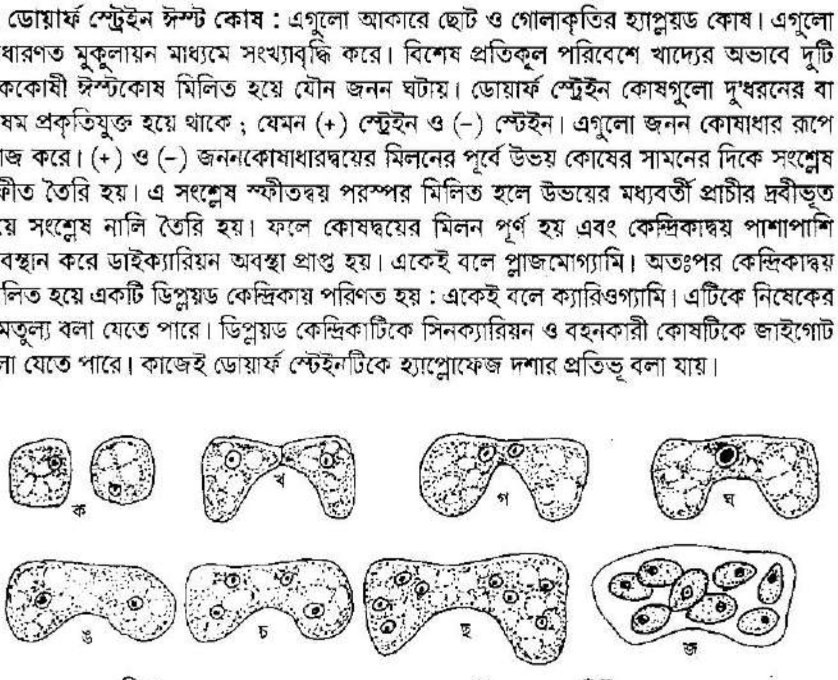

চিত্র ৯.৭ : *Saccharomyces cerevisiae* যৌন জননের বিভিন্ন অবস্থা

২. ঈস্টের বড় কোষ : এগুলো আকারে বড় ডিপ্লয়ড কোষ। এদের আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকৃতি। এগুলোই পাউরুটি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ঈস্টের এ বড় আকারের ডিপ্লয়ড কোষগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে জাইগোটকেই বুঝায়। জাইগোট কোষ অনুকূল পরিবেশ পেলে মুকুলায়ন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে কিংবা প্রতিকূল পরিবেশ হলে জাইগোটটি সরাসরি অ্যাসকাসে পরিণত হয় এবং মিওটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে ৪টি বা ৮টি গোলাকার বা ডিম্বাকার অ্যাসকোরেণু তৈরি করে। এগুলো তাই হ্যাপ্লয়ড প্রকৃতির।

বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশের আগমনে অ্যাসাই বিদীর্ণ হলে অ্যাসকোরেণুর মুক্তি ঘটে। অ্যাসকোরেণু গোলাকার। এগুলো অঙ্কুরিত হয়ে ছোট আকারের দেহকোষ দেয় ; এগুলোই ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন। এ ডোয়ার্ফ স্ট্রেইনের দেহকোষগুলো বিষম গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এগুলো

কিছুকাল মুকুলায়ন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। এগুলোই জননকোষাধাররূপে কাজ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ঈস্টের হ্যাপ্লোফেজ ও ডিপ্লোফেজ উভয় দশা দুটিই সমান অর্থবহ।

চিত্র ৯.৮ : *S. cerevisiae* অ্যাসকোরেণুর অঙ্কুরণ

Guillermond (১৯৪০) ঈস্টের যৌনজনন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং তা অপরের সামনে প্রদর্শনও করেন। তাঁর মতে ঈস্টে তিন ধরনের যৌনজনন বর্তমান। এগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

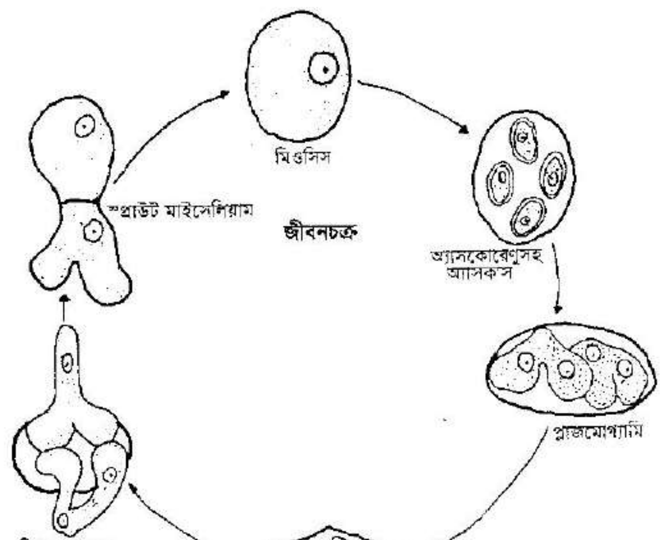

চিত্র ৯.৯ : *Saccharomycode ludwigii* যৌনজনন চক্র

১. *Saccharomyces ludwigii*–তে অ্যাসকোরেণুগুলো সরাসরি জননকোষাধাররূপে কাজ করে ও পরস্পর মিলিত হয়। তাদের যৌন মিলন অ্যাসকাসের মধ্যেই হয়ে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাসকোরেণু দুটি বিপরীত গুণবিশিষ্ট (+ ও -) হয়ে থাকে। তাদের মিলনে দুটি ডিপ্লয়ড রেণু–জাইগোট তৈরি হয়। এ রেণু–জাইগোট দুটি অ্যাসকাসের মধ্যেই থাকে। অঙ্কুরণের সময় প্রতিটি রেণু–জাইগোট হতে একটি করে অঙ্কুরনল বের হয়। এ অঙ্কুরনল অ্যাসকাসের প্রাচীর বিদীর্ণ

করে বহির্গত হয় এবং স্প্রাউট মাইসেলিয়াম (Sprout mycelium) হিসেবে কাজ করে। এটি ক্রমে মুকুলায়ন পদ্ধতিতে ডিপ্লয়ড দেহকোষ তৈরি করে। এগুলো পরে স্প্রাউট হতে ব্যবধায়ক প্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথক হয়ে যায় এবং অ্যাসকাস মাতৃকোষ হিসেবে কাজ করে। ক্রমে এগুলো অ্যাসকাসে পরিণত হয় এবং এদের ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে ৪টি হ্যাপ্লয়ড অ্যাসকোরেণু দেয়। এদের মধ্যে দুটি ঋনাত্মক (–) গুণযুক্ত ও অন্য দুটি ধনাত্মক (+) গুণবিশিষ্ট। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এ ঈস্টটির হ্যাপ্লোফেজ (গ্যামেটোফাইট) দশাটি খুবই ছোট। এটিতে শুধু অ্যাসকোরেণু বিদ্যমান।

২. *Schizosaccharomyces octosporus* নামক ফিশন ঈস্ট আবার অন্যরকম। এখানে ডিপ্লোফেজটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে থাকে। এ দশায় শুধু জাইগোট কোষটিই প্রতিনিধিত্ব করে।

এখানে দেহকোষগুলো লম্বাটে, এককেন্দ্রিকাযুক্ত ও হ্যাপ্লয়ড। এগুলো ফিশন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। এখানে প্রতিটি হ্যাপ্লয়ড দেহকোষ জনন কোষাধাররূপে কাজ করে। এ প্রজাতিটি হোমোথ্যালিক বলে দুটি সমাকৃতির দেহকোষ পাশাপাশি অবস্থান করে। কোষদ্বয়ের প্রতিটি হতে সরু ঠোঁটসদৃশ উপবৃদ্ধি নির্গত হয়ে মিলিত হয় এবং এদের অগ্রস্থ প্রাচীর দুটি দ্রবীভূত হয়ে একটি সংশ্লেষনালি গঠন করে।

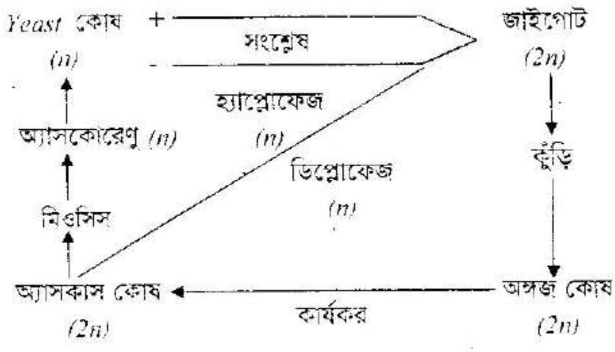

চিত্র ৯.১০ : *Schizosaccharomyces octosporus*–এ যৌন জনন

সংশ্লেষজড়িত কোষদ্বয়ের কেন্দ্রিকা দুটি সংশ্লেষনালির মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা গঠন করে। সংশ্লেষ নালিটি ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে ডাম্বেলের আকার ধারণ করে ; একেই কোষ জাইগোট বলে। পরে এটি অ্যাসকাস মাতৃকোষে পরিণত হয়। ডিপ্লয়ড জাইগোট কেন্দ্রিকাটি পর পর দু'বার বিভক্ত হয়ে ৮টি হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা উৎপন্ন করে। প্রথম বিভাজনটি মিওটিক ও দ্বিতীয়টি মাইটোটিক। প্রতিটি কেন্দ্রিকা কিছু পরিমাণ প্রাণসত্তাসহ প্রাচীরবেষ্টিত হয়ে ৮টি অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। এগুলো অ্যাসকাস নামক মাতৃকোষের মধ্যেই থাকে। অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু পরিণত হলে অ্যাসকাস প্রাচীর বিদীর্ণ হয় ও অ্যাসকোরেণুগুলো মুক্ত হয়। এগুলো অনুকূল পরিবেশ পেলে অঙ্কুরিত হয় এবং ফিশন পদ্ধতি দ্রুত জনন কাজ সম্পন্ন করে ও অঙ্গজ কোষের ন্যায় আচরণ করে। এখানে হ্যাপ্লোফেজটি দীর্ঘ ও ডিপ্লোফেজটি ছোট।

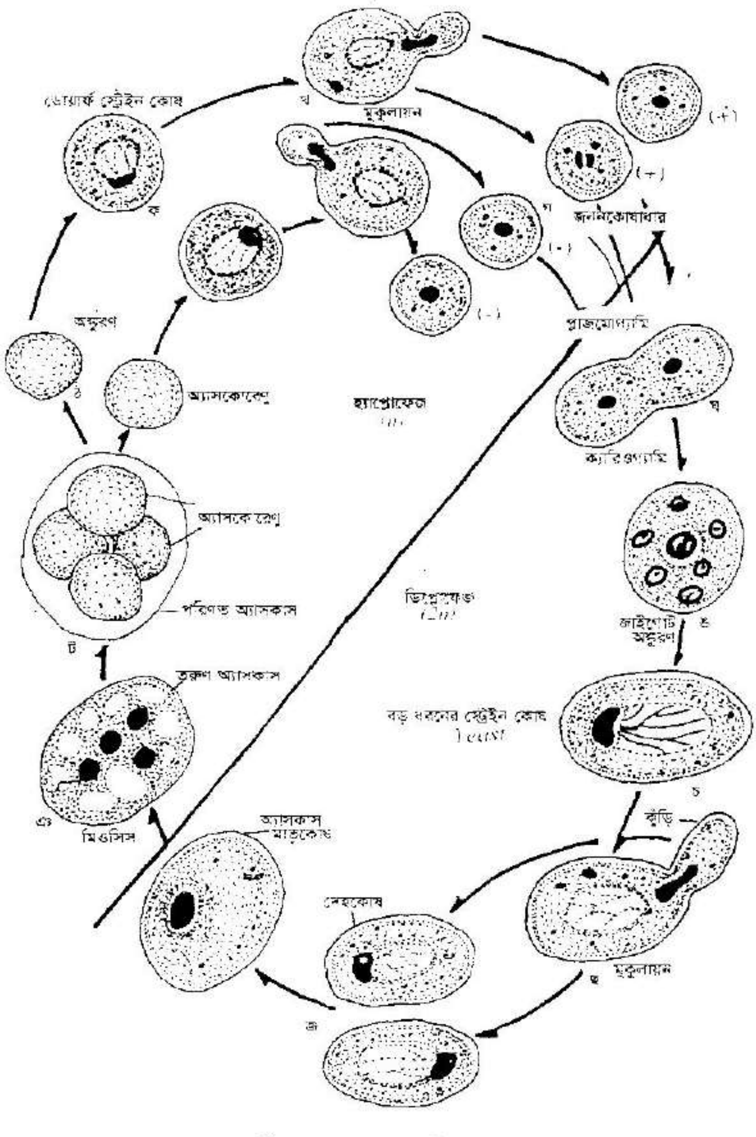

চিত্র ৯.১১ : ঈস্টের জীবনচক্র

জীবনচক্র

Guillermond (১৯৪০) ঈস্টে তিন ধরনের জীবনচক্র দেখতে পান—

১. হ্যাপ্লোবায়োন্টিক,

২. ডিপ্লোবায়োন্টিক ও

৩. হ্যাপ্লো–ডিপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র।

এ ধরনের জীবনচক্রের প্রতিটিতে আবার দুটি করে দশা বিদ্যমান–

ক. স্পোরোফাইটিক বা ডিপ্লোফেজ এবং

খ. গ্যামেটোফাইটিক বা হ্যাপ্লোফেজ।

ডিপ্লোফেজ দশাটির প্রতিনিধিত্ব করে বড় স্ট্রেইন বা জাইগোট ও অ্যামাই। পক্ষান্তরে হ্যাপ্লোফেজের প্রতিনিধি হলো ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন ও অ্যাসকোরেণু।

১. **হ্যাপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র :** এ ধরনের জীবনচক্র প্রধানত *Saccharomyces octosporus* নামক প্রজাতির ঈস্টে দেখা যায়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, হ্যাপ্লোফেজটি বেশ দীর্ঘ হয় এবং ডিপ্লোফেজ অবস্থাটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। যেহেতু এখানে হ্যাপ্লয়ড দশার প্রাধান্য রয়েছে, সেহেতু এ জীবনচক্রকে হ্যাপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র বলে।

২. **ডিপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র :** *Saccharomyces ludwigii*—প্রজাতির ঈস্ট ছত্রাকে এ জাতীয় জীবনচক্র দেখা যায়। এ সম্পর্কেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জীবনচক্রের হ্যাপ্লোফেজ ও ডিপ্লোফেজের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক। ডিপ্লোফেজ অবস্থাটি দীর্ঘ বা প্রাধান্যজড়িত এবং হ্যাপ্লোফেজ দশাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তাই এটিকে ডিপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র বলে।

৩. **হ্যাপ্লো–ডিপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র :** এ জাতীয় জীবনচক্র প্রধানত *Saccharomyces cerevisiae* নামক প্রজাতির ঈস্ট ছত্রাকে দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কেও পূর্বে ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন ও বড় স্ট্রেইন হিসেবে আলোচনা করেছি। এখানে এটুকু বলা যায় যে, এ ধরনের জীবনচক্রে হ্যাপ্লোফেজ ও ডিপ্লোফেজ দশার গুরুত্ব মোটামুটি সমান ও সুস্পষ্ট। আবার এও বলা যেতে পারে যে, এখানে জনুক্রমও সুস্পষ্ট। কারণ হ্যাপ্লয়ড জনু ও ডিপ্লয়ড জনু পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

ঈস্টের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ঈস্ট মানবজীবনের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে যেমন বিভিন্নভাবে কাজে আসে তেমনি কিছু ক্ষতিও হয়ে থাকে। তাই এর গুরুত্ব বিবেচনায় উপকারী ও অপকারী দিক আলোচনা করা যেতে পারে।

১. উপকারিতা :

ঈস্ট কোষে ফার্মেন্টেশনজড়িত যেসব উৎসেচক রয়েছে সেগুলোকে জাইমেজ বলে। এ উৎসেচকটি শর্করাসমৃদ্ধ দ্রব্যকে জারিত করে সরল জৈব অ্যাসিড ও শক্তিতে পরিণত করে। যখন এ কাজে মুক্ত অক্সিজেন সরবরাহে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় তখন জৈব অ্যাসিড ভেঙে CO_2 ও অ্যালকোহল তৈরি হয়। এ প্রক্রিয়া মদ ও রুটিশিল্পে ব্যবহৃত হয়। $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{yeas tcell}]{\text{জাইমেজ}} 2C_2H_5OH + CO_2 +$ শক্তি।

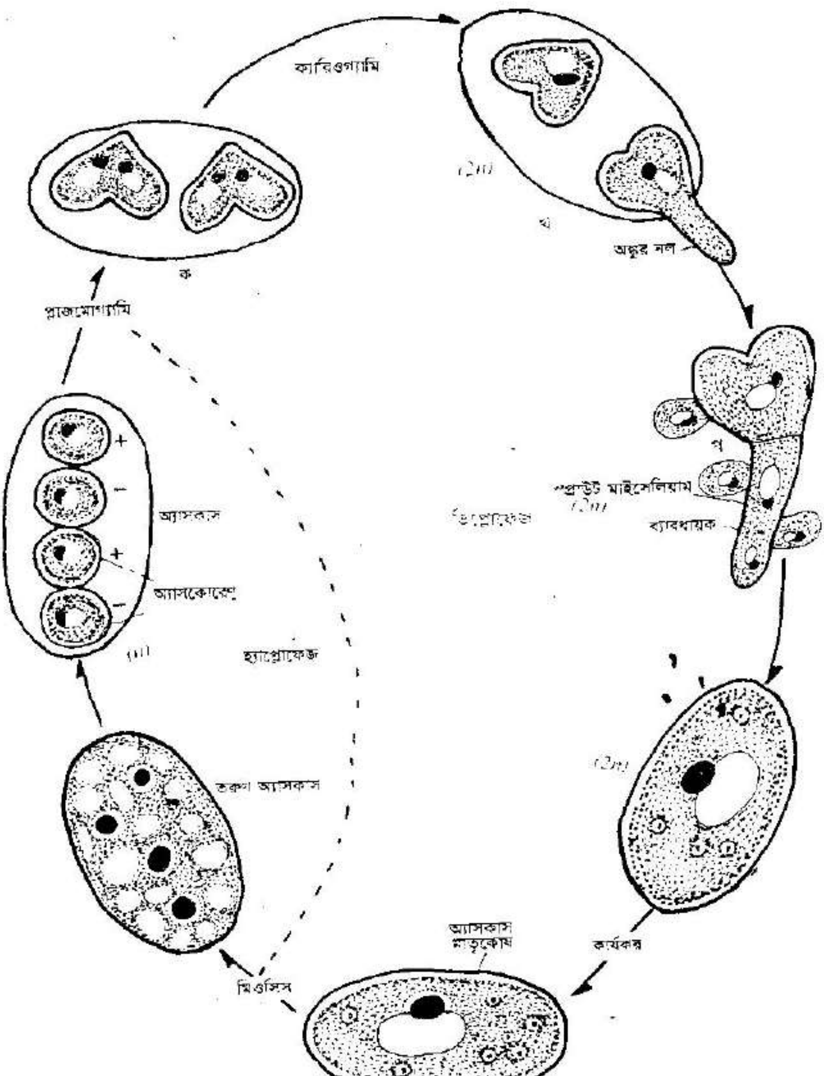

চিত্র ৯.১২ : *S. ludwigii* ঈস্টের ডিপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র

২. **রুটি শিল্পে ঈস্ট :** এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ময়দার সাথে ঈস্ট মিশালে তার বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডে উৎপন্ন হয়। এ কার্বন ডাই-অক্সাইড ময়দাকে ফাঁপিয়ে তোলে। ফলে পাউরুটি ফাঁপা ও হালকা হয়।

৩. **মদ শিল্পে ঈস্ট :** এই শিল্পে গাঁজান পদ্ধতির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। এখানে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাকে চাপ প্রয়োগে কঠিন বস্তুর আকারে নেওয়া হয়।

৪. ঈস্ট নিঃসৃত ইনভার্টেজ উৎসেচক আখের শর্করাকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ ও লেভুলোজ উৎপন্ন করা হয়।

৫. মদ ও রুটি শিল্পে ঈস্ট–এর ব্যবহার ব্যাপক বলে ঈস্ট কেক তৈরির একটি নতুন শিল্প–কারখানা গড়ে উঠেছে। ঈস্ট কেক হচ্ছে স্টার্চের সাথে বহু সংখ্যক ঈস্টকোষ–এর ঘনক। এটি সাধারণত চাপ প্রয়োগ করে তৈরি করা হয়।

৬. এ ঈস্ট কেক বাড়িতে ও রুটি শিল্প–কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এটি প্রচুর খাদ্য মানসমৃদ্ধ, সেহেতু সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রুটি শিল্পে ও মদ শিল্পে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

৭. ঈস্টকোষে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে বলে একে অন্য খাদ্যের সাথে মিশ্রিত করে খাদ্যমান বৃদ্ধি করা হয়।

৮. ভিটামিন বি ও জি–এর একটি উত্তম উৎস হলো ঈস্টকোষ।

৯. সিরাপ ও কনফেকশনারি দ্রব্য তৈরি করতে ঈস্ট-কেক ব্যবহৃত হয়।

১০. রাইবোফ্লেভিন ভিটামিন তৈরিতে সূত্রাকার *Asbby gosypii* ঈস্টকোষ ব্যবহৃত হয়।

১১. কোকো বিন–এর বীজকে সুগন্ধযুক্ত করতে ঈস্ট এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

১২ তাছাড়া, ওষুধ শিল্পে উৎসেচকের উৎস হিসেবে, মদ তৈরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ঈস্ট–এর ব্যবহার রয়েছে।

২. অপকারিতা

১. ঈস্টের বহু পরজীবী প্রজাতি টমেটো ও শিমজাতীয় ফলে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২. ঈস্টের অনেক পরজীবী প্রজাতি মানুষের দেহে blastomycosis ও torulosis রোগ সৃষ্টি করে।

৩. ঈস্টের কোনো কোনো প্রজাতি মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও ত্বক আক্রমণ করে থাকে।

৪. তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কান, যকৃত, প্লীহা ও লিম্ফ গ্রন্থি আক্রমণ করে থাকে।

ঈস্টের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. ঈস্ট এককোষী, মাইসেলিয়ামবিহীন মৃতজীবী ছত্রাক যা রেণু–ফল গঠন করে না।

২. এগুলো কার্বোহাইড্রেট দ্রবণকে জারিত করে ইথাইল অ্যালকোহল, কার্বন ডাই–অক্সাইড ও শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. থ্যালাসটি ছোট, স্বচ্ছ, ডিম্বাকার বা গোলাকার হয়ে থাকে এটি এককোষী ও সুস্পষ্ট প্রাচীরযুক্ত।

৪. কোষপ্রাচীর পাতলা, কোমল ও কাইটিননির্মিত।

৫. কোষের প্রোটোপ্লাস্ট ঘন দানাদার, কেন্দ্রিকা ছোট, বড় গহ্বর ও মাইটোকনড্রিয়াযুক্ত।

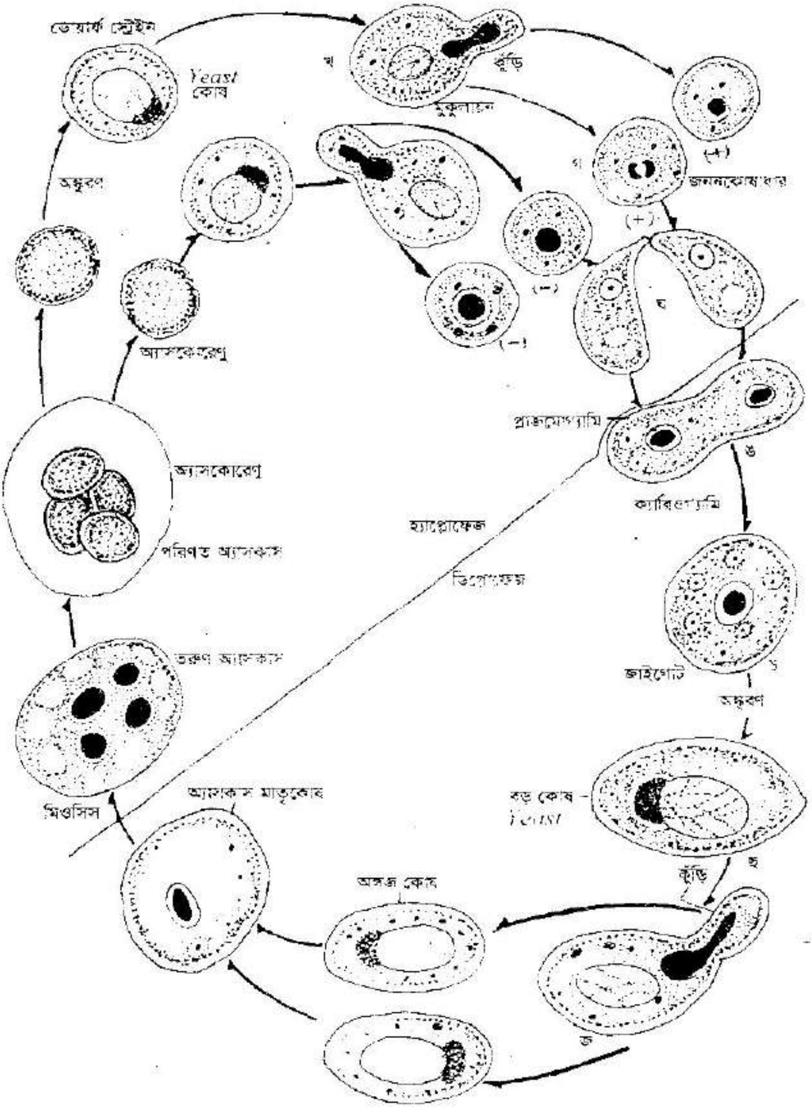

চিত্র ৯.১৩ : *S. cerevisiae* হ্যাপ্লো–ডিপ্লোবায়োন্টিক জীবনচক্র

৬. এতে মুকুলায়ন পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো ঈস্টকোষ ফিশন পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে থাকে।

৭. অ্যাসকোরেণু উৎপাদন মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে।

৮. অ্যাসকোরেণুর মিলনে যৌনজনন হয়ে থাকে এবং এ মিলনে ডিপ্লয়ড জাইগোট তৈরি হয়। এটি প্রতিকূল পরিবেশে অ্যাসাই হিসেবে কাজ করে।

৯. অ্যাসকাসের ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি মিওটিক নিয়মে বিভক্ত ৪টি অ্যাসকোরেণু দেয়। এগুলো হ্যাপ্লয়ড।

১০. অ্যাসকাস হতে নির্গত অ্যাসকোরেণু অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে ছোট গোলাকার হ্যাপ্লয়ড ঈস্টকোষ দেয়। এটিই ঈস্টের ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন।

১১. ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন মুকুলায়ন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং *S. cerevisiae* ঈস্টের হ্যাপ্লোফেজ গঠন করে।

১২. জননঅঙ্গ গঠন মাধ্যমে যৌনজনন ঈস্টে দেখা যায় না। এখানে যৌনজনন সরল প্রকৃতির এবং প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামি ও মিওসিস মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১৩. *S. cerevisiae*–তে সাধারণত দুটি ডোয়ার্ফ স্ট্রেইন মিলিত হয়ে বড় ধরনের ডিপ্লয়ড স্ট্রেইন দেয় এবং এটি মুকুলায়ন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

১৪. *S ludwigii*–তে দুটি অ্যাসকোরেণু মিলিত হয়ে ডিপ্লয়ড জাইগোট দেয় এবং এটি অঙ্কুরিত হয়ে স্প্রাউট মাইসেলিয়াম দেয়।

১৫. স্প্রাউট মাইসেলিয়াম মুকুলায়ন পদ্ধতিতে ডিপ্লয়ড কোষ দেয়।

১৬. ডিপ্লয়ড দেহকোষগুলো অ্যাসাইরূপে কাজ করে এবং মিওটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে অ্যাসকোরেণু দেয়।

১৭. এভাবেই ঈস্টে হ্যাপ্লোফেজ ও ডিপ্লোফেজ দশার আবর্তন হয়ে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখায়। এতে তিন ধরনের জনুক্রম দেখা যায়।

S. cerevisiae–তে হ্যাপ্লো–ডিপ্লোবায়োন্টিক,

S. ludwigii–তে হ্যাপ্লোবায়োন্টিক, এবং

S. chizosaccharomyces octosporus–এ ডিপ্লোবায়োন্টিক জনুক্রম দেখা যায়।

দশম অধ্যায়

উপশ্রেণী—ইউঅ্যাসকোমাইসেটিডি

Sub Class—Euascomycetidae

সাধারণ বৈশিষ্ট্য : Euascomycetidae উপশ্রেণিতে উচ্চশ্রেণির অ্যাসকোমাইসেটিস ছত্রাক রয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত মাইসেলিয়ামও ব্যাপকভাবে বিকশিত।

২. প্রতিটি প্রস্থপ্রাচীরে একটি কেন্দ্রীয় রন্ধ্র বিদ্যমান।

৩. প্লাজমোগ্যামির পর অ্যাসকোগোনিয়াম হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফির বিকাশ ঘটে।

৪. সাধারণত অ্যাসকোজেনাস হাইফি হতে অ্যাসাই বিকাশ লাভ করে। তবে কিছু প্রজাতিতে একগুচ্ছ অ্যাসকোজেনাস কোষ হতে অ্যাসাই উৎপন্ন হয়।

৫. অ্যাসাই ইউনিটিউনিকেট ও অ্যাসকোজেনাস হাইফির উপর উৎপন্ন হয় এবং ফলরেণুটি ভিতরে বা বাইরে থাকে ; একে অ্যাসকোকার্প বলে।

৬. বিশেষত পুংধানীতে ক্রমাবনতভাবে অঙ্গবিলুপ্তির একটি ধারা দেখা যায়।

যেসব প্রজাতিতে যৌনাঙ্গ অনুপস্থিত সেখানে দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত কোষ হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফির বিকাশ ঘটে এবং তা বন্ধ্যা হাইফিবেষ্টিত হয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে অ্যাসকোজেনাস হাইফির প্রান্তকোষ হতে অ্যাসাই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু আসলে এদের বিকাশ ক্রোজিয়ার বা হুক সৃষ্টির মাধ্যমে হয় না বরং পেনালটিমেট কোষ হতে হয়ে থাকে।

শ্রেণিবিন্যাস : Ainsworth ও Bisby (১৯৫০) এর মতে এ উপশ্রেণিটিতে ১২,০০০ প্রজাতি ১৬০০ গণ রয়েছে। Euascomycetidae উপশ্রেণিভুক্ত গণ ও প্রজাতির বাহ্যিক গঠন সম্পর্কে তথ্যের অপর্যাপ্ততাহেতু স্বাভাবিক শ্রেণিবিন্যাস করা এক দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অদ্যাবধি এ উপশ্রেণিটিকে সরাসরি ৪টি সিরিজে ভাগ করা সুবিধাজনক বলে মনে হয়। এগুলো হচ্ছে—Plectomycetes, Pyrenomycetes, Discomycetes ও Loboulbeniomycetes.

উপরোক্ত শ্রেণিভাগটি অ্যাসকোকার্পের প্রকৃতপক্ষে প্রকারভেদের উপর নির্ভরশীল। এ শ্রেণিভাগের ত্রুটি হলো, যেহেতু এটি বাহ্যিক গঠনের উপর নির্ভরশীল সেহেতু বহু নিকটতম প্রজাতি বাদ পড়তে পারে এবং বহুদূরবর্তী প্রজাতির অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে।

Walker (১৯৬৭) এর শ্রেণিবিন্যাসের একটি নিয়মনীতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, অ্যাসকোকার্পের মধ্যে অ্যাসাই-এর গঠন, বিতরণ এবং মোটামুটিভাবে অ্যাসকোকার্পের বাহ্যিক গঠন বিবেচনায় এনে শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। এ ভিত্তির উপর নির্ভর করে ইউঅ্যাসকোমাইসেটিডিকে দুটি সিরিজে ভাগ করা হয়েছে :

সিরিজ (১) Plectomycetes—অ্যাসাই গোলাকার বা বিডিম্বাকার। এগুলো গোলাকার ক্লিস্টোথেসিয়াম বা ফ্লাস্ক আকৃতির পেরিথেসিয়ামের মধ্যে এলোমেলোভাবে বিন্যাসিত থাকে। এতে দুটি বর্গ রয়েছে : i. Plectascales (Aspergillus) ও ii. Microoseales.

সিরিজ (২) Hymenoascomycetes—অ্যাসাই ক্লাভেট বা নলাকার। এগুলো অ্যাসকোকার্পের মধ্যে বা বাইরের প্যালিসেডসদৃশ স্তরে বিন্যাসিত হয়ে হাইমেনিয়াম স্তর গঠন করে। Discomycetes ও Pyrenomycetes উপসিরিজ দুটিও এর আওতাভুক্ত।

সিরিজ Plectomycetes

মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১. অ্যাসকোকার্পটি ক্লিস্টোথেসিয়াম (Plectascales) বা লম্বা গ্রীবাযুক্ত পেরিথেসিয়াম (Microascales) হতে পারে যা অস্টিওল মাধ্যমে উন্মুক্ত থাকে।

২. অ্যাসকোকার্পের মধ্যে অ্যাসাই বিভিন্ন তলে বিন্যস্ত থাকে। সেহেতু ক্লিস্টোথেসিয়াম অ্যাসাই-এর বিন্যাসরীতি এলোমেলো হয়ে থাকে।

৩. অ্যাসাই গোলাকার বা বড় ডিম্বাকার।

৪. অ্যাসকাস প্রাচীর দ্রবীভূত হলে অ্যাসকোকার্পের অ্যাসকোরেণু নির্গত হয়ে থাকে।

৫. পেরিডিয়াম পচে গেলে, দুভাগে ফেটে গেলে বা এলোমেলোভাবে ফেটে গেলে অ্যাসকোরেণু মুক্তি পায়। কিছু প্রজাতিতে অস্টিওল পথে অ্যাসকোরেণুর মুক্তি ঘটে।

৬. Plectomycetes সিরিজটাকে অ্যাসকোকার্পের বাহ্যিক গঠনের ভিত্তিতে দুটি বর্গে ভাগ করা যায় :

   ১. Plectascales (Aspergillales) — অ্যাসকোকার্প গোলাকার ক্লিস্টোথেসিয়াম।

   ২. Microascales — অ্যাসকোকার্প লম্বা গ্রীবাযুক্ত ও অস্টিওলবিশিষ্ট পেরিথেসিয়াম।

বর্গ : Plectascales Aspergillales

এ বর্গের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, অ্যাসকোজেনাস হাইফি ও জননকোষাধারের চারপাশে আবরণীর বিকাশ হওয়ার পূর্বেই যৌনাঙ্গের বিকাশ হয়ে থাকে। অ্যাসকোজেনাস হাইফি গঠিত হলেই শুধু বন্ধ্যা হাইফির বিকাশ ঘটে। এ বর্গে বহু শতাধিক প্রজাতি রয়েছে এবং এগুলোকে ৫০টি গণভুক্ত করা হয়েছে। এদের অধিকাংশ প্রজাতিই মৃতজীবী। তবে কিছু সংখ্যক প্রজাতি উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরজীবীরূপেও বসবাস করে থাকে। 'ব্লু' ও 'গ্রিন' মোল্ডজাতীয় মৃতজীবী ছত্রাকগুলো অর্থনৈতিক দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এদের কোনো কোনোটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের উৎস, জৈব অ্যাসিডের মাধ্যম ও বাণিজ্যিক উৎসেচকের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। আবার কোনোটা মাখনের জন্য একান্ত দরকারী। যেকোনো পচনশীল জৈব বস্তুর উপর মৃতজীবী ছত্রাকগুলোকে দেখা যায়।

এ জাতীয় ছত্রাকগুলো কনিডিয়ার সাহায্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এগুলো বহুলভাবে উৎপন্ন হয়। এগুলো কনিডিয়াসমৃদ্ধ হয়ে অনুসূত্রীয় ম্যাট তৈরি করে এবং প্রজাতিসূচক বর্ণ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো দুটি কারণে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে থাকে :

১. আলো, খরা, বায়ুতে কনিডিয়াগুলো বাহিত হতে পারে এবং বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২. কোষরসের উচ্চ অভিস্রবণ-চাপের মুখেও এগুলো অঙ্কুরিত হতে পারে, যদিও আশ্রয় শুষ্ক লবণ বা চিনি দ্রবণের ক্রমোচ্চ গাঢ়ত্ব বেশি থাকে। এরূপ আবাসে অন্য ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। এসব ছত্রাকের কনিডিয়াল দশাটি অধিক প্রকট বা প্রাধান্যযুক্ত। অ্যাসকান দশাটি প্রায়ই দেখা যায় না।

অ্যাসাই গোলাকার বা প্রশস্ত ক্লাব-আকৃতির। এগুলো ক্লিস্টোথেসিয়ামের মধ্যে অনিয়মিত বিন্যাস উৎপন্ন হয়, এখানে কোনো হাইমেনিয়ালস্তর থাকে না। অ্যাসকাস প্রাচীর ভেঙে বা বিগলনের ফলে ক্লিস্টোথেসিয়ামের মধ্যে অ্যাসকোরেণুর মুক্তি ঘটে। অপরপক্ষে পেরিডিয়াম বিদীর্ণ করে বা পচে গেলে এগুলো বাতাসে মুক্ত হয়। Bessry (১৯৫০) এ বর্গে ৭টি গোত্র, Walker ৪টি গোত্র (Gymnoascaceas, Aspergillaceae, Elaphomycetaceae ও Dmygenaceae) স্বীকার করলেও Alexopoulos (১৯৬২) ৩টি গোত্রের কথা উল্লেখ করেন। তিনি Onygenceae কে Onygenales বর্গের মর্যাদা দেন। Martin (১৯৬১) অবশ্য এ বর্গটিকে ২টি গোত্রে ভাগ করেন। এদের মধ্যে এখানে শুধু Eurotiaceae বা Aspergillaceae গোত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

গোত্র : Aspergillaceae (Eurotiaceae)

এ গোত্রটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো অর্ধ-বায়বীয় ও অবৃন্তক ক্লেইস্টোকার্পের উপস্থিতি ও বর্ণ উৎপাদন পেরিডিয়াম হচ্ছে সিউডোপ্যারেনকাইমীয় অনুসূত্র দ্বারা গঠিত। এটি হচ্ছে বন্ধ্যা হাইফির জড়াজড়ি অবস্থা বিশেষ। এটি এককোষ স্তরীয় হয়ে থাকে। কনিডিয়া পরিপক্ব হলে এককেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। অপরিপক্বগুলো মসৃণ প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে। এ গোত্রে অনেকগুলো গণ আছে ; তবে সর্বাধিক পরিচিত গণ হলো দুটি—*Aspergillus* ও *Penicillium*। এগুলো 'নীলাভ সবুজাভ' ও 'হলুদাভ' মোল্ড নামে পরিচিত।

প্রতীক গণ : *Aspergillus*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ— Mycota
উপবিভাগ— Eumycotina
শ্রেণি— Ascomycetes
উপশ্রেণি— Euascomycetidae
সিরিজ— Plectomycetes
বর্গ— Aspergillales (pletascaltes)
গোত্র— Aspergllaceae
গণ— *Aspergillus*
প্রজাতি— *A. niger / A. repens*

বসতি ও প্রকৃতি

এ ছত্রাকটিকে *Eurofium*ও বলে। এটি মৃতজীবী ছত্রাক ও বহুলভাবে বিস্তৃত। এ ছত্রাকগুলো সাধারণত পচনশীল শাক-সবজি, মাখন, রুটি, ভাত, জ্যাম, চামড়া, কাপড়-চোপড়, ফ্যাব্রিকস, ফলমূল ও জেলির উপর জন্মে। এই ছত্রাকের মধ্যে পরজীবী ছত্রাক বা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকও রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কয়েকটির নাম দেয়া হলো :

A. niger – আনার-বেদনা, খেজুর, ডুমুর প্রভৃতি ফলে 'রটরোগ' সৃষ্টি করে।

A. funigalus, *A. flavus*, *A. niger A. nidulans* প্রভৃতি প্রজাতি জীব জন্তুর পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগকে মিলিতভাবে Aspergillosis বলে। এগুলো মানুষের কানকে আক্রমণ করলে Otomycosis রোগ হয়।

দৈহিক গঠন

মাইসেলিয়াম দিয়ে দেহাঙ্গ গঠিত। মাইসেলিয়াম সুষ্ঠুভাবে বিকশিত শাখা-প্রশাখা যুক্ত, প্রস্থপ্রাচীরবিশিষ্ট ও স্বচ্ছ। কিছু কিছু অনুসূত্র আশ্রয়ের উপর ছড়িয়ে থাকে। অন্যগুলো আশ্রয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ে ও সমগ্র মাইসেলিয়ামের পুষ্টির জন্য খাদ্য শোষণ করে থাকে। অনুসূত্রগুলো সরু নমনীয় ও নরম। এদের প্রাচীর পাতলা ও মসৃণ। প্রতিটি মাইসেলিয়ামে কিছু ব্যবধানে প্রস্থপ্রাচীর থাকে এবং এতে কেন্দ্রীয় রন্ধ্র থাকে যার মাধ্যমে প্রাণসত্তা প্রবাহ নিশ্চিত থাকে। প্রতিটি কোষ এক বা একাধিক কেন্দ্রিকাযুক্ত। প্রাণসত্তার কেন্দ্রিকাসহ আরও কিছু অঙ্গাণু থাকে ; যেমন মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজোম, আন্তঃপ্লাজমা জালিকা ইত্যাদি। সঞ্চিত খাদ্যবস্তু হিসেবে তেলবিন্দু থাকে। *Aspergillus*-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো রঙ উৎপাদন। ফলে দু'ধরনের ফর্ম গঠিত হয়। যেমন—

১. বায়ব অংশে রঙ ধারণ করে ; তথা অনুসূত্র, কনিডিওফোর, মাথা ও কনিডিয়ায় বর্ণ নেয় ;
২. আশ্রয় ও বর্ণ ধারণ করে বলে বিশেষ উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও জীবের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়।

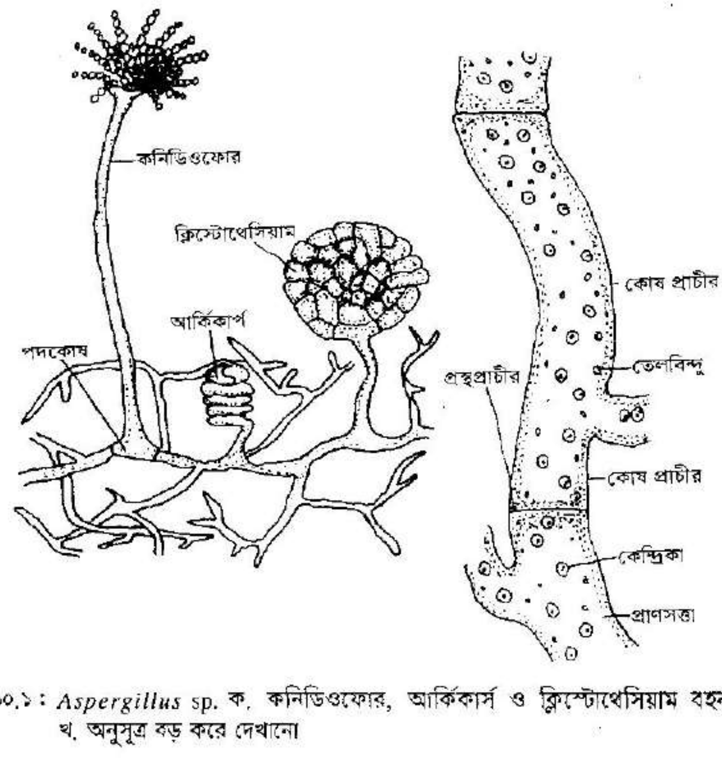

চিত্র ১০.১ : *Aspergillus* sp. ক. কনিডিওফোর, আর্কিকার্প ও ক্লিস্টোথেসিয়াম বহনকারী খ. অনুসূত্র বড় করে দেখানো

অযৌন জনন

Aspergillus তিনভাবে জনন কাজ চালায় ; যথা—

১. অঙ্গজ উপায়ে,
২. অযৌন উপায়ে ও
৩. যৌন উপায়ে।

১. **অঙ্গজ জনন :** *Aspergillus* খণ্ডায়ন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে।

২. **অযৌন জনন :** অযৌনভাবে কনিডিয়া তৈরি করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এ কনিডিয়া বায়ব অনুসূত্রের শীর্ষভাগে বহির্জনেষ্ণুভাবে শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। এগুলোকে যে অনুসূত্রটি বহন করে তাকে কনিডিওফোর বলে।

ক. **কনিডিওফোর :** বর্ধিষ্ণু, তরুণ ও শায়িত মাইসেলিয়ামের কোনো কোনো কোষ স্থূল প্রাচীরযুক্ত হয়ে T-আকৃতি ধারণ করে। এ কোষটিকে পদকোষ (foot cell) বলে। প্রতিটি পদকোষ হতে বিশেষ ধরনের খাড়া শাখা উপবৃদ্ধি হিসেবে উৎপন্ন হয় (ক)। এসব উল্লম্ব ও খাড়া শাখা তরুণ কনিডিওফোর বলে গণ্য। এগুলো দৈর্ঘ্যে প্রায় ২.৫ মিমি. এবং ক্রমশ শীর্ষভাগে স্ফীত হয়ে (খ) গোলাকার বা অর্ধচন্দ্রাকার বাল্বের রূপ নেয়। একেই ভেসিকল বলে (গ)। কোনো কোনো প্রজাতিতে ভেসিকলটি দিগ্বলয়ের ন্যায় হয়ে থাকে। ভেসিকলের নালিপথটি কনিডিওফোরের উপরাংশ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন থাকে ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। কনিডিওফোরটি পরিণত হলে লম্বা, সোজা-খাড়া, অশাখ ও প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হয়ে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই প্রস্থপ্রাচীর দেখা যায়। এগুলো এককভাবে উৎপন্ন হয় এবং কোনো প্রকার ফলদেহ গঠন করে না।

চিত্র ১০.২ : *Aspergillus* sp. অযৌন জনন। ক. পদকোষ ; খ. কনিডিওফোরের স্ফীতশীর্ষ ; গ–ঙ. ভেসিকল

বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত ভেসিকলের উপরতল হতে অসংখ্য অরীয় বিন্যাসযুক্ত, নলাকার উপবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। এগুলোকে স্টেরিগমাটা বা ফিয়ালিড বলে। এ স্টেরিগমাটাগুলো পাশাপাশি নিবিড়ভাবে সজ্জিত থাকে এবং সমগ্র ভেসিকল-তলকে আবৃত করে। এগুলোকে প্রাথমিক স্টেরিগমাটা বলে। কোনো কোনো প্রজাতিতে প্রাথমিক স্টেরিগমাটা শাখা গৌণ স্টেরিগমাটা তৈরি করে। যখন কোনো স্টেরিগমাটা হতে ২/৩ স্তর গঠন করে তখনও শুধু উপরের স্তর হতে কনিডিয়াগুলো শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, পদকোষ, ভেসিকল, প্রাথমিক, গৌণ বা টার্শিয়ারি স্টেরিগমাটাসহ সমগ্র গঠনটিকেই কনিডিওফোর বলে।

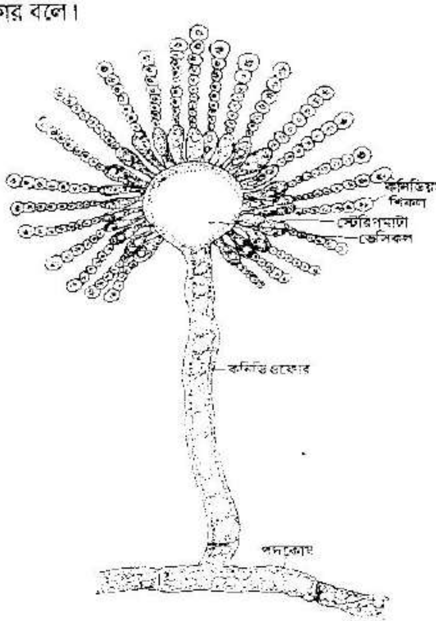

চিত্র ১০.৩ : *Aspergillus* sp. *A. violaceo-fuscus*—এ পাদকোষ হতে কনিডিওফোরের উৎপত্তি। এতে স্টেরিগমাটা ও শিকলাবদ্ধ কনিডিয়া দেখানো হয়েছে।

খ. কনিডিয়া উৎপাদন : রেণু-উৎপাদনকারী অঙ্গ স্টেরিগমাটা অনশ্যই একটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত উপবৃদ্ধি। এগুলো আকৃতিতে বোতলের মতো এবং সরু শীর্ষটি নলাকার। এ নলের মধ্যেই কনিডিয়াগুলো উৎপন্ন হয়। Baker (১৯৪৪) উল্লেখ করেন যে, স্টেরিগমাটা এককেন্দ্রিকাযুক্ত। কনিডিয়া উৎপাদনের সময় প্রতিটি স্টেরিগমাটার কেন্দ্রিকা মাইটোটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্যকেন্দ্রিকা দেয়। এদের মধ্যে একটি অপত্যকেন্দ্রিকা সরু নলের শীর্ষে চলে আসে এবং প্রস্থপ্রাচীর মাধ্যমে পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর এটি গোলাকার হয় এবং নিজস্ব প্রাচীর তৈরি করে কনিডিয়ামে পরিণত হয় ও বৈশিষ্ট্যসূচক আকার-আকৃতি নেয়। কনিডিয়ার প্রাচীরটি মাতৃপ্রাচীরের সাথে আংশিকভাবে কিংবা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয় অথবা মুক্ত থাকে। ইত্যবসরে স্টেরিগমাটার শীর্ষাঞ্চলের ঠিক নিচের অংশটি লম্বাকার হলে নল তৈরি করে এবং পুনরায় এককেন্দ্রিকাযুক্ত কোষ দেয়। এটি দ্বিতীয় কনিডিয়াম তৈরি করে। এটি পূর্বের নিয়মেই গঠিত হয় এবং পরেরটিকে সংযোগ ব্যতিরেকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়। এ প্রক্রিয়াটি বার বার ঘটে প্রতিটি স্টেরিগমাটাতে শিকলাকারে কনিডিয়া তৈরি করে। সবচেয়ে নবীন কনিডিয়ামটি শিকলের গোড়ায় ও কনিডিওফোরের শীর্ষে থাকে। পক্ষান্তরে প্রথম সৃষ্ট কনিডিয়ামটি শিকলের মাথায় থাকে। কনিডিয়ামের এ ধরনের নিম্নাভিমুখী বা পদাভিমুখী বিন্যাসশৈলীর কিছু কিছু সুবিধাও রয়েছে :

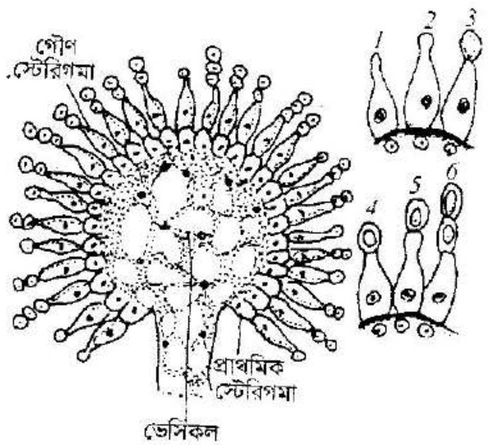

চিত্র ১০.৪ : *Aspergillus* sp. অযৌন জনন। ক. গৌণ স্টেরিগমাটায় কনিডিয়া ; খ–গ. কনিডিয়া গঠনের বিভিন্ন পর্যায়

১. অতি সহজে পরিণত কনিডিয়ামটি বায়ুবাহিত হতে পারে।
২. বিকাশোন্মুখ ও তরুণ কনিডিয়ামের যথাযথ পুষ্টির ব্যবস্থা হয়।

প্রথমত কনিডিয়াম এককেন্দ্রিকাযুক্ত থাকে এবং অধিকাংশ প্রজাতিতেই পরিণত হওয়া পর্যন্ত এমনিটিই থেকে যায় ; কিন্তু কিছু কিছু প্রজাতিতে এ কেন্দ্রিকাটি বিভাজিত হয়ে বহু কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। *A. repens*-এর কনিডিয়ামে ১২টি, *A. herbariorum*-এ ৪টি করে কেন্দ্রিকা থাকে। কনিডিয়ামগুলো প্রজাতিভেদে ও মাধ্যমভেদে কালো, সবুজ, বাদামি, নীল বা হলুদ বর্ণের হতে পারে।

পরিণত কনিডিয়াম গোলাকার ও এককোষী। এদের প্রাচীর স্থূল ও দ্বিস্তরীয় হয়ে থাকে ; বাইরের স্তরটিকে এপিস্পোর ও ভিতরের স্তরটিকে ইন্ডোস্পোর বলে। এপিস্পোরটি কন্টকিত (পরিণত হলে) মসৃণ (তরুণ হলে) হয়। এ রেণুগুলো আকারে খুবই ছোট, হালকা ও শুষ্ক এবং সেহেতু বায়ুবাহিত। এজন্য এদেরকে সবসময় বাতাসে ও ধূলিকণায় পাওয়া যায়। কনিডিয়ামগুলো কোনো উপযুক্ত স্থানে পতিত হলে অঙ্কুরিত হয় ও অঙ্কুর নল দেয়। এ অঙ্কুর নল কালক্রমে মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়।

যৌন জনন

Aspergillus প্রজাতির খুব কম ক্ষেত্রেই যৌন জনন দেখা যায়। আবার যেখানে যেখানে যৌন জনন উপস্থিত সেখানেও বিভিন্নতা বিদ্যমান। কোনো কোনো প্রজাতিতে পুংধানী অনুপস্থিত থাকলেও তা অকার্যকর হয়ে থাকে। অন্য ক্ষেত্রে উপস্থিত ও কার্যকর হয়ে থাকে। Gaumann (১৯৪৬) প্রথম *Aspergillus* গণে যৌন জননের পূর্ণ বিবরণ দেন। অতঃপর Benjamin (১৯৫৫) এ ধারণার সমর্থন যোগান। যাহোক, *Aspergillus* গণটি হোমোথ্যালিক ; কেননা, এখানে একই হাইফিতে পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপন্ন হয়। কিন্তু Kwon ও Roper (১৯৬৭) উল্লেখ করেন যে, *A. heterothallicus* প্রজাতিটি হেটারোথ্যালিক এবং এজন্যই এরূপ নামকরণ। হোমোথ্যালিক প্রজাতির ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী জননাঙ্গ একই হাইফিতে পাশাপাশি বা একই

মাইসেলিয়ামের নিকটবর্তী দুটি হাইফিতে বিকাশলাভ করে। অবশ্য কোথাও পুং জননাঙ্গ সুগঠিত *A. repen* কোথাও অনুদ্ভিন্ন ও কোথাও অনুপস্থিত।

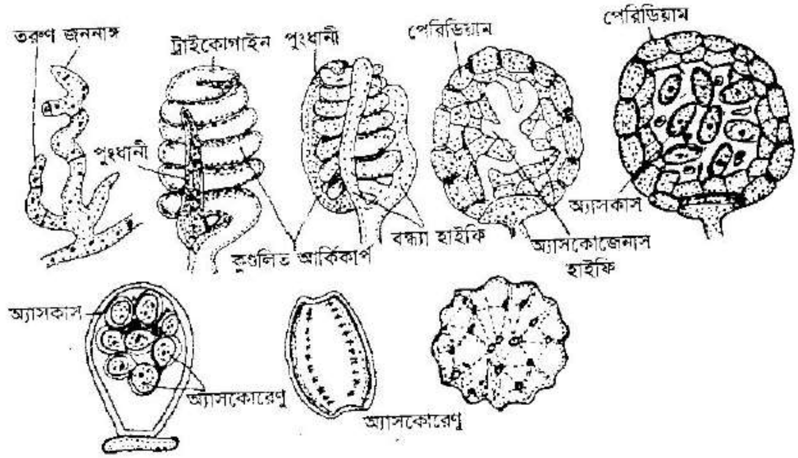

চিত্র ১০.৫ : *Aspergillus* sp. যৌন জনন। ক. জনন অঙ্গ ; খ. কুণ্ডলিত আর্কিকার্প ও পুংধানী ; গ. পদতল হতে উদ্ভূত বন্ধ্যা হাইফি আবৃত আর্কিকার্প ; ঘ. অ্যাসকোজেনাস হাইফিসহ অ্যাসকোগোনিয়াম পেরিডিয়াম দিয়ে আবৃত ; ঙ. ক্লিস্টোথেসিয়ামে প্রস্থচ্ছেদে পেরিডিয়াম, অ্যাসাই ও অ্যাসকোরেণু দেখানো হয়েছে ; চ. ক্লিস্টোথেসিয়ামে huelle-কোষ ; ছ. অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণু huelle কোষ

ক. অ্যাসকোগোনিয়াম বা স্ত্রী জননাঙ্গ

অঙ্গজ হাইফি হতে একটি ক্ষুদ্র, আলগাভাবে কুণ্ডলিত, প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত শাখার উৎপত্তি হয় ; একে আর্কিকার্প বলে। এটি তিনটি অংশে বিভক্ত :

১. ট্রাইকোগাইন,

২. অ্যাসকোগোনিয়াম ও

৩. বৃন্ত।

১. **ট্রাইকোগাইন :** প্রান্তীয় খণ্ডটি সাধারণত লম্বাটে ও এককোষ হয়ে থাকে। এতে সর্বোচ্চ ২০টি কেন্দ্রিকা থাকতে পারে। একেই ট্রাইকোগাইন বলে। এটিকে স্ত্রী জননাঙ্গের অভ্যর্থনা অংশ বলে গণ্য করা হয়।

২. **অ্যাসকোগোনিয়াম :** ট্রাইকোগাইনের নিচের খণ্ডাংশটি স্ত্রী জননকোষাধাররূপে কাজ করে ; একেই অ্যাসকোগোনিয়াম বলে। এটির প্রোটোপ্লাস্ট বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত এবং তা গোলাকার হয়ে কোনো ডিম্বাণু তৈরি করে না।

৩. **বৃন্ত :** অ্যাসকোগোনিয়ামের নিচেই কয়েকটি কোষ থাকে। এদেরকে মিলিতভাবে বৃন্ত বলে। অন্য কথায় একে অ্যাসকোগোনিয়াম বহনকারী অঙ্গ বলে।

আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, আর্কিকার্পের অংশত্রয় বহুকেন্দ্রিকা বিশিষ্ট্য। প্রথমদিকে আর্কিকার্পটি আলগাভাবে কুণ্ডলিত হলেও পরে কুণ্ডলায়ন মজবুত ও নিবিড় হয়।

খ. পুংজননাঙ্গ

আর্কিকার্পটি প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কিংবা পরে তারই পাশে একই হাইফি হতে কিংবা একই মাইসেলিয়ামের হাইফি হতে পুংশাখা বা পলিনোডিয়াম উৎপন্ন হয় (ক)। পলিনোডিয়ামটি মজবুতভাবে কুণ্ডলিত আর্কিকার্পকে এক বা একাধিকবার সর্পিলভাবে আকড়ে ধরে। অতঃপর এটি আর্কিকাপের শীর্ষভাগে পেঁচিয়ে যায় এবং অগ্রভাগ হতে এককোষীয় পুংধানী দেখ। (গ)। পুংধানী কোষটি বহুকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট ও সামান্য স্ফীত। পুংধানীর নিচের পলিনোডিয়ামের প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত নিম্ন অংশকে বৃন্ত বলে। সবগুলো খণ্ড বা কোষই বহুকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট।

গ. প্লাজমোগ্যামি

প্রথমত পুংধানী ও ট্রাইকোগাইনের মধ্যে মিলন ঘটে থাকে। পুংধানীর শীর্ষভাগ ট্রাইকোগাইনের শীর্ষকে জড়িয়ে ধরে এবং তাদের মধ্যে বিগলন হয়। উভয়ের প্রাচীর গলে যাবার ফলে পুংধানী বস্তুনিচয় ট্রাইকোগাইনের রন্ধ্রপথে অ্যাসকোগোনিয়ামে গমন করে। ট্রাইকোগাইন ও পুংধানীর মধ্যে এরূপ সংযোগ সেতু তৈরির কথা বহু ছত্রাকবিদই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পুংধানী অনুদ্ভিন্ন বা অকার্যকর। কোনো কোনো প্রজাতিতে পুংধানী পরিণত ও পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই পুংকেন্দ্রিকা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনও তথ্য পাওয়া যায় যে, কোথাও কোথাও পুংধানীর অস্তিত্বই থাকে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুংধানীটি ট্রাইকোগাইনের সাথে মিলিত হতে পারে না। ফলে ভেঙে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে অ্যাসকোগোনিয়ামের কেন্দ্রিকাগুলো যুগলায়িত হয়। অনেকেই একমত হয়েছেন যে, অ্যাসকোগোনিয়াল হাইফি বর্ধিত হয়ে অ্যাসকোগোনিয়াম হতে বের হয়ে আসে এবং ঘটনাচক্র সর্পিলাকার গঠনের কার্যকর কেন্দ্রিকা বহন করে।

Ascomycetes–এ যৌনাঙ্গের বিলুপ্তির ক্ষেত্রে _Aspergillus_–এর ভূমিকা নিরূপণ

Aspergillus–এর বিভিন্ন প্রজাতি হতে প্রতীয়মান হয় যে, Ascomycetes–এ পুং জননাঙ্গের বিলুপ্তি কিভাবে হয়েছে। এ প্রজাতিগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো যায়। এ বিন্যাস হতেই পুংজননাঙ্গের প্রাগ্রসর বিলুপ্তির ধাপগুলো জানা যায়। এ ধাপগুলো হচ্ছে :

১. *A. herbariorum*–এ পলিনোডিয়াম একটি শীর্ষ পুংধানী দেয়। পুংধানীর শীর্ষটি ট্রাইকোগাইনের শীর্ষের সাথে মিলিত হয়। কতিপয় ছত্রাকবিদের মতে পুংধানীর বস্তুনিচয় স্থানান্তরিত হয়ে অ্যাসকোগোনিয়ামের বস্তুনিচয়ের সাথে মিলিত হয় না।

২. কতিপয় প্রজাতির ক্ষেত্রে পুংধানীর বিকাশ বিলম্বিত হয়। ইতোমধ্যেই অ্যাসকোগোনিয়াম হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফির বিকাশ ঘটে।

৩. মাত্র কিছু প্রজাতিতে পুংধানী পরিণত হওয়ার পূর্বেই পুংধানীর পুংকেন্দ্রিকার বিলুপ্তি ঘটে।

৪. কিছু কিছু প্রজাতিতে (*A. flavus, A. fisheri* ও *A. fumigatus*) পুংধানীর বিকাশ একেবারেই হয় না।

ঘ. অ্যাসকোকার্পের বিকাশ

পুংধানীতে কার্যকর কেন্দ্রিকা থাকুক আর নাই থাকুক সব ক্ষেত্রেই অ্যাসকোগোনিয়ামটি ফলদেহ––অ্যাসকোকার্প–রূপ বিকাশ লাভ করে। অ্যাসকোগোনিয়ামের হ্যাপ্লয়েড কেন্দ্রিকাগুলো যুগলায়িত হয়। যেসব প্রজাতিতে প্লাজমোগ্যামি হয় না, সে ক্ষেত্রেও স্ত্রীকেন্দ্রিকাগুলো যুগলায়িত হয়ে ডাইক্যারিয়ন গঠন করে। এ যুগল কেন্দ্রিকা দুটি একই পর্দার মধ্যে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন পর্দার মধ্যে থাকতে পারে। কেন্দ্রিকাদ্বয়ের যুগলায়িত হওয়ার পরপরই অ্যাসকোগোনিয়ামটি প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হয়।

ফলে খণ্ডটি দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়। এ ডাইক্যারিওটিক খণ্ড হতেই অ্যাসকোজেনাস হাইফির উদ্ভব হয়। একই সময়ে আর্কিকার্পের গোড়া হতে বন্ধ্যা হাইফি উৎপন্ন হয়ে যৌন অঙ্গেও অ্যাসকোজেনাস হাইফির কাজে আসে। অ্যাসকোজেনাস হাইফি শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয় ; এদের দৈর্ঘ্যে তারতম্য থাকে এবং এলোমেলোভাবে বিকশিত অসংখ্য, ক্ষুদ্র, পাতলা প্রাচীরযুক্ত অ্যাসাই বহন করে। এসব গঠনগুলোকে একটি আবরণী ঘিরে থাকে একেই বলে অ্যাসকোকার্প (১০.৫ ঘ)। অ্যাসকোকার্পগুলো আকারে ছোট, গোলাকার, ফাঁপা বল (ব্যাসার্ধ প্রায় ১৫০ মাইক্রন) মসৃণ কোষপ্রাচীও হলুদ বর্ণের। পরিণত হবার পরও এটি বন্ধ থাকে। বন্ধ ও ফাঁপা অ্যাসকোকার্প বলে ক্লিস্টোথেসিয়াম বা ক্লিস্টোকার্প। আবরণীটি একস্তর যুক্ত হলুদ পেরিডিয়ামে পরিণত হয় এবং এক বা একাধিক দুর্বল ধরনের ভিতর দিকের স্তরকে ট্যাপেটাম বলে। এ ট্যাপেটামই অ্যাসকোকার্পের পুষ্টি যোগান দেয়। বাইরের স্তরটি বিকাশমান অ্যাসাইকে পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাত হতে রক্ষণ করে। তাছাড়া এখন হতে হলুদ বর্ণের পদার্থ নিঃসৃত হয়ে ক্লিস্টোথেসিয়ামকে বর্ণযুক্ত করে ; ফলে একে সহজেই চেনা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রজাতির পরিণত ক্লিস্টোথেসিয়ামের মধ্যে আলগাভাবে বিন্যস্ত হাইফি দেখা যায় ; এদের শীর্ষে বা নিবেশিত স্থানে বহু সংখ্যক ভেসিকুলোজ, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা প্রায় গোলাকার ও স্থূল কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ থাকে। ক্লিস্টোথেসিয়ামে এদের উপস্থিতির কথা ও hulle cell নামকরণ প্রথম Eiclam (১৮৮৩) উল্লেখ করেন। এদের উৎপত্তি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে এগুলোকে *A. nidulans*-এর ক্লেস্টোথেসিয়ামে পাওয়া যায়। Dangeard (১৯০৭) এদেরকে কোনো তথ্য ছাড়াই ক্ল্যামাইডোরেণু বলে উল্লেখ করেন।

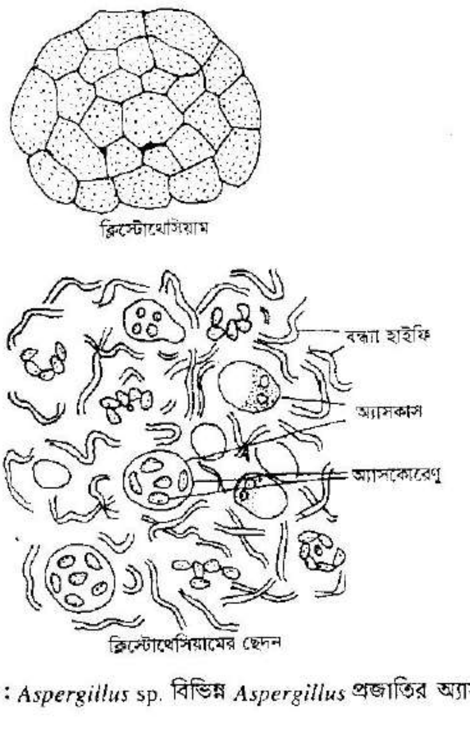

চিত্র ১০.৬ : *Aspergillus* sp. বিভিন্ন *Aspergillus* প্রজাতির অ্যাসকোরেণু

অ্যাসকাস ও অ্যাসকোরেণুর বিকাশ

অ্যাসকোজেনাস হাইফির প্রান্তীয় স্ফীত-কোষগুলো বা অ্যাসকোজেনাস হাইফির শাখাগুলো হতে অ্যাসকাসগুলোর উৎপত্তি হয়। এগুলো দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত এবং সরাসরি অ্যাসকাস মাতৃকোষ হিসেবে কাজ করে। এখানে কোনো ক্রোজিয়ার উৎপন্ন হয় না। অ্যাসকাস মাতৃকোষের কেন্দ্রিকাদ্বয়ের মধ্যে ক্যারিওগ্যামি বা মিলন হয়। ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাযুক্ত অ্যাসকাসটি আকারে বড় হতে শুরু করে। এটিই জীবনচক্রের ডিপ্লোফেজের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত। এ ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকাটি প্রথমে মিওটিক ও পরে মাইটোটিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে ৮টি হ্যাপ্লয়েড অপত্যকেন্দ্রিকা দেয়। অতঃপর প্রতিটি হ্যাপ্লয়েড অপত্যকেন্দ্রিকা প্রাণসত্তা পরিবৃত হয় এবং কোষপ্রাচীর নিঃসৃত করে অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। এভাবে অবাধ কোষগঠনের মাধ্যমে প্রতিটি অ্যাসকাসে ৮টি করে অ্যাসকোরেণু তৈরি হয়। রেণু গঠনের পর যেটুকু প্রাণসত্তা অব্যবহৃত থাকে, সেগুলোকে এপিপ্লাজম বলে।

পরিণত অ্যাসাই গোলাকার, ডিম্বাকার বা নাশপাতির মতো। এগুলো দীর্ঘস্থায়ীও নয় এবং বিদারীও নয়। অ্যাসকোরেণু তৈরি হওয়ার পরপরই অ্যাসকাস প্রাচীর, অ্যাসকোজেনাস হাইফি এবং ট্যাপেটাম গলে গিয়ে পুষ্টিগত তরল দ্রব্যে পরিণত হয়। অ্যাসকোরেণুগুলো ফাঁপা ক্লিস্টোথেসিয়ামের গহ্বরে মুক্তভাবে অবস্থান করে। বিকাশমান অ্যাসকোরেণু তাদের যাবতীয় পুষ্টি পুষ্টিজাত তরল দ্রব্য হতে সংগ্রহ করে। আবার অ্যাসকোরেণুগুলো পরিণত ও পরিপক্ব হলে পেরিডিয়াম প্রাচীরও বিগলিত হয়ে রেণুগুলোকে মুক্ত করে।

অ্যাসকোরেণুর গঠন

মুক্ত অ্যাসকোরেণুগুলো হ্যাপ্লয়েড ও এককেন্দ্রিকাযুক্ত একক। এগুলো অনেকখানি লেন্স আকৃতির ও কিনারাগুলো খাঁজকাটা বলে এদেরকে পুলির চাকার মতো দেখায়। এগুলোর প্রাচীর দ্বিস্তরযুক্ত–বহিঃস্তরকে বলে এপিস্পোর ও অন্তঃপ্রাচীরকে বলে ইন্ডোস্পোর। এপিস্পোর স্থূল ও খাঁজকাটা বলে অমসৃণ। পাশ থেকে দেখলে একে পুলি–চাকার মতো ও সামনে থেকে দেখলে গোল তারকার মতো দেখায়। অনুকূল পরিবেশে পতিত হলে রেণুগুলো অঙ্কুরিত হয়, অঙ্কুর নল দেয় এবং তা কালক্রমে হ্যাপ্লয়েড মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়।

জনুক্রম

আলোচনা হতে এ তথ্যই প্রমাণিত হয়েছে যে *Aspergillus*–এর জীবনচক্রে দু'টি দশা বা জনু রয়েছে। গ্যামেটোফাইটিক জনুটি পুষ্টির দিক হতে আত্মনির্ভর। এটিকে হ্যাপ্লোফেজও বলে। কারণ এটির কেন্দ্রিকায় হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজম থাকে। এ জনুটি যৌনাঙ্গ বহন করে এবং যৌন জননের সাথে জড়িত। জীবনচক্রে এ জনুটি উৎপাদিত অ্যাসকোরেণু হতে শুরু হয় এবং অ্যাসকোগোনিয়ামে ডাইক্যারিয়ন গঠিত হলে শেষ হয়। কাজেই, এ জনুটি অ্যাসকোরেণু, মাতৃ মাইসেলিয়াম পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়া নিয়ে গঠিত। এ দশায় অতিরিক্ত উপায়েও সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এটি কনিডিয়া দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। জনুক্রমে এটি কোনো ভূমিকা রাখে না।

Aspergillus–এর ২য় জনুটি হলো স্পোরোফাইটিক ফেজ। এ দশাটি পুষ্টির আত্মনির্ভর নয়; এটি গ্যামেটোফাইটের উপর নির্ভরশীল। এ ফেজটি ডাইক্যারিয়ন গঠন মাধ্যমে শুরু হয় এবং অ্যাসাই-এর মধ্যে সিনক্যারিয়নের মিওটিক বিভাজন হলে সমাপ্তি ঘটে। কাজেই স্পোরোফাইটিক ফেজটি— ১. অ্যাসকোজেনাস হাইফি, ডাইক্যারিয়ন (অ্যাসকোগোনিয়ামে) ডাইক্যারিওফেজ এবং

২. মিওসিসের পূর্বে তরুণ অ্যাসকাসের ডিপ্লোফেজ নিয়ে গঠিত। এ গঠনগুলোকে ঘিরে থাকা পেরিডিয়ামযুক্ত অঙ্গকেই ক্লিস্টোকার্প বলে। তরুণ ক্লিস্টোকার্পটি আংশিক হ্যাপ্লয়েড ও আংশিক ডিপ্লয়েড হয়ে থাকে।

Aspergillus–এর ফেজদ্বয় পালাক্রমে একে অন্যকে অনুসরণ করে আবর্তিত হয়। সেহেতু এখানে জনুক্রম বিদ্যমান।

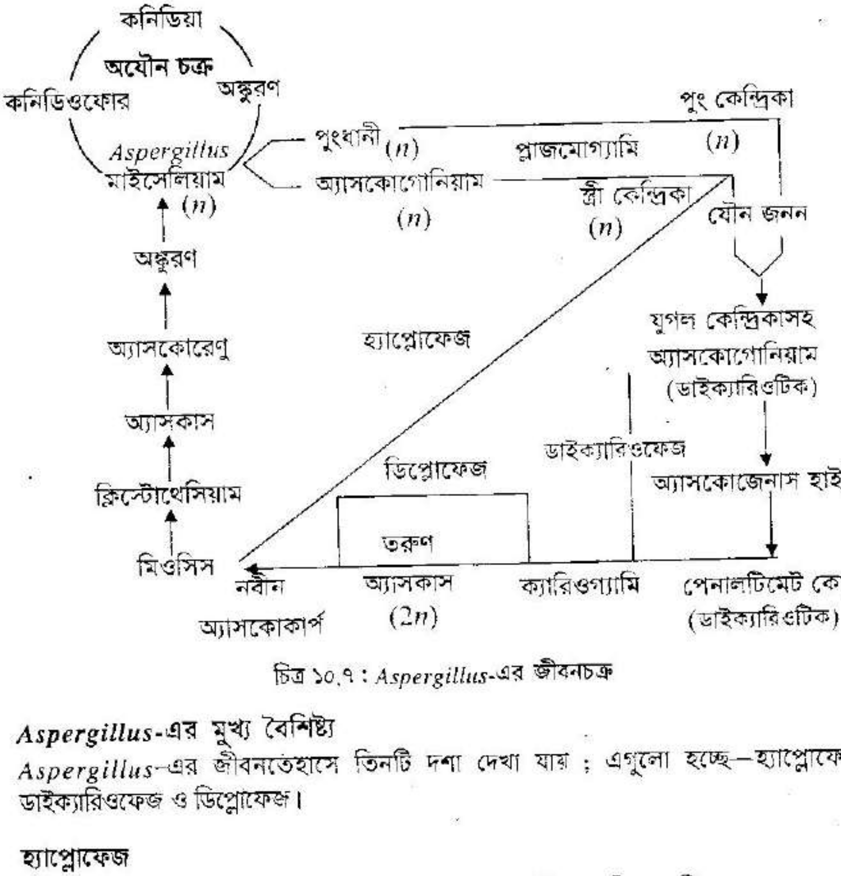

চিত্র ১০.৭ : *Aspergillus*-এর জীবনচক্র

Aspergillus-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য

Aspergillus–এর জীবনতিহাসে তিনটি দশা দেখা যায় ; এগুলো হচ্ছে—হ্যাপ্লোফেজ, ডাইক্যারিওফেজ ও ডিপ্লোফেজ।

হ্যাপ্লোফেজ

১. প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত ও বর্ণহীন অনুসূত্রের সশাখ মাইসেলিয়াম নিয়ে গঠিত। এর কোষগুলো বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত।

২. খণ্ডায়ন ছাড়াও নিশ্চল, বায়ুবাহিত ও বহির্জনেষ্ণুভাবে উৎপন্ন কনিডিয়া দিয়ে জনন কাজ চলে। প্রথমদিকে এগুলো এককেন্দ্রিকাযুক্ত হলেও পরে বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়ে যায়।

৩. কনিডিয়ামগুলো গোলাকার, স্থূল কন্টকিত এককেন্দ্রিকাযুক্ত প্রাচীর ও এককোষীয়।

৪. কনিডিয়াগুলো একটির উপর আরেকটি রূপে শিকলাকারে বোতলাকৃতি স্টেরিগমাটার উপর উৎপন্ন হয়।

৫. ভেসিকলের উপরতলে স্টেরিগমাটাগুলো উৎপন্ন হয়। আর ভেসিকলটি কনিডিওফোরের অগ্রভাগে প্রস্থপ্রাচীরবিহীন, অশাখ, খাড়া ও লম্বা ধরনের বিশেষ অগ্রভাগ।

৬. প্রতিটি মাইসেলিয়ামের T-আকৃতির স্থূল কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ হতে উপবৃদ্ধি হিসেবে প্রতিটি কনিডিওফোরের উৎপত্তি হয়।

৭. কোনো কোনো সময় স্টেরিগমাটা দুটি স্তরে উৎপন্ন হয়। উপরের স্তরটিকে গৌণ স্টেরিগমাটা ও নিচেরটিকে প্রাথমিক স্টেরিগমাটা বলে। এক্ষেত্রে গৌণ স্টেরিগমাটা কনিডিয়া বহন করে থাকে।

৮. কনিডিয়ামগুলো অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত আশ্রয়ে পতিত হলে অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর নল দেয় এবং হ্যাপ্লোমাইসেলিয়ামে বিকাশলাভ করে।

৯. একই মাইসেলিয়ামের পাশাপাশি অনুসূত্রে পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়াম উৎপন্ন হয়। স্ত্রী শাখাকে আর্কিকার্প ও পুং শাখাকে পলিনোডিয়াম বলে।

১০. জননাঙ্গ লম্বা ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত গঠন। পলিনোডিয়াম কুণ্ডলিত হয়ে অ্যাসকোগোনিয়াকে পেঁচিয়ে ধরে।

১১. পুংধানী শীর্ষটি ট্রাইকোগাইনের সংস্পর্শে আসে এবং স্পর্শ অঞ্চলে উভয়ের প্রাচীর গলে যায়।

১২. যদি পুংকেন্দ্রিকার অ্যাসকোগোনিয়ামে স্থানান্তর হয় তবে ক্যারিওগ্যামি হবে, অন্যথায় অ্যাসকোগোনিয়াল কেন্দ্রিকা যুগলায়িত হয়ে ডাইক্যারিয়ন গঠন করে। ফলে হ্যাপ্লোফেজের পরিসমাপ্তি ও ডিপ্লোফেজের সূচনা হয়।

ডাইক্যারিওনফেজ

১. ডাইক্যারিয়ন প্রতিষ্ঠিত হলে অ্যাসকোগোনিয়াল হাইফিগুলো অ্যাসকোগোনিয়াম হতে উদগত হয়। এটি প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত ও শাখা–প্রশাখাযুক্ত। তবে শাখাগুলো একই তলে থাকে না।

২. অ্যাসকোজেনাস হাইফি বা অন্য কোনো শাখায় প্রান্তীয় দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত কোষ হতে অ্যাসাই গঠিত হয়।

৩. দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত তরুণ অ্যাসকাস মাতৃকোষটি ডাইক্যারিওফেজের সর্বশেষ কোষ এবং ডাইক্যারিওনসহ অ্যাসকোগোনিয়াম ও অ্যাসকোজেনাস হাইফি নিয়ে গঠিত।

৪. ডাইক্যারিওফেজটি হ্যাপ্লোমাইসেলিয়ামের উপর নির্ভরশীল।

৫. যৌনজড়িত গঠনটি বন্ধ্যা হাইফি–গঠিত পেরিডিয়াম দিয়ে আবৃত থাকে।

৬. এভাবে গঠিত ফলদেহ বা ক্লিস্টোথেসিয়াম আকারে ক্ষুদ্র, গোলাকার অ্যাসকোকার্প। প্রাচীর স্থূল ও হলুদ। এতে কোনো প্রকার রন্ধ্র থাকে না।

৭. অ্যাসকাস মাতৃকোষে ক্যারিওগ্যামি সংঘটিত হলে ডাইক্যারিওফেজের সমাপ্তি ঘটে এবং ডিপ্লোফেজের সূচনা হয়।

৮. তরুণ অ্যাসকাসের বিকাশে এটি আকারে বড় হয় এবং সিনক্যারিয়ন মিওটিক ও মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে ৮টি অ্যাসকোরেণু দেয়।

৯. অ্যাসাই–এর প্রাচীর বিগলিত হয় ও অ্যাসকোরেণুগুলো ক্লিস্টোথেসিয়ামে মুক্ত হয়। অতঃপর ক্লিস্টোথেসিয়াম প্রাচীরও পচে–গলে যায় এবং অ্যাসকোরেণুগুলো মুক্ত পরিবেশে নির্গত হয়।

১০. প্রতিটি অ্যাসকোরেণু উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর নল দেয় এবং এ নলটিই কালক্রমে হ্যাপ্লোমাইসেলিয়ামে পরিণত হয়।

Aspergillus-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Aspergillus–আমাদের যেমন উপকার করে তেমনি অপকার করে দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর প্রভাব ফেলে ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করে।

উপকার

১. *A. oryzae* নামক মৃতজীবী ছত্রাকটি স্যাকারিফিশন পদ্ধতিতে ব্যবহার করে চাল-শর্করা হতে অ্যালকোহল তৈরি করা হয়।
২. *A. niger*–কে ব্যবহার করে সাইট্রিক অ্যাসিড ও অন্যান্য জৈব-অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়।
৩. *A. niger*, মাটি বা অন্য কোনো পদার্থে তামার উপস্থিতি যাচাইকরণে ব্যবহৃত হয়।
৪. কিছু কিছু প্রজাতি হতে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়।
৫. *A. niger* ও *A. oryzae* –এর আবাদ হতে যেসব উৎসেচক পাওয়া যায় সেগুলো শিল্প-কারখানায় গাঁজনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

অপকার

১. *Aspergillus* খেজুর, শাক-সবজি, ডুমুর, তামাক ও তামাকের তৈরি সামগ্রী, বাদামজাতীয় ফলমূল, রুটি ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু বিনষ্ট ও পচনের জন্য দায়ী।
২. *A. niger* হলো গবেষণাগারের আগাছা ; কেননা, এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আবাদ মাধ্যমকে দূষিত করে। এগুলো কালো বর্ণের ছত্রাক।
৩. *A. fumigatus, A. flavus, A. niger*, ছত্রাকগুলো মানুষ ও পশু-পক্ষীকে আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে। এরা প্রাণী ও গাছে যে রোগ সৃষ্টি করে সেগুলোকে মিলিতভাবে Aspergillosis রোগ বলে। আর মানুষের কানে এরা otomycosis রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

প্রতীক গণ : *Penicillium*

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

বিভাগ— Mycota
উপবিভাগ— Eumycotina
শ্রেণি— Ascomycetes
উপশ্রেণি— Euascomycetidae
সিরিজ— Plectomycetes
বর্গ— Aspergillales (Plectascales)
গোত্র— Aspergillaceae
গণ— *Penicillium (Talaromycus)*
প্রজাতি— *P. vermiculatum (vermiculatus)*

স্বভাব ও বসতি

Penicillium একটি মৃতজীবী ছত্রাক। স্থলজ ও বায়বীয় পরিবেশ ছাড়াও এগুলো শাক-সবজি, পচা ফল, গলিত মাংস প্রভৃতির উপর জন্মে সবুজ বা নীলাভ বর্ণের আস্তরণ সৃষ্টি করে। এ রং

রেণু দিয়ে সৃষ্ট। এরা বিশ্বজনীন এবং 'সবুজ মোল্ড' ও 'নীলাভ মোল্ড' নামে পরিচিত। এদের প্রায় ১৪০টি প্রজাতি রয়েছে। এদের অনেকেই ক্ষতিকারক ; কিন্তু কতিপয় প্রজাতি উপকারী। *P. italicuim* ও *P. digitalum*–উদ্ভিদ রোগসৃষ্টিকারীরূপে অধিক পরিচিত। এগুলো লেবুজাতীয় ফলে 'soft-rot' রোগ সৃষ্টি করে। *P. roqueforti* ও *P. camemberti* মাখন–পনিরকে সাজিয়ে একটি বিশেষ গন্ধ দান করে এদের মান বৃদ্ধি করে। অনেক ছত্রাকবিদ এদের ১৪০টি প্রজাতির কথা উল্লেখ করলেও Raper ও Thom (১৯৪৯) ১৩৬টি প্রজাতির কথা উল্লেখ করেন।

মানুষ ও পশুর রোগ সৃষ্টিকারীরূপেও এদের পরিচিতি আছে। আবার জৈব–অ্যাসিড, অ্যালকোহল ও রঞ্জকদ্রব্য সংশ্লেষে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। Sir Alexander Fleming (১৯২৯) এ ছত্রাক হতে *(P. notatum)* এক অত্যাশ্চর্য জীবাণুধ্বংসকারী মহৌষধ বা অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

দৈহিক গঠন

Penicillium-এর দেহ বা মাইসেলিয়াম কতকগুলো বহু শাখাযুক্ত, বহুকোষী, অতি সরু সূতার ন্যায় অনুসূত্র নিয়ে গঠিত। অনুসূত্রগুলো পরস্পর জড়িত হয়ে জালের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। নিম্নভাগের অনুসূত্র হতে কতকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রাইজয়ড–এর ন্যায় অংশ বের হয়ে মাধ্যম হতে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রতিটি অনুসূত্র কোষে একটি করে কেন্দ্রিকা থাকে *(P. vermiculatum)*। তবে একাধিক কেন্দ্রিকাযুক্ত প্রজাতিও রয়েছে। কেন্দ্রিকাপর্দা রন্ধ্রযুক্ত। কোষের প্রাণসত্তায় মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজম ও আন্তঃপ্লাজমা জালিকা থাকে। প্রস্থপ্রাচীরেও রন্ধ্র থাকে। ফলে প্রাণসত্তা প্রবাহ অব্যাহত থাকে। কোষের প্রাণসত্তায় কখনো কখনো সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে তেলবিন্দুও দেখা যায়। অঙ্গজ দশায় মাইসেলিয়ামের রঙ স্বচ্ছ বা বিবর্ণ থাকে। কিন্তু জনন পর্যায়ে রঙের আবির্ভাব হয়। Baker (১৯৪৪) উল্লেখ করেন যে, দুটি ভিন্ন মাইসেলিয়ামের একাধিক অনুসূত্রের মিলনের ফলে অনেক সময় হেটারোক্যারিওটিক মাইসেলিয়াম এর উদ্ভব হয়। কিছু কিছু প্রজাতিতে Selerotium–ও গঠিত হয়।

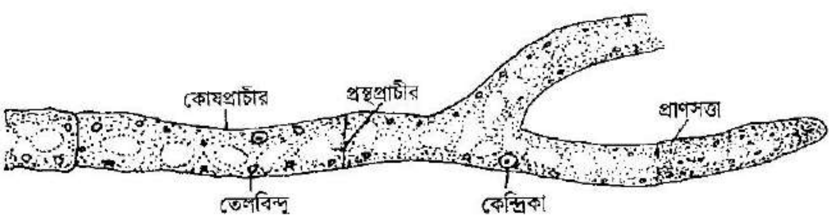

চিত্র ১০.৮ : *P. vermiculatum* খ. মাইসেলিয়ামের একাংশ বড় করে দেখানো হয়েছে

জনন

Penicillium–এ তিন ধরনের জনন দেখা যায় ; যথা—

১. অঙ্গজ জনন ;

২. অযৌন জনন ও

৩. যৌন জনন।

অঙ্গজ জনন : সাধারণত খণ্ডায়ন পদ্ধতিতে অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে। এ ধরনের খণ্ডায়ন যে কোনোভাবেই হতে পারে এবং মাতৃ-অনুসূত্রটি একাধিক খণ্ডে ভাগ হয়ে যেতে পারে। এ অপত্য খণ্ডগুলো বারবার বিভক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মাইসেলিয়ামে পরিণত হয়।

অযৌন জনন : বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি সবচেয়ে সফল প্রক্রিয়া বলে গণ্য। কনিডিয়া নামক অযৌন রেণু মাধ্যমে অযৌন জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অযৌন জননের সময় পরিণত মাইসেলিয়ামের অভ্যন্তরভাগ হতে ২/৩ কোষযুক্ত কতকগুলো সূক্ষ্ম শাখান্বিত অনুসূত্র খাড়াভাবে বের হয়ে আসে। একেই কনিডিওফোর বলে। এদের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট। প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত কনিডিওফোর অতঃপর তার শীর্ষভাগে সমআকারের গুটিকয়েক (৩/৪) প্রতিসম শাখা আবর্তাকারে উৎপন্ন হয়। এগুলোকে মেটুলি বলে। প্রতিটি মেটুলির অগ্রভাগ হতে অনেকগুলো বোতলাকৃতির ঘন সন্নিবিষ্ট প্রশাখা বের হয় এগুলোকে স্টেরিগমাটা বলে। প্রতিটি স্টেরিগমাটার শীর্ষাঞ্চল হতে পদাভিমুখ পদ্ধতিতে সাধারণত স্থূল প্রাচীরযুক্ত এক সারি উপবৃত্তাকার ঈষৎ কণ্টকিত বা মসৃণ এককেন্দ্রিকাযুক্ত কোষ পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন হয়। এ কোষগুলোকে কনিডিয়া বলে। বিশেষ ধরনের এ শাখাবিন্যাসবিশিষ্ট কনিডিওফোর শাখার শীর্ষভাগ দেখতে ব্রাশ বা শিল্পীর তুলির ন্যায় দেখায় ; একেই Penicillus বলে। এখান হতেই ছত্রাকটির গণ নাম *Penicillium* রাখা হয়েছে।

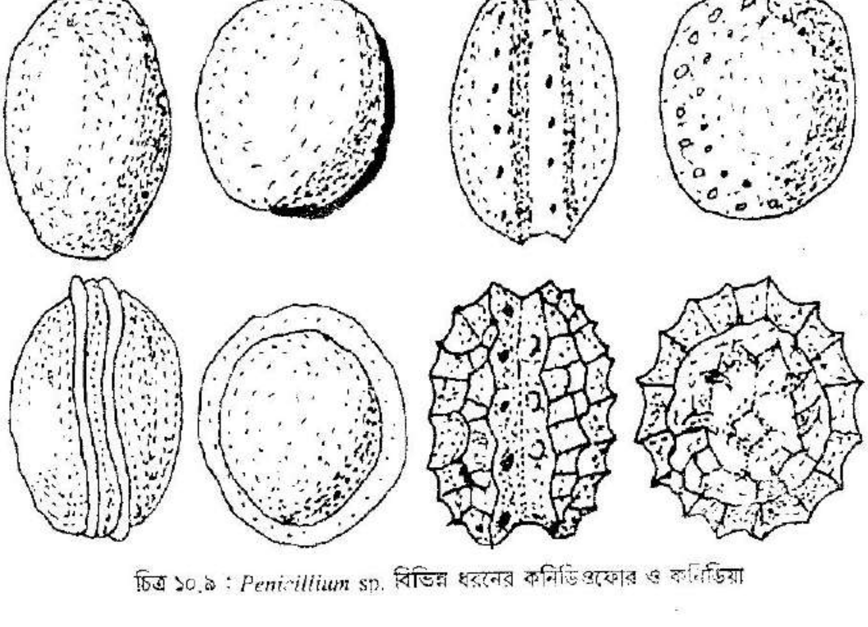

চিত্র ১০.৯ : *Penicillium* sp. বিভিন্ন ধরনের কনিডিওফোর ও কনিডিয়া

কনিডিয়ামগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার ও উপবৃত্তাকার হতে পারে এবং এদের গাত্র কণ্টকিত বা মসৃণ হতে পারে। এদের উদ্ভব (চিত্র ১০.৯) পর্যায়ক্রমে হয় বলে এদেরকে মালার মতো দেখায়। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর এগুলো সহজেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে। প্রতিটি কনিডিয়াম অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে বিকাশলাভ করে প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন মাইসেলিয়ামের জন্ম দেয়।

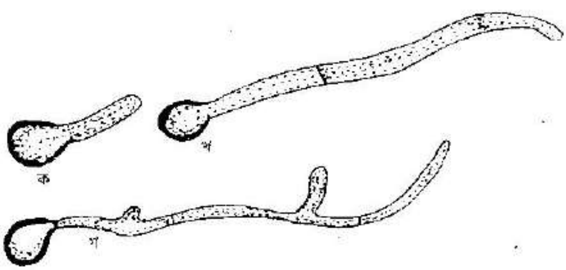

চিত্র ১০.১০ : *Penicillium* sp. কনিডিয়ার অঙ্কুরণ দশা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, *Penicillium*-এর কনিডিয়াল দশা *Aspergillus* হতে অধিক প্রকট। এদের অধিকাংশ প্রজাতিই তাদের কনিডিয়াল দশা দিয়ে পরিচিত। এদের প্রায় ২০টি প্রজাতিতে ক্লিস্টোথেসিয়াম গঠিত হয়। যখন এদের অযৌন ও যৌন দশার সাথে সম্পর্ক অজ্ঞাত ছিল তখন এদের অসম্পূর্ণ দশার নাম ফর্মগণ *Penicillium* ও যৌন দশার নাম ফর্মগণ *Talaromyces* রাখা হয়। কিন্তু যেদিন যৌন জনন আবিষ্কৃত হলো এবং অযৌন দশার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো সেদিন ও ফর্মগণদ্বয়কে একত্রিত করে Ascomycetes-এর অন্তর্ভুক্ত করে গণ নাম দেওয়া হলো Talaromyces. কিন্তু আজও বহু ছত্রাকবিদ *Penicillium* গণ নামই ব্যবহার করছেন। কেননা এখানে কনিডিয়াল দশাটি প্রকট। তাছাড়া *Penicillium* নামটি প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে।

যৌন জনন

Penicillium vermiculatum, *P. glaucum*, *P. brefeldianum* প্রভৃতি কতিপয় হোমোথ্যালিক প্রজাতিতে যৌন জনন অনুশীলন করে দেখা হয়েছে। Derx (১৯২৫). *P. luteum*-এ হেটারোথ্যালিজম লক্ষ্য করেছেন বলে দাবি করলেও তা গবেষকগণ কর্তৃক সমর্থিত হয় নি। প্রজাতিভেদে যৌন জননে বিভিন্নতা দেখা যায়। *P. vermiculatum*-এ উগ্যামীয় জনন দেখা যায়। Dangeard (১৯০৭) এটির যৌন জনন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেন। তিনি পুংজননাঙ্গকে পুংধানী ও স্ত্রীজননাঙ্গকে অ্যাসকোগোনিয়াম বলে উল্লেখ করেন।

ক. **অ্যাসকোগোনিয়াম :** পরিণত অ্যাসকোগোনিয়াম লম্বা, খাড়া, বহু কেন্দ্রিকাযুক্ত, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও নলাকার ধরনের। এটির ঊর্ধ্বাংশটি ছাতার হাতলের মতো বক্র হতে পারে। এটি মাইসেলিয়ামের যে কোনো কোষ হতে পার্শ্বীয় উপবৃদ্ধি হিসেবে উৎপন্ন হয়। এটি তরুণাবস্থায় এককেন্দ্রিকাবিশিষ্ট হয়। এটি যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন কেন্দ্রিকা বরাবর বিভক্ত হয়ে ৩২ থেকে ৬৪টি অপত্য কেন্দ্রিকা দেয়। এগুলো অ্যাসকোগোনিয়ামের প্রাণসত্তায় ছড়িয়ে থাকে।

খ. **পুংধানী :** ইতোমধ্যে পাশের নিকটবর্তী অপর একটি অনুসূত্র হতে একটি এককোষী শাখা সোজা ও শাখাবিহীনভাবে উৎপন্ন হয়। একেই পুংধানী শাখা বলে। এটি অ্যাসকোগোনিয়ামকে স্পর্শ করার পরপরই শাখার অগ্রভাগে একটি কোষ গঠিত হয়। একে বলে পুংজননকোষ বা পুংধানী। পুংধানী খাটো, প্রান্তীয়, এককোষী ও ক্লাব-আকৃতির।

গ. **প্লাজমোগ্যামি :** পুংধানীযুক্ত শাখাটি ক্রমশ দীর্ঘ হয় এবং আসকোগোনিয়ামকে কয়েকবার পেঁচিয়ে উপরে উঠে এবং এর অগ্রভাগ অ্যাসকোগোনিয়ামকে স্পর্শ করে।

স্পর্শস্থানের প্রাচীরদ্বয় ক্রমে দ্রবীভূত হয়ে রন্ধ্রের সৃষ্টি হয়। এ রন্ধ্রপথেই পুংকেন্দ্রিকাটি অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে। কিন্তু Dangeard তা অস্বীকার করেন এবং উল্লেখ করেন যে, পুংধানী শুধু অ্যাসকোগোনিয়াম সংস্পর্শ দিয়ে উত্তেজিত করে। এছাড়া পুংধানীর আর কোনো ভূমিকা নেই। তবে মিলনক্রিয়া সঠিকভাবে পরিলক্ষিত না হলেও এককোষী অ্যাসকোগোনিয়াম এরূপ মিলনের পরই দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত বা যুগলকেন্দ্রিকাযুক্ত হয় ; একে অটোগ্যামি বলে। প্রতি জোড়া কেন্দ্রিকাকে বলে ডাইক্যারিয়ন। আবার অনেকেই মনে করেন যে, পুং ও স্ত্রী কেন্দ্রিকার মিলন অবশ্যম্ভাবী। যাহোক, ডাইক্যারিয়ন অবস্থা সৃষ্টির পরেই প্রতি জোড়া পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত হয়ে অ্যাসকোগোনিয়াম বহু .কোষে পরিণত হয়।

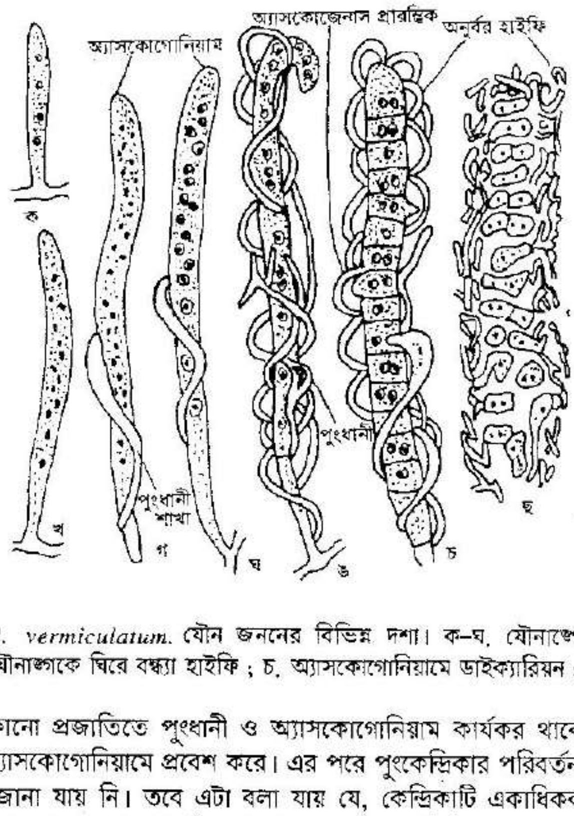

চিত্র ১০.১১ : *P. vermiculatum.* যৌন জননের বিভিন্ন দশা। ক–ঘ. যৌনাঙ্গের বিকাশ ; ঙ. যৌনাঙ্গকে ঘিরে বন্ধ্যা হাইফি ; চ. অ্যাসকোগোনিয়ামে ডাইক্যারিয়ন ; ছ. পরবর্তী দশা

কোনো কোনো প্রজাতিতে পুংধানী ও অ্যাসকোগোনিয়াম কার্যকর থাকে এবং রন্ধ্রপথে পুংকেন্দ্রিকা অ্যাসকোগোনিয়ামে প্রবেশ করে। এর পরে পুংকেন্দ্রিকার পরিবর্তন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায় নি। তবে এটা বলা যায় যে, কেন্দ্রিকাটি একাধিকবার বিভক্ত হয়ে অ্যাসকোগোনিয়ামের সমসংখ্যক কেন্দ্রিকা উৎপন্ন করে যাতে প্রতিটি সজোড় হতে পারে।

প্লাজমোগ্যামি-উত্তর পরিবর্তন

প্লাজমোগ্যামি সংঘটিত হওয়ার পর যেসব পরিবর্তন অ্যাসকোগোনিয়ামে দেখা যায় সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **অ্যাসকোগোনিয়াম-পার্শ্বপ্রাচীরযুক্ত হয় :** অ্যাসকোগোনিয়াম ডাইক্যারিয়নযুক্ত হয়ে প্রতিটি সজোড় কোষ প্রস্থপ্রাচীর তৈরি করে পৃথক হয়ে যায় ও বহুকোষীতে পরিণত হয়।

২. **অ্যাসকোজেনাস হাইফির বিকাশ :** এ কোষগুলো হতে বহুসংখ্যক দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত শাখা অনুসূত্র উৎপন্ন হয়। এগুলো প্রথমত উপবৃদ্ধিরূপে বের হয়। এদেরকে বলে অ্যাসকোজেনাস প্রারম্ভিক। অতঃপর প্রতিটি অ্যাসকোজেনাস প্রারম্ভিকগুলো শাখান্বিত হয়ে অ্যাসকোজেনাস হাইফিতে পরিণত হয়। এসব হাইফি সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয় না। প্রজাতিভেদে এ হাইফিগুলো এককোষী বা একাধিককোষী হতে পারে।

৩. **অ্যাসকাস গঠন :** Emmons (১৯৩৫) উল্লেখ করেন যে, অনেক প্রজাতিতে এসব ডাইক্যারিয়ন কোষ হতে সরাসরি (উপর দিক হতে) অ্যাসকাস তৈরি হয়। প্রথমে শীর্ষকোষটি এবং পরে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকের কোষগুলো অ্যাসকাস গঠন করে। ফলে এগুলো শিকলাকারে বিন্যস্ত হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই ক্রোজিয়ার মাধ্যমে অ্যাসকাস তৈরি হয়। দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত কোষটি প্রথমে অ্যাসকাস মাতৃকোষরূপে কাজ করে। এসময় ক্যারিওগ্যামি সংঘটিত হয় এবং অ্যাসকাসটি ডিপ্লয়ড হয়। এখান হতেই ডিপ্লোফেজ দশা শুরু হয়। প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত অ্যাসকোগোনিয়াম, অ্যাসকোজেনাস হাইফি ও অ্যাসকাস মাতৃকোষ নিয়ে এ ডাইক্যারিওফেজ গঠিত। এটি পরনির্ভরশীল। সিনক্যারিয়নযুক্ত কোষটি হলো তরুণ অ্যাসকাস। এটিই ডিপ্লোফেজের একমাত্র প্রতিনিধি। এ দশাটি ক্ষণস্থায়ী।

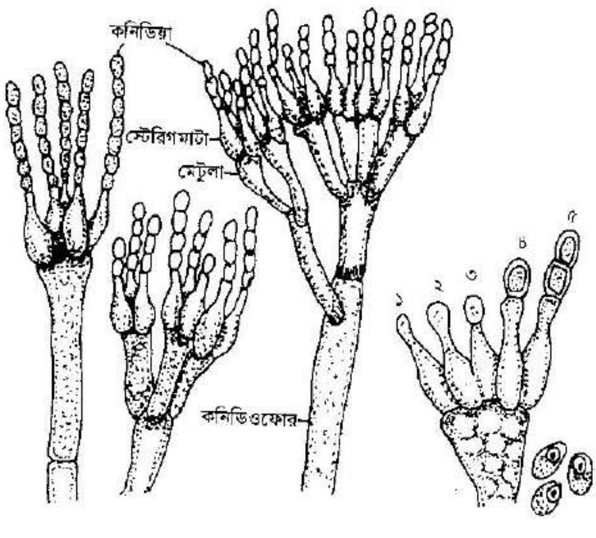

চিত্র ১০.১২ : *P. vermiculatum* ক. তরুণ ক্লিস্টোথেসিয়ামের প্রস্থচ্ছেদ ; খ. পরিণত ক্লিস্টোথেসিয়ামের অংশবিশেষ দেখানো হয়েছে ; গ. অ্যাসকোরেণু

৪. **অ্যাসকোরেণু তৈরি :** তরুণ অ্যাসকাস আকারে বড় হয় এবং ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকাটি মিওটিক ও মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে ৮টি অপত্য কেন্দ্রিকা দেয়। প্রতিটি অপত্য কেন্দ্রিকাকে ঘিরে স্বল্প পরিমাণ প্রাণসত্তা থাকে। অতঃপর এগুলো নিজস্ব প্রাচীর নিঃসৃত করে

অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। কাজেই মুক্ত কোষগঠন পদ্ধতিতে প্রতিটি পরিণত অ্যাসকাসে ৮টি করে অ্যাসকোরেণু থাকে। এগুলো গোলাকার বা নাশপাতি আকৃতির। পাশ থেকে দেখলে এগুলোকে পুলি–চাকার মতো এবং সামনে থেকে দেখলে গোল বা তারকাকার দেখায়। রেণুপ্রাচীর মসৃণ কিংবা অলংকৃত হতে পারে।

৫. **অ্যাসকোকার্পের গঠন :** অ্যাসকোগোনিয়াম প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত ও অ্যাসকোজেনাস হাইফি উৎপন্ন হওয়ার পর যৌনযন্ত্রের চারদিকে বহু সংখ্যক বন্ধ্যা হাইফি উৎপন্ন হয়। এ হাইফিগুলো পরস্পর জড়াজড়ি করে যৌনযন্ত্রকে ঘিরে ফেলে এবং ফাঁপা বলের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। একেই অ্যাসকোকার্প বলে। এ বন্ধ্যা হাইফি পরিবৃত অবস্থায় অ্যাসকোজেনাস হাইফি বিকশিত ও শাখান্বিত হয় এবং হাইফিগুলো পেরিডিয়ামে পরিণত হয়। এ অ্যাসকোকার্পের মধ্যেই অ্যাসকোরেণুগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। Talaromyces–এর অ্যাসকোকার্প অনিয়ত বৃদ্ধিযুক্ত এবং অ্যাসকোরেণু পরিণত হতে শুরু করার পরও আকারে বৃদ্ধি পেতে পারে। সমগ্র পরিণত যৌনাঙ্গটি আকারে গোলাকার হয় এবং এতে কোনো মুখছিদ্র থাকে না। এ ধরনের ফলদেহকেই ক্লেস্টোথেসিয়াম বলে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, *Penicillum*-এর পেরিডিয়াম *Aspergillus*–এর আবরণী হতে অধিক স্থূল ও মজবুত।

অ্যাসকোকার্পের মধ্যে অ্যাসাই শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। কিন্তু *Penicillium*–এর কয়েকটি প্রজাতির পেরিডিয়াম সুগঠিত ও সিউডোপ্যারেনকাইমীয় হয়ে থাকে। অ্যাসাই এককভাবে এবং পার্শ্বীয় শাখার এককোষযুক্ত শীর্ষভাগে উৎপন্ন হয়।

Penicillium–এর ক্লেস্টোথেসিয়ামে তিনটি জনু দেখা যায় —

১. **মাতৃহ্যাপ্লোফেজ :** এর প্রতিনিধি হলো আবরণী বা পেরিডিয়াম যা আলগাভাবে পরস্পর জটপাকানো অনুসূত্রের তৈরি।

২. **ডাইক্যারিওফেজ :** এটি অ্যাসকোগোনিয়ামের দ্বিকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট কোষ, অ্যাসকোজেনাস অনুসূত্র ও অ্যাসকাস মাতৃকোষ নিয়ে গঠিত। ডিপ্লাফেজটি শুধু তরুণ অ্যাসকাসে ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকার উপস্থিতির মাধ্যমে উপস্থাপিত।

৩. **ভাবী হ্যাপ্লোফেজ :** অ্যাসাই–এর অ্যাসকোরেণু এর প্রতিনিধি বলে গণ্য।

অ্যাসকোরেণুর নির্গমন

ক্লিস্টোথেসিয়াম পরিণত হলে অ্যাসকাসপ্রাচীর দ্রবীভূত হয় এবং মুক্ত অ্যাসকোরেণুগুলো দেখতে পুলি–চাকার পার্শ্বদৃশ্যের মতো। মুক্ত হওয়ার পূর্বে এ রেণুগুলো এক ধরনের তরল পদার্থের উপর ভাসতে থাকে। এ তরল পদার্থ হচ্ছে—অ্যাসকোজেনাস হাইফি, অ্যাসকাস প্রাচীর ও পেরিডিয়ামের ভিতর প্রাচীরের তরলীভূত অবস্থা বিশেষ। অ্যাসরেণুগুলো এখান হতেই পুষ্টিদ্রব্য সংগ্রহ করে ও পরিণত হয়। পেরিডিয়ামের বহিঃপ্রাচীর বিনষ্ট হলে অ্যাসকোরেণুগুলো মুক্ত হয়।

অ্যাসকোরেণুর অঙ্কুরণ

এককেন্দ্রিকাবিশিষ্ট ও মুক্ত অ্যাসকোরেণুগুলো বায়ুবাহিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা ও বায়ুস্বল্পতা থাকলে তা সুপ্তাবস্থায় থেকে যায় ; আর উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অঙ্কুরিত হয়ে অঙ্কুর নল দেয়। কালক্রমে এটি বড় হয়ে, প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত হয় ও শাখান্বিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম উৎপন্ন করে।

আলোচনা

অনেক *Penicillium* প্রজাতির যৌন জনন সম্পর্কে আজও কিছু জানা যায় নি। Brefeld (১৮৭৪) *Penicillium glaucum*–এ অ্যাসকোকার্পের বিকাশ সম্পর্কে প্রথম তথ্য পরিবেশন করেন। Dodge (১৯৩৩) *P. stipitalum* এর যৌন জননের বিশদ বিবরণ দেন।

Langeron (১৯২২) *P. glaucum*–এর গণ নাম *Carpenteles* রাখার প্রস্তাব করেন। কেননা এর অ্যাসকোকার্প প্রারম্ভিক পর্যায়ে স্ক্লেরোশিয়ামসদৃশ বড়ির মতো হয়ে উদ্গত হয় এবং ক্রমশ শক্ত প্রাচীরযুক্ত হয়ে অ্যাসকাসগুলো কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে গঠিত হয়। Raper ও Thom (১৯৪৯) ঐসব *Penicillium*–এর গণ নাম *Carpentelas* রাখার পক্ষপাতি সেগুলো অ্যাসকোকার্প এভাবে উৎপন্ন হয়। Benjamin (১৯৫৫) *Carpenteles* নাম ব্যবহারের পক্ষপাতি। তিনি আরও মনে করেন যে, যেসব *Penicillium*–এর অ্যাসকোকার্প কোমল, হলুদ ও হলুদাভ সেগুলোর গণ নাম *Talaromyces* হওয়া উচিত। Raper (১৯৫৭) এ ধরনের পরামর্শকে জোরালো ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন ও যুক্তিহীন বলে প্রমাণ করেছেন। অ্যাসকোকার্পিকই হোক বা পূর্ণভাবে কনিডিয়ালই হোক না কেন, শ্রেণিবিন্যাসের দিক হতে *Penicillium* নামটি ধরে রাখা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়।

***Penicillium* ও *Aspergillus*-এর পার্থক্য**

নিম্নবর্ণিত ছকে বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে গণদ্বয়কে অতি সহজেই চেনা যায়।

Penicillium	*Aspergillus*
১. কনিডিওফোর সশাখ ও প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত।	১. কনিডিওফোর অশাখ ও প্রস্থপ্রাচীর-বিহীন।
২. মাইসেলিয়ামের কোনো দেহকোষ হতে কনিডিওফোর উৎপন্ন হয় না এবং পাদকোষও অনুপস্থিত।	২. পুরু প্রাচীরযুক্ত T-আকৃতির পাদকোষ হতে কনিডিওফোর উৎপত্তি হয়।
৩. কনিডিওফোরের শীর্ষদেশ গোলাকার নয় এবং ভেসিকলও থাকে না	৩. কনিডিওফোরের শীর্ষভাগ গোলাকার ভেসিকলে রূপান্তরিত হয়।
৪. কনিডিয়া ও স্টেরিগমাটাসহ সমগ্র গঠনটি ব্রাশ বা শিল্পীর তুলির ন্যায় ; একে পেনিসিল্লাস বলে।	৪. কনিডিয়া ও স্টেরগমাটাসহ গঠনটিকে ছাতার মতো বা মুগুরের ন্যায় দেখায়।
৫. ক্লিস্টোথেসিয়ামের পেরিডিয়াম মজবুত, স্থূল ও সুগঠিত হতে পারে। রং সবুজ বা নীল।	৫. ক্লিস্টোথেসিয়ামের পেরিডিয়াম নরম; একস্তরীয় ও হলুদাভ।

Penicillium brefeldianum : এ প্রজাতিটিতে কোনো যৌনাঙ্গ তৈরি হয় না। অঙ্গজ অনুসূত্র হতে দুটো একই ধরনের স্ফীতি উদ্গত হয়। এগুলোকে সংশ্লেষ শাখা বলে। এগুলো বৃদ্ধি পায় এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। ফলে উভয়ের শীর্ষভাগ পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। স্পর্শস্থানের প্রাচীরদ্বয় দ্রবীভূত হয়। ফলে একটির বস্তুনিচয় অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে ডাইক্যারিয়ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এটিকে আইসোগ্যামীয় ধরনের জনন বলা যায়।

সংশ্লেষক্রিয়া ঘটার পরপরই সংশ্লেষ শাখার চারদিকে বন্ধ্যা অনুসূত্রে উৎপত্তি হয়ে একে আবৃত করে। এগুলো পার্শ্ববর্তী কোষ হতে উদ্গত হয়। এরূপ বন্ধ্যা হাইফির পরিবেষ্টনের ফলে একটি

'নট' (knot) তৈরি হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এটির বহিঃপ্রাচীর পুরু হয়। এসময়ে ডাইক্যারিওটিক কোষ হতে কিছু উপবৃদ্ধি বের হয় ; এগুলোকে অ্যাসকোজেনাস হাইফি বলে। ইত্যবসরে ডাইক্যারিয়নটি একই সময়ে যুগপৎ বিভাজিত হয়ে সজোড় অবস্থায় অ্যাসকোজেনাস হাইফিতে প্রবেশ করে। অতঃপর অ্যাসকোজেনাস হাইফিটি খাটো দ্বিকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়ে বিভক্ত হয়। এদের কিছু সংখ্যক কোষ কুঁড়ি হিসেবে বিকশিত হয়। এদের শীর্ষভাগটি কুণ্ডলিত থাকে। উত্তম শীর্ষ তলের কুণ্ডলিত শাখাটি হতে বক্রশাখা উদ্ভূত হয় ও কুণ্ডলিত হয়। আবার এখান হতে অনুরূপ বহু শাখার উৎপত্তি হয়। সর্বশেষে উদ্ভূত শাখার প্রতিটি কোষ গোলাকার ; এগুলোকে অ্যাসকাস বলে। অ্যাসকাসে কেন্দ্রিকার মিলন সম্পর্কে কোনো তথ্য আজও জানা যায় নি। প্রতিটি অ্যাসকাসে ৮টি করে অ্যাসকোরেণু থাকে। এ অ্যাসকাসগুলো অন্য প্রজাতির মতোই ক্লিস্টোথেসিয়াম নামক ফলদেহের মধ্যে থাকে। এদের রেণু দ্বিস্তরীয় বহিঃস্তরকে এক্সোরেণু ও অন্তঃস্তরকে অন্তঃরেণু বলে। রেণুর অন্য প্রজাতির অনুরূপ। একে আবাদ মাধ্যমে চাষ করা যায়।

চিত্র ১০.১৩ : *P. crustaceum*–এ যৌন জনন

Penicillium–এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Penicillium–এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একদিকে যেমন মানবজাতির প্রভূত কল্যাণে আসে, তেমনি নানাবিধ ক্ষতিসাধনও করে থাকে।

উপকার

১. শিল্পকারখানায় সাইট্রিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড (*P. purpurognum*) তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

২. মূল্যবান ও সুরভিত পানির খাদ্য তৈরিতে *P. roqueforti* ও *P. camemberti* প্রজাতি দুটির ব্যবহার রয়েছে।

৩. *Griseofulvin*–নামক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধটি *P. griseofulvum* প্রজাতি হতে পাওয়া যায়। এটি ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে এবং প্রাণীও মানুষের দাদ রোগের (রিংওয়ার্ম) প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

৪. *P. notatum, P. chrysogwnum* হতে 'পেনিসিলিন' নামক অত্যাশ্চর্য অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়। এ মহৌষধটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত বহুবিধ রোগের প্রতিষেধক রূপে কাজ করে। অবশ্য এটি কারও কারও জন্য অ্যালার্জিক হতে পারে।

৫. *Penicillium*–এর বিভিন্ন প্রজাতি হতে অ্যালকিডিন, নোটাটিন, স্পাইনুলোসিন, সাইট্রিনিন, ক্ল্যাডিসিন প্রভৃতি প্রতিষেধক ওষুধ তৈরি হয়। এগুলো ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক ও নিবারক হিসেবে কাজ করে।

৬. আর্গস্টেরল ভিটামিন D ও C জাত খাদ্য তৈরি *Penicillium*–এর কোনো কোনো প্রজাতি ব্যবহৃত হয়।

অপকার

১. *Penicillium*–এর অধিকাংশ প্রজাতি চামড়াজাত সামগ্রী, ফ্যাব্রিক্স ও আসবাবপত্র নষ্ট করে থাকে। এরা আর্দ্র আবহাওয়ায় দরজা, জানালার কাঠ গৃহসামগ্রীর ক্ষতিসাধন করে থাকে।

২. আর্দ্র জলবায়ু ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এগুলোর কোনো কোনো প্রজাতি রুটি, পনির, মাখন, জ্যাম, জেলি প্রভৃতিতে জন্মে এগুলোকে নষ্ট করে দেয়। অবশ্য এগুলো কোনো বিষক্রিয়া করে না।

৩. *P. digilatum* ও *P. expansum* লেবুজাতীয় ও অন্যান্য গুদামজাত ফলের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে (গ্রিন মোল্ড)। এগুলো রট ও পচন–এর জন্য দায়ী।

৪. *P. italicum*–প্রজাতিটি লেবুজাতীয় ফলে 'ব্লু–মোল্ড' রোগ সৃষ্টি করে ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

৫. *P. purpurogenum* প্রজাতিটি ছাপা কাগজ, বইপত্র ও কাঠে কালো দাগ সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

৬. *Penicillium* বেশ কিছু প্রজাতি মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীর কান, নাক, মুখমণ্ডল, ফুসফুস ও যকৃত আক্রমণ করে নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করে।

Penicillium সাধারণ বৈশিষ্ট্য

Penicillium–এর জীবনেতিহাসে তিনটি দশা দেখা যায়। যথা—

১. হ্যাপ্লোফেজ,

২. ডাইক্যারিওফেজ ও

৩. ডিপ্লোফেজ

১. হ্যাপ্লোফেজ

১. প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত, সশাখ, বর্ণহীন অনুসূত্র নিয়ে মৃতজীবী মাইসেলিয়ামবিশিষ্ট সুগঠিত ছত্রাকটি এ ফেজের প্রতিনিধি।

২. হ্যাপ্লোমাইসেলিয়ামগুলো জনন মৌসুমে হালকা শুষ্ক, নিশ্চল বায়ুবাহিত রেণু দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এ রেণুগুলোর নাম কনিডিয়া। কনিডিয়াম এককেন্দ্রিকাবিশিষ্ট বা একাধিক কেন্দ্রিকাবিশিষ্ট অযৌন জনন একক।

৩. কনিডিয়াম বহির্জনেষ্ণুভাবে বোতলাকৃতি গৌণ স্টেরিগমাটার শীর্ষে শিকলাকারে উৎপন্ন হয়। এগুলো পদাভিমুখীভাবে উৎপন্ন হয়।

৪. কনিডিওফোরের মেটুলির উপর স্টেটিগমাটাগুলো গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়।

৫. কনিডিওফোরগুলো লম্বা, খাড়া, প্রস্থপ্রাচীরযুক্ত বিশেষ ধারনের অনুসূত্র যা মাইসেলিয়াম হতেই উৎপন্ন হয়। এগুলো শীর্ষাঞ্চলে ব্রাশের ন্যায় শাখা তৈরি করে। একেই পেনিসিল্লাস (penicillus) বলে।

৬. হ্যাপ্লোমাইসেলিয়াম হোমোথ্যালিক। পুং ও স্ত্রীজননাঙ্গ একই মাইসেলিয়ামে উৎপন্ন হয়।

৭. *P. vermiculatum*–এ স্ত্রীজননাঙ্গটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে খাড়া, নলাকার, প্রস্থপ্রাচীরবিহীন ও বহুকেন্দ্রিকাযুক্ত হয়।

৮. পুংজননাঙ্গটি খাটো, ক্লাব-আকৃতির, এককেন্দ্রিকাবিশিষ্ট কোষ এবং পুংশাখাকে এরা আবৃত করে রাখে। এটি স্ত্রীজননাঙ্গকে পেঁচিয়ে ধরে রাখে।

৯. পুংজননাঙ্গের শীর্ষ স্ত্রীজননাঙ্গের সংস্পর্শে আসে এবং স্পর্শস্থানের প্রাচীর দ্রবীভূত হয়ে ছিদ্রপথ তৈরি হয়।

১০. পুং ও স্ত্রীকেন্দ্রিকার মিলনপথ তৈরি হলেও পুংকেন্দ্রিকা স্ত্রীজননাঙ্গে প্রবেশ করে না (*P. vermiculatum*)।

২. ডাইক্যারিওফেজ

১. স্ত্রীকেন্দ্রিকাগুলো যুগলায়িত হয়ে ডাইক্যারিয়ন দেয়। ফলে হ্যাপ্লোফেজের সমাপ্তি ও ডাইক্যারিওফেজের সূচনা হয়।

২. ডাইক্যারিয়ন সম্পন্ন হলে স্ত্রীজননাঙ্গে প্রস্থপ্রাচীর তৈরি হয় এবং প্রতি খণ্ডে একটি করে যুগলকেন্দ্রিকা থাকে।

৩. মধ্যবর্তী খণ্ড হতে অ্যাসকোজেনাস হাইফি উৎপন্ন হয় ও শাখান্বিত হয়। এ শাখাগুলো সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নয়।

৪. অ্যাসকোজেনাস হাইফির দ্বিকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট শীর্ষকোষ হতে অ্যাসকাস তৈরি হয়। অ্যাসকাস মাতৃকোষ দ্বিকেন্দ্রিকাবিশিষ্ট। এটিই হচ্ছে ডাইক্যারিওফেজের সর্বশেষ গঠন একক।

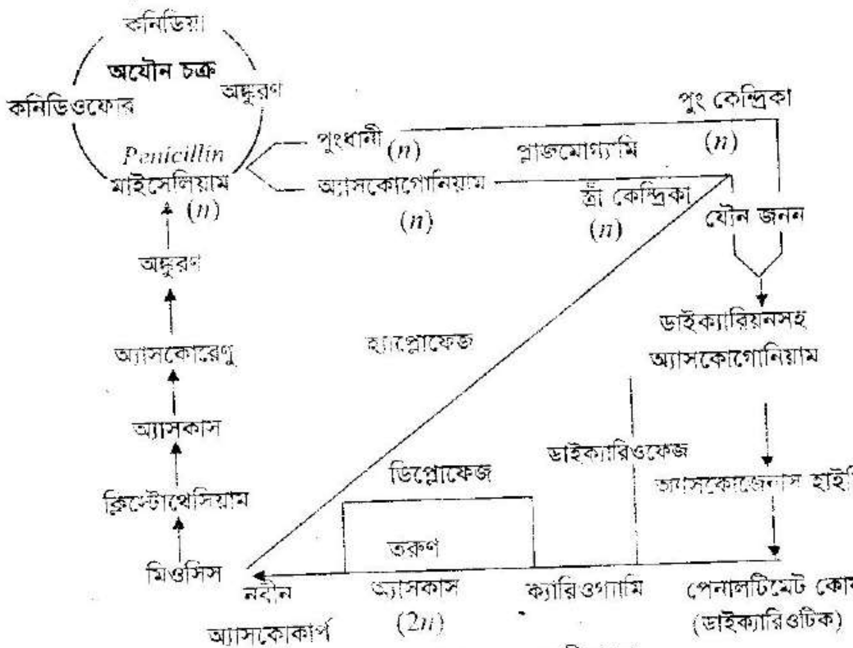

চিত্র ১০.১৪ : *Penicillium* sp.-এ জীবনচক্র

৩. ডিপ্লোফেজ

১. অ্যাসকাস মাতৃকোষে কেন্দ্রিকাদ্বয় মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড কেন্দ্রিকা গঠন করে ; ফলে ডাইক্যারিওফেজেরও পরিসমাপ্তি ঘটে এবং সিনক্যারিয়নযুক্ত ডিপ্লোফেজের উদ্বোধন হয়।

৪. ভাবী হ্যাপ্লোফেজ

১. তরুণ অ্যাসকাস আকারে বড় হয়ে থলির আকার ধারণ করে। সিনক্যারিয়নটি মিওটিক ও মাইটোটিক নিয়মে বিভক্ত হয়ে ৪টি অপত্যকেন্দ্রিকা দেয় ও পরে এগুলো কিছু প্রাণসত্তাসহ অ্যাসকোরেণুতে পরিণত হয়। এ অ্যাসকোরেণুই ভাবী হ্যাপ্লোফেজের পথ প্রদর্শক।

২. পূর্ণতাপ্রাপ্ত থলিসদৃশ অ্যাসাইয়ের প্রতিটিতে ৮টি অ্যাসকোরেণু থাকে। এ রেণুগুলো গোলাকার বা নাশপাতির আকৃতিসদৃশ হয়ে থাকে।

৩. ইতোমধ্যে যৌনাঙ্গকে কিছু সংখ্যক বন্ধ্যা হাইফি ঘিরে ফেলে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে পেরিডিয়াম নামক প্রাচীর তৈরি করে। এ সমগ্র গঠনটিকে অ্যাসকোকার্প বলে।

৪. পরিণত অ্যাসকোকার্প বৃত্তাকার ও ছিদ্রবিহীন। এধরনের অ্যাসকোকার্পকে ক্লিস্টোথেসিয়াম বলে।

৫. অ্যাসকাস পরিণত হওয়ার সাথে সাথে অ্যাসকাস প্রাচীর ভেঙে পড়ে এবং অ্যাকোরেণুগুলো ক্লিস্টোথেসিয়ামের মধ্যে মুক্ত হয়। একসময় এ ক্লিস্টোথেসিয়ামের প্রাচীরও ভেঙে পড়ে এবং রেণুগুলো পরিবেশে মুক্ত হয়।

৬. এককেন্দ্রিকাবিশিষ্ট অ্যাসকোরেণুগুলোর রেণুপ্রাচীর কারুকার্যখচিত হতে পারে। পাশ থেকে দেখলে এগুলো পুলি–চাকার মতো ও সামনে থেকে দেখলে গোলাকার বা তারকার দেখায়।

৭. প্রতিটি অ্যাসকোরেণু, উপযুক্ত পরিবেশে নীত হলে অঙ্কুর নল মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয় এবং এ অঙ্কুর নলই বিকশিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম দেয়।

প্যারাসেক্সুয়ালিটি : যৌন জনন-চক্রে প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামি ও মিওসিস নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে থাকে। কিন্তু *Aspergillus, Penicillium* প্রভৃতি ছত্রাকে এ নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয় না। এসব ছত্রাকে প্লাজমোগ্যামি, ক্যারিওগ্যামি ও মিওসিস হলেও তা নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয় না। ক্যারিওগ্যামি ও মিওসিস এখানে একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এ ধরনের যৌনচক্রকে প্যারাসেক্সুয়ালিটি চক্র ও ঘটনাকে প্যারাসেক্সুয়ালিটি বলে। এক্ষেত্রে কোনো গ্যামেট তৈরি হয় না।

Aspergillus nidulans, A. nigar, Penicillium expensum প্রভৃতি ছত্রাকে প্যারাসেক্সুয়ালচক্রের বিভিন্ন ধাপ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। এ ধাপগুলো নিম্নরূপ :

ক. হেটারোক্যারিওটিক মাইসেলিয়ামের উৎপত্তি

এখানে বিভিন্ন বংশগতিবিশিষ্ট কেন্দ্রিকার অঙ্গজ হাইফি অ্যানাস্টোমোসিস পদ্ধতিতে মিলিত হয়ে এক কোষ হতে অন্য কোষে বা একাধিক কেন্দ্রিকা স্থানান্তরিত হয় ও বিভক্ত হয়। অতঃপর নতুন নতুন অপত্যকেন্দ্রিকা বিতরিত হয়ে হেটারোক্যারিওটিক হয়। অনেক সময় হোমোক্যারিওটিক মাইসেলিয়ামের এক বা একাধিক কেন্দ্রিকা পরিব্যক্তি মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে কোষে অন্যান্য কেন্দ্রিকার মধ্যে বিতরিত হয়েও হেটারোক্যারিওটিক হতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বা একাধিক কেন্দ্রিকা মিলিত হয়ে ডিপ্লয়ড হয় এবং কোষের হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকার মধ্যে বিতরিত হয়ে হেটারোক্যারিওটিক হয়।

খ. **কেন্দ্রিকাগুলোর একত্রীকরণ এবং ডিপ্লয়ড ও হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি**

হেটারোক্যারিওটিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর বংশগতির দিক হতে সদৃশ কেন্দ্রিকার মধ্যে বিসদৃশ কেন্দ্রিকার মধ্যে মিলন হয়। প্রথমটিতে হোমোজাইগাস ডিপ্লয়ড ও দ্বিতীয়টিতে হেটারোজাইগাস ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকার উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাইসেলিয়ামে পাঁচ ধরনের কেন্দ্রিকা থাকতে পারে—যেমন, দু'প্রকার হ্যাপ্লয়ড, দু'প্রকার হোমোজাইগাস ডিপ্লয়ড ও একপ্রকার হেটারোজাইগাস ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা। এসব কেন্দ্রিকা সাধারণত একইহারে বিভক্ত হয় বলে ধরা হয়। তবে হ্যাপ্লয়ড কেন্দ্রিকা ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকা অপেক্ষা সংখ্যায় কম থাকে।

গ. **2n-কেন্দ্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিকালে আকস্মিক মাইটোটিক ক্রসওভার**

অধিকাংশ সময়ই ডিপ্লয়ড কেন্দ্রিকার বিভাজনকালে ক্রসওভার হয়ে থাকে। ফলে কেন্দ্রিকার ক্রোমোজমের বংশাণুর নতুন সমাবেশ ঘটে এবং এটি প্যারাসেক্সুয়াল-চক্রের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

BANSDOC Library
Accession No. 18244

গ্রন্থপঞ্জি

১. দেবব্রত মিত্র, জি.গুহ, এস. কে. চৌধুরী ও এন. দত্ত : *উদ্ভিদবিজ্ঞান* (১ম খণ্ড)
২. আমজাদ আলী খান ও টি. ইসলাম : *উদ্ভিদবিজ্ঞান* (১ম খণ্ড)
৩. মাহবুব, হাসান ও জামান : *উদ্ভিদবিজ্ঞান* (১ম খণ্ড)
৪. এ. গঙ্গোপাধ্যায়, এন. সি. কুমার : *উদ্ভিদবিজ্ঞান* (১ম খণ্ড)
৫. এইচ. সি. মুখোপাধ্যায়, এন. বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় : *উদ্ভিদবিজ্ঞান* (১ম খণ্ড)
৬. হাসান আশরাফউজ্জামান : *ছত্রাকতত্ত্ব*
৭. Gangalee, H.C. and A.K. Kar : *College Botany* (Vol. 2)
৮. Vashista, B.R. : *Textbook of Botany* (Part II : Fungi)
৯. Alexopoulos, C.J. : *Introductory Mycology*
১০. Bessey, E.A. : *Morphology and Taxonomy of Fungi*
১১. Burnett, J.H. : *Fundamentals of Fungi*
১২. Cochrane, V.W. : *Physiology of Fungi*
১৩. Gauman, E.A. and Dodge, C.W. : *Comparative Morphology of Fungi*
১৪. Geoyne-Vavghan, H.CI and B. Barnes : *The Structure and Development of Fungi*
১৫. Hawker, L.E. : *An Introduction to Fungi*
১৬. Smith, G.M. : *Cryptogamic Botany* (Vol. II)
১৭. Stevenson, Gret.B. : *The Biology of Fungi, Bacteria and Viruses*
১৮. Ainsworth : *Dictionary of Fungi*
১৯. Ainsworth : *Fungi : An Advanced Treatise*